প্রথম প্রকাশ : শ্রাবণ, ১৩৭৮
[জুলাই, ১৯৭১]

প্রকাশনায়
ফজলে রাব্বি
পরিচালক
প্রকাশন-মুদ্রণ-বিক্রয় বিভাগ
বাংলা একাডেমী, ঢাকা-২

মুদ্রণে
এ. ওয়াসে
সাজ প্রিন্টার্স
৬, গোবিন্দদাস লেন,
আরমানিটোলা, ঢাকা

ভূমিকা

মধ্যযুগীয় ভারতে মুসলিম শাসন-ব্যবস্থা সম্পর্কে আরবী, ফার্সী, বিশেষ করিয়া ইংরেজী ভাষায়, বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তক ও গবেষণামূলক বহু মূল্যবান গ্রন্থ দেশী-বিদেশী প্রখ্যাত ঐতিহাসিকগণ রচনা করিয়াছেন। কিন্তু এই বিষয়ের উপর বাংলা ভাষায় আমার জানামতে এখনও কোন গবেষণামূলক গ্রন্থ কিংবা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তক লিখিত ও প্রকাশিত হয় নাই। ভারতে সুলতানী ও মোগল আমলে মুসলিম শাসন-ব্যবস্থার ইতিহাসের ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকা ও পণ্ডিতগণ দীর্ঘদিন ধরিয়া এই বিষয়ে বাংলা ভাষায় রচিত একটি পূর্ণাঙ্গ পুস্তকের অভাব অনুভব করিয়া আসিতেছেন। স্বাধীনতা অর্জনের পর থেকে বাংলাদেশে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে বাংলাভাষার মাধ্যমে উচ্চ শিক্ষা প্রদানের প্রচেষ্টা চলিতেছে। সুতরাং স্নাতক (সম্মান), স্নাতকোত্তর প্রথম পর্ব ও শেষ পর্বের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য বিভিন্ন বিষয়ে বাংলা ভাষায় পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন অপরিহার্য হইয়া পড়িয়াছে। উক্ত অভাব পূরণের উদ্দেশ্যেই, আমি এই পুস্তক রচনায় ব্রতী হইয়াছি।

বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের স্নাতক (সম্মান) ও স্নাতকোত্তর প্রথম পর্বের পাঠ্যক্রমে (syllabus), ভারতে মুসলিম শাসন-ব্যবস্থা নামক একটি বাধ্যতামূলক পত্র রহিয়াছে; কিন্তু উক্ত বিষয়ের উপর বাংলা ভাষায় কোন পুস্তক এখনও প্রকাশিত হয় নাই। বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত ছাত্র-ছাত্রীরা বাংলায় লিখিত পুস্তকের অভাবে খুবই অসুবিধার সম্মুখীন হইয়াছেন। সুতরাং বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রম অনুযায়ী, এই পুস্তকটি সর্বপ্রথম বাংলা ভাষায় রচিত হইল। এই বিষয় সম্পর্কে উৎসাহী ছাত্র-ছাত্রীরা যদি এই পুস্তক পাঠ করিয়া উপকৃত হন; তাহা হইলে আমার পরিশ্রম সার্থক বিবেচিত হইবে।

আরবী ফার্সী ভাষায় রচিত বহু সূত্র-গ্রন্থ, ইংরেজীতে লিখিত অনেক মূল গ্রন্থ ও সমসাময়িক পর্যটকদের ভ্রমণ-কাহিনী হইতে সংগৃহীত অতি মূল্যবান মৌলিক তথ্যাদি, এই পুস্তক রচনার কাজে ব্যবহৃত হইয়াছে। সুলতানী ও মোগল আমলে রাজদরবারের ঐতিহাসিক ও লেখকদের রচিত সমসাময়িক তথ্যবহুল গ্রন্থাদি এবং আধুনিক ইতিহাসবিদ্‌দের লিখিত পুস্তকাদি হইতে

প্রয়োজনীয় তথ্যাদি অকৃপণভাবে গ্রহণ করিয়াছি, উহা আমি সবিনয়ে কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি। মুদ্রা-বিজ্ঞান ও শিলালিপিও উপেক্ষিত হয় নাই; উহা হইতেও প্রয়োজনীয় মুখ্য তথ্যাদি কাজে লাগান হইয়াছে। বিভিন্ন ঐতিহাসিকের পরস্পর-বিরোধী-মতবাদ আলোচনা করিয়া, যথাসম্ভব স্বাধীন সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার চেষ্টা করা হইয়াছে। বিতর্কমূলক বিষয়বস্তু সম্পর্কে, ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গির স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিতে, চেষ্টার ত্রুটি করা হয় নাই। ভারতে মুসলিম শাসন-ব্যবস্থার ইতিহাসের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে ইদানীং প্রকাশিত ও আলোচিত তথ্যাদির নিরপেক্ষ ব্যবহার, এই পুস্তকে যথাযথভাবে করা হইয়াছে। ইংরেজ ঐতিহাসিকদের নাম, ইউরোপীয় পর্যটকদের নাম, ইংরেজী গ্রন্থ, পত্র-পত্রিকার নাম এবং শাসন-সংক্রান্ত কতকগুলি পারিভাষিক শব্দ সুবিধার খাতিরে পরিশিষ্টে ইংরেজীতে লিখিত হইয়াছে।

এই পুস্তক রচনার কাজে বন্ধুবর ডক্টর মমতাজুর রহমান তরফদার (ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়) আমাকে নানাভাবে সাহায্য করিয়াছেন, তাঁহার নিকট আমি কৃতজ্ঞ। বিশেষ উল্লেখযোগ্য যে, আমার স্ত্রী রোজীর আন্তরিক উৎসাহ ও উদ্দীপনা প্রদানের জন্যই, আমার পক্ষে এই কাজ সম্পন্ন করা সম্ভব হইয়াছে। তাঁহাকে মামুলি কথায় ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিয়া কৃতজ্ঞতা স্বীকার করা সম্ভব নহে। পরিশেষে, এই পুস্তক প্রকাশ করিবার জন্য আমি বাংলা একাডেমীকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

এ. কে. এম. আবদুল আলীম

ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

সূচীপত্র

প্রথম খণ্ড

সুলতানী আমলে শাসন-ব্যবস্থা

প্রথম অধ্যায়ঃ উপক্রমণিকা ১

সুলতানী আমলে শাসন-ব্যবস্থা প্রসঙ্গে তথ্যবহুল উৎস —আবরী ফার্সী সূত্র-গ্রন্থ—সমসাময়িক সাহিত্য—বিদেশী পর্যটকদের ভ্রমণ-কাহিনী — আইন ও রাজনীতিবিদ্যা সংক্রান্ত গ্রন্থ— মুদ্রা-বিজ্ঞান ও শিলালিপি—আধুনিক পুস্তক ; মোগল শাসন ব্যবস্থা সম্পর্কে তথ্যবহুল উৎস— ঘটনাপঞ্জী —সমসাময়িক ফার্সী গ্রন্থ— ফার্সী পাণ্ডুলিপি— সরকারী চিঠিপত্র ও নথিপত্র — জীবন-চরিত — রাজনৈতিক মতবাদ সংক্রান্ত গ্রন্থ—ইউরোপীয় পর্যটকদের ভ্রমণ কাহিনী—আধুনিক গ্রন্থ।

দ্বিতীয় অধ্যায়ঃ খলিফাদের সহিত দিল্লীর সুলতানদের সম্পর্ক ১০

খলিফা—আইনসঙ্গত বৈধ স্থান — সুলতান—সর্বপ্রথম ক্ষমতার পদে অভিষিক্তকরণ—মুস্তাসিমের মৃত্যু ও স্বীকৃতি সমস্যা — আলাউদ্দীন খল্‌জী—একজন দিল্লীর খলিফা— দ্বিতীয় অভিষিক্তকরণ, মুহম্মদ-বিন-তুঘলক— ফিরোজ শাহ—সাইয়েদ ও লোদী।

তৃতীয় অধ্যায়ঃ প্রকৃত সার্বভৌম সুলতান ১৮

সুলতানের ক্ষমতা, কর্তব্য, দায়িত্ব ও ইহার সীমাবদ্ধতা— শরিয়াত, প্রকৃত সার্বভৌম—সুলতানের আইন-প্রণয়ন ক্ষমতা—শরিয়াতের প্রকৃত প্রাধান্য ও ধর্মের প্রভাব— সুলতানের প্রতিপত্তি—সুলতানের সরকারী কর্তব্যাবলী—

ক্ষমতার সীমাবদ্ধতা—ব্যক্তিগত আইন—বিভিন্ন শ্রেণীর সহযোগিতা।

চতুর্থ অধ্যায় ঃ রাজকীয় গৃহস্থালী সংগঠন ২৪

দরবার ও উৎসবাদি—গৃহস্থালী সংগঠন—সংগঠনের উচ্চ-পদস্থ ও নিম্নপদস্থ কর্মচারিবৃন্দ ওয়াকিল-ই-দার—আমীর হাজিব (বারবেক্)—নকিব —দেহরক্ষী ('জানদার')—অধস্তন কর্মচারিগণ—আমীর-ই-মজলিস—কারখানা—রাতিবি—গায়ের রাতিবি— রাজ আস্তাবল—রাজকীয় শিকার—রাজদরবারে শিষ্টাচার ও মার্জিত আদব-কায়দা —রাজপরিবার—ক্রীতদাস।

পঞ্চম অধ্যায় ঃ কেন্দ্রীয় শাসন ব্যবস্থা ৩৩

রাজ্য-শাসনে আলাপ-আলোচনা ও শলা-পরামর্শের প্রয়োজনীয়তা—মন্ত্রিমণ্ডলী,প্রতিনিধিমূলক পরিষদ কিনা? ওয়াজির (প্রধানমন্ত্রী)—ওয়াজিরের বৈধ শ্রেণীবিভাগ—ওয়াজিরের কর্তব্য—ওয়াজিরের পদমর্যাদা—ওয়াজিরের বাধা ও অসুবিধা—কেন্দ্রীয় পরিষদ—দিওয়ান-ই-ওয়াজিরাত (ওয়াজিরের দপ্তর)—অন্যান্য মন্ত্রণালয়—দিওয়ান-ই-রিসালাত, দিওয়ান-ই-কাজা—দিওয়ান-ই-আরজ—দিওয়ান-ই-ইনশা—দিওয়ান-ই-বারিদ—বিভিন্ন দপ্তর—গোয়েন্দা ও গুপ্তচর—কেন্দ্রীয়-মন্ত্রিদের স্থান—না'ইব-উল-মুলক—মন্তব্য।

ষষ্ঠ অধ্যায় ঃ অর্থ ও রাজস্ব-ব্যবস্থা ৫৫

রাজস্বের প্রধান উৎস—ধর্মীয় ও বৈষয়িক গানিমাত—জাকাত — সাদকাহ্— ওশর — জিজিয়া—ভূমি-রাজস্ব 'ওশরি জমি—সুল্‌হি জমি—আরজ-ই-মুমলিকাত—খারাজ বণ্টন ব্যবস্থা ('শেয়ারিং প্রথা')—মূল্য নির্ধারণ পদ্ধতি—

জরিপের রীতি—কর নিরূপণ—রাজস্বের নির্দিষ্ট হার—নগদে অথবা শস্যের মাধ্যমে রাষ্ট্রের রাজস্ব প্রদান—রাষ্ট্রের রাজস্ব দাবি—রাষ্ট্রের অংশ—শতকরা নির্দিষ্ট হারে কর সংগ্রহকারী—ভূমি সমর্পণ, হস্তান্তর ও স্বত্ব-নিয়োগ—ইক্‌তা—জায়গীর প্রথা— মূল্য-নির্ধারণ—রাজস্ব এককে সাম্রাজ্য বিভক্তিকরণ—রাজস্ব আদায়কারী কর্মচারিবৃন্দ—উত্তরাধিকারীহীন সম্পত্তি—উপহার ও উপঢৌকন—ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চিত ধন—আয়-ব্যয়ের আর্থিক আগাম হিসাব।

সপ্তম অধ্যায় ঃ সামরিক শাসন-ব্যবস্থা ৮৫

কেন্দ্রীয় সামরিক-দপ্তর, দিওয়ান-ই-আরজ—দাগ ও হুলিয়া প্রথা—সৈন্যদের নির্দিষ্ট স্থানে নিয়োগ—সামরিক বাহিনীর শ্রেণী বিন্যাস — অশ্বারোহী বাহিনী— হস্তি-বাহিনী — পদাতিক বাহিনী — গোলন্দাজ, অস্ত্রশস্ত্র, আগ্নেয়াস্ত্র, কামান, গোলা-বারুদ—দুর্গ অবরোধ, ইঞ্জিন ও কৌশল — সন্ধানী লোক ('স্কাউট') ও গুপ্তচর—ভ্রাম্যমাণ হাসপাতাল— পতাকা —সামরিক সংগঠন—বেতন ও ভাতা—পুরস্কার ও সম্মান-চিহ্ন—সৈন্য সংখ্যা—সেনাবাহিনীতে কর্মচারিবৃন্দ—যুদ্ধক্ষেত্রে শ্রেণীবদ্ধভাবে সৈন্য সমাবেশ—প্রশিক্ষণ, শৃঙ্খলা ও নৈতিক চরিত্র।

অষ্টম অধ্যায় ঃ বিচার ও পুলিশী শাসন-ব্যবস্থা ১০৪

সদর-উস্‌-সুদুর — কাজী-ই-মুমালিক—শেখ-উল্‌-ইসলাম—বিচার ব্যবস্থায় প্রধান আইন বলবৎকারী—দিওয়ান-ই সিয়াসত — দিওয়ান-ই-মাজালিম — দিওয়ান-ই-কাজা—কাজী—আমীর-ই-দাদ — বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীর মধ্যে কলহ-বিবাদ -- মুহতাসিব — দিওয়ান-ই-রিয়াসাত — পুলিশ—বিচারে নিরপেক্ষ নীতি ও আদর্শ।

নবম অধ্যায় ঃ প্রাদেশিক ও স্থানীয় শাসন-ব্যবস্থা ১১৭

প্রাদেশিক গভর্ন'র — গভর্ন'রের কর্তব্য ও দায়িত্ব— প্রাদেশিক আরিজ — প্রাদেশিক সাহিব-ই-দিওয়ান — প্রশাসনিক বিভাগ—শিক কিংবা সরকার-এর প্রশাসনিক কাঠামো—পরগণার (কস্‌বাহ্‌র) প্রশাসনিক কাঠামো—স্থানীয় শাসন-ব্যবস্থা, গ্রাম—মন্তব্য।

দ্বিতীয় খণ্ড

মোগল আমলে শাসন-ব্যবস্থা

প্রথম অধ্যায় ঃ মোগল শাসন-ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য ১২৭

বর্ত'মান কালে মোগল শাসন-পদ্ধতির দিক ও প্রভাব—মোগল শাসন-ব্যবস্থায় দেশী ও বিদেশী উপকরণ—সামরিক পদ্ধতি—রাজস্ব নীতির বৈশিষ্ট্য—আইন ও বিচার পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য।

দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ সম্রাট ১৩৩

সার্বভৌম, ওসমানী খেলাফতের সহিত মোগল সম্রাটদের সম্পর্ক—ঐশ্বরিক ক্ষমতা—আল্লাহর প্রতিবিম্ব, প্রতিচ্ছায়া—কেন্দ্রীয় শাসন-ব্যবস্থা— রাষ্ট্রে সম্রাটের বৈধস্থান—সম্রাটের কর্ত'ব্য, দায়িত্ব নিষ্ঠা ও সরকারী নিত্যকর্ম সম্পাদন—ঝরোকা-দর্শন—সম্রাটের নিত্য কর্ম-তালিকার গুরুত্ব — মোগল দরবার — রাজ আস্তাবল—রাজকীয় শিকার—রাজকীয় বিশিষ্ট সম্মান—পরিচয়-চিহ্ন—খুৎবা—তিরাজ—সিক্কাহ্—ফরমানসীল-মোহর।

তৃতীয় অধ্যায় ঃ কেন্দ্রীয় শাসন-ব্যবস্থা ১৪২

সম্রাটের বিশেষ অধিকার, ক্ষমতা ও সুযোগ-সুবিধা—সম্রাটের অনিয়ন্ত্রিত ক্ষমতা—ওয়াজির, প্রধানমন্ত্রীর পদমর্যাদা, কর্তব্য, দায়িত্ব ও ক্ষমতা — ওয়াকিল, বৈরামখানের ক্ষমতা—কেন্দ্রীয় শাসন-ব্যবস্থায় চারি মন্ত্রী ও দপ্তরসমূহ—দিওয়ান, অর্থ ও রাজস্ব দপ্তর—প্রধান দিওয়ানের কর্তব্য — দিওয়ান-ই-তানের (তঙ্কার) কর্তব্যাদি — দিওয়ান-ই-খালসার কর্তব্যাদি— আকবর ও অন্যান্য সম্রাটের আমলের দিওয়ান—টোডরমলের রাজস্ব সংস্কার—মীরবখ্‌শী ও সামরিক দপ্তর—মীর-বখ্‌শীর কর্তব্যাদি — মীরসামান (খানসামান) ও সরবরাহ দপ্তর—মীরসামানের (খানসামানের) কর্তব্যাদি —সরবরাহ মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাগণ—সদর, ধর্মবিষয়ক দপ্তর ও বিচার বিভাগ—সদরের কর্তব্য ও দায়িত্বাদি—ধর্মবিষয়ক দপ্তর অর্থাৎ সদরের দপ্তর—কাজী ও বিচার বিভাগ—কেন্দ্রীয় শাসন ব্যবস্থায় মন্ত্রীদের স্থান।

চতুর্থ অধ্যায় ঃ অর্থ ও ভূমি-রাজস্ব ব্যবস্থা ১৬৭

আল্‌গানিমাহ্‌ — আজ-জাকাত ও আস্‌-সাদ্‌কাহ্‌ — আল্‌-জিজিয়া—আল্‌-ফে—মোগল আমলে জমির শ্রেণী বিন্যাস—খালিসা জমি—আল্‌-ইক্‌তা—আল্‌-'ওশুর ও আমদানির উপর শুল্ক—বাজেয়াপ্ত সম্পত্তি—একচেটিয়া ব্যবসা—টাকশাল—খনি — উপহার ও উপঢৌকন—'আবওয়াব' (অবৈধ কর)—ভূমি-রাজস্ব-ব্যবস্থা, রাজস্ব এককে সাম্রাজ্য বিভক্তিকরণ—রাজস্ব কর্মচারী—রাষ্ট্রের অংশ, খারাজ—ভূমি রাজস্ব নিরূপণ পদ্ধতি—সাম্রাজ্যের মোট ভূমি-রাজস্বের পরিমাণ — রাজস্ব আদায়ের ব্যবস্থা।

পঞ্চম অধ্যায় ঃ সামরিক শাসন-ব্যবস্থা ১৮৩

মনসবদারী প্রথা—প্রথম পর্যায়—দ্বিতীয় পর্যায়—তৃতীয় পর্যায়—চতুর্থ পর্যায়—পঞ্চমও শেষ পর্যায়—সামরিক বাহিনীর পুনর্গঠন পরিকল্পনা—মনসবদারদের শ্রেণী-বিভাগ—দাখিলী ও আহ্দী—বিভিন্ন জাতির সমন্বয়ে সেনাবাহিনী--বেতন ও ভাতা--পুরস্কার, বিশেষ উপাধি, সম্মান-চিহ্ন—জলন্ত-লোহ দ্বারা চিহ্নিতকরণ—'চেহ্রাহ' (হুলিয়া) পদ্ধতি—অশ্বের শ্রেণী বিন্যাস—'তশিহাহ্' সনাক্তকরণ—সেনাবাহিনীর বিভিন্ন শাখা—অশ্বারোহী—পদাতিক—হস্তী—গোলন্দাজ, কামান, গোলাবারুদ, মীর আতশ—অস্ত্রশস্ত্র—তরবারি—যুদ্ধে ব্যবহৃত কুঠার—বর্শা—ছোরা ও ছুরি — তীর-ধনুক—পিস্তল—বর্ম — সংগঠন — শৃঙ্খলা, সামরিক কুচকাওয়াজ ও প্রশিক্ষণ—দুর্গ ও সামরিক ঘাঁটি—দুর্গ অবরোধ কৌশল—সৈন্যদের অগ্রগমন—পরিবহণ—শিবির—স্ত্রীলোক—সরবরাহ—গোয়েন্দা ও গুপ্তচর—মনোবল।

ষষ্ঠ অধ্যায় ঃ বিচার-ব্যবস্থা ২০৮

বিচার-সংগঠন—সম্রাট—সদর—প্রধান কাজী — সুবার কাজী—সরকার-এর কাজী—পরগণার কাজী—মুফ্তি—মীর আদল—কাজী-ই-আস্কার—বিচারের নিয়ম-পদ্ধতি ও কার্যপ্রণালী—অপরাধ সম্পর্কে মুসলিমদের ধারণা ও অপরাধের শ্রেণী বিন্যাস—অপরাধ প্রতিরোধের উপর গুরুত্ব আরোপ—শাস্তির শ্রেণী বিভাগ--আপীল—মামলা মোকদ্দমার দ্রুত বিচার সম্পাদন—মুহতাসিব—শান্তি-শৃঙ্খলা ও পুলিশ—কারাগারের প্রশাসন-ব্যবস্থা—মন্তব্য।

সপ্তম অধ্যায় ঃ প্রাদেশিক ও স্থানীয় শাসন-ব্যবস্থা ২২৬

সাম্রাজ্য সুবায় বিভক্তিকরণ—সুবার বিভিন্ন দপ্তর ও প্রধান কর্মকর্তাগণ—গভর্নর (সুবাদার)—'আতালিক'

(উপ-গভর্নর) — ভারপ্রাপ্ত ভাইস্‌রয়—যুগ্ম গভর্নর—সুবাদারের কর্তব্যও দায়িত্ব—দিওয়ান—প্রদেশে দ্বৈত শাসন পদ্ধতি—দিওয়ানের কর্তব্য ও দায়িত্ব—দিওয়ানের সচিবালয়—বখশী —সদরও কাজী —কোতোয়াল —ফৌজদার—মীরবহর—সংবাদ সংস্থা ও সংবাদদাতা—প্রাদেশিক সরকারের প্রকৃতি—স্থানীয় শাসন-ব্যবস্থা—সরকার-এর শাসন-ব্যবস্থা—পরগণার শাসন-ব্যবস্থা—শহরের শাসন-ব্যবস্থা--কোতোয়ালের ক্ষমতা ও দায়িত্ব — বন্দরের শাসন-ব্যবস্থা — বন্দরের শাসন-ব্যবস্থায় কর্মকর্তাগণ — গ্রাম্য শাসন-ব্যবস্থা — গ্রাম্য পরিষদ, পঞ্চায়েৎ--পঞ্চায়েৎ নির্বাচন—পঞ্চায়েৎ উপ-কমিটি—পঞ্চায়েতের কর্মচারীদের কর্তব্য — পঞ্চায়েতের কার্যাবলী।

অষ্টম অধ্যায় ঃ উপসংহার ... ...

মোগল শাসন ব্যবস্থায় কৃতিত্ব, ত্রুটি-বিচ্যুতি ও দোষ-গুণ।

পরিশিষ্ট ঃ

(ক) বংশ-পরিচয় ২৫৬

(খ) শব্দ-কোষ ২৬১

(গ) গ্রন্থপঞ্জী ২৬৮

(ঘ) শব্দ-সংক্ষেপ ২৮৫

(ঙ) নির্ঘণ্ট ২৮৬

———

প্রথম খণ্ড

সুলতানী আমলে শাসন-ব্যবস্থা

প্রথম অধ্যায়

উপক্রমণিকা

মধ্যযুগীয় ভারতে সুলতানী আমলে মুসলিম শাসন- ব্যবস্থার ইতিহাস রচনা করিতে যে সকল তথ্যের উৎস ব্যবহৃত হইয়াছে, উহা সংক্ষিপ্তভাবে নিম্নে আলোচিত হইল।

মৌলিক উৎসরূপে আরবী ও ফার্সী সূত্র গ্রন্থাদির মূল্য অপরিসীম। উৎবীর রচিত 'তারিখ-ই-ইয়ামিনী' পুস্তকে গজনী সুলতানদের শাসন-ব্যবস্থার পদ্ধতি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা নাই। আবুল ফজল বইহাকীর লিখিত 'তারিখ-ই আল্-ই সবুক্তিগীন' নামক পুস্তকটি দুর্ভাগ্যবশতঃ এখনও পাওয়া যায় নাই; তবে এই পুস্তকেরই একটি খণ্ডবিশেষে 'তারিখ-ই বইহাকী'তে গজনী কেন্দ্রীয় সরকারের শাসন-ব্যবস্থা, বিশেষ করিয়া দরবার পরিচালনা বিস্তারিতভাবে লিখিত আছে। আল্ কারদিজীর রচিত 'জয়নুল আখ্‌বার' একটি সংক্ষিপ্ত ও নীরস ঘটনাপঞ্জী।

দিল্লী সুলতানী আমলের গোড়ার দিকের শাসন-ব্যবস্থা সম্পর্কে (১১৯১-১২১৭ খ্রীস্টাব্দ) হাসান নিজামী রচিত 'তাজ-উল-মা'আছির' একটি মৌলিক উৎস ও একটি তথ্যবহুল প্রশাসনিক পুস্তক। 'তারিখ-ই-ফখর উদ্দীন মুবারক শাহ' একটি সমসাময়িক মূল্যবান ঘটনা-সম্বলিত গ্রন্থ। শুধু সুলতান কুতুবউদ্দীন আইবেক সম্পর্কে এই পুস্তকে আলোচিত হইয়াছে। আবু ওমর মিনহাজ উদ্দীন ওসমান-বিন-সিরাজ উদ্দীন আল্ জাওয়াজ জানীর রচিত 'তবাকাত-ই নাসিরী' মুসলিম ইতিহাসের একটি সংক্ষিপ্তসার গ্রন্থ। এই পুস্তকে ১২৬১ সাল পর্যন্ত দিল্লীর সুলতানদের ইতিহাস পাওয়া যায়। মিনহাজ নিজে কিছু দিনের জন্য প্রধান কাজী ছিলেন; কিন্তু দুভার্গ্যবশতঃ তাঁহার রচনায় শাসন-ব্যবস্থা সম্পর্কে খুব বিস্তারিত আলোচনা লক্ষ্য করা যায় না। জিয়াউদ্দীন বারনীর লিখিত 'তারিখ-ই-ফিরোজশাহী' একটি মূল্যবান সমসাময়িক গ্রন্থ। তিনি একজন অবসর-প্রাপ্ত রাজকর্মচারী ছিলেন এবং দেশের শাসন-ব্যবস্থা সম্বন্ধে তাঁহার প্রচুর উৎসাহ ছিল। যদিও তাঁহার ঘটনাপঞ্জী নির্ভরযোগ্য নহে, তবুও শাসন-সংক্রান্ত সংস্কারাদি

তিনি নিখুঁতভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। শামস-ই-সিরাজ আফিফের রচিত 'তারিখ-ই-ফিরোজশাহী' একটি সমসাময়িক তথ্যবহুল পুস্তক। তিনিও একজন রাজকর্মচারী ছিলেন। তাঁহার পুস্তকে সুলতান ফিরোজশাহ তুঘলকের আমলের শাসন-ব্যবস্থার বিস্তারিত আলোচনা রহিয়াছে। বাঁকিপুর সাধারণ গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত 'সিরাত-ই-ফিরোজশাহী' একটি দুর্লভ পাণ্ডুলিপি। খলিফার সঙ্গে দিল্লীর সুলতানদের সম্পর্ক ইহাতে আলোচিত হইয়াছে।

ইয়াহিয়া বিন আহমদ আস্-সহরিন্দীর রচিত 'তারিখ-ই-মুবারকশাহী'তে সাইয়েদ সুলতানদের ১৪৩৪ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত শাসন-ব্যবস্থা সম্পর্কে বর্ণনা রহিয়াছে। আফগান বংশের শাসন-ব্যবস্থা সম্পর্কে কোন সমসাময়িক ঘটনাপঞ্জী নাই। সুতরাং পরবর্তী সময়ে মোগল সম্রাট আকবর কিংবা জাহাঙ্গীরের আমলে লিখিত পুস্তকের উপর আমরা নির্ভরশীল, যেমন খাজা নেয়ামতউল্লাহ্ হিরাতির রচিত 'তারিখ-ই-খানজাহানী' বা 'মাখজান-ই-আফগানী' এবং আব্বাস সারওয়ানীর লিখিত 'তুহফাহ্-ই-আকবরশাহী' বা 'তারিখ-ই-শেরশাহী'। তবে এই পুস্তকাদিতে আফগান সুলতানদিগকে আদর্শ শাসকরূপে প্রশংসা করিবার চেষ্টার প্রয়াসে অতিশয়োক্তি করা হইয়াছে, ইহা অনস্বীকার্য। কিন্তু নিজাম উদ্দীন আহমদ-রচিত 'তবাকাত-ই-আকবরী' ও আবদুল কাদির বদায়ূনী-লিখিত 'মুন্তাখাব-উত্-তাওয়ারিখ' গ্রন্থদ্বয়ে প্রয়োজনীয় সংশোধন লক্ষ্য করা যায়।

সমসাময়িক সাহিত্যে বহু মূল্যবান তথ্য নিহিত আছে। আমীর খুসরুর রচনাবলী গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক তথ্যে সমৃদ্ধ। তাঁহার 'তুঘলক-নামা' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। 'নুহসিপিহর'এ সুলতান কুতুবউদ্দীন মুবারকশাহের আমলের রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক অবস্থা বর্ণিত আছে। 'ইজাজ-ই-খুসরুভী' শাসন-ব্যবস্থার উপর প্রচুর আলোকপাত করিয়াছে। খুসরুর সমসাময়িক হাসানের গীতিকাব্যও খুবই জ্ঞানগর্ভ। ইসামী রচিত 'ফুতুহ-উস্-সালাতিন' মধ্যযুগীয় ভারতের মূল্যবান ঘটনাপঞ্জী। সুলতান ফিরোজশাহ তুঘলকের অন্যতম মন্ত্রী আইন-উল-মুলক সরকারের শাসন-ব্যবস্থা সংক্রান্ত বহু তথ্যপূর্ণ সরকারী চিঠিপত্র সংগ্রহ করেন। তাঁহার সংগৃহীত 'ইনশা-ই-মাহরু' শাসন-ব্যবস্থার উপর আলোকপাত করিয়াছে। সরকারের শাসন-ব্যবস্থা কিভাবে পরিচালিত হইত, উহাতে ইহার বিস্তারিত আলোচনা রহিয়াছে।

সুলতানী আমলে বিদেশী পর্যটকদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ছিলেন ইবনে বতুতা। তিনি ১৩৩৩ সনে ভারতে আগমন করেন এবং নয় বৎসর এই দেশে অবস্থান করেন। তাঁহার 'তুহফাত্-উন্-নুজ্জার ফি গরাইব-ই-অল্-আমসার' পুস্তকে সুলতানী আমলে সরকারের শাসন-ব্যবস্থা, সামাজিক জীবন ও রাজদরবারের চমৎকার বর্ণনা করা হইয়াছে; যদিও ইহা খুব নির্ভরযোগ্য নহে, কারণ ইহার ভিত্তি ছিল মূলতঃ জনশ্রুতি ও জনরব। ইবনে ফজলউল্লাহ্ আল-উমারি রচিত 'মাসালিক-উল-আবসার ফি মুমালিক আল-আমসার' গ্রন্থে বিভিন্ন পরিভ্রমণকারী ও প্রবাসী ভারতীয় মুসলিমদের বিবরণী সংগৃহীত হইয়াছে। এই বিবরণী সুলতান মুহম্মদ-বিন তুঘলকের রাজত্বকাল সম্পর্কিত। বিদেশী পর্যটকদের ভ্রমণ-কাহিনীর গুরুত্ব অনস্বীকার্য।

সুলতানী আমলের রাজনৈতিক ও আইন সংক্রান্ত পুস্তকাদি স্বভাবতঃই মুসলিম শাসন-ব্যবস্থার ইতিহাসের প্রয়োজনীয় পটভূমি সৃষ্টি করিয়াছে। 'হিদায়াহ্ ও ওয়াকেয়াহ্' হইতেছে বিখ্যাত আইন-গ্রন্থ। সুলতান ফিরোজশাহের পৃষ্ঠপোষকতায় রচিত 'ফিকাহ-ই-ফিরোজশাহী' বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ফখরউদ্দীন মুবারক শাহের রচিত 'আদব-উল-মুলুক ওয়া কিফায়াতে-উল-মামলুক' এবং হাজী আবদুল হামিদ মুহাররির গজনভীর লিখিত 'দস্তুর-উল-অলবাব ফি ইলম-ইল-হিসাব' নামক পুস্তকদ্বয়ে সমসাময়িক রাজনৈতিক, সামরিক অবস্থা ও সরকারের প্রশাসনিক কাঠামোর চিত্র চমৎকারভাবে অঙ্কিত হইয়াছে। বিশেষ করিয়া এই সমসাময়িক গ্রন্থে রাজস্ব ব্যবস্থা সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে আলোচিত হইয়াছে; ইহার ঐতিহাসিক গুরুত্ব তুলনাহীন।

রাজনৈতিক ইতিহাস লিখিতে যেমন মুদ্রা-বিজ্ঞান, পরিমাপ-বিজ্ঞান ও শিলালিপি তথ্যের উৎস হিসাবে অতীব প্রয়োজনীয়, তেমনি শাসন-ব্যবস্থার ইতিহাস রচনায়ও ইহাদের গুরুত্ব অপরিসীম। এই ক্ষেত্রে এড্ওয়ার্ড টমাস ও এইচ. নেলসন্ রাইট-এর পুস্তকাদি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

ভারতীয় মুসলিম ও অমুসলিম ঐতিহাসিকদের ইংরেজীতে লিখিত, ভারতে মুসলিম শাসন-ব্যবস্থা সংক্রান্ত অনেক গ্রন্থ, আরবী ও ফার্সী ভাষায় লিখিত বহু মূল গ্রন্থের ইংরেজীতে অনুবাদ ইত্যাদি অতি সতর্কতার সহিত এই পুস্তক রচনায় ব্যবহৃত হইয়াছে। বাছাই করা পুস্তকাদির পূর্ণ তালিকা পরিশিষ্টে গ্রন্থপঞ্জীতে সংযোজিত হইয়াছে বলিয়া এখানে ইহার পুনরাবৃত্তি নিষ্প্রয়োজন।

ভারতে মোগল আমলে মুসলিম শাসন-ব্যবস্থার ইতিহাস লিখিতে যে সকল মৌলিক গবেষণামূলক তথ্যবহুল উৎস[১] ব্যবহৃত হইয়াছে, নিম্নে তাহা সংক্ষিপ্তাকারে আলোচনা করা হইল।

এই ব্যবহৃত উৎসগুলিকে আট ভাগে ভাগ করা যায়ঃ

(১) এই সময়ের ঘটনাপঞ্জী;

(২) সমসাময়িক ফার্সী গ্রন্থ;

(৩) মোগল সাম্রাজ্যের শাসন-ব্যবস্থার বিশ্লেষণ সম্বলিত ফার্সী পাণ্ডুলিপি;

(৪) সরকারী চিঠিপত্র ও নথিপত্র;

(৫) জীবন-চরিত;

(৬) মুসলিম আইনশাস্ত্রজ্ঞ ও অন্যান্য লেখকদের রাজনৈতিক মতবাদের উপর রচিত পুস্তকাদি;

(৭) ইউরোপীয় পর্যটকদের ভ্রমণকাহিনী এবং

(৮) সাম্প্রতিক কালে রচিত পুস্তকাদি।

মহামতি মোগল সম্রাট আকবরের শাসন-ব্যবস্থার পূর্ণাঙ্গ আলোচনা প্রখ্যাত ঐতিহাসিক আবুল ফজলের রচিত 'আকবর-নামায়' পাওয়া যায়। 'আকবর নামা' আকবরের রাজত্বকালের একটি প্রামাণিক ও বিশ্বাসযোগ্য গ্রন্থ।

'আইন-ই-আকবরী' আকবর-নামার তৃতীয় খণ্ড। আকবরের কেন্দ্রীয় শাসন-ব্যবস্থার বিভিন্ন দপ্তর ও কার্যাবলী ইহাতে বিশদভাবে বর্ণিত আছে।

সম্রাট জাহাঙ্গীরের আত্মজীবনী 'তুজুক-ই-জাহাঙ্গীরী' একটি মূল্যবান গ্রন্থ। তৎকালীন মোগল শাসন-ব্যবস্থার বিস্তারিত বিবরণ এই পুস্তকে পাওয়া যায়।

মোগল রাজদরবারের ঐতিহাসিক আবদুল হামিদ লাহোরীর রচিত 'বাদশাহ-নামা' ('পাদশাহনামা') গ্রন্থে সম্রাট শাহজাহানের আমলের মোগল শাসন-ব্যবস্থার পূর্ণ চিত্র পাওয়া যায়।

মোগল রাজকর্মচারী মুহম্মদ সালিশ কামবুহের রচিত 'আমল-ই-সালিহ' নামক গ্রন্থটিও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

মোগল সম্রাটদের প্রত্যেকের রাজত্বকালেই, সমসাময়িক লেখক ও ঐতি-

১ বিশেষ দ্রষ্টব্য: আচার্য যদুনাথ সরকার: 'মুসলমান ভারতের ইতিহাসের উপকরণ' (প্রবাসী ১৩৫১, ভাগ ৯, নং ১১, ফাল্গুন, পৃঃ ৮৭৩-৮৭৯)।

হাসিকগণ ফার্সী ভাষায় মূল্যবান তথ্য-সম্বলিত গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। নিজামউদ্দীন রচিত 'তবাকাত-ই-আকবরী' ও বদায়ুনী রচিত 'মুন্‌তাখাব-উত্‌-তাওয়ারিখে'র নাম পূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। আকবরের শাসন-ব্যবস্থার ইতিহাস হিসাবে তুলনামূলকভাবে বদায়ূনীর গ্রন্থ নিজামউদ্দীনের গ্রন্থ অপেক্ষা অধিক প্রয়োজনীয়। বদায়ূনীর পুস্তকটি আকবরের রাজত্বের রাজনৈতিক বাদানুবাদ সম্বন্ধে মূলতঃ লিখিত হইলেও, শাসন-ব্যবস্থার বিভিন্ন বিভাগ সম্পর্কে যে প্রচুর তথ্য এই পুস্তকে পাওয়া যায়, ইহার সঠিক মূল্যায়ন করা হয় নাই।

জাহাঙ্গীরের আমলে মুতামিদ খানের রচিত 'ইকবালনামা' গ্রন্থের নাম উল্লেখ করিতে হয়। 'মা'আছির রহিমী' জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালের ইতিহাসের জন্য প্রয়োজনীয় পুস্তক, কিন্তু এই পুস্তকটি শাসন-ব্যবস্থার ইতিহাসের সঙ্গে সরাসরিভাবে জড়িত নহে।

শাহজাহানের আমলে সাম্রাজ্যের রাজকর্মচারীদের শাসন-ব্যবস্থার কার্যাবলী সম্পর্কে, উচ্চ রাজকর্মচারী সাদিক খানের রচিত 'তারিখ-ই-শাহজাহানী' প্রয়োজনীয় উপকরণবহুল একটি উল্লেখযোগ্য পুস্তক (ব্রি. মি. প্রা. পাণ্ডুলিপি ১৭৪)। সমসাময়িক লেখক চন্দ্রাভন ব্রাহ্মণের রচিত 'চাহার চামন' নামক গ্রন্থটি (ব্রি. মি. অ. পাণ্ডুলিপি ১৬, ৮৬৩) শাহজাহানের আমলের শাসন-ব্যবস্থা পরিচালনা সম্পর্কে একটি অতি মূল্যবান প্রামাণিক গ্রন্থ। মোগল সাম্রাজ্যের শাসন-ব্যবস্থার ইতিহাস রচনা করিতে, কোন লেখকই এখনও উক্ত গ্রন্থটি সঠিকভাবে ব্যবহার করেন নাই।

মোগল সাম্রাজ্যের বিভিন্ন প্রশাসনিক দপ্তরের আভ্যন্তরীণ কার্যাবলী ও প্রশাসনিক আইন-কানুন সম্পর্কে রচিত আরেক শ্রেণীর ফার্সী মৌলিক পাণ্ডুলিপি রহিয়াছে।

'দস্‌তুর-উল-আমল-ই-আওরঙ্গজেবী' (ব্রি. মি. অ. পাণ্ডুলিপি ৬৫৯৯) নামক পাণ্ডুলিপিটি প্রধান প্রধান প্রশাসনিক আইন-কানুন ও রাষ্ট্র পরিচালনার পদ্ধতির একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণী।

মোগল কেন্দ্রীয় রাজস্ব ও প্রাদেশিক শাসন-ব্যবস্থার বিশদ ধারণা-লাভের জন্য চাত্তারমল-রচিত 'দিভান্ পসন্দ' (ব্রি. মি. অ. পাণ্ডুলিপি ২০১১), নামক পাণ্ডুলিপি অত্যধিক প্রয়োজনীয়।

শাকির খানের রচিত 'তারিখ-ই-শাকিরখানী' (ব্রি. মি. অ. পাণ্ডুলিপি

৬৫৮৫) মোগল সম্রাটদের বিশেষ করিয়া আকবরের শাসন-ব্যবস্থার উপর বিশেষ আলোকপাত করিয়াছে।

মোগল প্রাদেশিক শাসন-ব্যবস্থা, বিশেষ করিয়া সুবা, সরকার ও মহলের বিস্তারিত আলোচনা মুন্সী ঠাকুর লালের রচিত 'দস্তুর উল-আমল-ই-শাহানশাহী' নামক ফার্সী পাণ্ডুলিপিতে পাওয়া যায়।

'মিরাট-উল-ইস্তিলাহ' (ব্রি. মি. প্রা. পাণ্ডুলিপি ৮১৩) ফার্সী পাণ্ডুলিপিতে মোগল রাজকর্মচারী, মনসবদারদের উপাধি প্রদানের নিয়ম এবং বেতন ও ভাতা সংক্রান্ত নিয়মাবলী বর্ণিত আছে।

নজাফ আলী খানের প্রস্তুতকৃত মনসবদারদের পদ ও বেতনের বিভিন্ন ধাপের তালিকার পূর্ণ বিবরণ 'শারাহ-ই-মনসিব' (ব্রি. মি. প্রা. পাণ্ডুলিপি ১৯০৬) নামক ফার্সী পাণ্ডুলিপিতে আলোচিত হইয়াছে।

আলী মুহম্মদ খানের রচিত ফার্সী পাণ্ডুলিপি 'মিরাট-ই-আহমদী' (ব্রি. মি. অ. পাণ্ডুলিপি ৬৫৮০) একটি উল্লেখযোগ্য পুস্তক। মোগল আমলে একটি প্রাদেশিক শহর কিভাবে শাসিত হইত, ইহার সুস্পষ্ট ধারণা এই পুস্তক পাঠে লাভ করা যায়।

মোগল আমলের রাজদরবারের সরকারী চিঠিপত্র ও নথিপত্রের সংকলন, মোগল শাসন-ব্যবস্থার সম্যক ধারণা লাভের জন্য একটি উল্লেখযোগ্য উপাদানের উৎস।

কেন্দ্রীয় রাজধানী দিল্লী ও প্রাদেশিক রাজধানীতে রক্ষিত সরকারী কাগজপত্রের বেশীর ভাগ বিলুপ্ত হইয়াছে। সৌভাগ্যবশতঃ আম্বরে (জয়পুর) রক্ষিত সরকারী নথিপত্র নষ্ট হয় নাই এবং এখনও সুরক্ষিত আছে। দলিলপত্রের সর্বাপেক্ষা মূল্যবান হইতেছে এই 'আখবরাত'। এইগুলিকে মোগল দরবারের কার্যাবলীর ধারাবাহিক বিবরণী বলিলে আরও সঠিক হইবে। ইহাতে রহিয়াছে সরকারী কর্মচারী নিয়োগ-পদ্ধতি, বেতনের হার, ছুটি মঞ্জুরি, রাজস্ব হিসাব, প্রশাসনিক সংস্কার ইত্যাদি।[১] সমর অধিনায়ক, গভর্ণরদের ক্ষমতা, ভূমি রাজস্ব ধার্য ও আদায় সংক্রান্ত নিয়মাবলী ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে। তদুপরি মুন্সী হরকরানের লিখিত 'ইনশা-ই-হরকরানে' মোগল শসন-ব্যবস্থায় ভূমি-রাজস্ব ধার্য ও আদায় পদ্ধতির বিস্তারিত আলোচনা রহিয়াছে।

১ শ্রীরাম শর্মা : মোগল গভর্ণমেন্ট অ্যাণ্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, পৃঃ ৮-১১ ও ১৩।

চাহার চামনের গ্রন্থকার চন্দ্রাভন ব্রাহ্মণের 'ইনশা-ই-ব্রাহ্মণে' (আই. ও. অতিরিক্ত পাণ্ডুলিপি ২৬,১৪১) মোগল সম্রাটদের সঙ্গে উচ্চ রাজকর্মচারীদের এবং উচ্চ রাজকর্মচারীদের মধ্যেকার পারস্পরিক সম্পর্ক আলোচনা করা হইয়াছে।

'লতিফা-ই-ফৈজী' আবদুস সামাদ আফজাল মুহম্মদ কর্তৃক সম্পাদিত 'মুকাতাবাত-ই-আল্লামি আবুল ফজল' এই প্রসঙ্গে বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

শাহজাহানের নিকট প্রেরিত মুজাফ্ফর খানের চিঠিপত্রের সংকলন (ব্রি. মি. অ. পাণ্ডুলিপি ১৬,৮৫৯), 'আরজেদাশত্' শাহজাহানের আমলের বিচার ব্যবস্থার উপর আলোকসম্পাত করিয়াছে।

'রুকাত-ই-আলমগীরী'তে[১] আওরঙ্গজেবের ১৮১টি চিঠি পাওয়া যায়। এইসব পত্রে মোগল শাসন-ব্যবস্থার বিবরণ পাওয়া যায়।

মোগল শাসন-ব্যবস্থার ইতিহাস রচনার উপাদান হিসাবে জীবনচরিত একটি প্রধান উৎস। প্রধান রাজকর্মচারী ও আমীরদের পারস্পরিক সম্পর্ক এবং তাহাদের প্রশাসনিক কর্মধারার বিশেষ আলোচনা নানা জীবনচরিতে পাওয়া যায়।

মোগল সাম্রাজ্যের আমীর ও রাজকর্মচারীদের জীবনধারার বিস্তারিত আলোচনা-সম্বলিত, শাহ নাওয়াজ খান ওরফে সমসম্-উদ-দৌলার রচিত 'মা'আসির-উল-ওমারা' একটি সুপরিচিত প্রকাশিত গ্রন্থ। কিন্তু এই পুস্তকের প্রধান ত্রুটি হইল যে, তথ্যের উৎস সম্পর্কে ইহাতে কোন উল্লেখ নাই।

সদরউদ্দীন মুহম্মদের রচিত 'ইরশাদ-উল-ওয়াজারাতে' (ব্রি. মি. প্রা. পাণ্ডুলিপি ২৩৩), মুসলিম ওয়াজিরদের সংক্ষিপ্ত জীবনচরিত আলোচিত হইয়াছে।

কেওয়ালরাম লিখিত 'তাজকিরাত-উল-ওমারাতে' (ব্রি. মি. অ. পাণ্ডুলিপি ১৬,৭০৩), মোগল সাম্রাজ্যের আমীদের সংক্ষিপ্ত জীবনকাহিনী বর্ণিত আছে।

শাহজাহানের রাজত্বকালের চন্দ্রাভন ব্রাহ্মণ-রচিত 'চাহার চামনে (ব্রি. মি. অ. পাণ্ডুলিপি ১৬,৮৬৩,) ঐ সময়কার মন্ত্রীবর্গের বিবরণ লিখিত আছে।

শাসন-ব্যবস্থায় সম্রাট ও ওয়াজিরদের কর্তব্যাদি সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করিতে হইলে রাজনৈতিক মতবাদ সংক্রান্ত গ্রন্থাদি পাঠ আবশ্যকীয়।

ফজল-বিন-রোজেবাহান ইস্পাহানীর রচিত 'সুলুক-উল-মুলুক' (ব্রি. মি. প্রা. পাণ্ডুলিপি ২৫৩), এবং আলী-বিন-শাহাব হামদানীর লিখিত 'জখিরাত-উল-

---

১ অনূদিত গ্রন্থটি সম্প্রতি প্রকাশিত হইযাছে।

মুলুকে' (ব্রি. মি. অ. পাণ্ডুলিপি ৭,৬১৮) সম্রাটদের কর্তব্যাদি সম্পর্কে আলোচনা করা হইয়াছে।

এই প্রসঙ্গে গাজ্জালীর 'সুলুক-উল-সালতানাত' (ব্রি. মি. প্রা. পাণ্ডুলিপি ২৫৪), আল্-মাওয়ার্দীর 'আহকাম-ই-সুলতানিয়াহ্,' এবং ইবনে খালদুনের 'মুক্কাদ্‌মা-ই-তারিখ-ই-ইবনে খালদুন'-এর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

ইউরোপীয় পর্যটকদের ভ্রমণকাহিনী ভারতে মোগল আমলে মুসলিম শাসন-ব্যবস্থার ইতিহাস রচনায় প্রয়োজনীয় উৎস। ইংরেজ, ওলন্দাজ, ইতালীয়, পর্তুগীজ পরিব্রাজকগণ মোগল আমলে বিভিন্ন সময়ে ভারত পরিভ্রমণ করিয়াছেন এবং মূল্যবান ভ্রমণ-কাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা সম্রাট, উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তা, রাজদরবার, শহর ও নগরের যে বর্ণনা দিয়াছেন, উহা অতি প্রয়োজনীয় সন্দেহ নাই; তবে দেশের শাসন-ব্যবস্থার পদ্ধতি সম্পর্কে তাঁহাদের কাহিনী হইতে সঠিক জ্ঞান লাভ করা যায় না, কিংবা নির্ভরযোগ্য ঐতিহাসিক সত্য-সম্বলিত তথ্যের উপাদান হিসাবে ঐগুলি সর্বক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য নহে।[১]

আকবরের আমলের ফাদার মন্‌সারেট (১৫৮০-১৫৮২), জাহাঙ্গীরের আমলের হকিন্স্ (১৬০৯-১৬১১), স্যার টমাস রো (১৬১৫-১৬১৮), এডওয়ার্ড টেরী (১৬১৬-১৬১৯), প্যালিট্-১৬২৫, পেল্‌সারট্ (১৬২২-১৬২৭) এবং শাহজাহানের রাজত্বকালের শেষদিকের বার্নিয়ার (১৬৫৮) ইত্যাদি পর্যটকদের ভ্রমণকাহিনী বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে।

উপরোক্ত পর্যটকদের মধ্যে ফাদার মন্‌সারেট্-এর ভ্রমণকাহিনী অতি প্রয়োজনীয়। আকবরের সময়ে বিচার-পদ্ধতি ও দোষী ব্যক্তির শাস্তি প্রদানের সম্পর্কে সঠিক পর্যবেক্ষক ও প্রকৃত লেখক হিসাবে মন্‌সারেট্-এর আলোচনা ও মতামত মোগল শাসন-ব্যবস্থার উপর প্রচুর আলোকপাত করিয়াছে। প্যালিট্-এর ভ্রমণকাহিনীতে শাসন-ব্যবস্থার কয়েকটি বিষয়ের উপর বিশদ আলোচনা রহিয়াছে। স্যার টমাস রো মোগল দরবার ব্যতীত বেশী কিছু শাসন-ব্যবস্থার বর্ণনা দেন নাই। এড্‌ওয়ার্ড টেরী-এর কাহিনী নির্ভরযোগ্য নহে, কারণ তাঁহার

---

১ এমনকি ফাদার মন্‌সারেট-এর মত একজন যথার্থ পর্যবেক্ষক বলিয়াছেন যে, জায়গীর প্রথা ছিল বংশগত এবং আবুল ফজল ছিলেন একজন প্রধানমন্ত্রী।—ইবনে হাসান: দি সেন্ট্রাল স্ট্রাক্‌চার অফ দি মোগল এম্‌পায়ার, পৃ: ২৬।

মতামত কোন সমসাময়িক লেখক সত্য বলিয়া স্বীকার করেন নাই। নিকোলাস্ মানুচী-এর ভ্রমণকাহিনীতে মোগল শাসন-ব্যবস্থা ও রাজদরবারের সমালোচনা লক্ষ্য করা যায়। যদিও এই সমালোচনা সংক্ষিপ্ত ও হাল্কা-ধরনের, তথাপি তাহার সমালোচনা ও ব্যক্তিগত পর্যবেক্ষণের জন্য ইহা মূল্যবান।

ভারতে মুসলিম শাসন-ব্যবস্থা সম্পর্কে লিখিত আধুনিক ঐতিহাসিক ও লেখকদের গ্রন্থাদি অতি সতর্কতার সহিত এই পুস্তক রচনার কাজে ব্যবহার করা হইয়াছে। এই পুস্তকের পরিশিষ্টে (গ্রন্থপঞ্জীতে) বাছাই করা ব্যবহৃত পুস্তকাদির পূর্ণ তালিকা সংযোজিত হইয়াছে ; তাই এখানে পুনরাবৃত্তি অবান্তর।

দ্বিতীয় অধ্যায়

খলিফাদের সহিত দিল্লীর সুলতানদের সম্পর্ক

মুসলিমবিশ্বের প্রধান ছিলেন খলিফা।[১] মুসলিম রাষ্ট্রপতি হিসাবে তিনি ছিলেন ইসলাম ধর্ম-বিশ্বাসীদের রক্ষাকর্তা, মুসলিম রাজ্যের রক্ষক, রাষ্ট্রের প্রধান বিচারপতি এবং রাষ্ট্রপুঞ্জের প্রধান সংগঠক ও প্রশাসক।[২] তিনি ছিলেন নবীর উত্তরাধিকারী, মুসলিম সমাজের প্রধান, ইসলাম ধর্ম বিশ্বাসীদের অধিনায়ক, মুসলিম জাতির নেতা ও শাসক।[৩] তাঁহার ক্ষমতা সীমিত ছিল, কারণ তিনি ঐশ্বরিক আইন বাতিল করিতে পারিতেন না; তবে অবশ্য তিনি এই আইনের চূড়ান্ত ব্যাখ্যাকারী ছিলেন এবং এই আইন কার্যকরী করা ছিল তাঁহার প্রধান কর্তব্য।[৪] কিন্তু তিনি যে একজন ধর্মযাজক ছিলেন না,[৫] ইহা অনায়াসে বলা যায়।

সুন্নী ইসলামের প্রভাবাধীনে প্রাচ্যদেশে আব্বাসীয় খলিফাদের আইনসম্মত বৈধস্থান ছিল প্রশ্নাতীত ও বিতর্কের ঊর্ধ্বে। খলিফার আধিপত্য ও প্রাধান্যের স্বীকৃতি অনিবার্য ছিল; সংক্ষেপে বলা যায় যে, কোন রাজতন্ত্রই খলিফার স্বীকৃতিলাভ না করিলে, বৈধভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে বলিয়া বিবেচিত হইত না। নিজাম-ই-আরুজী বলিয়াছেন যে, মুসলিম রাষ্ট্রপুঞ্জের যে সকল দূরবর্তী সীমান্তে অবস্থিত অঞ্চলসমূহে কেন্দ্র হইতে সহজে প্রত্যক্ষভাবে শাসন পরিচালনা

---

১ মুসলিম জাহানের খলিফার উৎপত্তি ও তাঁহার ক্ষমতা কর্তব্য ও দায়িত্ব সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য—আল্-খুদারি : তারিখই উমামিল্ ইসলামিয়াহ্, ১৯৩৪, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ১৭১।

২ আল্-মাওয়ার্দী : আল্-আহ্কাম-উস্-সুলতানিয়াহ্, পৃঃ ৩১৬; আর্নল্ড্ : দি ক্যালিফেট্, ১৯২৪ পৃঃ ৭২।

৩ ইশতিয়াক্ হুসেইন কোরায়েশী : দি অ্যাড্মিনিস্ট্রেশন্ অফ দি সাল্তানেট্ অফ দেহ্‌লি, করাচী ১৯৫৮, পৃঃ ২৩।

৪ আর্নল্ড্: ক্যালিফেট্, পৃঃ ৩১-৩৪ ও ৭২।

৫ কোরায়েশী : এস্. অ্যাডমিনিস্ট্রেশন্, পৃঃ ২৩।

সম্ভব নয়, ঐ সকল অঞ্চলে শাসন-ব্যবস্থা পরিচালনার জন্য একজন সুলতান হইতেছেন খলিফার প্রতিনিধি। যেমন নবী হইতেছেন আল্লাহর প্রতিনিধি এবং খলিফা নবীর প্রতিনিধি, তেমনি সুলতান হইতেছেন খলিফার প্রতিনিধি।[১] সুতরাং ইহা স্পষ্ট যে, খলিফার স্বীকৃতির ব্যতিরেকে কোন অঞ্চলই বৈধভাবে স্বাধীন হইতে পারে না। মুসলিম শাসকগণ বিধি সঙ্গতভাবে খলিফার অনুগত। আইনতঃ খলিফা হইতেছেন সার্বভৌম; কেহই তাঁহার সম্মতি ব্যতীত শাসন করিতে পারেন না।[২]

প্রাচ্য-খেলাফতের শাসনকর্তা হাজ্জাজ-বিন-ইউসুফের আদেশে তরুণ সেনানায়ক মুহম্মদ-বিন-কাসিম দেবলের রাজা দাহিরকে পরাজিত করিয়া রাজ্য জয় করিয়াছিলেন। ভারতের সিন্ধু-রাজ্যই প্রথম অঞ্চল, যাহা ইসলামের পতাকাতলে অষ্টম শতাব্দীর প্রারম্ভে মুসলিম শাসনাধীনে আসিয়াছিল। গজনীর সুলতান মাহমুদ কর্তৃক পাঞ্জাবের বৃহত্তর অংশ অধিকার, ভারতের মুসলিম ইতিহাসে আরও বেশী গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। মাহমুদ ছিলেন বৈধভাবে খলিফার প্রতিনিধি।[৩] এইভাবে পাঞ্জাব প্রাচ্য-খেলাফতের অংশে পরিণত হইয়াছিল। মাহমুদের পুত্র মা'সুদও আব্বাসীয় খলিফা হইতে স্বীকৃতলাভ করিয়াছিলেন।[৪] পরবর্তী গজনী বংশধরগণ খলিফাদের অধীনতা অকপটভাবে স্বীকার করিয়া লইয়াছেন।[৫] আব্বাসীয়দের প্রাধান্যের স্বীকৃতির নিয়ম পাঞ্জাবে প্রচলিত হয় মইজউদ্দীন মুহম্মদ-বিন-সাম-এর পাঞ্জাব অধিকারের পর হইতে। গজনী সুলতানদের মত, ঘূর সুলতানগণও খলিফাদের প্রভুত্ব স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন। মুহম্মদ ঘুরী ও তাঁহার ভ্রাতা গিয়াসউদ্দীন উভয়ই 'খলিফার সাহায্যকারী' ('হেল্পার অফ দি কমাণ্ডার অফ দি ফেথ্ফুল্') উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন।[৬]

---

১ আরনল্ড্: দি ক্যালিফেট্, পৃঃ ৭৩-৭৪। চাহার মাকালাহ্ হইতে উদ্ধৃত; কোরায়েশী: এস. অ্যাডমিনিস্ট্রেশন্, পৃঃ ২৪।

২ কোরায়েশী: এস. অ্যাড্মিনিস্ট্রেশন্, পৃঃ ২৫।

৩ দি কেমব্রিজ হিস্টরি অফ ইণ্ডিয়া, তৃতীয় খণ্ড, পৃঃ ২৬।

৪ বইহাকী: তারিখ-ই-বইহাকী (তারিখ-ই-আল্-ই-সবুক্তগীন), পৃঃ ৫০। গজনীর সুলতান মা'সুদ খলিফার প্রতি আনুগত্য স্বীকারের শপথ গ্রহণের লিখিত প্রতিলিপি বইহাকী সংরক্ষণ করিয়াছেন। —বইহাকী, পৃঃ ৩৭০-৩৭৪। ইহা হইতেছে খলিফার অধীনস্থ হিসাবে সুলতানের বৈধ আনুগত্যের নিদর্শন স্বরূপ।

৫ এডওয়ার্ড টমাস: অন দি কয়েন্স অফ গজনা, লণ্ডন, ১৮৪৮, পৃঃ ৭৮, ১০৮।

৬ মিনহাজ-উস্-সিরাজ: তবাকাত-ই-নাসিরী, পৃ ৭৮, ১০৮।

ভারতের মধ্যযুগীয় ইতিহাসে কুতুবউদ্দীন আইবেক ১২০৬ খ্রীস্টাব্দে যখন দিল্লী সালতানাত স্থাপন করিয়া, রাজকীয় মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হইলেন, তখন তিনি স্বাভাবিকভাবেই ধর্মীয় বিশ্বাস ও চিরাচরিত নিয়মানুযায়ী খেলাফতের আনুগত্য স্বীকার করিয়াছিলেন।

শামসউদ্দীন ইলতুৎমিশ ছিলেন দিল্লীর প্রথম সুলতান, যিনি খলিফার সন্দেহ-মুক্ত ও সুস্পষ্ট স্বীকৃতি লাভ করেন।[১] ১২২৯ খ্রীস্টাব্দে খলিফা আবুজাফর মনসুর আল্-মুসতান্সিব বিল্লাহ্ হইতে ইলতুৎমিশ রীতিসিদ্ধ স্বীকৃতি ও খেলাৎ লাভ করেন। ইহাই ছিল সর্বপ্রথম ক্ষমতার পদে অভিষিক্তকরণ ও পদবীতে বিভূষিতকরণ। খলিফার নিকট হইতে ইলতুৎমিশের সরকারী স্বীকৃতি লাভ দিল্লী অধিবাসীদের নিকট ছিল অত্যধিক আনন্দ ও গৌরবের বিষয়। তখন হইতে তাঁহাকে দেশবাসী বৈধ অধিস্বামী[২] হিসাবে সম্মান জ্ঞাপন করে। জনসাধারণ ভাবিত যে, তাহাদের দেশ দার-উল-ইসলামের অংশ এবং তাহাদের শাসনকর্তা খলিফার স্বীকৃতিপ্রাপ্ত বৈধ সুলতান। ইলতুৎমিশ দাবি করিতেন যে, খলিফার প্রতিনিধি হওয়া অপেক্ষা বড় সম্মানজনক পদ আর কি হইতে পারে![৩] তিনি 'নাসির আমীর-উল্-মুমিনিন' এবং 'নসর-উদ-দুনিয়া ওয়াদ্দীন'[৪] উপাধি গ্রহণ করেন। জনগণ তাঁহাকে 'সুলতান-ই-আজম'[৫] অর্থাৎ মহান সুলতান হিসাবে অভিনন্দিত করে।

১২৫৮ খ্রীস্টাব্দে হলাগু খান অত্যধিক বর্বোরোচিতভাবে খলিফা মুস্তা-সিমকে ক্ষমতাচ্যুত করেন এবং তাঁহাকে নির্দয়ভাবে হত্যা করেন। খলিফার

---

১ কোরায়েশী: এস্. অ্যাড্‌মিনিস্ট্রেশন, পৃ: ২৭।

২ এডওয়ার্ড টমাস: দি ক্রনিক্‌ল্‌স অফ দি পাঠান কিংস্ অফ দেল্‌হি, লণ্ডন, পৃ: ৪৯-৫২; এইচ. নেল্‌সন্ রাইট: দি কয়নেজ অ্যাণ্ড মেট্রলজি অফ দি সুল্‌তান্‌স্ অফ দিহ্‌লি দিল্লী, ১৯৩৬, পৃ: ১৮-২১ ও ২৬।

৩ আর. পি. ত্রিপাঠি: সাম্ অ্যাস্পেক্টস অফ মুসলিম অ্যাড্‌মিনিস্ট্রেশন্, এলাহাবাদ, ১৯৫৯, পৃ: ২৭।

৪ পূর্বোক্ত, পৃ: ২৭ পাদটীকা; মিনহাজ: তবাকাত-ই-নাসিরী (এইচ. জি. র‍্যাভারটি-এর অনুবাদ), পৃ: ১৭৪।

৫ পূর্বোক্ত, পৃ: ২৭।

এই হত্যায় দিল্লীর সুলতানগণ এক অদ্ভুত সমস্যার সম্মুখীন হয়। মুস্‌তাসিমের কোন উত্তরাধিকারী ছিল না। প্রাচ্য-খেলাফতের বৃহত্তর অংশ মোঙ্গলদের আয়ত্তাধীনে চলিয়া আসে। এমতাবস্থায় কেন্দ্রীয় খলিফার স্বীকৃতিলাভ একটি সমস্যায় পরিণত হইল। মুস্‌তাসিমের মৃত্যুর পর দীর্ঘদিন ধরিয়া দিল্লীর সুলতান-গণ মুস্‌তাসিমের নাম মুদ্রাতে অঙ্কিত করিবার পদ্ধতি বিনা দ্বিধায় কার্যকরী রাখিয়া, এই অসুবিধার মুকাবিলা করেন।

জালালউদ্দীন ফিরোজ খল্‌জীর রাজত্বের শেষ ১২৯৬ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত, দিল্লীর মুদ্রায় মুস্‌তাসিমের নাম চালু থাকে।[১] বলিতে গেলে তাঁহার মৃত্যুর পর প্রায় চল্লিশ বৎসর কাল মুস্‌তাসিমের নাম দিল্লীর মুদ্রায় বিদ্যমান থাকে। রাষ্ট্রের রাজকর্মকর্তাদের প্রবল চাপেও, ধর্মভীরু বৃদ্ধ সুলতান জালালউদ্দীন ফিরোজ ভাবাবেগে আপ্লুত হইয়া শহিদ খলিফার নাম মুদ্রা হইতে অপসারণ করিতে অসম্মত হন। অবশ্য তাঁহার মৃত্যুর পরই, খলিফার নাম মুদ্রা হইতে অপসারিত হয় এবং বালক সুলতান রুকনউদ্দীন ইব্রাহীম 'নাসির-ই-আমীর-উল-মুমিনিন' উপাধি গ্রহণ করেন।[২]

খল্‌জী সুলতান আলাউদ্দীন পূর্ববর্তী ইব্রাহীমের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া, তাঁহার উপাধিই তিনি গ্রহণ করেন, তবে এই উপাধিতে 'ইয়া-মিন-উল খিলাফত' এই অংশটি সংযুক্ত করেন।[৩] যদিও আলাউদ্দীন একজন মহা পরাক্রমশালী সুলতান ছিলেন, তবুও তিনি 'সিকান্দার'-এর অপেক্ষা উচ্চতর উপাধি গ্রহণ করেন নাই, বরঞ্চ তিনি 'ইয়ামিন-উল-খিলাফত নাসির- ই-আমীর-উল-মুমিনিন' উপাধি গ্রহণ করিয়াই তুষ্ট ছিলেন।[৪] এই উপাধি গ্রহণ দ্বারা ইহাই প্রমাণিত

১ টমাস : ক্রনিকল্‌স্‌, পৃ: ১৪৫।

২ মিনহাজ : নাসিরী, পৃ: ১৫৫; রাইট্‌ : কয়নেজ্‌, পৃ: ৪৮।

৩ এই উপাধি-ই আলাউদ্দীনের মুদ্রায় প্রকাশ পায়। টমাস : ক্রনিকল্‌স্‌, পৃ: ২৬৮; রাইট : কয়নেজ পৃ: ৮৮-৯১। দিল্লীতে কুওয়াত-উল-ইসলাম মসজিদের খিলানে তাঁহার শিলা-লিপিতেও এই একই উপাধি খোদিত আছে।—কোরায়েশী : এস. অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, পৃ: ২৯ পাদটীকা; সাইয়েদ আহমদ খান : আসার-উদ্‌-সানাদিদ, পৃ: ৪২-৪৫।

৪ ত্রিপাঠি : এম্‌. এড্‌মিনিস্ট্রেশন, পৃ: ৪৯-৫০; রাইট : কয়নেজ, পৃ: ৩৮; ইলিয়ট ও ডাওসন্‌ : হিস্টরী অফ ইণ্ডিয়া অ্যাজ টোল্‌ড্‌ বাই হার ওন হিস্টরিয়ান্‌স, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৫৪৩; ইয়ামিন-উল-খিলাফতের অর্থ খেলাফতের দক্ষিণ হস্ত বা খেলাফতের শক্তি এবং নাসির-ই-আমীর-উল-মুমিনিনের অর্থ খলিফার সহকারী। ত্রিপাঠি : এম. অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, পৃ: ৫০ পাদটীকা।

হয় যে, তিনি নিজে খলিফা হওয়ার আগ্রহী ছিলেন না। কিন্তু সমসাময়িক লেখক হাসান ও আমীর খুসরু তাঁহাকে খলিফার উপাধি প্রদান করেন। খুসরু তাঁহাকে 'খলিফা-ই-আহদ', ইমাম-ই-আহদ', 'খলিফা-ই-জামান', উপাধিতে ভূষিত করেন।[১] আলাউদ্দীন সরকারীভাবে খলিফার উপাধি গ্রহণ করিতে দ্বিধা বোধ করেন, কিন্তু তিনি তাঁহার রাজসভাসদ ও কবিদ্বয়কে তাঁহাকে খলিফা হিসাবে সম্বোধন করিতে বোধ হয় নিষেধও করেন নাই। পরোক্ষ ও নীরব সমর্থন লাভ করিয়া হাসান ও খুসরু তাঁহাদের রচনাবলীতে আলাউদ্দীনকে খলিফা হিসাবে চিত্রিত করেন। তদুপরি, রাজধানীকে দার-উল-ইসলাম বলা হইত; অর্থাৎ ইহা ছিল মুসলিম সাম্রাজ্যের কেন্দ্র ও সর্বপ্রধান কর্মস্থল।[২] অবশ্য ইহা হাসান ও খুসরুর দ্বারা আলাউদ্দীনকে খলিফার উপাধি প্রদানের যুক্তির সপক্ষে ছিল। কিন্তু হাসান ও খুসরুর যুক্তির সমর্থনে তৎকালীন মুদ্রা ও শিলালিপিতে কোন প্রমাণ বা সাক্ষ্য নাই। মোটকথা, আলাউদ্দীন নিজে খলিফার উপাধি গ্রহণ করেন নাই; এই ঐতিহাসিক-সত্যতা অনস্বীকার্য।

একজন অন্যতম শ্রেষ্ঠ সুলতান যাহা প্রকাশ্যভাবে করিতে ইতস্ততঃ করিয়াছেন, উহা তাঁহার পুত্র ও উত্তরাধিকারী কুতুবউদ্দীন মুবারকশাহ নিঃসঙ্কোচে করিতে দ্বিধাবোধ করেন নাই। যাহা মহাপরাক্রমশালী আলাউদ্দীন করিতে অসমর্থ ছিলেন, উহা তাঁহার পুত্র করিতে অবিশ্বাস্যভাবে সক্ষম হইলেন। তিনি ছিলেন একমাত্র প্রথম সুলতান, যিনি খেলাফতের কল্পিত আধিপত্যকে উপেক্ষা করিয়া, দিল্লীর সুলতানকে বহিঃশক্তির প্রাধান্য হইতে মুক্ত করিয়া দিল্লীর সুলতান বৈধ সার্বভৌমত্বের অধিকারী বলিয়া প্রকাশ্যভাবে ঘোষণা করেন। তিনি মুসলিম খেলাফতের আওতা হইতে মুক্ত ভাবিয়া দিল্লী সুলতানকে স্বাধীন হিসাবে গণ্য করেন এবং তাঁহার সাম্রাজ্যের বহির্ভূত কোন শক্তি ও ক্ষমতার বৈধতাকে স্বীকৃতি দিতে সুস্পষ্টভাবে অসম্মতি জ্ঞাপন করেন। তিনি তাঁহার দেশবাসী ও পৃথিবীর উদ্দেশে দ্ব্যর্থহীনভাবে ঘোষণা করেন যে, তিনি ছিলেন প্রধান ইমাম,

---

১ ত্রিপাঠি: এম. অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, পৃ: ৫০ পাদটীকা; লাইফ অ্যাণ্ড ওয়ার্কস অফ আমীর খুসরু, পৃ: ১২৪।

২ সিরিকে 'দার-উল-খিলাফাহ্' বলা হইত। ত্রিপাঠি: এম. অ্যাডমিনিস্ট্রেশন পৃ: ৩২ পাদটীকা।

খলিফা, আল্লাহর প্রতিনিধি—'আল, ইমাম-উল,-আজম খলিফা-ই-রাব,-উল-আল-আমীন' অথবা 'খলিফাত উল্লাহ্' অথবা 'আমীর-উল-মুমিনিন'।[১] ১৩১৭ খ্রীস্টাব্দ হইতে তাঁহার মুদ্রায় খলিফার উপাধি দেখা যায়।[২] এই সময় হইতে সুলতানকে খলিফা হিসাবে নানাসূত্রে অসংখ্যবার উল্লেখ করা হইয়াছে।[৩]

তুঘলক বংশের প্রতিষ্ঠাতা গিয়াসউদ্দীন তুঘলক অবশ্য 'নাসির-ই-আমীর-উল-মুমিনিন' পুরাতন উপাধিই গ্রহণ করেন।[৪]

স্বাধীন মতবাদের অধিকারী শক্তিশালী পুরুষ মুহম্মদ-বিন-তুঘলকের কাছে বৈধ, স্বাধীন সালতানাতের ধারণা বদ্ধপরিকর ছিল। তাঁহার রাজত্বের প্রথম দিকে, তাঁহার মুদ্রায় খলিফার নামের উল্লেখ ছিল না; এমনকি কোথায়ও খেলাফতেরও উল্লেখ ছিল না, যদিও তিনি নিজেও খলিফার উপাধি 'আমীর-উল-মুমিনিন' গ্রহণ করেন নাই।

পরবর্তী সময় মুহম্মদ-বিন-তুঘলকের শিক্ষক কুতলুঘ খান সুলতানকে বিশ্বাস করিতে বাধ্য করিয়াছিলেন যে, কোন রাজতন্ত্রই খলিফার স্বীকৃতি ব্যতীত আইনসঙ্গত হইতে পারে না। তিনি যুক্তি প্রদর্শন করেন যে, যেহেতু সুলতান খলিফার নিকট হইতে স্বীকৃতি-লাভ করেন নাই, তাই তিনি বৈধ শাসকও নহেন এবং এই কারণেই তাঁহার উচ্চাকাঙ্ক্ষাপ্রসূত পরিকল্পনাসমূহ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইয়াছে।[৫] খলিফাকে উপেক্ষা করাই বোধ হয় জনগণের অসন্তোষ ও উপর্যুপরি প্রাকৃতিক দুর্যোগের জন্য দায়ী। কুতলুঘ খানের যুক্তির যথার্থতা বিশ্বাস করিয়া সুলতান ও তাঁহার সভাসদগণ খলিফা আল-মুসতাক্ফি বিল্লাহর আনুগত্য স্বীকার করিবার শপথ গ্রহণ করিলেন এবং খলিফার স্বীকৃতিলাভের জন্য আবেদনপত্রসহ

১ ত্রিপাঠি: এম. অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, পৃ: ৫২-৫৩; টমাস: ক্রনিকলস, পৃ: ১৭৯-১৮১ স্টেনলি লেন-পুল: দি কয়েনস অফ দি সুলতানস্ অফ দেলহি ইন দি ব্রিটিশ মিউজিয়াম, (রেগিনাল্ড স্টুয়ার্ট পুল কর্তৃক সম্পাদিত, লণ্ডন ১৮৮৪), পৃ: ৪৪-৪৮। খলিফার উপাধি গ্রহণ করিবার পর দিল্লী দার-উল-খিলাফত বলিয়া অভিহিত হয়। দ্রষ্টব্য—আমীর খুসরুর প্রণীত মুহ সিপাহর।

২ টমাস: ক্রনিকলস্, পৃ: ১৭৯-১৮২; রাইট: কয়নেজ, পৃ: ৯৬-১০২।

৩ আমীর খুসরু; তুঘলক-নামা (সাইয়েদ হাশিমি ফরিদাবাদী কর্তৃক সম্পাদিত), পৃ: ১৩৯।

৪ টমাস; ক্রনিকলস্, পৃ: ১৭৯-১৮২; রাইট: কয়নেজ, পৃ: ১১১-১১৩।

৫ কোরায়েশী: এস. অ্যাড্মিনিস্ট্রেশন্, পৃ ৩৩; বিশেষ দ্রষ্টব্য—মুল্লা আহমদ তাত্তাভী; তারিখ-ই-আল্ফি।

মিশরে রাষ্ট্রদূত প্রেরণ করেন।[১] ১৩৪৪ খ্রীস্টাব্দে হাজী সাইয়েদ সরাসরি মিশর হইতে খলিফা আল-মুসতাক্‌ফি বিল্লাহর স্বীকৃতি প্রদানের চিঠি, পতাকা ও সম্মানসূচক পোশাক লইয়া দিল্লী পৌঁছাইলে, তাঁহাকে অতীব সম্মানের সহিত অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করা হয়।[২] ইহাই ছিল রীতিসিদ্ধ ক্ষমতায় অভিষিক্ত-করণের দ্বিতীয় নিদর্শন। ইহা ছিল খলিফার বৈধ শ্রেষ্ঠত্ব ও প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার প্রতীক।[৩] মুহম্মদ-বিন-তুঘলকের আদেশে তাঁহার নাম খুৎবা ও মুদ্রা হইতে অপসারিত হইল এবং ইহার পরিবর্তে খলিফার নাম খুৎবায় পঠিত ও মুদ্রায় অঙ্কিত হইল।[৪]

পরবর্তী সুলতান ফিরোজ শাহ তুঘলক আব্বাসীয় খলিফার স্বীকৃতি লাভ করেন। খলিফা তাঁহাকে সর্বময় ক্ষমতা ও খেলাফতের প্রতিনিধিত্ব প্রদান করিয়া 'সুলতানদের মধ্যে প্রধান' উপাধিতে ভূষিত করেন।[৫] প্রতিদানে ফিরোজশাহ খলিফার জন্য উপযুক্ত উপঢৌকন প্রেরণ করেন। মুসলিম ভারতে তিনিই প্রথম, যিনি সুলতানকে না'ইব, খলিফার সহকারী—'খলিফার খলিফা'[৬] উপাধি গ্রহণ করিবার রীতি প্রবর্তন করেন। তিনি নিজে 'সাইফ-উল-আমীর-উল-মুমিনিন', পরবর্তী-সময় 'না'ইব আমীর-উল-মুমিনিন' ও 'আল-খলিফা-ই-আমীর-উল-মুমিনিন'[৭]

---

১ সিরাত-ই-ফিরোজশাহী, পৃ: ২৬৭।

২ সিরাত-ই-ফিরোজশাহী; পৃ: ২৬৭; জিয়াউদ্দীন বারনী অবশ্য তাঁহার তারিখ-ই-ফিরোজশাহী গ্রন্থে হাজী সরাসরির আগমনের ভিন্ন তারিখ উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার তারিখ গ্রহণযোগ্য নহে। সিরাতে হাজী সরাসরির সঙ্গীদের নামও উল্লেখ রহিয়াছে।—ত্রিপাঠি: এম. অ্যাডমিনিস্ট্রেশন পৃ: ৩৪ পাদটীকা।

৩ ত্রিপাঠি: এম. অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, পৃ: ৬২।

৪ লেন-পুল: কয়নেজ অফ সুলতানস্‌, পৃ: ৭৪২; রাইট: কয়নেজ পৃ: ৫২-৫৮।

৫ ফুতুহাত-ই-ফিরোজশাহী (শেখ আবদুর রশিদের অনুবাদ), পৃ: ২৩। সিরাত-ই-ফিরোজশাহীতে বলা হইয়াছে যে, ৭৫৪ হিজরীতে ফিরোজশাহ খলিফা আল্‌-মুতাসিদ-বিল্লাহর নিকট হইতে স্বীকৃতি লাভ করেন। খলিফা তাঁহাকে 'সাইফ-উল-খিলাফাহ্‌' অর্থাৎ 'খেলাফতের তরবারি' এবং 'কাসিম-ই-আমীর-উল-মুমিনিন' অর্থাৎ 'খলিফার সহ-উত্তরাধিকারী' উপাধি প্রদান করেন। —সিরাত-ই-ফিরোজশাহী, পৃ: ২৬৯; কোরায়েশী: এস. অ্যাডমিনিস্ট্রেশন পৃ: ৩৬ পাদটীকা।

৬ ত্রিপাঠি: এম্‌. অ্যাডমিনিস্ট্রেশন্‌, পৃ: ৬৯।

৭ লেন-পুল: কয়েন্‌স অফ সুলতানস্‌, পৃ: ৭৩-৭৫।

উপাধি গ্রহণ করেন। তাঁহার শাসনকালের প্রথম ছয় বৎসরের মধ্যে, তিনি মিশরের খলিফার নিকট হইতে দুইবার সম্মান-সূচক পোশাক ও শাসনকর্তা পদের মানপত্র লাভ করেন।[১]

নূতন সাইয়েদ রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা খিজির খান কোন রাজকীয় উপাধি গ্রহণ করেন নাই এবং তিনি নিজেকে বিজয়ীর প্রতিনিধি হিসাবে পরিচয় দিয়া তুষ্ট ছিলেন। পরবর্তী সময় খিজির খানের পুত্র মুবারক শাহ ও তাঁহার উত্তরাধিকারিগণ তাঁহাদের মুদ্রায় 'না'ইব-ই-আমীর-উল-মুমিনিন' উপাধি গ্রহণ করেন।

লোদী সুলতানগণও সাইয়েদ সুলতানদের মত, একই রীতি অনুসরণ করেন।[২] লোদী সুলতানগণ 'শাহ সুলতান' উপাধি অপেক্ষা কোন উচ্চতর উপাধি গ্রহণ করেন নাই। সম্ভবতঃ ইহার কারণ ছিল এই যে, তাঁহারা সাইয়েদ সুলতানদের দ্বারা অনুপ্রাণিত হন। প্রাক-মোগল দিল্লীর শাসকগণের মধ্যে তাঁহারাই ছিলেন সর্বশেষ সুলতান, যারা না'ইব অথবা 'খলিফা-ই-আমীর-উল-মুমিনিন' উপাধি গ্রহণ করেন। মোটকথা, নানা বিপদ ও অসুবিধার হাত হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্যই বোধ হয়, দিল্লীর সুলতানগণ খলিফার প্রতি প্রচলিত ও নামে মাত্র সম্মান প্রদর্শন ও স্বীকৃতি প্রদান করিতেন।

১৫১৭ খ্রীস্টাব্দে ওসমানী তুর্কীরা আব্বাসীয় খেলাফতের অবসান ঘটায়; ইহার পর হইতে তুরস্কের সুলতান নিজেকে খলিফা বলিয়া দাবি করেন। ঘটনাক্রমে লোদী রাজবংশের শেষ সুলতান ইব্রাহীম লোদী দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন ১৫১৭ খ্রীস্টাব্দে; তিনি নিজস্ব ব্যাপারে এত বেশী ব্যস্ত ছিলেন যে, খেলাফতের বিষয়ে কোন উৎসাহই প্রকাশ করেন নাই।

মাত্র দুইটি ব্যতিক্রম ব্যতীত নীতিগতভাবে এবং বস্তুতঃপক্ষে বহুলাংশে, সমগ্র তুর্কী ও লোদী শাসন আমলে দিল্লী শাসকদের ও বিদেশীয় খেলাফতের মধ্যে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত ছিল। খলিফা জীবিত কি মৃত ছিলেন, ইহা খুব বেশী একটি বিবেচনার বিষয় ছিল না। খেলাফতের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া নেওয়া হইত এবং দিল্লী সুলতানগণ নিজদিগকে কেন্দ্রীয় খলিফার উচ্চ পদসম্পন্ন প্রতিনিধি বিবেচনা করিতেন।[৩]

---

১ বারনী: ফিরোজশাহী, পৃ: ৫৯৮।

২ টমাস: ক্রনিকল্স্, পৃ: ৩০৩-৩৪০; রাইট: কয়নেজ, পৃ: ২৪৩-২৫৬।

৩ ত্রিপাঠি: এম্. অ্যাড্‌মিনিস্ট্রেশন্, পৃ: ১৫০—১৫১।

তৃতীয় অধ্যায়

প্রকৃত সার্বভৌম সুলতান

মধ্যযুগীয় মুসলিম ভারতে দিল্লী সালতানাতের ইতিহাসের বেশীর ভাগ সময়ই যদিও ইহা আইনসঙ্গতভাবে প্রাচ্য খেলাফতের অংশ ছিল, তথাপি প্রকৃত-পক্ষে ইহা সর্বদাই একটি স্বাধীন রাষ্ট্র।[১] ছিল। দিল্লীর সুলতানগণ কেন্দ্রীয় খলিফার আনুগত্য স্বীকার করিবার পুরাতন রীতি অনুসরণ করেন। স্বল্পকালের জন্য একমাত্র কুতুবউদ্দীন মুবারক শাহ নিজেকে খলিফা হিসাবে ঘোষণা করিয়াছিলেন। কিন্তু অন্যান্য সুলতানগণ খলিফার আধিপত্য ও প্রাধান্য মানিয়া লইয়াছিলেন, ইহা অনস্বীকার্য। কিন্তু বস্তুতঃপক্ষে, সালতানাত ছিল একটি স্বাধীন সাম্রাজ্য। সরকারের প্রকৃতি ও গঠন ছিল স্বেচ্ছাচারী; সুলতান ছিলেন রাষ্ট্রপ্রধান এবং ইহার প্রধান সামরিক অধিনায়ক। বৈধভাবে তিনি মুসলিম আইনের অধীন ছিলেন এবং এই মুসলিম আইন রক্ষা করা ও কার্যকরী করা ছিল তাঁহার প্রধান কর্তব্যাদির অন্যতম। যদিও মুসলিম আইন ব্যাখ্যা করিবার তাঁহার সীমিত অধিকার ছিল, তথাপি মূলতঃ ইহা পরিবর্তন করিবার তাঁহার কোন ক্ষমতা ছিল না। এই সামান্য বাধা ব্যতীত, তাঁহার ক্ষমতা ছিল অনিয়ন্ত্রিত; তবে বিবিধ রাজনৈতিক কারণে তাঁহার প্রাধান্য কিয়দংশে নিয়ন্ত্রিত ছিল, ইহাও সত্য। প্রকৃতপক্ষে, সুলতান ছিলেন শাসন-ব্যবস্থার কেন্দ্রবিন্দু।[২]

মুসলিম আইনবিশারদ ও ধর্মতত্ত্ববিদগণ শরিয়াতের প্রাধান্যে বিশ্বাসী ছিলেন এবং তাঁহারা অভিমত ব্যক্ত করেন যে, ইহা সারবত্তায় শাশ্বত ও অপরিবর্তনীয়। শরিয়াত কোরআনের উপর প্রতিষ্ঠিত; প্রত্যেক মুসলমান কোরআনকে আল্লাহর বাণী বলিয়া বিশ্বাস করে, যাহা, এমনকি নবী পর্যন্ত,

---

১ ত্রিপাঠি: এম্. অ্যাডমিনিস্ট্রেশন্, পৃ: ৪০।

২ কোরায়েশী: এস্. অ্যাডমিনিস্ট্রেশন্, পৃ: ৯।

পরিবর্তন করিতে পারিতেন না। তিনি শুধু ইহার ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করিতে পারিতেন। তাঁহার ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ হাদিসে সংরক্ষিত আছে। এই দুইটি স্তম্ভ—কোরআন ও হাদিস-এর উপর মুসলিম আইনের কাঠামো প্রতিষ্ঠিত। এই আইনই মুসলিম জাহানে যথার্থ সার্বভৌম; কেহই ইহার উর্ধ্বে নহে এবং সকলই ইহার দ্বারা শাসিত।[১] মুসলিম-বিশ্বে জনমত শরিয়াতের প্রাধান্যের স্বীকৃতি দিয়াছে। সুতরাং দিল্লী সুলতানগণ কখনও শরিয়াতের বিধান লঙ্ঘন করিতে পারিতেন না।

যদি কোন প্রতিনিধির মাধ্যমে আইন বলবৎ না করা হয়, তাহা হইলে আইন ক্ষমতাহীন ও দুর্বল হইয়া পড়ে। ভারতে খলিফার আইনসম্মত প্রতিনিধি ছিলেন দিল্লীর সুলতান। অধীনস্থ সমস্ত এলাকার উপর খলিফার সার্বিক ক্ষমতা সুলতানকে অর্পণ করা হইয়াছিল।[২] আইনতঃ সুলতানের সিদ্ধান্তকে খলিফা অগ্রাহ্য ও বাতিল করিয়া দিতে পারিতেন; কিন্তু শাসন-ব্যবস্থার সর্বদিকে বস্তুতঃপক্ষে সুলতান এত বেশী ক্ষমতাশীল ছিলেন এবং দিল্লী খেলাফতের কেন্দ্রস্থল হইতে এত দূরে অবস্থিত ছিল যে খলিফার পক্ষে সুলতানের শাসন-ব্যবস্থায় হস্তক্ষেপ করা সম্ভব ছিল না। তদুপরি, আব্বাসীয় খেলাফত যখন ধ্বংসের দিকে অগ্রসর হইতেছিল, তখন ভারতে সালতানাত প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। তখন আব্বাসীয় খলিফাদের পক্ষে তাঁহাদের অধীনস্থ প্রতিনিধিদের আভ্যন্তরীণ শাসন-ব্যবস্থায় হস্তক্ষেপ করা সম্পূর্ণ অসম্ভব ছিল। সুতরাং মুসলিম আইন ব্যাখ্যা ও কার্যকরী করিবার মাধ্যম হিসাবে দিল্লী সাম্রাজ্যে খলিফার সর্বোচ্চ প্রতিনিধি ছিলেন সুলতান।[৩]

যদিও মুসলিম আইনবিশেষজ্ঞগণ আইনের সর্বোচ্চ ব্যাখ্যাকারী হিসাবে শাসনকর্তার অধিকার স্বীকার করেন; কিন্তু কার্যতঃ তিনি আইনের স্বীকৃত ব্যাখ্যার বিরুদ্ধে যাইতে পারিতেন না, কারণ তাঁহার পক্ষে ইজমা উপেক্ষা করা সম্ভব ছিল না।[৪] তিনি সাধারণতঃ সংখ্যাগুরু আইনজ্ঞদের সিদ্ধান্ত মানিয়া

---

১ খুদা বখশ: এসেস্, ইণ্ডিয়ান্ অ্যাণ্ড ইসলামিক্, পৃ: ৫১।

২ কোরায়েশী: এস. অ্যাডমিনিস্ট্রেশন্, পৃ: ৪৩।

৩ পূর্বোক্ত, পৃ: ৪৩।

৪ ফজল-বিন-রুজবাহান আল্-ইস্পাহানী: সুলুক-উল্-মুলুক, ১৯; আখলাক্-ই-জালালী, পৃ: ৫৫; ইহিয়া-উল-উলুম, প্রথম খণ্ড, পৃ: ৭।

চলিতেন।[১] জনকল্যাণের জন্য বেসামরিক ও রাজনৈতিক আইন প্রণয়নে তাঁহার অধিকারের উপর উক্ত বাধা প্রযোজ্য ছিল না।[২] অবশ্য এই আইন প্রণয়নেও তিনি শরিয়াতের বিরুদ্ধে যাইতে পারিতেন না। হিন্দুদের মতানুসারেও শাসক ছিলেন আইনের অধীন।[৩] এই শরিয়াতের প্রাধান্যই অনেকের মনে ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি করিয়াছে যে, সালতানাত ছিল একটি ঈশ্বরতন্ত্র (ঈশ্বর অর্থাৎ পুরোহিত কর্তৃক রাজ্য-শাসন) —একটি ধর্মআশ্রিত রাজ্য।[৪] ঈশ্বরতন্ত্রের অপরিহার্য উপকরণ—পুরোহিতের শাসন—মুসলিম রাষ্ট্র সংগঠনে আদৌ পরিলক্ষিত হয় না। গীব্-এর উক্তি যথার্থই সত্য যে, ইসলামী রাষ্ট্রশাসন-ব্যবস্থা ধর্ম-কেন্দ্রিক।[৫]

আইনের সার্বভৌমত্ব অতি বাস্তব, ইহা রূপকথা নহে। মোটের উপর, দিল্লীর সুলতানগণ তাঁহাদের রাজ্যশাসন-ব্যবস্থায় এবং জনগণের সহিত তাঁহাদের আচার-ব্যবহারে শরিয়াতের প্রতি অসাধারণ সম্মান প্রদর্শন করিতেন।[৬] তাঁহাদের শাসন-ব্যবস্থায় ধর্মের প্রভাব অস্বীকার করা চলে না।

আইন বিশারদদের প্রতিবাদ সত্ত্বেও, পরবর্তীকালের লেখকগণ সমর্থন করেন ও জোর দিয়া বলেন যে, ধার্মিক শাসনকর্তা ছিলেন 'আল্লাহর প্রতিনিধি' এবং 'পৃথিবীতে সৃষ্টিকর্তার প্রতিবিম্ব'।[৭] রাজার শ্রেষ্ঠত্ব ও প্রাধান্য সম্বন্ধে হিন্দুদের আরও বেশী অতিরঞ্জিত ধারণা রহিয়াছে। একজন রাজা হইতেছেন রাষ্ট্রের প্রাণশক্তি, জনগণের শাসক, রক্ষক ও পৃষ্ঠপোষক।[৮]

---

১ আইন-উল-মাহরু : ইনশা-ই-মাহরু, চিঠি নং ১৯।

২ ইহা তাঁহার প্রশাসনিক ক্ষমতার অংশ হিসাবে বিবেচিত হইত। —আখলাক্-ই-জালালী, পৃ: ৫৫

৩ মহাভারত, শান্তি পর্ব, অধ্যায় ৫৯।

৪ দৃষ্টান্ত স্বরূপ—ত্রিপাঠি ; এম্. অ্যাডমিনিস্ট্রেশন্, পৃ: ২।

৫ ত্রিপাঠি : এম্. অ্যাডমিনিস্ট্রেশন্, পৃ: ৪৪।

৬ কোরায়েশী : এস্. অ্যাডমিনিস্ট্রেশন্, পৃ: ৪৪।

৭ ইস্পাহানী : সুলুক-উল-মুলুক, পৃ: ১৭ ; আখলাক-ই-জালালী, পৃ: ১৩৪ ; আমীর খুসরু : কিরাণ-উস-সা'দায়িন, পৃঃ ২৫ ; খুসরু : খাজা-ইন-উল্-ফুতাহ বা তারিখ-ই-আলা-ই, পৃ: ৮, ৫৪, ৭৯।

৮ কৌটিল্য (চাণক্য) : অর্থশাস্ত্র (আর. শর্মা শাস্ত্রী কর্তৃক অনূদিত), পৃ: ৩৭৮ ; শুক্রনীতি, প্রথম (বি. কে. সরকার কর্তৃক অনূদিত), পৃ: ৩৯—৪০।

সুলতানের সম্মান ও প্রতিপত্তি সম্পর্কে হিন্দু-মুসলিম সকলে একমত। সুলতানদের সরকারী কর্তব্য ও দায়িত্ব সম্বন্ধে মুসলিম আইনজ্ঞদের প্রদত্ত তালিকা নিয়ে বর্ণিত হইল।[১]

(১) ধর্মীয় বিশ্বাসকে রক্ষা করা ;
(২) প্রজাবৃন্দের মধ্যে পারস্পরিক ঝগড়া-কলহ নিষ্পত্তি করা;
(৩) মুসলিম রাজ্য রক্ষা করা, এবং ভ্রমণকারীদের জন্য রাস্তা-ঘাট নিরাপদ রাখা;
(৪) অপরাধ সম্বন্ধীয় নিয়মাবলী বলবৎ করা ;
(৫) সম্ভাব্য আক্রমণ হইতে মুসলিম রাজ্যের সীমান্ত শক্তিশালী করা ;
(৬) ইসলামের যাহারা বিরোধিতা করে, তাহাদের বিরুদ্ধে জেহাদ পরিচালনা করা ;
(৭) কর আদায় করা ;
(৮) রাষ্ট্রের শাসন-কার্য পরিচালনায় তাঁহাকে সাহায্য করিবার জন্য কর্মচারী নিয়োগ করা ; এবং
(৯) জনগণের দৈনন্দিন ব্যাপারে ব্যক্তিগত যোগাযোগ রক্ষা করা।

প্রখ্যাত আইনবিশারদ আহমদ-বিন-মুহম্মদ-বিন-আবদুর্‌রব চমৎকারভাবে উপরোক্ত কর্তব্যগুলি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। যেমন, তিনি বলেন যে, সুলতান ঘটনাবলী নিয়ন্ত্রণ করেন, অধিকার বজায় রাখেন, অপরাধমূলক আইন প্রয়োগ করেন ; সুলতান ছিলেন ধ্রুবনক্ষত্র, তাঁহার চারিদিক ঘিরিয়া রাজ্যের ঘটনাবলী সংঘটিত হয় ; তাঁহার রাজ্যে তিনি সৃষ্টিকর্তার আশ্রয়ের প্রতিরূপ ; সৃষ্টিকর্তার উপর তাঁহার ছত্রচ্ছায়া বিস্তারিত, কারণ তিনি নিষিদ্ধকে নিষিদ্ধ বলিয়া ঘোষণা করেন, উৎপীড়িতদের সাহায্য করেন, অত্যাচারীকে নির্মূল করেন এবং ভীরুদের নিরাপত্তা বিধান করেন।[২] এক কথায় বলা যায় যে, সুলতানগণ নিষ্ঠা ও শ্রদ্ধার মনোভাব লইয়া তাঁহাদের সরকারী কর্তব্য ও দায়িত্ব পালন করিতেন।

---

১ বিশেষ দ্রষ্টব্য—কোরায়েশী : এস্. অ্যাডমিনিস্ট্রেশন্, পৃ: ৪৮-৪৯ ; খুস্রু : নুহ সিপিহর (ব্রি. মি. অ. পাণ্ডুলিপি ২১১০৪), ৭২ ; বারনী : ফাতাওয়া-ই-জাহান্দারী (আই. ও. পাণ্ডুলিপি ২১৬৯), ৭-৮।

২ কোরায়েশী : এস্. অ্যাডমিনিস্ট্রেশন্, পৃ: ৪৯ ; শিহাবউদ্দীন আহমদ : নিহায়াত-উল্ আরব, পৃ: ৫।

একক হস্তে ক্ষমতা কেন্দ্রীভূতকরণের দরুন অনেক অজ্ঞাত লেখক দিল্লীর সুলতানকে স্বৈরতন্ত্রের ও স্বেচ্ছাচারিতার প্রতীক হিসাবে চিত্রিত করিয়াছেন।[১] এই সকল লেখকদের মতে, সুলতানের ক্ষমতা সীমাহীন ছিল—তিনি সর্বময় কর্তৃত্ব ও অসীম সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে, এই অনিয়ন্ত্রিত সর্বক্ষমতা স্বৈরাচারী শাসকের স্বপ্নে অথবা মূর্খের কল্পনায়ই বিরাজ করে—বাস্তবে ইহার মূল্য নগণ্য। সমস্ত রাজনৈতিক ক্ষমতারই কিছু না কিছু সীমাবদ্ধতা আছে এবং এই কথাও সত্য যে, রাষ্ট্রের শক্তিশালী ব্যক্তিদের সহযোগিতার উপরই এই ক্ষমতার অস্তিত্ব নির্ভরশীল। এই মৌলিক নীতি দিল্লী সালতানাতের শাসন-ব্যবস্থায়ও বিদ্যমান ছিল—ইহা নিঃসন্দেহে বলা চলে।

ইহা পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে, দিল্লী সুলতানের খুব কমই আইন-প্রণয়ন ক্ষমতা ছিল। রাজ্যের জনগণের ব্যক্তিগত ও ধর্মীয় আইনে তিনি হস্তক্ষেপ করিতে পারিতেন না। কারণ হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়েরই নিজ নিজ আইন-কানুন, রীতি-নীতি ছিল এবং এই নিয়মাবলীতে অন্যের হস্তক্ষেপ তাঁহারা নিজেদের জীবনের বিনিময়েও সহ্য করিত না। এই প্রসঙ্গে, সুলতানগণ সম্পূর্ণ অসহায় ছিলেন; তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ কিছু কিছু হিন্দু রীতি-নীতি ও প্রথা অপছন্দ করিতেন। কিন্তু এই রীতি-নীতিতে হস্তক্ষেপ করা অযৌক্তিক বলিয়া মনে করিতেন।[২]

একক সার্বভৌমত্ব নিছক একটি পৌরাণিকী কথা—একটি অবাস্তব অবতারণা ব্যতীত আর কিছুই নহে। জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থন ও সহযোগিতা ব্যতীত কোন শাসক তাঁহার ইচ্ছা-অনিচ্ছা রাজ্যের জনগণের উপর চাপাইয়া দিতে পারেন না। ইহা সর্বক্ষেত্রে লক্ষণীয় যে, শাসন-ব্যবস্থায় কতিপয় প্রভাবশালী ব্যক্তি তাহাদের উদ্যম, উৎসাহ, সামর্থ্য দিয়া শাসনকর্তাকে সক্রিয়ভাবে সমর্থন জ্ঞাপন করিতে প্রস্তুত থাকেন। আর জনগণের বৃহৎ অংশ সরকারী হুকুম পালন করিয়া এবং খাজনা-কর রীতিমত প্রদান করিয়া, সরকারকে পরোক্ষ

---

১ কোরায়েশী: এস্. অ্যাডমিনিস্ট্রেশন্, পৃ: ৪৯।

২ শিহাবউদ্দীন: নিহায়াত-উল্-আরব, পৃ: ৫; ইস্পাহানী: মুলুক-উল্-মুলুক, ১৬।

সমর্থন প্রদর্শন করে। তাই স্বাভাবিকভাবেই দিল্লী সুলতান অভিজাত সম্প্রদায়ের সক্রিয় সমর্থনের উপর নির্ভর করিতেন। ইহা লক্ষ্য করা যায় যে, এই সম্ভ্রান্তবংশীয় ব্যক্তিগণও সুলতানকে সাহায্য ও সহযোগিতা করিতে আগ্রহশীল ছিলেন।[১] উলামা, আইনবিশারদদের সমর্থনও সুলতান কামনা করিতেন, কারণ মুসলিম জনসাধারণের উপর তাঁহাদের গভীর প্রভাব ছিল। তাঁহাদের প্রভাব এত প্রবল ছিল যে, সুলতানগণ অনেক সময় ঈর্ষান্বিত হইতেন।[২] রাজ্যশাসন-ব্যবস্থায় অভিজ্ঞ রাজকর্মচারীদের সমর্থনও সুলতান উপেক্ষা করিতে পারিতেন না। বিশেষ করিয়া, মুসলিম সেনাবাহিনীর কথা উল্লেখযোগ্য, কারণ রাজ্যের শক্তির প্রধান উৎস ও মেরুদণ্ড ছিল এই সামরিক বাহিনী, যাহারা সুলতানের গৌরব ও যশ রক্ষার্থে তাহাদের জীবন উৎসর্গ করিতে প্রস্তুত ছিল। কোন সুলতানই উপরোক্ত বিভিন্ন সহযোগিতা উপেক্ষা করিতে পারিতেন না, কারণ তাহাদের সক্রিয় সমর্থন ব্যতীত রাজ্যশাসনে সফলতা অর্জন অসম্ভব ছিল। সুতরাং সুলতানকে সর্বদা সজাগ থাকিতে হইত যে জনগণের শত্রুতা ও বিরোধিতা কদাচিৎ বিফলে পর্যবসিত হয়।[৩] সমসাময়িক লেখকগণ প্রকৃত সার্বভৌমের অধিকারী দিল্লী সুলতানদের রাজকীয় ক্ষমতার সীমাবদ্ধতা নিঃসন্দেহে স্বীকার করিয়াছেন।

---

১ বারনী : ফিরোজশাহী, পৃ: ১৩৬-১৩৮ ও ১৫১।

২ শেখ নিজামউদ্দীনের প্রভাবের জন্য, দ্রষ্টব্য—বারনী : ফিরোজশাহী, পৃ: ৩৪১-৩৪৬।

৩ কোরায়েশী : এস্. অ্যাডমিনিস্ট্রেশন্, পৃ: ৫২ ; খুস্রু, 'তুঘলক-নামা', পৃ. ৪৭।

চতুর্থ অধ্যায়

রাজকীয় গৃহস্থালী সংগঠন

দিল্লীর সুলতানগণ অত্যধিক জাকঁজমক ও আড়ম্বরপূর্ণ রাজকীয় জীবন অতিবাহিত করিতেন, এই কথা সর্বজনবিদিত। তাঁহাদের দীপ্তিপূর্ণ, চটকদার রাজকীয় পারিবারিক জীবন, আনুষ্ঠানিক দরবার, সভা, শোভাযাত্রা, রাজ-ভোজ, উৎসবাদি, প্রভাব-প্রতিপত্তি আজও ভারতীয় লোককাহিনীর প্রিয়-বিষয়বস্তু হইয়া আছে। সমসাময়িক ঐতিহাসিকগণ সুলতানের দরবার-সভা ও রাজকীয় অনুষ্ঠান-উৎসবাদির চমকপ্রদ বিবরণ দিয়াছেন; বিশেষ করিয়া, এই প্রসঙ্গে প্রত্যক্ষদর্শী ইবনে বতুতার বিবরণী খুবই আকর্ষণীয়।[১]

প্রকাশ্য দরবারে সুলতান জনসাধারণের অভাব-অভিযোগ শ্রবণ করিতেন[২] এবং উহা মোচন করিবার চেষ্টা করিতেন। এই দরবারেই তিনি তাঁহার সরকারী কর্তব্য পালন করিতেন। রাজ্যের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে যে সকল বিশ্বাসী ও অভিজ্ঞ রাজকর্মকর্তাদের পরামর্শ[৩] গ্রহণ প্রয়োজনীয় মনে করিতেন, তিনি শুধু তাহাদের সহিত গোপন বৈঠকে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতেন। গোপন দরবারে রাষ্ট্রের উচ্চতর অভিজাত ব্যক্তি ও প্রধান প্রধান রাজকর্মকর্তাগণ আলোচনায় অংশ গ্রহণ করিতেন। সচিবালয়ের পদস্থ কর্মকর্তাগণকেও অনেক সময় ইহাতে যোগদান করিতে হইত। রাষ্ট্র পরিচালনার বিভিন্ন ধরনের বেশীর ভাগ কাজই এখানে সমাধা করা হইত।

সুলতানের বিচিত্র জীবনে বিভিন্নমুখী ব্যস্ততার দরুন রাজকীয় প্রদর্শনী

---

১ মিনহাজ: নাসিরী, পৃ: ৩১৬-৩১৯; বারনী: ফিরোজশাহী, পৃ: ৩০-৩৩; শামস-ই-সিরাজ আফিফ: তারিখ-ই-ফিরোজশাহী, পৃ: ২৮০-২৮৭। 'ইবনে ফজল-উল্লাহ আল্-উমারি: মাসালিক-উল্-আবসার ফি মুমালিক-ই-আল্-আমসার, পৃ: ১০, ৪১-৫২; খুসরু: খাজাইন-উল-ফুতাহ, পৃ: ১৮১-১৮৪; খুসরু: কিরান-উস-সা'দিন, পৃ: ৫২-৫৩।

২ কোরায়েশী: এস. অ্যাডমিনিস্ট্রেশন্, পৃ: ৫৮।

৩ আফিফ: ফিরোজশাহী, পৃ: ২৭৮।

ও আড়ম্বরপূর্ণ উৎসবাদির সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য এবং রাজ পরিবারের তত্ত্বাবধানের জন্য অনেক উচ্চ ও নিম্নপদস্থ কর্মচারীর প্রয়োজন ছিল। তাহাদের দ্বারাই সংগঠিত ছিল রাজকীয় গৃহস্থালী সংগঠন। সুলতানের মর্যাদা যাহাতে কোন রূপেই ক্ষুণ্ণ না হয়, সেইজন্য অতি নিষ্ঠার সঙ্গে সুষ্ঠুভাবে শৃঙ্খলার মাধ্যমে, নিখুঁতভাবে রাজপরিবারের ও রাজকীয় অনুষ্ঠানাদির সর্বপ্রকার কাজকর্ম পরিচালিত হইত। ইহার জন্য প্রয়োজন ছিল অনেক উচ্চপদস্থ, নিম্নপদস্থ কর্মচারী, ঘোষক, দারোয়ান ইত্যাদি। রাজপরিবারের পুরুষ ও মহিলাদের সেবার জন্য নিয়োজিত ছিল সুলতানের দেহরক্ষী, তাঁহার ব্যক্তিগত চিকিৎসক রাজপ্রাসাদের পাহারাদার এবং আরও অনেক কর্মচারী ও দাস-দাসী। ইহা ব্যতীত রাষ্ট্রের কয়েকটি দপ্তরও রাজপ্রাসাদের সংগঠনের অংশ হিসাবে বিবেচিত হইত। এইভাবে দেখা যায় যে, এই রাজকীয় গৃহস্থালী সংগঠন দিল্লী সালতানাতের শাসন-ব্যবস্থায় একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করিত।

রাজকীয় পারিবারিক প্রতিষ্ঠানের সর্বাপেক্ষা উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা ছিলেন ওয়াকিল-ই-দার।[১] আব্বাসীয় আমলে ইহা ছিল একটি গুরুত্বপূর্ণ পদ এবং এই পদটি ওস্তাদ-উদ-দার নামে পরিচিত ছিল।[২] ওয়াকিল-ই-দার এই সমগ্র সংগঠনকে নিয়ন্ত্রণ করিতেন এবং সুলতানের ব্যক্তিগত কর্মচারীদের বেতন ও ভাতা প্রদান করিতেন।[৩] রাজপরিবারের রন্ধনশালা, শরাফখানা, আস্তাবল এবং এমনকি রাজপরিবারের সন্তান-সন্ততিও তাঁহার তত্ত্বাবধানে ছিল।[৪] তাঁহার একটি পৃথক সচিবালয় ছিল। সুলতানের সকল আদেশ, হুকুম এই সচিবালয়েই তালিকাভুক্ত হইত এবং সীলমোহর করা হইত।[৫] রাজ সভাসদ, রাজকুমারী, রানী, রাজপরিবারের সকলই ওয়াকিল-ই-দারকে মানিয়া চলিতেন। এই রাজকীয় সংগঠনের উপর ওয়াকিল-ই-দারের প্রভাব ছিল প্রগাঢ়। তাঁহাকে সুলতানের প্রতিনিধি বলা হইত।[৬] যেহেতু তিনি রাজপরিবারের সদস্য-

---

১ বারনী: ফিরোজশাহী, পৃঃ ৫৭৬।

২ আব্বাসীয় আমলের শেষ দিকে অবশ্য এই পদটির গুরুত্ব হ্রাস পাইয়াছিল।—আবু আলী হাসান ইবনে আলী তুসি নিজাম-উল্-মুলুক: সিয়াসত-নামা অথবা সিয়ার-উল্-মুলুক, পৃঃ ৮১।

৩ মিনহাজ: নাসিরী, পৃঃ ২৯৮।

৪ নিজাম-উল্-মুলুক: সিয়াসত-নামা, পৃঃ ৮২।

৫ কোরায়েশী: এস. অ্যাডমিনিস্ট্রেশন্, পৃঃ ৫৯।

৬ পূর্বোক্ত: পৃঃ ৫৯।

সদস্যাদের তত্ত্বাবধানের কাজে ও সুযোগ-সুবিধা প্রদানের দায়িত্বে জড়িত থাকিতেন, সেইহেতু তাঁহাকে অতি সতর্কতা, কৌশল ও দক্ষতার সহিত তাঁহার কর্তব্য পালন করিতে হইত। তিনি ছিলেন ব্যাপক ক্ষমতার অধিকারী। তবে তাঁহাকে দরবারে রাজপ্রতিনিধি কিংবা মোগল ওয়াকিল-উস-সালতানাহ্[১] মনে করিলে ভুল হইবে। গজনী সুলতানদের আমলেও এই রাজকর্মচারীর পদটি বিদ্যমান ছিল, কিন্তু এই পদটি বিভিন্ন নামে পরিচিত ছিল। তখনও তাঁহাকে সাহিব-ই-দিওয়ান-ই-ওয়াকালাত[২] বলা হইত। মোগল সম্রাট হুমায়ুনের রাজত্বকালে এই পদটি ওয়াকিল-ই-দার-ই-খানাহ্[৩] নামে পরিচিত ছিল। আর একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি সুলতানী আমলে ওয়াকিল-ই-দারকে সক্রিয়-ভাবে সাহায্য করিতেন, তিনি না'ইব ওয়াকিল-ই-দার[৪] পদে অভিহিত ছিলেন।

পদ ও গুরুত্বের দিক হইতে বিবেচনা করিলে, সমপর্যায়ের আরেকজন এই প্রতিষ্ঠানের রাজকর্মকর্তা ছিলেন—তিনি হইলেন আমীর হাজিব। তিনি বারবেক্[৫] নামেও পরিচিত ছিলেন। ইউরোপীয় লেখকগণ বারবেক্‌কে সাধারণতঃ প্রধান রাজকীয় গৃহস্থালীর তত্ত্বাবধায়ক (দি চিফ্ অফ চ্যাম্-বারলেন)।[৬] নামে অভিহিত করেন। বারবেক্ ছিলেন দরবারে অনুষ্ঠান উৎসবাদির আয়োজনের প্রধান। রাজকীয় উৎসবাদির মর্যাদা রক্ষা করা এবং উৎসবের দরবারে সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ও পদস্থ কর্মকর্তাগণ পদমর্যাদানুযায়ী কে কোথায় আসন গ্রহণ করিবেন, উহার সুষ্ঠু বন্দোবস্ত করা ছিল তাঁহার কাজ। তাঁহার সহকারিগণকে বলা হইত হাজিব, তাহাদের দ্বারা পরিচিত না হইয়া কেহ-ই সুলতানের সম্মুখে হাজির হইতে পারিত না। আমীর হাজিব

---

১ দ্রষ্টব্য—র‍্যাভারটি-এর তবাকাত-ই-নাসিরীর অনুবাদ, পৃঃ ২৮৭; আবুল ফজল: আইন-ই-আকবরী, প্রথম খণ্ড (এইচ. ব্লকম্যান কর্তৃক সম্পাদিত, কলিকাতা ১৮৯৪), পৃঃ ৪।

২ মুহম্মদ নাজিম: *দি লাইফ অ্যাণ্ড টাইম্‌স্ অফ সুলতান মাহমুদ অফ গাজনা*, ১৪৭।

৩ আবুল ফজল: আকবর-নামা (এইচ. বেভারিজ কর্তৃক অনূদিত, কলিকাতা ১৮২১), পৃঃ ২০২, ৩০৬

৪ বারনী: ফিরোজশাহী, পৃঃ ৩৬, ২৭৫।

৫ সুলতানী আমলে আমীর হাজিব ও বারবেক্ পদটি এক-ই ব্যক্তিকে বুঝাইত।—বারনী: ফিরোজ-শাহী, পঃ ২৪, ৬১; আফিফ: ফিরোজশাহী, পৃঃ ৪২।

৬ র‍্যাভর্টি তাহার তবাকাত-ই-নাসিরীর অনুবাদে আমীর হাজিব (বারবেক)-কে প্রধান রাজকীয় গৃহাধ্যক্ষ ('লর্ড চ্যাম্বারলেন্') নামে অভিহিত করেন। —নাসিরী, পৃঃ ৮২।

অথবা তাঁহার অধীনস্থদের মাধ্যমে, সকল আবেদনপত্র, দরখাস্ত সুলতানের নিকট পেশ করা হইত।[১] বলিতে গেলে সব ব্যাপারই তাঁহার দ্বারা সম্পাদিত হইত। সুতরাং তিনি অতি মর্যাদাসম্পন্ন পদের অধিকারী ছিলেন, এবং সাধারণতঃ এই পদটি রাজপরিবারের রাজকুমারদের কিংবা সুলতানের বিশ্বস্ত অভিজাত ব্যক্তিদের জন্য সংরক্ষিত ছিল।[২] না'ইব বারবেকের পদেও সুলতানের কোন বন্ধু কিংবা নিকট আত্মীয় অধিষ্ঠিত ছিলেন।[৩] কখনও কখনও সুলতান রাজধানী হইতে দূরে অবস্থান করিলে, ঐ অনুপস্থিতকালে না'ইব বারবেক্ অন্যান্য অভিজাত ব্যক্তি, আমীর ওমারাহদের সহিত সুলতানের প্রতিনিধি হিসাবে কাজ চালাইতেন।[৪] সুলতান কিছু সংখ্যক বিশেষ সাহায্যকারী হাজিব দ্বারা সর্বদা পরিবেষ্টিত থাকিতেন। সম্ভবতঃ এই বাছাইকৃত হাজিবদিগকে খাস্ হাজিব[৫] বলা হইত। নেতৃস্থানীয় হাজিবদিগকে বিশেষ উপাধি দেওয়া হইত—যেমন, 'সাঈদ-উল-হুজ্জাব' অথবা 'শরাফ-উল হুজ্জাব'।[৬] হাজিবগণের অনেকেই প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত সৈনিক ছিলেন এবং তাহাদিগকে সামরিক অভিযান পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়া হইত।[৭] সুলতান-প্রাপ্ত উপহার সামগ্রীর তালিকা প্রণয়নের দায়িত্বও হাজিবদের মধ্য হইতে একজনকে দেওয়া হইত। তাহাকে 'হাজিব-ই-ফাসল্'[৮] বলা হইত।

উক্ত নেতৃস্থানীয় হাজিবগণকে সুলতান যুদ্ধ-পরিচালনা পরিষদের আলোচনায় অংশ গ্রহণ করিবার জন্য আমন্ত্রণ করিতেন এবং তাহাদের পরামর্শ গুরুত্বের সহিত বিবেচিত হইত।[৯]

---

১ বারনী : ফিরোজশাহী, পৃঃ ৫৭৮।

২ পূর্বোক্ত, পৃঃ ৩৬-৩৭, ৬১ ; বইহাকী : তারিখ-ই-বইহাকী, পৃঃ ৭।

৩ কোরায়েশী : এস. অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, পৃঃ ৬১।

৪ বারনী : ফিরোজশাহী, পৃঃ ৫০৯।

৫ দ্রষ্টব্য—কোরায়েশী : এস. অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, পৃঃ ৬২ পাদটীকা। আলুজব্বার আল্ উৎবি একই ব্যক্তি আলতুনতাশ-এর জন্য হাজিব-ই-খাস্, আমীর হাজিব ও হাজিব-ই-কবির শব্দগুলি ব্যবহার করিয়াছেন।—তারিখ-ই-ইয়ামিনী (ফার্সী অনুবাদ), পৃঃ ৩৪২, ৩৪৯, ৪০৬। দিল্লী সুলতানী আমলে খাস হাজিব অবশ্যই আমীর হাজিব হইতে ভিন্ন পদ ছিল। শেরশাহের সময় হাজিবদার নামে একটি পদ ছিল।—দাউদী : তারিখ-ই-দাউদী, ৮৭।

৬ বারনী : ফিরোজশাহী, পৃঃ ৫২৭-৫২৮

৭ মিনহাজ : নাসিরী, পৃঃ ১৭৩।

৮ খুসরু : কিরান-উস্-সা'দায়িন, পৃঃ ৯৩।

৯ বইহাকী : তারিখ-ই-বইহাকী, পৃঃ ৫৮৫-৫৮৬ ; খুসরু : খাজাইন্-উল্-ফুতুহ, পৃঃ ১৬।

পদমর্যাদায় অধঃস্তন হইলেও, রাজকীয় অনুষ্ঠানাদিতে জড়িত আর একটি গুরুত্বপূর্ণ পদ হইল নকিব[১] অর্থাৎ ঘোষক। সাধারণতঃ এই ঘোষকগণ সৈন্যদিগের ও জনসাধারণের জন্য সুলতানের সরকারী আদেশ ঘোষণা করিত। তাহারা রাজঅশ্বারোহীদিগের দীর্ঘ শোভাযাত্রার সম্মুখভাগে থাকিয়া, উচ্চস্বরে সুলতানের উপস্থিতি ঘোষণা করিত।[২] এই ঘোষকদের প্রধান ছিল নকিব-উল-নুকাবা। ময়ূরের পালক দ্বারা বেষ্টিত একটি স্বর্ণ 'টিয়ারা' ও একটি স্বর্ণদণ্ড ছিল তাহার পদমর্যাদার সম্মানের বিশিষ্ট পরিচয়-চিহ্ন স্বরূপ।[৩] রাজকীয় উৎসবাদিতে প্রত্যেক যোগদানকারীর আগমন ও প্রত্যাগমন লক্ষ্য রাখা ছিল তাহার দায়িত্বের অন্যতম।

সুলতানের কিছু সংখ্যক জান্‌দার নামে বাছাই করা সৈন্য ছিল; উহারা ছিল তাঁহার দেহরক্ষী। দেখিতে সুন্দর, সুদেহী, স্বাস্থ্যবান ও সাহসী যুবকগণকে এই পদে নিয়োগ করা হইত। তাহাদিগকে সামরিক প্রশিক্ষণ দেওয়া হইত এবং তাহাদের পোশাক পরিচ্ছদ ও অন্যান্য সাজ-সরঞ্জাম অতি যত্নের সহিত তৈয়ারী করা হইত। দেহরক্ষী হিসাবে সর্বত্র সুলতানের সঙ্গে উপস্থিত থাকাই ছিল তাহাদের প্রধান কর্তব্য। সাধারণতঃ প্রমাণিত রাজানুগত-ক্রীতদাসরা ছিল জান্‌দার। বিশ্বাসভাজন অভিজাত ব্যক্তি দ্বারা তাহারা পরিচালিত হইত। তাহাকে বলা হইত সার্‌-জান্‌দার। কখনও কখনও দুইজন সার্‌-জান্‌দার থাকিতেন—একজন ডান ও অপরজন বাম দিকের জন্য।[৪] আর এক দল সশস্ত্র সৈনিক ছিল—তাহাদিগকে বলা হইত সিলাদার। সুলতান যখনই জনসাধারণকে দর্শন দিতেন কিংবা অশ্বারোহণ করিয়া ভ্রমণে যাইতেন, তখন তাহারা সুলতানের সঙ্গে থাকিত।[৫] তাহাদের নেতাকে বলা হইত সার্‌-সিলাদার; সাধারণতঃ দুইদিকের জন্য দুইজন সার্‌-সিলাদার ছিলেন।[৬]

---

১ মিনহাজ: নাসিরী, পৃঃ ১৯২।

২ ইবনে বতুতা: তুহ্‌ফাত-উন-মুজ্জার, দ্বিতীয়, পৃঃ ৩৬।

৩ পূর্বোক্ত, পৃঃ ৩৬।

৪ বারনী: ফিরোজশাহী, পৃঃ ২৪। কখনও কখনও দুইয়ের অধিকও সার্‌-জান্‌দার থাকিতেন।

৫ ইবনে বতুতা: তুহ্‌ফাত-উন্‌-মুজ্জার, দ্বিতীয়, পৃঃ ৩৬।

৬ মীর-সিলাহ্‌ও বলা হইত।—খুস্‌রু: কিরান-উস্‌-সা'দায়িন, পৃঃ ৯৬।

রাজ পারিবারিক সংগঠনের অধস্তন কর্মচারীদের বিভিন্ন দায়িত্ব ও কর্তব্য ছিল। গ্রন্থাগার ছিল একজন গ্রন্থাগারিক কিতাবদার-এর তত্ত্বাবধানে ; চাশ্‌নিগির রন্ধনশালা পরিদর্শন ও তদারক করিত এবং খাবারের স্বাদ গ্রহণ করিবার পর, সুলতানকে ঐ খাবার পরিবেশন করা হইত।[১] পানীয় দ্রব্যের দায়িত্বে ছিল শারাবদার এবং সাকি-ই-খাস মাদকদ্রব্য পরিবেশন করিত।[২] প্রধান ফর্‌রাশ আসবাবপত্র তদারক করিত এবং মশ'আলদার আলো-বাতির দায়িত্বে ছিল।[৩] রাজকীয় সংগঠনের লেখাপড়ার দোয়াত-কালি সংরক্ষণ করিত দোয়াত-দার এবং রাজপ্রাসাদের নিবন্ধক ছিলেন দবির-ই-সারা।[৪] বাহ্‌লাহ্‌দার অর্থাৎ খাজিনাদার রাজার ব্যক্তিগত ধন-দৌলত অর্থাৎ রাজার খাস্‌ তহবিল রক্ষক।[৫] সার্‌-ছত্রদার ছিল প্রধান রাজ-ছত্রধারী এবং আমীর-ই-তুজুক রাজকীয় পদমর্যাদার বিশেষ পরিচয়-চিহ্ন তদারক করিত।[৬] সুলতানের ব্যক্তিগত অস্ত্র-শস্ত্রের দায়িত্বে ছিল খাসাহ্‌দার।[৭] রাজ-চিকিৎসক সাধারণতঃ মালিক-উল্‌-হুকুমা[৮] নামে অভিহিত ছিলেন।

সুলতানের ব্যক্তিগত বন্ধুবান্ধবদিগকে সাক্ষাৎ প্রদানের জন্য, বে-সরকারী উৎসবের আয়োজন করিবার দায়িত্বে ছিলেন আমীর-ই-মজলিস।[৯]

রাজপারিবারিক সংস্থার মত একটি বৃহৎ প্রতিষ্ঠানের জন্য, স্বাভাবিকভাবেই রসদ যোগাইবার একটি বিরাট দপ্তরের প্রয়োজন ছিল এবং ইহা বিভিন্ন বিভাগে

---

১ মিনহাজ : নাসিরী, পৃঃ ২৩২, ২৬১, ২৬৫। কিতাবদারকে মুশাফবরদারও বলা হইত।—ইবনে বতুতা : তুহফাত-উন-নুজ্জার, দ্বিতীয়, পৃঃ ৭১।

২ শরাবের অর্থ যে-কোন পাণীয় দ্রব্য ; সর্বদা সুরাসার নাও হইতে পারে। অন্য অর্থানুযায়ী 'সর-আবদার' হইল প্রধান পানি-রক্ষক।—কোরায়েশী : এস. অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, পৃঃ ৬৫, পাদটীকা।

৩ বারনী : ফিরোজশাহী, পৃঃ ১৮৩।

৪ বইহাকী : তারিখ-ই-বইহাকী, পৃঃ ৮১৭, ৮১৯।

৫ মিনহাজ : নাসিরী, পৃঃ ২৪৮, ২৫৪।

৬ বারনী : ফিরোজশাহী, পৃঃ ১২৬, ২৪১, ৫২৭।

৭ মিনহাজ : নাসিরী, পৃঃ ২৬৫।

৮ বারনী : ফিরোজশাহী, পৃঃ ২৫৪-২৫৫।

৯ মিনহাজ : নাসিরী, পৃঃ ২৩৮।

বিভক্ত ছিল। ইহাদিগকেই কারখানা বলা হইত। কারখানার সংখ্যা নির্দিষ্ট ছিল না; ভিন্ন ভিন্ন সুলতানের আমলে বিভিন্ন সংখ্যার কারখানা বিগুমান ছিল। ফিরোজশাহের রাজত্বকালে কারখানার সংখ্যা ছিল ৩৬টি। এই কারখানা দুই শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল, যেমন রাতিবি ও গায়ের-রাতিবি। শামস্-ই-সিরাজ আফিফ তাঁহার তারিখ-ই-ফিরোজশাহী গ্রন্থে নিম্নলিখিত কয়েকটি কারখানার নাম উল্লেখ করিয়াছেন।[১]

রাতিবি ঃ আবদার খানাহ্,—রাজপ্রাসাদের পানি সরবরাহ, রন্ধনশালা; শাম-দারখানাহ্,—আলো বাতির বিভাগ; ইতরদারখানাহ্,—সুগন্ধি সরবরাহ বিভাগ; পইগাহ—আস্তাবল ও অশ্বের রক্ষণাবেক্ষণ; পিলখানাহ্,—হস্তী বিভাগ।

গায়ের রাতিবি ঃ জমদারখানাহ (জমাহ্‌দার খানাহ্‌ও বলা হয়)—তোষাখানা (পোশাকের আলমারি); কিতাবখানাহ্,—গ্রন্থাগার; গড়ি-ইয়ালখানাহ্,—সময়রক্ষক; ফররাশখানাহ্,—আসবাবপত্র ও তাঁবুবিভাগ; রিকাবখানাহ্,—জিন ও ঘোড়ার সাজ বিভাগ; জরাদখানাহ—আত্মরক্ষার্থ বর্ম, যুদ্ধসজ্জার সামগ্রী বিভাগ; সিলাহ্‌খানাহ্,—মণিমুক্তা, অলঙ্কারাদি বিভাগ ইত্যাদি।

রাতিবি কারখানা পচনশীল দ্রব্য-সামগ্রী যথা, আস্তাবল, কুকুরশালা ও রন্ধনশালার জন্য খাদ্যদ্রব্য সরবরাহ করিত। শামখানাহ্ আলোবাতি, তেল সরবরাহ করিত। ইহাও রাতিবি ছিল। গায়ের-রাতিবি কারখানা পোশাক-পরিচ্ছদ, কাপড়জামা, আসবাবপত্র, তাঁবু ও এই জাতীয় জিনিসপত্র সরবরাহ করিত। প্রতিটি কারখানা মালিক অথবা খান উপাধিধারী বিশিষ্ট সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি দ্বারা পরিচালিত ছিল। মুতাসাররিফ কারখানার হিসাবপত্রের জন্য দায়ী ছিলেন এবং তিনি কারখানা পরিদর্শন করিতেন। সমস্ত কারখানার তত্ত্বাবধানের জন্য একজন প্রধান মুতাসাররিফ ছিলেন। প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রীর সরবরাহের জন্য কর্তৃপক্ষের নিকট আনুষ্ঠানিকভাবে আবেদনপত্র এই প্রধান মুতাসাররিফের নিকট প্রেরিত হইত এবং তিনি যথারীতি নির্দেশ দিয়া সংশ্লিষ্ট মুতাসাররিফের নিকট আবেদনপত্র প্রেরণ করিতেন। সুলতান ফিরোজশাহের রাজত্বকালে এই কারখানাগুলির জন্য একটি পৃথক হিসাব রাখার দপ্তর ছিল।

---

১ কোরায়েশী : এস. অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, পৃঃ ৬৯ পাদটীকা।

প্রতিবৎসর শেষে কারখানার হিসাবপত্র, আয়-ব্যয় সরকারীভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হইত।[১] মনে হয়, খুব সম্ভব, দিল্লীতে প্রতিটি কারখানার জন্য একজন করিয়া কোষাধ্যক্ষ ছিলেন। রাজপরিবারের ও রাজদরবারের ব্যবহার্য দ্রব্যসামগ্রী এই কারখানাগুলি প্রস্তুত করিত। উদাহরণস্বরূপ, জমদারখানাহ্‌ সাম্রাজ্যের সর্বাপেক্ষা ভাল পোশাক-পরিচ্ছদ, কাপড়-জামা প্রস্তুত করিয়া সরবরাহ্‌ করিত।

রাতিবি কারখানাগুলির মধ্যে, পাইগাহ্‌ অশ্ব প্রতিপালন বিভাগ ছিল খুবই বিস্তৃত। আরব ও তুর্কী অশ্ব সাধারণতঃ তৎকালে ভারতে আমদানি করা হইত; এমনকি সুদূর রাশিয়া হইতেও অশ্ব আমদানির ব্যবস্থা ছিল। এইজন্য রাজ-আস্তাবল একটি বিরাট প্রতিষ্ঠান ছিল। এই রাজ-আস্তাবলের সর্বোচ্চ পদস্থ কর্মচারী ছিলেন আখুরবেক্[২] অর্থাৎ রাজ-অশ্বাদির তত্ত্বাবধানকারী। হস্তী যুদ্ধক্ষেত্রে একটি বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করিত। শাহ্‌নাহ্‌-ই-ফিল[৩] নামে একজন পদস্থ কর্মচারীর অধীনে রাজ্যের হস্তীবাহিনীর বৃহত্তর অংশ রাজ-আস্তাবলে সংরক্ষিত ছিল। এই রাজ-আস্তাবলে অনেক উট, খচ্চর, বলদ ও মহিষ পরিবহনের সুবিধার জন্য সযত্নে রাখা হইত।[৪]

রাজকীয় শিকারের আয়োজনের জন্যও কারখানার প্রয়োজন ছিল। বহু সংখ্যক শিকারী চিতাবাঘ, কুকুর ও বাজপাখী বিভিন্ন কারখানায় পালিত হইত এবং উহাদিগকে অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের পরিচালনায় প্রশিক্ষণ দেওয়া হইত।[৫] রাজধানীর নিকটে রাজকীয় শিকারের সুবিধার্থে বৃহৎ জঙ্গল সংরক্ষণ করা হইত।[৬] রাজকীয় শিকারের আয়োজনের তত্ত্বাবধানে ছিলেন আমীর-ই-শিকার ও সহকারী না'ইব আমীর-ই-শিকার।[৭]

---

১ আফিফ : ফিরোজশাহী, পৃঃ ৩৮৭-৪০০।

২ মিনহাজ : নাসিরী, পৃঃ ২৩২,২৪২।

৩ বারনী : ফিরোজশাহী, পৃঃ ২৪, ১২৬।

৪ কোরায়েশী : এস্‌. অ্যাডমিনিস্ট্রেশন্‌, পৃঃ ৭১।

৫ উমির : মাসালিক-উল্‌-আবসার, পৃঃ ৩২; খুসরু : কিরান-উস্‌-সা'দায়িন, পৃঃ ৫৩-৫৪।

৬ আফিফ : ফিরোজশাহী, পৃঃ ৩১৯-৩২৮।

৭ মিনহাজ : নাসিরী, পৃঃ ১৬৯।

রাজদরবারে শিষ্টাচার ও মার্জিত আদব-কায়দা খুবই জটিল ও বলপূর্বক আদায়করণ-জাতীয় ছিল। রাজ-কর্মকর্তা ও রাজ পরিবারের সদস্যদের প্রত্যেকের পদমর্যাদা অনুযায়ী পর্যায়ক্রমে তাহাদের আসন রাজকীয় উৎসবে সংরক্ষণ করা হইত।[১]

রাজপরিবারের মহিলা সদস্যগণের প্রভাব প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে ছিল না বলিলেই চলে। যদিও তাঁহারা অতীব সম্মানের অধিকারী ছিলেন। জ্যেষ্ঠা রাণীকে বলা হইত মালিকাহ্-ই-জাহান এবং রাণীমাতা খুদাওয়ানদাহ্-ই-জাহান, অধিক প্রচলিতভাবে মাখদুমাহ্-ই-জাহান উপাধিতে ভূষিত ছিলেন।[২] দেশের শাসন-ব্যবস্থা ও রাজনীতিতে তাঁহাদের কোন প্রভাব বিস্তারিত ছিল না, ঐ সম্পর্কে আমরা সঠিক প্রমাণ পাই না।

ক্রীতদাস রাজপরিবারের অখণ্ড অংশ ছিল। তাহারা দেশের শাসন-ব্যবস্থায় একটি বিশেষ ভূমিকা পালন করিত। সুতরাং তাহারা সরকারী প্রশাসনিক যন্ত্রেরও একটি অভিন্ন অংশ[৩] ছিল, ইহা অনস্বীকার্য।

দিল্লী সালতানাতের শাসন-ব্যবস্থায় রাজকীয় গৃহস্থালী সংগঠনের বিশিষ্ট ভূমিকা পালনের যথার্থ মূল্যায়ন না হইলে, ঐতিহাসিক সত্যতার অপলাপ হইবে। রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক দিক হইতে বিবেচনা করিলে দেখা যায় যে, এক কথায়, রাজকীয় গৃহস্থালী সংগঠন ও রাজদরবার ছিল দিল্লী সালতানাতের প্রাণকেন্দ্র।

---

১ আফিফ: ফিরোজশাহী, পৃ: ২৭৭-২৮৭।

২ মিনহাজ: নাসিরী, পৃ: ১৮১।

৩ বারনী: ফাতাওয়া-ই-জাহানদারী, ৭১,৭২ (আই. ও. পাণ্ডুলিপি ২১৬৯)

পঞ্চম অধ্যায়

কেন্দ্রীয় শাসন-ব্যবস্থা

আরব প্রবাদ বাক্যে বলা হয় যে, সর্বাপেক্ষা সাহসী ব্যক্তির প্রয়োজন অস্ত্র-শস্ত্রের, তেমনি সর্বাপেক্ষা জ্ঞানী রাজার প্রয়োজন মন্ত্রীর।[১] প্রাথমিক রাজনৈতিক নীতি হইতেছে যে, একক শক্তি একটি রাজ্য শাসন করিতে পারে না, এই কথা হিন্দুদের মধ্যেও স্বীকৃত। কৌটিল্য বলিয়াছেন যে, সহযোগিতা, সমর্থন ও সাহায্যের মাধ্যমেই শুধু সার্বভৌমত্বের কার্যকারিতা সম্ভব। সুতরাং রাজ্যের শাসনের সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য, একজন রাজাকে অবশ্যই মন্ত্রী নিয়োগ করিতে হয় এবং তাঁহাদের শলা-পরামর্শ গ্রহণ করিতে হয়।[২] মন্ত্রীদের পরিণত চিন্তা, আলোচনা, পরামর্শ ও উপদেশের মূল্য রাজাকে গভীরভাবে উপলব্ধি করিতে হয়।[৩] হিন্দু-মুসলিম রাজনীতি বিশারদ ও দার্শনিকগণ একমত যে, দেশ শাসকের পক্ষে অভিজ্ঞ, জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তিদের পরামর্শ ও উপদেশ[৪] ব্যতীত, সুচারু ও সুষ্ঠুভাবে রাজ্য শাসন করা সম্ভব নহে। পবিত্র কোরআনে স্পষ্টভাবে উল্লিখিত রহিয়াছে যে, মুসলিমগণ অবশ্যই চিন্তা-ভাবনা, আলাপ-আলোচনা ও পারস্পরিক শলা-পরামর্শের দ্বারা রাজ্য শাসন-ব্যবস্থা পরিচালনা করিবে।[৫] সুতরাং অন্যের পরামর্শ ও উপদেশ গ্রহণের চেষ্টা করা দেশ-শাসকের একটি ধর্মীয় কর্তব্যে পরিণত

---

১ কোরায়েশী : এস. অ্যাডমিনিস্ট্রেশন্, পৃ: ৭৬ ; শিহাবউদ্দীন : নিহায়াত-উল্-আরব, পৃ: ২৯।

২ কৌটিল্য : অর্থশাস্ত্র, পৃ: ১৩।

৩ আবুবকর মুহম্মদ-বিন-আল্ ওয়ালিদ আল্ কোরায়েশী : সিয়ার-উল্-মুলুক, ৬৭ ; হাসান নিজামী : তাজ-উল-মা'আছির, ১৮, ১৯।

৪ আবু তালিব আল্ হুসাইনী : তুজুকাত-ই-তিমুরী, পৃ: ৫।

৫ নিজাম্-উল-মুলক : সিয়াসত-নামা, পৃ: ৩৫ ; উনসুর উল্-মা'আলী কাইকাউস : কাবুস-নামা, পৃ: ২৭।

হইয়াছে[১], ইহা অনস্বীকার্য। দিল্লী সালতানাতের শাসন-ব্যবস্থা পরিচালনায়, সুলতানগণ উপরোক্ত নীতিমালা দ্বারা সর্বদাই অনুপ্রাণিত হইতেন, ইহা স্পষ্টভাবে পরিলক্ষিত হয়।

সুলতানী আমলে কেন্দ্রীয় শাসন-ব্যবস্থায় মন্ত্রিমণ্ডলী জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধি ছিলেন না—ইহা নিঃসন্দেহে বলা চলে। এই কথা সত্য যে, দিল্লী রাজদরবারে সুলতান রাজ্যের সর্বাপেক্ষা বুদ্ধিমান, অভিজ্ঞ ও জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তিদের দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকিতেন। তাহাদের সুচিন্তিত অভিমত, পরামর্শ ও উপদেশ গ্রহণ করিবার সুযোগ সুলতানের প্রচুর ছিল। তাহাদের মাধ্যমে তিনি জনগণের ইচ্ছা-অনিচ্ছা ও পছন্দ-অপছন্দ সম্পর্কে ধারণা করিতে পারিতেন। এমনকি প্রবল জন-প্রতিবাদ ও বিক্ষোভের চাপে, তিনি অনেক সময় নমনীয় মনোভাব প্রদর্শন করিতেও বাধ্য হইতেন। কিন্তু সুলতানের এই মন্ত্রিবর্গ জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধি ছিলেন না বলিয়া, এই মন্ত্রিমণ্ডলীকে প্রতিনিধিমূলক পরিষদ[২] রূপে গণ্য করা চলে না। এক কথায়, মন্ত্রিগণ ছিলেন সুলতানের 'ভৃত্য' মাত্র এবং শুধু তাঁহার নিকট-ই মন্ত্রিগণ দায়ী ছিলেন। তবে ইহা মনে করিলে ভুল হইবে যে, মন্ত্রীদের কোন ক্ষমতাই ছিল না ; কারণ তাঁহাদের পদ-মর্যাদা, ক্ষমতা, দায়িত্ব ও কর্তব্য আইন দ্বারা নির্ধারিত ছিল এবং চিরাচরিত প্রথা দ্বারা অনুমোদিত ছিল।

প্রধানমন্ত্রীকে বলা হইত ওয়াজির।[৩] মুসলমান রাজনৈতিক দার্শনিকগণ এই ওয়াজির পদটিতে অত্যন্ত গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন। আল্-ফখ্‌রির মতে, ওয়াজির ছিলেন শাসনকর্তা ও প্রজাবৃন্দের মধ্যপথে অবস্থিত।[৪] ফখর-ই-মুদাব্বির ওয়াজিরকে সর্বময় কর্তৃত্ব ও ক্ষমতার অংশীদার বলিয়া অভিহিত করেন। তিনি বলেন যে, শাসনকর্তার উচিত ওয়াজিরকে তাঁহার নিজের কর্মক্ষেত্রে

---

১ কোরায়েশী : এস. অ্যাডমিনিস্ট্রেশন্, পৃ: ৭৬।

২ পূর্বোক্ত, পৃ: ৭৮।

৩ ইহা মূলত: ফার্সী।—দ্রষ্টব্য ক্লেমেন্ট হুয়ার্ট : এনশেন্ট পার্শিয়া অ্যাণ্ড ইরানিয়ান সিভিলিজেশন, পৃ: ১৪১ ; ইসলামের শাসনের ইতিহাসের ওয়াজির পদটি আব্বাসীয় সৃষ্টি।—জুরজি জায়দান : তমাদ্দান-উল্-ইসলামী, পৃ: ১১২ ; কোরায়েশী : এস. অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, পৃ: ৭৮, পাদটীকা।

৪ ভনক্রিমার : কালচারাস্ চিভি দা অরিয়েন্টস (খুদাবখ্‌শ কর্তৃক অনুদিত দি অরিয়েন্ট আণ্ডার ক্যালিফস্, পৃ: ২২০ পাদটীকা।

স্বাধীনতা দেওয়া।[১] তিনি আরও মন্তব্য করেন যে, ওয়াজির ব্যতীত কোন সাম্রাজ্য স্থিতিশীল ও স্থায়ী, সমৃদ্ধ ও উন্নত হইতে পারে না।[২] একজন ভারতীয় শাসনকর্তা হুমায়ুন শাহ বাহ্মনী অভিমত ব্যক্ত করেন যে, ওয়াজিরের সাহায্য ও সহযোগিতা ব্যতীত কোন রাজ্য সর্বময় ক্ষমতার উচ্চশিখরে আরোহণ করিতে পারে না; কারণ ওয়াজিরের সুচিন্তিত পরামর্শ ও উপদেশের উপরই দেশের মঙ্গল ও উন্নতি, জনকল্যাণ ও সমৃদ্ধি নির্ভর করে।[৩] দেশের শাসন-ব্যবস্থা পরিচালনায় এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ সর্বোচ্চ পদে উপযুক্ত ব্যক্তি সর্বদা সহজে পাওয়া যায় না; উপযুক্ত ব্যক্তি পাওয়া গেলে, ইহাকে সৃষ্টিকর্তার আশীর্বাদ মনে করিয়া জনসাধারণের উচিত তাঁহার নিকট গভীরভাবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা।[৪]

মুসলিম আইন বিশারদগণ ওয়াজিরাতের বৈধ দিক সম্পর্কে বিস্তারিত আলাচনা করিয়াছেন। এই আলোচনা ওয়াজির পদের বৈধ শ্রেণী-বিভাগের উপর প্রচুর আলোকসম্পাত করিয়াছে। তাহাদের মতে, বৈধভাবে ওয়াজিরাত হইতেছে রাজা বা খলিফার প্রতিনিধিত্ব।[৫] সুতরাং ওয়াজির ছিলেন অর্পিত ক্ষমতার অধিকারী। দুই শ্রেণীর[৬] ওয়াজির লক্ষ্য করি। আল্‌মাওয়ার্দীর মতে ওয়াজির পদ ছিল দুই স্তরের।[৭] তিনি বলেন যে, প্রথম শ্রেণীর ওয়াজিরকে বলা হইত 'ওয়াজির-উত্‌-তাফয়িদ' এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর ওয়াজির 'ওয়াজির-উত্‌-তানফি্জ' নামে অভিহিত ছিলেন। প্রথম শ্রেণীর ওয়াজির বিধিসঙ্গত অসীম

---

১ মুহম্মদ বিন-মনসুর কোরায়েশী ওরফে ফখর-ই-মুদাব্বির: আদব-উল্‌-মুলুক ওযাকিফায়াত-উল-মামলুক, ৩৬।

২ নিজামী: তাজ-উল-মা'আছির, ৯, ২৪৮।

৩ খাজা নিজামউদ্দীন আহমদ: তবাকাত-ই-আকবরী (বি. দে কর্তৃক অনূদিত), কলিকাতা ১৯৩৫, তৃতীয় খণ্ড, পৃ: ৩৫-৩৬।

৪ নসাইহ নিজাম-উল-মুলক (ওয়াসায়া-ই-নিজাম-উল-মুলক), ২১৮। একজন ওয়াজিরের কর্তব্যাদি সম্পর্কে নিজাম-উল-মুলক তুসি তাঁহার পুত্রকে উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন।

৫ ইস্পাহানী: মুলুক-উল্‌-মুলক, ১৭।

৬ ওয়াজিরের বৈধ শ্রেণীবিভাগের বিস্তারিত আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য—কোরায়েশী: এস. অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, পৃ: ৭৯-৮০; ত্রিপাঠি: এম. অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, পৃ: ১৬১-১৬৪।

৭ বিশেষ দ্রষ্টব্য—আল্‌-মাওয়ার্দী: আল্‌-আহকাম-উস্‌-সুলতানিয়াহ।

ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন।[১] সামান্য বাধা ব্যতীত, তিনি শাসনকর্তার সমস্ত ক্ষমতা ও বিশেষ অধিকার ভোগ করিতেন। তিনি শাসনকার্য পরিচালনার জন্য, যে সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করিতেন, ঐগুলি শুধু শাসনকর্তাকে জানাইতেন। তবে বিশেষ অনুমতি ব্যতীত, শাসনকর্তা কর্তৃক নিয়োজিত কোন রাজকর্মচারীকে তিনি পদচ্যুত কিংবা বদ্‌লী করিতে পারিতেন না। কিন্তু তিনি শাসনকর্তার পক্ষে রাজকর্মচারী নিয়োগ করিতে পারিতেন এবং শাসনকর্তা কর্তৃক নিয়োজিত বা নিয়োজিত নহে এমন সকল রাজকর্মচারীর বিরুদ্ধে অভিযোগ শ্রবণ করিতে পারিতেন। পরস্পরের অজ্ঞাতে যদি শাসনকর্তা ও ওয়াজির দুইজনই একই বিষয়ে কোন হুকুম প্রদান করিয়া থাকেন, তবে যিনি প্রথম হুকুম দিয়াছেন, তাঁহার হুকুমই বলবৎ থাকিবে।[২] যাহা হউক, যদি কোন বিষয়ে তাঁহাদের মধ্যে মতের গুরুতর পার্থক্য দেখা দেয়, তাহা হইলে শাসনকর্তা ওয়াজিরের অভিমত অগ্রাহ্য করিতে বা বাতিল করিতে পারিতেন। আর একটি বিশেষ বাধা ছিল যে, ওয়াজির বৈধ অনুশাসনানুযায়ী, তাঁহার উত্তরাধিকারী অথবা প্রতিনিধি নিয়োগ করিতে পারিতেন না।[৩] মুসলিম আইন বিশেষজ্ঞগণ বলেন যে, একাধিক প্রথম শ্রেণীর ওয়াজির নিয়োগ করা যাইত না।[৪] শুধু মুসলিমই প্রথম শ্রেণীর ওয়াজির পদে নিয়োজিত হইতে পারিত ; কারণ অন্যথায় অমুসলমান এই পদে অধিষ্ঠিত হইলে, মুসলিম আইন-কানুনের প্রতি সম্মান প্রদর্শন না করিয়া দেশ শাসন করিবার সম্ভাবনা থাকে।

দ্বিতীয় শ্রেণীর ওয়াজির পদ সম্পূর্ণ অন্য ধরনের ছিল। তাঁহার ক্ষমতা ছিল সীমিত। তিনি কোন প্রশাসনিক নীতি নিজ উদ্যোগে প্রণয়ন করিতে অথবা স্বীয় দায়িত্বে কোন জটিল গুরুত্বপূর্ণ কাজ সম্পাদন করিতে পারিতেন না। দেশের শাসনকর্তার সহকারী হিসাবে, তাঁহার হুকুম পালন করা ও আদেশ কার্যকরী করাই ছিল তাঁহার প্রধান কর্তব্য।[৫] রাজস্ব বিষয়ে তাঁহার ক্ষমতা সীমাবদ্ধ ছিল না,

১ ত্রিপাঠি : এম্. অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, পৃঃ ১৬১।
২ কোরায়েশী : এস্. অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, পৃঃ ৭৯।
৩ পূর্বোক্ত, পৃঃ ৭৯।
৪ আল্-মাওয়ার্দী : আল-আহকাম-উস্-সুলতানিয়াহ, পৃঃ ২১-২৮ ; জায়দান : তামাদ্দুন-উল্-ইসলামী, পৃঃ ১১৪।
৫ জায়দান : তামাদ্দুন-উল্-ইসলামী, পৃঃ ৬১১-৫১১।

ইহা সত্য ; কিন্তু যুদ্ধ ঘোষণা করা কিংবা শান্তি প্রতিষ্ঠা করা, এমন কি উচ্চ পদস্থ রাজকর্মকর্তা নিয়োগ কিংবা বরখাস্ত করিবার কোন ক্ষমতা তাঁহার ছিল না, তবে আইনগতভাবে শাসন পরিচালনার প্রধান হিসাবে, আমলাতান্ত্রিক রাজকর্মচারীদের এবং জনগণের উপর তাঁহার প্রভাব-প্রতিপত্তি অস্বীকার করা যায় না। শাসনকর্তার সর্বপ্রকার হুকুম, নির্দেশ এই ওয়াজিরের দপ্তরের মাধ্যমেই চূড়ান্ত আকার ধারণ করিয়া, দেশের সর্বত্র কার্যকরী হইত। এই দ্বিতীয় শ্রেণীর ওয়াজির, রাজ্যের প্রধানমন্ত্রীরূপে শুধু মাত্র দপ্তর প্রধান ছিলেন। কোন বিষয়ে স্বীয় উদ্যোগে প্রথম পদক্ষেপ লইবার ক্ষমতা না থাকার দরুন, তাঁহার কর্মদক্ষতা, নৈপুণ্য বহুলাংশে হ্রাস পায়। মালিক শাহের প্রখ্যাত ওয়াজির নিজাম-উল্-মুলকের অভিমতে, এই দ্বিতীয় শ্রেণীর ওয়াজির একাধিক নিয়োজিত হওয়া বাঞ্ছনীয় ; কারণ একক হস্তে সর্বক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হইলে অযোগ্যতা ও শৈথিল্যের[১] সৃষ্টি হওয়া স্বাভাবিক। উল্লিখিত দোষ-ত্রুটি ও ক্ষমতার সীমাবদ্ধতা থাকা সত্ত্বেও, এই দ্বিতীয় শ্রেণীর ওয়াজিরই মধ্যযুগের রাজনৈতিক সংবিধানে অধিক উপযোগী বিবেচিত হইত। এই প্রকারের সীমিত ক্ষমতার ওয়াজিরাতের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হইতেছে যে, অমুসলমানদের এই পদে অধিষ্ঠিত হইবার যোগ্যতা আছে।[২] মুসলিম আইনজ্ঞদের মতে, অমুসলমানেরা দ্বিতীয় শ্রেণীর ওয়াজিরের মত সর্বোচ্চ পদে নিয়োজিত হইতে পারে[৩]—ইহাতে কোন বাধা নাই।

দিল্লী সালতানাতের কেন্দ্রীয় শাসন-ব্যবস্থায় এই দুই শ্রেণীর ওয়াজিরই বিদ্যমান ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে বেশীর ভাগ ওয়াজির সীমিত ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন ; মাত্র কয়েকজন ওয়াজির অসীম ক্ষমতার অধিকারী হইয়া সুলতানের নামে সাম্রাজ্যের শাসন-ব্যবস্থা পরিচালনা করিতেন। এই আমলে কয়েকজন সুলতান প্রধানমন্ত্রীর অভিভাবকত্ব ও প্রাধান্য মানিয়া নেওয়ায়, বস্তুতঃপক্ষে এই ওয়াজিরগণ সমস্ত ক্ষমতা অন্যায়রূপে অধিকার করেন।[৪] তবে এই

১ তুসি : কিতাব-ই-সিয়াসাত, অধ্যায় ৪৪, পৃঃ ৯৪, ৯৯।

২ সাইয়েদ আমীর আলী : এ শর্ট হিস্টরী অফ দি স্যার্যাসেন্‌স্, পৃঃ ৪১৩ ও পাদটীকা।

৩ খুদা বখশ : দি অরিয়েন্ট আণ্ডার দি ক্যালিফস্, পৃঃ ২২৪।

৪ কোরায়েশী : এস. অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, পৃঃ ২৮০ ; অসীম ক্ষমতাসম্পন্ন ওয়াজিরের উদাহরণ, যেমন, ফিরোজশাহের রাজত্বের শেষদিকে খানজাহান।—ইয়াহিয়া-বিন-আহমদ আস্-সহরিন্দী : তারিখ-ই-মুবারকশাহী, পৃঃ ১৩৫-১৩৬।

কথা সত্য যে, শুধু দুর্বল সুলতানদের রাজত্বকালেই ওয়াজিরগণ সম্পূর্ণ ক্ষমতার প্রভাব বিস্তার করিতেন।

গজনী সুলতানদের শাসন আমলে ওয়াজির পদটি প্রচলিত ছিল এবং এই আমলের পরবর্তী যুগেও এই পদটির বিলুপ্তি ঘটে নাই। তবে নিঃসন্দেহে বলা চলে যে ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে, ভারতে স্বাধীন সালতানাত প্রতিষ্ঠিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে, এই গুরুত্বপূর্ণ সর্বোচ্চ বেসামরিক ওয়াজির পদটির উৎপত্তি ঘটে। সুলতান ইলতুৎমিশের সময় হইতে ওয়াজিরের পদ-মর্যাদা সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। তাঁহার প্রথম ওয়াজিরকে নিজাম-উল-মুলক বলা হইত। ইলতুৎমিশের পরবর্তী দুর্বল উত্তরাধিকারীদের আমলে, ওয়াজিরের ক্ষমতা স্বাভাবিকভাবেই ক্রমশঃ বৃদ্ধি পায়। সুলতান নাসিরউদ্দিন মাহমুদ শাহের সময়ে গিয়াসউদ্দিন বলবন ছিলেন সীমাহীন ক্ষমতা ও প্রতিপত্তিসম্পন্ন প্রধানমন্ত্রী, কিন্তু নিজে পরবর্তীকালে দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করিয়া, সুলতান হিসাবে তিনি অসীম ক্ষমতাসম্পন্ন ওয়াজিরের পক্ষপাতী ছিলেন না। রাজ্যের সার্বিক শাসন-ব্যবস্থায় বলবনের সদাসর্তক দৃষ্টি থাকায়, স্বাভাবিকভাবেই ওয়াজিরের ক্ষমতা ও কার্য-কলাপের তৎপরতা বহুলাংশে হ্রাস পায়।[১] তাঁহার উত্তরাধিকারের আমলেও ওয়াজিরের ক্ষমতা বৃদ্ধি পাইতে পারে নাই।

খলজী শাসন আমলে খলজী বংশের প্রতিষ্ঠাতা সুলতান জালালউদ্দীন ফিরোজ খল্‌জীর রাজত্বকালে, ওয়াজির পদটির গুরুত্ব ও ক্ষমতা পুনর্জীবিত হইবার সম্ভাবনা ছিল। প্রতাপশালী সুলতান আলাউদ্দীনের সময়ে, অপূর্ব সামরিক দক্ষতা প্রদর্শনের দরুন, একজন কৃতি সামরিক নেতা হিসাবে, মালিক তাজ-উল-মুলক কাফুরি ওয়াজির পদ অলঙ্কৃত করেন।[২] পরবর্তী সময়ে সামরিক নেতার হস্তেই ওয়াজির পদটি ন্যস্ত থাকে।[৩]

তুঘলক শাসনকালে, তুঘলক বংশের প্রতিষ্ঠাতা গিয়াসউদ্দীন তুঘলক এক নূতন পরীক্ষামূলক পদ্ধতি প্রয়োগ করেন। তিনজন প্রাক্তন ওয়াজির খাজা খাতির, খাজা মুহাজ্জাব ও জুনাইদিকে লইয়া, তিনি একটি ওয়াজির-সংসদ গঠন

---

১ ত্রিপাঠি: এম. অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, পৃঃ ১৭১।

২ ফুতুহাত-ই-ফিরোজশাহী, ৩০৪।

৩ বারনী: ফিরোজশাহী, পৃঃ ১৮১।

করেন এবং উক্ত তিনজনের সঙ্গেই আলোচনার মাধ্যমে তাঁহাদের পরামর্শের সমগুরুত্ব[১] দিয়া, তিনি রাজ্য-শাসন পরিচালনা করেন। তন্মধ্যে জুনাইদি 'মালিক উল্ ওয়াজারা' উচ্চ উপাধি গ্রহণ করেন। তবে ঘটনাপঞ্জী লেখকগণ অবশ্য এই নূতন পদ্ধতি কিরূপ কার্যকরী হইয়াছিল এবং কতদিন উহা বলবৎ ছিল, ঐ সম্পর্কে কিছু বলেন নাই। পরবর্তী সুলতান মুহম্মদ বিন তুঘলক ওয়াজিরের ব্যক্তিগত দায়িত্বের পুরাতন নীতি অবলম্বন করিয়া, পূর্ববর্তী শাসনামলে তত্বাবধায়ক[২] পদের অধিকারী প্রবীণ অভিজ্ঞ ও কর্মদক্ষ ব্যক্তি খাজা জাহানকে ওয়াজির পদে নিয়োগ করেন।[৩] খাজা জাহানের পর বিচক্ষণ ও তীক্ষ্ণ কৌশলের অধিকারী একজন ধর্মান্তরিত তেলাঙ্গ হিন্দু মকবুল ওয়াজির পদে অধিষ্ঠিত হন। তিনি সুলতান ফিরোজশাহ তুঘলকের অতি আস্থাভাজন ছিলেন। সুলতান তাঁহাকে পূর্ণ ক্ষমতা[৪] প্রদান করেন।

মুসলিম ভারতে তুঘলক আমল ছিল ওয়াজিরাতের গৌরবোজ্জ্বল যুগ। এই আমলের শেষদিকে, সুলতানগণ যখন দুর্বল ও আরামপ্রিয় হইয়া উঠেন, তখন ওয়াজিরের ক্ষমতা ও প্রাধান্য ক্রমশঃ অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পাইতে থাকে এবং কার্যতঃ ওয়াজির সামরিক ও বেসামরিক উভয় বিষয়ের প্রধান কর্মকর্তারূপে পরিণত হন।

সাইয়েদ শাসন আমলে, ওয়াজির ছিলেন সামরিক নেতা। একই সঙ্গে তিনি ছিলেন সামরিক অধিনায়ক, অর্থমন্ত্রী ও হিসাব পরীক্ষা-নিরীক্ষা প্রধান ; বস্তুতঃ-পক্ষে, তিনি ছিলেন সর্বেসর্বা।[৫]

সাইয়েদদের উত্তরাধিকারী লোদী আফগান সুলতানগণ গণতান্ত্রিক ও উপ-জাতীয় সনাতনী, ঐতিহ্যগত রীতি-নীতিতে বিশ্বাসী ছিলেন। সুতরাং তুর্কী রাজতন্ত্রের প্রতি তাঁহাদের বিশেষ অনুরাগ ও উৎসাহ ছিল না। এই দিক দিয়া তাঁহারা ছিলেন অনেকটা আরবদের মত। লোদী সুলতানদের শাসন-ব্যবস্থা

---

১ ত্রিপাঠি : এম. অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, পৃঃ ১৮১।

২ জার্নাল্ অফ এশিয়াটিক সোসাইটি অফ বেঙ্গল, ১৮৭১, পৃঃ ২২৫।

৩ ইবনে বতুতা : ভয়েজেস্ দ্যা ইবর্ন বতুতাহ, ভ্রমণকাহিনী (এইচ. এ. আর. গিব কর্তৃক ইংরেজীতে অনূদিত—ট্র্যাভলস্ ইন এশিয়া অ্যাণ্ড আফ্রিকা) পৃঃ ৩৭।

৪ আফিফ : ফিরোজশাহী, পৃঃ ৩৯৬।

৫ ত্রিপাঠি : এম. অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, ১৮৮।

উমাইয়া খলিফাদের শাসন-ব্যবস্থার সঙ্গে সাদৃশ্য রহিয়াছে, যেমন উমাইয়া শাসন আমলে ওয়াজিরের পদ উদ্ভাবিত হয় নাই, তেমনি লোদী সুলতানদের রাজত্ব-কালে ওয়াজিরের প্রাধান্য ছিল না। বস্তুতঃপক্ষে, সুলতান বাহলুল লোদীর সময়ে, ওয়াজিরের কোন উল্লেখই নাই ; সম্ভবতঃ তাঁহার কোন ওয়াজিরই ছিল না।[১] তবে অবশ্য সুলতান ইব্রাহীম লোদীর রাজত্বের প্রথম দিকে মিয়াভুভা সীমিত ক্ষমতা-সম্পন্ন ওয়াজির ছিলেন।[২] কিন্তু শাসন পরিচালনায় তাঁহার কোন প্রভাবই ছিল না।

দ্বিতীয় পাঠান সুরী সুলতানদের শাসনকালেও ওয়াজির পদটি অজ্ঞাত ছিল।

মোট কথা, দিল্লী সুলতানী আমলে, তথাকথিত মামলুক, খলজী ও তুঘলক শাসন-ব্যবস্থায় ওয়াজিরের ক্ষমতা ও প্রতিপত্তির প্রভাব স্পষ্ট পরিলক্ষিত হয়, ইহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। এই কথা সত্য যে, সরকারের শাসন-ব্যবস্থার সম্পূর্ণ বোঝার ভার ওয়াজিরের স্কন্ধে ন্যস্ত ছিল। সুতরাং ওয়াজিরের সত্যিকারের ক্ষমতা, কর্তব্য ও দায়িত্বের একটি নিরপেক্ষ অনুসন্ধান ও আলোচনার প্রয়োজন।

'ফখর-ই-মুদাব্বির' তাঁহার রচিত 'আদব-উল-মুলুক' পুস্তকে ওয়াজিরের কর্তব্য ও দায়িত্ব সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছেন।[৩] তাঁহার মতে, ওয়াজির ছিলেন সরকারের সমগ্র শাসন-যন্ত্রের প্রধান। যদিও তিনি কেন্দ্রীয় শাসন-ব্যবস্থার অর্থ-দপ্তরের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন, তথাপি কেন্দ্রীয় সরকারের অন্যান্য দপ্তরের তত্ত্বাবধানের জন্যও তিনি দায়ী ছিলেন।[৪] তিনি সকল বেসামরিক রাজকর্মচারী নিয়োগ এবং তাহাদের কাজ-কর্ম তদারক করিতেন। তিনি রাজস্ব আদায়ের বন্দোবস্ত করিতেন এবং রাজ্যের খরচ-পত্রের বিভিন্ন দিকের উপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ ও কর্তৃত্ব বজায় রাখিতেন। সরকারের বিভিন্ন দপ্তর হইতে প্রেরিত ও পেশকৃত হিসাব-পত্র, তাঁহার সহকারীবৃন্দ পরীক্ষা করিয়া দেখিত এবং তাঁহার দপ্তরের মাধ্যমে-ই নিয়ম অনুযায়ী, হিসাব-পত্রের বিবরণগুলি তুলনা, পরীক্ষা ও হিসাব মিলাইবার পর অনুমোদিত হইত। স্থানীয় কর্মচারিগণ যে সমস্ত টাকা

১ পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৯২।

২ আবদুল কাদির-বিন-মালুক শাহ আল্-বদায়ূনী : মুন্তাখাব-উত-তাওয়ারিখ, (র‍্যান্কিং লো ও হেইগ কর্তৃক ইংরেজীতে অনূদিত), পৃঃ ৪৩২।

৩ মুদাব্বির : আদব-উল্-মুলুক, ৩৬।

৪ কোরায়েশী : এস. অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, পৃঃ ৮০—৮১।

বে-আইনীভাবে খরচ করিয়াছে, ওয়াজির কখনও কখনও, এমনকি অপ্রীতিকর উপায় অবলম্বন করিয়া উহা আদায় করিতেন। সামরিক বিভাগের অর্থের প্রয়োজন ও দাবি তাঁহার নিকট পেশ করিতে হইত। তাঁহার দপ্তর হিসাব রাখিত, বেতন প্রদান করিত এবং সমর্পিত বা হস্তান্তরিত সম্পত্তি বণ্টন করিত। তাঁহার দপ্তর উপযুক্ত পণ্ডিত ও বিদ্বান ব্যক্তিদিগকে বৃত্তি প্রদান করিত এবং নিতান্ত দরিদ্র, নিঃস্ব ও দীনদের মধ্যে অল্প পরিমাণে সাহায্য বিতরণ করিত। শাসন-ব্যবস্থার কোন দপ্তরের শাখাই, তাঁহার ক্ষমতার সীমার বহির্ভূত ছিল না এবং দেশের পরাক্রমশালী গভর্ণর হইতে শুরু করিয়া নিম্নতম গরীব কৃষক পর্যন্ত, প্রত্যেকেরই তাঁহার কিংবা তাঁহার সহকারীদের সহিত কাজের সম্পর্ক ও লেনদেন ছিল।

ওয়াজিরের পদের গুরুত্ব ও প্রকৃতি স্বভাবতঃই দাবি করে যে, সুলতান শাসন-কর্তারূপে ওয়াজিরের সহিত সহযোগিতা করিবেন এবং তাঁহার মর্যাদা রক্ষা করিবেন।[১] অবাধ্য সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি, কিংবা অধীনস্থ কর্মচারী, এমনকি সুলতানের প্রিয়পাত্রদের প্রতিও, রাজ্যের আইন ও শৃঙ্খলার নীতি কঠোরভাবে প্রয়োগ করিতে সুলতান ওয়াজিরকে পূর্ণ সমর্থন দান করিতেন।[২] ইহা অতি সত্য কথা যে, যদি শাসনকর্তা ও প্রধানমন্ত্রীর মধ্যে সর্বদা মতের স্পষ্ট পার্থক্য প্রতীয়মান হয়[৩] তাহা হইলে সরকার রাজ্য শাসন-ব্যবস্থা সুষ্ঠুভাবে কখনও পরিচালনা করিতে পারে না। ওয়াজিরের পদে অধিষ্ঠিত থাকাকালীন, রাজ্যশাসন পরিচালনায় যখন ওয়াজিরকে শাসনকর্তার তরফ হইতে বাধার সম্মুখীন হইতে হইয়াছে, তখন ফল হইয়াছে এই যে, শাসন-ব্যবস্থায় শৃঙ্খলা নষ্ট হইয়া বিশৃঙ্খলা বিরাজ করিয়াছে।[৪] ওয়াজিরকে বরখাস্ত করা কোন রকমেই সহজ কাজ ছিল না, কারণ এই পদটি এতই গুরুত্বপূর্ণ ছিল যে, সহসা একজনের পরিবর্তে আর একজনকে

---

১ কাইকাউস: কাবুস-নামা, পৃঃ ১৬৮।

২ উদাহরণ স্বরূপ—সুলতান মাসুদ ও আবুল কাসিম কাছির—বইহাকী: তারিখ-ই-বইহাকী, পৃঃ ৪৪৭-৪৪৮; সুলতান ফিরোজশাহ ও আইন-উল-মুলক—আফিফ: ফিরোজশাহী, পৃঃ ৪১৩-৪১৪; কোরায়েশী: এস. অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, পৃঃ ৮১, পাদটীকা।

৩ কাইকাউস: কাবুস-নামা, পৃঃ ১৬৩।

৪ ফিরোজশাহের আমলে আবু রিজার পদোন্নতি এবং ওয়াজিরের ক্ষমতা অন্যায় রূপে অধিকার করা।—আফিফ: ফিরোজশাহী, পৃঃ ৪৫৮-৪৯২।

নিয়োগ করা সম্ভব ছিল না।[১] খ্যাতি ও প্রতিপত্তিসম্পন্ন ওয়াজির পদ লাভের জন্য কর্মকুশলতা, বিচক্ষণতা, কর্মদক্ষতা ও প্রচুর অভিজ্ঞতার প্রয়োজন ছিল।[২] সুতরাং সুলতান অতিশয় সর্তকতার সহিত তাঁহার ওয়াজির মনোনীত করিতেন এবং ওয়াজিরের কর্ম-নৈপুণ্যের উচ্চমান ও চরিত্রের বলিষ্ঠতা তিনি সর্বদা আশা করিতেন।[৩] একবার ওয়াজিরের পদে কোন ব্যক্তিকে নিয়োগ করা হইলে, তাঁহাকে ঐ পদে পূর্ণ ক্ষমতা প্রদান করিবার প্রয়োজনীয়তা সুলতান অনুভব করিতেন।[৪] প্রকৃতপক্ষে, দিল্লী সালতানাতের শাসন-ব্যবস্থায় স্থিতিশীলতা আনিবার জন্য, স্বভাবতঃই সুলতান ওয়াজিরের পূর্ণ সহযোগিতা কামনা করিতেন এবং তিনি ওয়াজিরের পদমর্যাদা কোনক্রমেই যেন ক্ষুণ্ণ না হয়, ঐ দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিতেন।

এতদসত্ত্বেও, একজন ঈর্ষান্বিত প্রভুকে সন্তুষ্ট রাখিয়া, ওয়াজিরের পদ রক্ষা করা সহজসাধ্য ছিল না।[৫] ঈর্ষান্বিত রাজ-সভাসদগণ ওয়াজিরের বিরুদ্ধে সুলতানের মন বিষাক্ত করিয়া তুলিবার জন্য, সর্বদাই সুযোগের অনুসন্ধানে থাকিতেন এবং অভিযোগ করিতেন যে ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি ওয়াজিরের মাথা বিগড়াইয়া দিয়াছে।[৬] বুদ্ধিমান ওয়াজির সর্বদাই সতর্ক থাকিতেন যাহাতে কেহ তাঁহার প্রভু, শাসনকর্তার উপর তাঁহার প্রভাব সম্বন্ধে বিরুদ্ধাচারণ না করিতে পারে।[৭] সুতরাং প্রাথমিক সতর্কতামূলক ব্যবস্থা স্বরূপ, রাজদরবার ও রাজপ্রাসাদে কখন কি ঘটিতেছে সেই সম্পর্কে সর্বদাই তিনি ওয়াকিবহাল থাকিতেন।[৮] রাজ-

---

১ ওয়াজিরের প্রধান শত্রু আইন-উল-মুলক নিজেই ফিরোজশাহকে পরামর্শ দিয়াছিলেন যে সুলতান যেন খান জাহানকে বরখাস্ত না করেন।—আফিফ ; ফিরোজশাহী, পৃঃ ৪১৫-৪১৬।

২ মুদাব্বির: আদব-উল-মুলুক, ৩৫-৩৭।

৩ ইসলামিক সিভিলাইজেশন, পৃঃ ২৬৬-২৬৭।

৪ মুদাব্বির: আদব-উল্-মুলুক, ৩৭।

৫ দ্রষ্টব্য—সুলতান মাহমুদের নিকট আবু নসর মিশকানের মন্তব্য।—সাদিদ উদ্দীন মুহম্মদ আল্-আওফি: জাওয়ামি-উল্-হিকায়াত, প্রথম, দ্বাদশ, ৯; কোরায়েশী: এস. অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, পৃঃ ৮২, পাদটীকা।

৬ উদাহরণস্বরূপ—ফিরোজশাহের নিকট আইন-উল্-মুলকের মন্তব্য।—আফিফ: ফিরোজশাহী, পৃঃ ৪১১; কোরায়েশী: এস. অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, পৃঃ ৮২, পাদটীকা।

৭ কাইকাউস: কাবুস-নামা, পৃঃ ১৬৩।

৮ পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৬১।

সভাসদবৃন্দ, প্রাদেশিক গভর্ণর ও সামরিক প্রধানদের নিয়া সম্ভবতঃ ওয়াজিরকে সর্বাপেক্ষা বেশী অসুবিধা ভোগ করিতে হইত ; কারণ সুলতানের উপর তাঁহাদের প্রকট প্রভাব ছিল ; তদুপরি, তাঁহারা যদি সরকারের রাজকোষ হইতে আর্থিক ঋণ গ্রহণ করিতেন, ঐ ঋণের টাকা তাঁহাদের নিকট হইতে আদায় করিবার মত জটিল ও অপ্রীতিকর কর্ম ওয়াজিরকে সম্পাদন করিতে হইত। বলিতে গেলে, প্রকৃতপক্ষে, আমলাতন্ত্রী রাজকর্মকর্তাগণের প্রায় সকলই সরকারের সঙ্গে অর্থকরী লেনদেনে জড়িত ছিলেন। তাহাদের নিকট হইতে সরকারী অর্থ আদায় করা ওয়াজিরের পক্ষে অত্যধিক দুরূহ কাজ ছিল। কঠোর হস্তে ওয়াজির তাহাদের বিরুদ্ধে আইন প্রয়োগ করিলে সকল পদস্থ সরকারী কর্মকর্তা ওয়াজিরের বিরুদ্ধাচারণ শুরু করিতেন, যাহার ফলে ওয়াজিরের পক্ষে দীর্ঘদিন এই পদে অধিষ্ঠিত থাকা অসম্ভব হইয়া পড়িত। এমতাবস্থায় ওয়াজির তাহাদের সহিত বন্ধুত্বও স্থাপন করিতে পারিতেন না, কিংবা তাহাদের সহিত নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখিতেও পারিতেন না,[১] ইহা ছিল এক উভয় সঙ্কট। রাষ্ট্রের স্থিতিশীলতা ও স্থায়িত্ব, জনসাধারণের সমৃদ্ধি ও উন্নতি পারস্পরিক নির্ভরশীল[২] ছিল বলিয়া, রাজস্ব আদায়ের ব্যাপারে রাষ্ট্রের স্বার্থ অক্ষুণ্ণ রাখিয়াও, রাজস্ব প্রদানকারী জনগণের কর দেওয়ার আর্থিক সঙ্গতির ও সামর্থ্যের প্রতি ওয়াজির কখনও অবিবেচক ছিলেন না। ওয়াজির সুলতানের প্রধান পরামর্শদাতারূপে, বিভিন্ন জাতীয় সমস্যামূলক বিষয়ে, তিনি সুলতানকে পরামর্শ দিতেন। বৈদেশিক নীতি নির্ধারণ, সামরিক বিষয় সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ইত্যাদি বিষয়েও সুলতানকে তাঁহার পরামর্শ দিতে হইত। সুতরাং পররাষ্ট্র বিষয়ে ও সামরিক-বিজ্ঞানে, ওয়াজিরের গভীর জ্ঞান থাকা প্রয়োজন ছিল। এক কথায়, তাঁহাকে সর্ববিদ্যায় জ্ঞানসম্পন্ন পণ্ডিত ব্যক্তি না হইলে চলিত না।[৩]

---

১ মুহাম্মদ খাবউদ্দীন অভিজাত ব্যক্তিদের দ্বারা নিহত হইয়াছিলেন।—মিনহাজ : নাসিরী, পৃঃ ১৯৮ ; বিশেষ দ্রষ্টব্য—সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ খানজাহানের প্রায় পতন ঘটাইয়াছিলেন।—আফিফ : ফিরোজশাহী, পৃঃ ৪১৫-৪১৬ ; কোরায়েশী : এস. অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, পৃঃ ৮২, পাদটীকা।

২ কাইকাউস : কাবুস-নামা, পৃঃ ১৫৯।

৩ কোরায়েশী : এস. অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, পৃঃ ৮৩।

দিল্লী সুলতানী আমলে বেশীর ভাগ ওয়াজিরই ছিলেন সংস্কৃতিমনা ও সুরুচিসম্পন্ন ব্যক্তি। এমনকি অল্প শিক্ষিত খান জাহান মকবুল ছিলেন যোগ্যতা, সামর্থ্য ও দক্ষতায় সর্বশ্রেষ্ঠ এবং তিনি সর্বাপেক্ষা বুদ্ধিমান ব্যক্তি বলিয়া ঐ সময় বিবেচিত হইতেন।[১] তদুপরি, সুলতানী আমলে সকল ওয়াজিরই প্রাচ্যজগতে সর্বশ্রেষ্ঠ বিদ্যুৎসাহী ও শিক্ষা-দীক্ষার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন।[২]

সুলতানী আমলে ওয়াজিরকে প্রচুর বেতন ও ভাতা দেওয়া হইত। বিদেশী পর্যবেক্ষকগণ তাঁহার বিপুল ধন-সম্পত্তি এবং তাঁহার সহকারীদের বেতনের প্রাচুর্য দেখিয়া বিস্মিত হইতেন।[৩] এই কথা সত্য যে, ওয়াজিরের প্রতি সুলতানের পূর্ণ বিশ্বাস ছিল; কিন্তু ওয়াজিরের প্রতি সুলতানের এই বাহ্যিক বিশ্বাস, প্রত্যয় ও অনুগ্রহ থাকা সত্ত্বেও, বুদ্ধিমান, দূরদর্শী সুলতান তাঁহার মন্ত্রীর কাজকর্মের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিতেন, কারণ ওয়াজিরের ক্ষমতা ও প্রতিপত্তির অপব্যবহার সাম্রাজ্যের পতন তরান্বিত করিতে পারে।[৪] তবে ইহা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, দিল্লী সুলতানদের সঙ্গে ওয়াজিরগণ চূড়ান্ত বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছেন, ইহার দৃষ্টান্ত বিরল।

পারসিক পদ্ধতিতে দিল্লী সালতানাতের কেন্দ্রীয় সরকারের কাঠামো প্রতিষ্ঠিত ছিল। সামরিক বাহিনী ছিল কেন্দ্রীয় সরকারের শক্তির উৎস ও মেরুদণ্ড। এই বাহিনী তুর্কী পদ্ধতিতে পরিচালিত হইত। কেন্দ্রীয় পরিষদ চারিটি মন্ত্রণালয় লইয়া গঠিত ছিল; ইহা পারসিক দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত ছিল। উক্ত পরিষদ ছিল শুধুমাত্র পরামর্শ প্রদানকারী মন্ত্রণালয়বিশেষ এবং ইহার অস্তিত্ব ছিল সুলতানের ইচ্ছা অনিচ্ছা, পছন্দ-অপছন্দ ও অনুমতির উপর নির্ভরশীল।[৫] বস্তুতঃপক্ষে, সুলতানকে অবশ্য দায়িত্বশীল মন্ত্রিদের অভিমত ও সুচিন্তিত পরামর্শকে মূল্য দিতে হইত।

---

১ মিনহাজ: নাসিরী, পৃঃ ১৪৪।

২ বিশেষ দ্রষ্টব্য—কোরায়েশী: এস. অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, নবম অধ্যায়।

৩ ইলিয়ট অ্যাণ্ড ডাওসন: দি হিস্টোরী অফ ইণ্ডিয়া অ্যাজ টোল্ড বাই ইট্স্ ওন হিস্টরিয়ান্স্, তৃতীয় খণ্ড, পৃঃ ৫৭৮।

৪ নিজাম-উল্-মুলক: সিয়াসত-নামা, পৃঃ ১৯-২৭।

৫ পরমাত্মা শরণ: দি প্রভিন্সিয়াল গভর্ণমেণ্ট অফ দি মোগলস্, পৃঃ ৩৪।

সুলতানী আমলে ওয়াজিরের দপ্তরকে বলা হইত দিওয়ান-ই-ওয়াজিরাত এবং ইহা প্রধানতঃ অর্থদপ্তর ছিল। এই দপ্তরটি সরাসরি ওয়াজিরের অধীনে ছিল। শাম্‌স-ই-সিরাজ আফিফ তাঁহার প্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'তারিখ-ই-ফিরোজশাহী'তে উক্ত দপ্তরের একটি বিস্তারিত বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।[১] না'ইব ওয়াজির ওয়াজিরকে অর্থদপ্তর পরিচালনায় সাহায্য করিতেন। তিনি ছিলেন ওয়াজিরের প্রধান সহকারী।[২] তাঁহার পরে ছিলেন 'মুশ্‌রিফ-ই-মুমালিক', যিনি ছিলেন সাম্রাজ্যের হিসাব-নিকাশ বিভাগের অধ্যক্ষ অর্থাৎ মহাগণনিক বা প্রধান হিসাব-রক্ষক।[৩] আর মুস্‌তাওফি-ই-মুমালিক ছিলেন প্রধান আয়-ব্যয় পরীক্ষক-নিরীক্ষক। সাধারণতঃ প্রদেশসমূহও বিভিন্ন দপ্তর হইতে প্রেরিত হিসাবাদি, সরকারী খতিয়ান বইতে তালিকাভুক্ত করা ছিল মুশরিফের কর্তব্য ও দায়িত্ব এবং মুস্‌তাওফি ঐ হিসাব-পত্র পরীক্ষা-নিরীক্ষা করিতেন। হিসাবের দস্তুর অনুযায়ী লিখিত বিবৃতির ভিন্ন ভিন্ন প্রতিলিপি মুশ্‌রিফ ও মুস্‌তাওফি উভয়কে প্রেরণ করা হইত। ইহাতে অবশ্য অহেতুক কাজের মাত্রা দ্বিগুণ হইত; তথাপি এই ব্যবস্থায় একটি বড় সুবিধা ছিল এই যে, দুইজন স্বাধীন কর্মকর্তা দ্বারা একই হিসাব-নিকাশ মিলান ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা হইয়া যাইত।[8]

সুলতানী আমলের প্রারম্ভ হইতে মুহম্মদ-বিন-তুঘলকের শাসনকাল পর্যন্ত, উপরোক্ত পদ্ধতিই অর্থদপ্তরে হিসাব-নিকাশের পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য বলবৎ ছিল। কিন্তু তুঘলক আমলের শেষদিকে ফিরোজশাহের সময় এই পদ্ধতির সামান্য পরিবর্তন সাধিত হয়। হিসাব-নিকাশের কাজটি পুনর্বণ্টন করা হয়; অর্থাৎ মুশ্‌রিফ রাজ্যের আয় এবং মুস্‌তাওফি ব্যয়ের হিসাব রাখিতেন। কেহ কেহ অবশ্য বলেন যে, কাজের ও দায়িত্বের এই পুনর্বণ্টন পূর্বেই শুরু করা হইয়াছিল, ফিরোজ শুধু এই পুনর্বণ্টনকে কার্যকরী করেন।[৫] একজন নাজির মুশ্‌রিফকে হিসাবের কাজে সক্রিয়ভাবে সাহায্য করিতেন। তিনি সমগ্র সাম্রাজ্যব্যাপী

---

১ আফিফ: ফিরোজশাহী, পৃঃ ৪১৯-৪২০।

২ বারনী: ফিরোজশাহী, পৃঃ ২৪।

৩ কোরায়েশী: এস. অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, পৃঃ ৮৪।

৪ মুদাব্বির: আদব-উল-মুলুক, ৪০, ৪১।

৫ আফিফ: ফিরোজশাহী, পৃঃ ৪০৯-৪১০।

এক বিরাট কর্মচারী বাহিনীর মাধ্যমে, রাজস্ব আদায়ের বন্দোবস্ত করিতেন এবং স্থানীয় হিসাব পরীক্ষা-নিরীক্ষা করিতেন।[১]

দিওয়ান-ই ওয়াজিরাতে আর একটি উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটে। জালাল-উদ্দীন খল্‌জি উক্ত দপ্তরে ওয়াকুফ্‌ নামে একটি নূতন পদ সৃষ্টি করেন। স্থানীয় প্রশাসকগণের খরচপত্রাদি তত্ত্বাবধান করা ছিল এই এই ওয়াকুফের কর্তব্য। এই নূতন পদটি অত্যধিক প্রয়োজনীয় বলিয়া প্রমাণিত হওয়ায়, শীঘ্রই ওয়াকুফের অধীনস্থ কর্মচারীর সংখ্যা বৃদ্ধি পায় এবং এই পদটিকে স্থায়ী ঘোষণা করা হয়।[২]

মুস্‌তাওফি ও মুশ্‌রিফ উভয়ের নিকট হইতেই ওয়াজির পৃথক হিসাব-নিকাশের প্রতিবেদন পাইতেন এবং তাঁহার কর্মচারীবৃন্দ উভয়ের প্রদত্ত হিসাব একে অন্যের সঙ্গে ও স্থানীয় প্রতিনিধিদের পেশকৃত পূর্ণাঙ্গ বিবরণীর সঙ্গে তুলনা করিয়া দেখিত।[৩]

'মুশরিফ-ই-মুমালিক' ও মুস্‌তাওফি-ই-মুমালিক উভয়ই মন্ত্রীর পদমর্যাদাসম্পন্ন কর্মকর্তা ছিলেন এবং সুলতানের নিকট তাঁহাদের সরাসরি প্রবেশ অধিকার ছিল। আল্‌-কাল্‌ কাশান্দীর 'সুবাহ্‌-উল-আ'শা' নামক গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, প্রধান মুশ্‌রিফ, প্রধান মুস্‌তাওফি, নাজির ও ওয়াকুফ ছিলেন ওয়াজিরের চারিজন সহকারী। তাহাদের প্রত্যেকের অধীনে প্রায় তিনশত করিয়া কেরানী নিযুক্ত ছিল বলিয়া জানা যায়।[৪]

পরিশেষে উল্লেখ করা যায় যে, ওয়াজিরকে সাধারণতঃ 'সদর-ই-আলা' বলা হইত এবং ক্রমশঃ আরও অধিক সম্মানসূচক 'খাজাহ্‌-ই-জাহান' উপাধিতে তাঁহাকে ভূষিত করা হয়।[৫] 'শরফ-উল-মুলক', 'নাজিম-উল-মুলক', 'তাজ-

---

১ খুস্‌রু: ই'জাজ-ই-খুসরুভী, দ্বিতীয়, পৃঃ ৫৫।

২ আফিফ: ফিরোজশাহী, পৃঃ ৪২০।

৩ পূর্বোক্ত, পৃঃ ৪০৯।

৪ আল্‌কাল কাশান্দী: সুবাহ-উল-আ'শা, পৃঃ ৬৮; আল-উমরির রচিত মাসালিক-উল্‌-আবসার গ্রন্থে এই প্রসঙ্গে অবশ্য কিছুটা বিভ্রান্তিকর তথ্য লিপিবদ্ধ আছে।—মাসালিক-উল-আবসার, পৃঃ ৩১-৩২; কোরায়েশী: এস. অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, পৃঃ ৮৫, পাদটীকা।

৫ নিজামী: তাজ-উল-মা'আছির, ২৫; ইবনে বতুতা: তুহফাত-উল-নুজ্জার দ্বিতীয়, পৃঃ ৭৪।

উল-মুলক' প্রভৃতি ছিল ব্যক্তিগত উপাধি; তবে ইহাও সত্য যে ওয়াজির ও তাঁহার সহকারিগণ উপরোক্ত ব্যক্তিগত উপাধিও গ্রহণ করিতেন।[১]

সুলতানী আমলে কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে দিওয়ান-ই-ওয়াজিরাত ব্যতীত আরও তিনটি প্রধান মন্ত্রণালয় ও দপ্তর ছিল। মোট এই চারিটি মন্ত্রণালয় লইয়া কেন্দ্রীয় সরকার গঠিত ছিল। দিওয়ান-ই-ওয়াজিরাত সম্পর্কে পূর্বেই আলোচনা করা হইয়াছে।

দ্বিতীয় মন্ত্রণালয় দিওয়ান-ই-রিসালাত ছিল ধর্মীয় বিষয় সংক্রান্ত দপ্তর। ধর্মীয় বিষয়, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, উপযুক্ত পণ্ডিত ব্যক্তি ও সৃষ্টিকর্তার ভক্তদের মধ্যে বৃত্তি বিতরণ প্রভৃতি কাজের তদারক করা ছিল এই দপ্তরটির প্রধান দায়িত্ব। এই দপ্তরটির পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন সদর-উস-সুদুর; তিনি সাধারণতঃ 'কাজী-ই-মুমালিক' অর্থাৎ সাম্রাজ্যের প্রধান কাজীও ছিলেন।[২] এই সর্বোচ্চ পদের অধিকারী হইয়া তিনি 'দিওয়ান-ই-কাজা' অর্থাৎ বিচার বিভাগও নিয়ন্ত্রণ করিতেন।[৩] 'দিওয়ান-ই-রিসালাত' ও 'দিওয়ান-ই-কাজা' একই দপ্তরের দুইটি শাখা ছিল। 'কাজী-ই-মুমালিক' সাম্রাজ্যের প্রধান বিচারপতিরূপে, শরিয়াত, মুসলিম আইন-কানুন বলবৎকরণের জন্য দায়ী ছিলেন। ইহার অতিরিক্ত, 'সদর-উস-সুদুর' হিসাবে, তিনি ধর্মীয় বিষয়, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, দাতব্য-প্রতিষ্ঠান, ওয়াকফ্ সম্পত্তি তদারক এবং শিক্ষা-দীক্ষা নিয়ন্ত্রণ করিতেন।[৪]

তৃতীয় মন্ত্রণালয় ছিল দিওয়ান-ই-আরজ। আরিজ-ই-মুমালিকের অধীনে ইহা একটি অত্যধিক গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রীয় দপ্তর ছিল। 'আরিজ-ই-মুমালিক' ছিলেন সামরিক বিষয়-সংক্রান্ত দপ্তরের নিয়ন্ত্রণ-অধ্যক্ষ। এক কথায় বলা যায় যে, আরিজ-ই-মুমালিকের নেতৃত্বে দিওয়ান-ই-আরজ ছিল সামরিক বিষয় সংক্রান্ত মন্ত্রণালয়। 'আরিজ-ই-মুমালিক' সৈন্য বাহিনীর রক্ষণাবেক্ষণসহ, সামরিক বিষয়ের

---

১ কোরায়েশী: এস. অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, পৃ: ৮৫, পাদটীকা; মুল্লা আহমদ তাত্তাভী: তারিখ-ই-আলফি, দ্বিতীয়, পৃ: ২১৩।

২ উমরি: মাসালিক-উল-আবসার, পৃ: ৩২।

৩ বিচার বিভাগের বিশেষ আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য—কোরায়েশী: এস. অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, অষ্টম অধ্যায়।

৪ কোরায়েশী: এস. অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, পৃ: ১০।

সমগ্র শাসন-ব্যবস্থা পরিচালনার দায়িত্বে নিযুক্ত ছিলেন।[১] সামরিক বিভাগের প্রধান হিসাবে তিনি নূতন সৈন্য সংগ্রহ করা, তালিকাভুক্ত করা ও সরবরাহ করিবার গুরুদায়িত্ব পালন করিতেন এবং তিনি তালিকাভুক্ত প্রত্যেক নূতন সৈন্যের বেতন নির্ধারণ করিতেন। সৈন্যবাহিনীর প্রধান পর্যবেক্ষক ও পরিদর্শনকারীরূপে, তিনি অন্ততঃ বৎসরে একবার আনুষ্ঠানিকভাবে সেনাবাহিনী পরিদর্শন করিতেন। সৈন্যদের পদোন্নতি ও পদচ্যুতি আরিজের উপর নির্ভর করিত এবং তিনি সৈন্যদের নামের তালিকা প্রস্তুত করিতেন এবং প্রতি বাৎসরিক পর্যবেক্ষণ ও পুনঃপরীক্ষার পর, তাহাদের বেতন সংশোধন করিতেন।[২] সামরিক পরিবহণ সরবরাহ, সৈন্যবাহিনীর রসদ সংগ্রহ এবং অশ্ব ও অশ্বারোহী সৈন্যের চেহারার বর্ণনামূলক তালিকা প্রস্তুতের দায়িত্বও তাঁহার তত্ত্বাবধানে এই সামরিক দপ্তরের উপর ন্যস্ত ছিল।[৩] এই দপ্তরের কার্যাবলীর গুরুত্ব এত বেশী ছিল যে সময় সময় সুলতান স্বয়ং আরিজ-ই-মুমালিকের কিছু কিছু দায়িত্ব পালন করিতেন।[৪]

চতুর্থ মন্ত্রণালয় ছিল দিওয়ান-ই-ইনশা ; এই কেন্দ্রীয় দপ্তরটি রাজকীয় পত্র-বিনিময়ের দায়িত্বে ন্যস্ত ছিল।[৫] ইহাকে যথার্থভাবেই বলা হয় যে, ইহা ছিল

---

১ খুসরু : খাজা 'ইন-উল-ফুতুহ, পৃ: ৫০।

২ বারনী : ফিরোজশাহী, পৃ: ৬২, ১০১-১০২।

৩ সামরিক বিভাগের বিশেষ আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য—কোরায়েশী : এস. অ্যাডমিনিস্ট্রেশন সপ্তম অধ্যায়।

৪ উদাহরণ স্বরূপ, শেরশাহ। দ্রষ্টব্য—আব্বাস সারওয়ানী : তারিখ-ই-শেরশাহী, ৬৪, ৬৯।

৫ নিয়মিত পর্যায়ে, উমাইয়া খলিফা মুয়াবিয়া-ই প্রথম চিঠিপত্র বিনিময়ের দপ্তর প্রবর্তন করেন। তখন ইহাকে দিওয়ান-উল-খতম অর্থাৎ রাজকীয় সিল-মোহরের বিভাগ বলা হইত। —খুদা বখশ : দি ওরিয়েন্ট, পৃ: ১৯৩ ; ক্রমে এই বিভাগ দিওয়ান-উর-রাসা'ইল অর্থাৎ চিঠিপত্রের বিভাগ নামে পরিচিত হয়।—আমীর আলী : সেরাসেন্স, পৃ: ৪১৪ ; গজনী সুলতানদের আমলেও দিওয়ান-ই-রিসালাত নামে রাজকীয় চিঠিপত্র আদান-প্রদানের বিভাগ প্রবর্তিত হইয়াছিল এবং দবির-ই-খাসএর অধীনে এই দপ্তর পরিচালিত হইত। তাহাকে 'মুন্সী-ই-হজরতও'ও বলা হইত।—উৎবী : তারিখ-ই-ইয়ামিনী, পৃ: ৩৬২-৩৬৩ ; কোরায়েশী এস. অ্যাড্‌মিনিস্ট্রেশন, পৃ: ৮৬। এই বিভাগকে আব্বাসীয় ও ফাতেমীয় আমলে যথাক্রমে দিওয়ান-উর-রাসাইল ও দিওয়ান-ই-ইনশা বলা হইত।—এডাম মেজ্‌ : দাই রেনেসাঁস দা ইসলাম (খুদা বখশ কর্তৃক ইংরেজীতে অনূদিত—দি রেনেসাঁস্ অফ ইসলাম), পৃ: ৭৭ ; কোরায়েশী : এস. অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, পৃ: ৮৭ পাদটীকা।

রাষ্ট্রের 'গোপন তথ্যের সংরক্ষণাগার'। দবির-ই-খাস এই দপ্তরের সভাপতিত্ব করিতেন ; তিনি ছিলেন রাষ্ট্রের প্রধান 'বিশ্বস্ত রাজকর্মচারী।'[১] অসংখ্য দবির এই গোপনীয় জটিল কাজে, দপ্তর-প্রধান দবির-ই-খাসকে সক্রিয়ভাবে সাহায্য করিত। এই সাহায্যকারী দবিরগণ গোপনীয় চিঠিপত্রের খসড়া প্রণয়নে পারদর্শী, সরকারী চিঠিপত্র বিনিময়ে অভিজ্ঞ ছিল এবং তাহারা লিখন-কৌশলে প্রচুর সুনাম অর্জন করে।[২] দবির-ই-খাসএর অধীনস্থ দবিরদিগকে তাহাদের কর্তব্য ও দায়িত্বের ধারানুযায়ী বিভিন্ন নামে অভিহিত করা হইত, যেমন, 'শব-নবিস' অর্থাৎ রাত্রির জন্য লেখক, 'খাস্-নবিস' অর্থাৎ ব্যক্তিগত লেখক ইত্যাদি।

সুলতান ও অন্যান্য রাষ্ট্রের শাসকদের মধ্যে, কিংবা তাঁহার করদ রাজাদিগের সহিত, দস্তুর মাফিক অথবা গোপনীয় যে-ধরনেরই হউক, সকল সরকারী চিঠিপত্রের আদান-প্রদান, এই দপ্তরের মাধ্যমে পরিচালিত হইত। সুলতানের প্রত্যেকটি হুকুমের খসড়া প্রথম এই দপ্তরে প্রণয়ন করিবার পর, সুলতানের অনুমতির জন্য প্রেরিত হইত এবং খসড়াটি সুলতানের অনুমোদন লাভ করিলে, অনুমোদিত আদেশটি সরকারী নিবন্ধগ্রন্থে তালিকাভুক্ত করা হইত এবং তৎপরে যথাস্থানে সত্বর প্রেরিত হইত।[৩] রাজকীয় আদেশ-নির্দেশাবলীর প্রকৃতি ও গুরুত্ব অনুযায়ী ইহাদিগকে শ্রেণীবিভক্ত করিয়া তালিকাভুক্ত করিবার দায়িত্বও ছিল এই দপ্তরের। জরুরী চিঠির খসড়া প্রণয়ন করিবার প্রয়োজন হইলে, দবির-ই-খাস সঙ্গে সঙ্গে খসড়া প্রস্তুত করিতেন, কারণ তিনি সর্বদাই কাছাকাছি অবস্থান করিতেন।[৪] যুদ্ধ অভিযানের বর্ণনা, রাজ্য অধিকার, যুদ্ধ-বিজয় সংক্রান্ত পত্র প্রভৃতি তিনিই রচনা করিতেন এবং বিভিন্ন স্থানে উহা প্রেরণ করা হইত, যাহাতে ফাতেহ্-নামাএর মাধ্যমে যুদ্ধে সুলতানের বিজয় গৌরবের সংবাদ জানিয়া জনসাধারণ মুগ্ধ হয়।[৫] এইভাবে রাষ্ট্রের ঘটনাবলীর সঙ্গে দবির-ই খাস ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিলেন। বাস্তবিকই, দবির-ই-খাস সুলতানের অত্যন্ত

১ উৎবী : তারিখ-ই-ই-য়ামিনী, পৃ: ৩০ ; খুসরু : খাজা-ইন-আল্-ফুতুহ, পৃ: ১৮৪ ; আইন-উল্-মুলক মাহরু : ইনশা-ই-মাহরু ; কাসাইদ-ই-বদর-ই-চাচ, পৃ: ১৪।

২ বইহাকী : তারিখাই-বইহাকী, পৃ: ৬।

৩ খুদাবখশ: দি অরিয়েন্ট, পৃ: ১৯৩-১৯৪

৪ বারনী : ফিরোজশাহী, পৃ: ৯৫

৫ নিজামী : তাজ-উল-মা'আছির, ৫৯,৮১

বিশ্বাসভাজন ছিলেন। এত বিশ্বাসী ছিলেন যে প্রায়ই উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের এমনকি প্রধান মন্ত্রীর কাজ-কর্ম সম্পর্কেও, তাহাকে গোপনে সংবাদ সংগ্রহ করিতে হইত।[১] এই ধরনের 'দবির-ই-খাস' পদের গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া অনেকে মনে করেন যে, এই পদটি ছিল ভবিষ্যতে ওয়াজির পদে উন্নতি লাভের সোপান স্বরূপ।[২] দিওয়ান-ই-ইনশাহর যে সকল সদস্য সুলতানের একান্ত সচিব ছিলেন এবং তাঁহার ব্যক্তিগত চিঠিপত্রের সঙ্গে জড়িত ছিলেন, তাহাদের প্রত্যেককে কাতিব-ই-খাস বলা হইত।[৩]

বারিদ-ই-মুমালিক ছিলেন একজন গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রী। তিনি দিওয়ান-ই-বারিদ দপ্তরের প্রধান কর্মকর্তা ছিলেন। তিনি রাষ্ট্রের সংবাদ সরবাহ সংস্থা ও রাজকীয় ডাক বিভাগের প্রধান। সাম্রাজ্যের সর্বত্র কি কি ঘটিতেছে উহার খবর সংগ্রহ করিয়া ওয়াকিবহাল থাকা ছিল তাঁহার কর্তব্য। প্রত্যেক প্রশাসনিক বিভাগের সদর দপ্তরে একজন করিয়া বারিদ নিযুক্ত ছিলেন। তাঁহারা কেন্দ্রীয় দপ্তরে নিয়মিত সংবাদবাহী পত্র প্রেরণ করিতেন।[৪] সততা, সাধুতা ও ন্যায়পরায়ণতা প্রভৃতি গুণে গুণান্বিত ব্যক্তিদিগকে এই পদে নিয়োগ করা হইত। সময় সময় নিজেদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে, কিন্তু জনগণের সেবার খাতিরে, নিরপেক্ষতা ও স্বদেশানুরাগে উদ্বুদ্ধ হইয়া প্রখ্যাত বিদ্বান ব্যক্তিগণকেও এই পদ গ্রহণ করিতে হইত।[৫] রাষ্ট্রের বিদ্রোহীদের সতর্কতা ও সজাগ অবস্থার মধ্যেও, বারিদগণ কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট গোপনে সংবাদ প্রেরণের যে প্রশংসনীয় চাতুর্য ও কৌশল প্রদর্শন করিয়াছে, উহার দৃষ্টান্ত বিরল।[৬] বারিদদের জ্ঞানের ও দৃষ্টির বাহিরে কিছুই ছিল না। প্রশাসন-ব্যবস্থার প্রত্যেকটি দিক সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ পেশ করিবার জন্য বারিদ ছিলেন কেন্দ্রীয় সরকারের একজন বিশ্বস্ত প্রতিনিধি। সরকারী কর্মচারীদের আচরণ, নিজ এলাকার জনগণের আর্থিক অবস্থা, কৃষির অগ্রগতি ইত্যাদি ছিল তাহার পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে গোপনীয় অনুসন্ধানের আওতাভুক্ত। তিনি সেনাবাহিনী পরিদর্শন, পর্যবেক্ষণ ও অন্যান্য

১ কাইকাউস : কাবুস-নামা, পৃ: ১৫৬-১৫৭
২ পূর্বোক্ত, পৃ: ১৫৮
৩ কাসাইদ-ই-বদর-ই-চাচ, পৃ: ১৪
৪ খুদা বখশ : দি অরিয়েন্ট, পৃ: ২৩০-২৩২
৫ নিজাম-উল-মুলক : সিয়াসত-নামা পৃ: ৪৩
৬ বইহাকী : তারিখ-ই-বইহাকী পৃ: ৩৯৮

গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠানাদিতে যোগদান করিয়া, বিভিন্ন দিকের সংবাদ সংগ্রহ করিয়া কেন্দ্রীয় সরকারের সংশ্লিষ্ট দপ্তরে নিয়মিত প্রেরণ করিতেন।[১] কোন রাজকর্মচারী জনগণের প্রতি অত্যাচার, অবিচার করিলে, এই নিপীড়নের অভিযোগ কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট প্রেরণ করা ছিল বারিদের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বের একটি।[২] দেশে বিচার-ব্যবস্থা ন্যায়পরায়ণতার ভিত্তিতে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য, সংবাদ সংগ্রহ ও সরবরাহের একটি সুসংহত সংস্থার অতীব প্রয়োজন। অনুসন্ধান, পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে ঘটনার সত্যতা নিরূপণ করাই ছিল বারিদের প্রধান কর্তব্য। তাহাদিগকে সত্য, শুধু সত্য, নির্ভেজাল সত্য সংবাদ কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট প্রেরণ করিতে হইত।[৩] এই বারিদ পদটি ছিল অত্যধিক গুরুত্বপূর্ণ পদ। বারিদকে উৎকোচ গ্রহণের প্রলোভন হইতে মুক্ত রাখিবার জন্য, উচ্চ বেতন প্রদান যুক্তিসঙ্গত বিবেচনা করিয়া, তাহাকে সন্তোষজনক বেতন দেওয়া হইত।[৪]

কেন্দ্রীয় শাসনকার্য সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য আরও কতকগুলি পৃথক পৃথক সরকারী বিভাগের সৃষ্টি হইয়াছিল, যেমন দিওয়ান-ই-বন্দেগান্ বা ক্রীতদাস-বিভাগ, দিওয়ান-ই-আমীর কোহি বা কৃষি-বিভাগ, দিওয়ান-ই মুস্তাখরাজ বা অনাদায়ী রাজস্ব বিভাগ, দিওয়ান-ই-খায়রাৎ বা সরকারী সাহায্য বিতরণের বিভাগ, দিওয়ান-ই-ইস্‌তিকাক্ বা সরকারী ভাতা-বিভাগ, দিওয়ান-ই-ইমারত বা সৌধ নির্মাণ-বিভাগ ইত্যাদি।[৫]

কোন মুসলিম দেশেই গোপনীয় সংবাদ সংগ্রহের জন্য, কেন্দ্রীয় সরকার শুধু বারিদের উপরই নির্ভর করিত না; কেন্দ্রীয় সরকার অসংখ্য সত্যিকারের গুপ্তচর নিয়োগ করিয়া সারা দেশব্যাপী গোয়েন্দার জাল বিস্তার করিয়া রাখিত।[৬]

---

১ মুদাবিবর: আদব-উল-মুলুক, পৃ: ৪১, ৪২

২ নিজাম-উল-মুলক: সিয়াসত-নামা, পৃ: ৬৮-৬৯

৩ কোরায়েশী: এস. অ্যাডমিনিস্ট্রেশন পৃ: ৯০

৪ নিজাম-উল মুলক: সিয়াসত-নামা পৃ: ৫৮

৫ কেন্দ্রীয় বিভিন্ন দপ্তরের বিস্তারিত আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য—এ.কে. এম. আবদুল আলীম: ভারতে মুসলিন রাজত্বের ইতিহাস, পৃ: ১৫৯-১৬০

৬ নাজিম: সুলতান মাহমুদ, পৃ: ১৪৪-১৪৫; আল্-উমরি: মাসলিক-উল-আবসার, পৃ: ৫৩। অধ্যাপক নাজিম ভুলবশত: মনে করেন যে মুশ্‌রিফ-ই-মুমালিক ছিলেন গুপ্তচর ও গোয়েন্দা বাহিনীর প্রধান। মুশ্‌রিফ শব্দটির ভুল অর্থ কবিবার দরুনই, হয়তো তিনি উক্ত অভিমত ব্যক্ত করেন।—কোরায়েশী: এস. অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, পৃ: ৯১ পাদটীকা।

এই গুপ্তচরেরা সমাজের সর্বস্তরের লোকের সহিত মেলা-মেশা করিয়া রাষ্ট্রের বিবিধ বিষয় সম্পর্কে জনসাধারণের অভিমত জানিতে পারিত এবং অনেক সময় রাজকর্মচারিগণ যে সকল সংবাদ জানিত না, গুপ্তচরেরা গোপন অনুসন্ধানের মাধ্যমে ঐ সকল তথ্য সংগ্রহ করিয়া নিয়মিত সংশ্লিষ্ট দপ্তরে প্রতিবেদন পেশ করিত। প্রতাপশালী সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের কাজকর্মের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা গুপ্তচরের কর্তব্য ছিল। রাজদরবারের কর্মকর্তাদের কার্যকলাপও গুপ্তচরদের দৃষ্টি এড়াইতে পারিত না।[১] বিদেশী দূত ও রাজকুমারদের উপর দৃষ্টি রাখিবার জন্য এবং যতটা সম্ভব গোপনে সংবাদ সংগ্রহ করিবার জন্য সংবাদবাহকও নিয়োগ করা হইত।[২] সময় সময় জটিল সমস্যার অনুসন্ধান ও তদন্ত করিবার জন্য, বিশ্বাসী রাজসভাসদদিগকে ছদ্মবেশে বিশেষ গুপ্তচর হিসাবে প্রেরণ করা হইত।[৩] সুলতানী আমলে এই গুপ্তচর বাহিনী কেন্দ্রীয় বারিদ দপ্তরের নিয়ন্ত্রণাধীন ছিল ; অন্য কোন পৃথক গুপ্তচর নিয়ন্ত্রণ সংস্থা ঐ আমলে ছিল না।[৪]

পরিশেষে বলা চলে যে, আলোচিত মন্ত্রিগণই সুলতানী আমলের বিভিন্ন সুসংগঠিত দিওয়ান অর্থাৎ কেন্দ্রীয় দপ্তরের দায়িত্বে নিযুক্ত ছিলেন। এক কথায়, তাঁহারা কেন্দ্রীয় সচিবালয়ের কর্মকর্তা ছিলেন। এতদ্ব্যতীত কয়েকটি অধীনস্থ বিভাগের দায়িত্বে নিযুক্ত ছিলেন আরও কয়েকজন পদস্থ রাজকর্মচারী। সুলতানের সহিত তাহাদেরও সরাসরি সাক্ষাৎ করিবার অধিকার ছিল ; কিন্তু প্রকৃত অর্থে তাহাদিগকে মন্ত্রী বলিয়া গণ্য করা যাইত না। আমীর-ই-দাদ ও কোতোয়াল উক্ত শ্রেণীভুক্ত ছিলেন। আমীর-ই-দাদ বিচার-ব্যবস্থার প্রশাসনিক দিকের সঙ্গে জড়িত ছিলেন এবং কোতোয়াল শান্তি-শৃঙ্খলার দায়িত্বে

---

১ ইবনে বতুতা তাঁহার ভ্রমণকাহিনীতে বলিয়াছেন যে, ভারতীয় রাজাদের মধ্যে ইহাই রীতি ছিল যে তাঁহারা প্রত্যেক অভিজাত ব্যক্তির পিছনে একজন করিয়া গুপ্তচর রাখিতেন ; একই নিয়মে, প্রত্যেক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির গৃহে মেয়ে-ক্রীতদাস থাকিত এবং তাহারা ঝাড়ুদার-দিগকে গোপনে সংবাদ দিত। তৎপর ঝাড়ুদাররা একজন উচ্চ-পদস্থ কর্মচারীর নিকট সকল গোপন তথ্য সরবাহ করিত।—ইবনে বতুতা : তুহফাত-উন্-নুজ্জার, দ্বিতীয়,পৃ : ৬৬ ; কোরায়েশী : এস. অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, পৃঃ ৯২ পাদটীকা।

২ নিজাম-উল্-মুল্ক : সিয়াসত-নামা, পৃঃ ৮৭।

৩ পূর্বোক্ত, পৃঃ ১১৯।

৪ কোরায়েশী : এস. অ্যাড্মিনিস্ট্রেশন; পৃঃ ৯২।

নিযুক্ত ছিলেন। এই রাজকর্মকর্তাদ্বয় ছিলেন উচ্চ পদমর্যাদাসম্পন্ন এবং রাজ-দরবারে পদমর্যাদার রীতি অনুযায়ী উচ্চস্থানের অধিকারী। সুলতানের পরামর্শ সংসদে তাহাদের মতামতের গুরুত্ব দেওয়া হইত।

পূর্বে বলা হইয়াছে যে, সুলতানী আমলে মন্ত্রিগণ সুলতানের 'ভৃত্য' মাত্র ছিলেন এবং শুধু সুলতানের নিকটই তাঁহারা দায়ী ছিলেন। তবে ইহা সত্য যে একজন মন্ত্রীর প্রকৃত ক্ষমতা নির্ভর করিত তাঁহার স্বীয় সামর্থ্য, যোগ্যতা ও সুলতানের উপর তাঁহার প্রভাবের মাত্রার উপর। বুদ্ধিমান ও দূরদর্শী সুলতান একজন প্রভাবশালী মন্ত্রীর অভিমত গ্রহণ করিতে সর্বদাই প্রস্তুত ছিলেন, যদি মন্ত্রী তাঁহার মতামত যুক্তিতর্কের মাধ্যমে জোরালভাবে পেশ করিতে পারিতেন। মন্ত্রিদের একত্রিত হইয়া সুলতানের মতের বিরোধিতা করিবার প্রশ্নই উঠে না। সুলতানকে কোন বিষয়ে বলপ্রয়োগে দমন করিবার বা বাধ্য করিবার মত ক্ষমতা তাঁহাদের ছিল না বলিলেই চলে। সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের মত, বিশেষ সুযোগ-সুবিধাবাদী কোন শ্রেণীভুক্তও তাঁহারা ছিলেন না। প্রকৃত অর্থে, সুলতানী আমলে কোন মন্ত্রিপরিষদ বলিয়া কিছু ছিল না। সুলতানের রাজদরবারে মন্ত্রিবর্গ, প্রভাবশালী অভিজাতবর্গ, উচ্চরাজ-কর্মকর্তাগণ সকলেই রাজ্য-পরিচালনার বিষয়াদি নিয়মিতভাবে আলোচনা করিতে পারিতেন।[১] আসলে কিন্তু সুলতান তাঁহার বিশেষ মনোনীত পরামর্শ-কারীদের সঙ্গেই সত্যিকারের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদি বেসরকারীভাবে আলাপ-আলোচনা করিয়া সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতেন। এই জাতীয় জরুরী সভায় সুলতান শুধু সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা এবং তাঁহার অত্যন্ত বিশ্বাসভাজন পরামর্শকারীদিগকে (তাঁহারা মন্ত্রী পর্যায়ের না-ও হইতে পারিতেন) আমন্ত্রণ করিতেন। তাহাদের মধ্যে ছিলেন উচ্চ-পদস্থ সামরিক কর্মকর্তা অথবা রাজকীয় গৃহস্থালী সংগঠনের উচ্চপদস্থ ব্যক্তিগণ।

দিল্লী সুলতানী আমলে সাধারণতঃ একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে না'ইব-উল-মুলক অর্থাৎ রাজ্যের রাজ-প্রতিনিধি 'লর্ড' লেফটেন্যান্ট মনোনীত করা হয়, কিন্তু তাঁহার ক্ষমতার তারতম্য সুলতানের ব্যক্তিত্বের উপর নির্ভরশীল ছিল। সময় সময় ইহা ছিল একটি ফাঁকা উপাধি মাত্র; কিন্তু অনেক সময় এই

১ আফিফ: ফিরোজশাহী, পৃঃ ২৭৭-২৮০।

উপাধিধারী বস্তুতঃপক্ষে সর্বক্ষমতার অধিকারী ছিলেন।[১] তিনি সামরিক সংগঠনের প্রধান ছিলেন এবং কেন্দ্রীয় শাসনের আওতাভুক্ত অঞ্চলের প্রশাসনের দায়িত্বে ন্যস্ত ছিলেন।[২] সুলতানের অনুপস্থিতিতে একজন অভিজাত ব্যক্তিকে না'ইব-ই-গায়বাত হিসাবে কাজ করিবার জন্য মনোনীত করা হইত।[৩] এই রাজকর্মকর্তা রাজধানীতে সুলতানের প্রতিনিধি হিসাবে জরুরী ও নিত্য-কর্ম সম্পাদন করিতেন। এই রাজকর্মকর্তাদ্বয় বেশ ক্ষমতাশীল ছিলেন বটে, কিন্তু সত্যিকার অর্থে তাঁহারা মন্ত্রী ছিলেন না; তবে এই কথাও ঠিক যে, অসীম ক্ষমতাসম্পন্ন ওয়াজীর ব্যতীত অন্য কোন মন্ত্রী তাঁহাদের মত ক্ষমতাবান ছিলেন না। সাধারণ মন্ত্রীরা বিভিন্ন দপ্তরের প্রধান ছিলেন মাত্র।[৪]

কেন্দ্রীয় শাসন ব্যবস্থার বিভিন্ন দিক আলোচনা করিবার পর, ইহা সুস্পষ্ট-ভাবে প্রতীয়মান হয় যে, রীতির দিক হইতে দিল্লী সালতানাত ছিল একটি রাজতন্ত্র—আংশিক নির্বাচিত ও আংশিক বংশগত; প্রকৃতপক্ষে, ইহা ছিল একটি যথেচ্ছাচারী আমলাতন্ত্র।[৫] বৈশিষ্ট্যের দিক হইতে, শাসন-ব্যবস্থা আমলা-তান্ত্রিক ছিল বলিয়া, রাজবংশের পরিবর্তনের সহিত উহার বিশেষ পরিবর্তন ঘটে নাই। তবে এই কথা অনস্বীকার্য যে, বস্তুতঃপক্ষে, দিল্লী সুলতানী শাসন-ব্যবস্থা ছিল জনকল্যাণ ও বদান্যতামূলক। জনগণের উপকার করিবার আন্তরিক সদিচ্ছা ছিল সুলতানগণের প্রশাসনিক মুখ্য নীতি।

---

১ তাঁহাকে মালিক না'ইবও বলা হইত। প্রথম প্রকারের ছিলেন সুলতান জালালউদ্দীন খলজীর অধীনে কুতুবউদ্দীন আল্ভী, (বারনী : ফিরোজশাহী, পৃঃ ২০২) আরেক প্রকারের ছিল সুলতান হইবার পূর্বে গিয়াসউদ্দীন বল্বন, (বারনী : ফিরোজশাহী, পৃঃ ২৬) এবং সুলতান মুইজউদ্দীন বাহরামের অধীনে ইখ্তিয়ার উদ্দীন আইতকিন।—(মিনহাজ : নাসিরী, পৃঃ ১৯১-১৯২); কোরায়েশী : এস. অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, পৃঃ ৯৩ পাদটীকা।

২ আল-কাল্ কাশান্দী : সুবাহ্-উল্-আ'শা, পৃঃ ৬৭-৬৮; উমরি : মাসালিক-উল্-আবসার, পৃঃ ৩০-৩১। এই লেখকদ্বয় তাঁহাকে 'আমরিয়াত' বলিতেন।—কোরায়েশী : এস. অ্যাড্মিনি-স্ট্রেশন, পৃঃ ৯৪ পাদটীকা।

৩ কোরায়েশী : এস. অ্যাড্মিনিস্ট্রেশন, ৯৪।

৪ পূর্বোক্ত, পৃঃ ৯৪।

৫ পূর্বোক্ত. পৃঃ ২১৫।

ষষ্ঠ অধ্যায়

অর্থ ও রাজস্ব-ব্যবস্থা

মুসলিম রাজনৈতিক চিন্তাবিদ্‌ ও প্রশাসকগণের মধ্যে কোন দ্বিমত নাই যে, রাষ্ট্রের আর্থিক সচ্ছলতা ও স্থিতিশীলতার জন্য রাষ্ট্রের অর্থ ও রাজস্ব-শাসন-ব্যবস্থার সুষ্ঠু পরিচালনা অপরিহার্য।[১] ভারতে যখন মুসলিম শাসন ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন আরবদের অর্থ ও রাজস্ব-ব্যবস্থা প্রভূত উৎকর্ষ এবং পূর্ণতা লাভ করে। ইহা সত্য যে, মুসলিম ভারতে সুলতানী আমলে মুসলিম শরিয়াত ও আব্বাসীয় ঐতিহ্যগত রীতি-নীতি-পদ্ধতি অনুযায়ী, দিল্লীর সুলতানগণ অর্থ ও রাজস্ব-ব্যবস্থা প্রবর্তন ও কার্যকরী করেন।[২] দেশীয় অর্থনীতি ও রাজস্ব-প্রথা মুসলিম পদ্ধতির মতোই ছিল, উভয়ের মধ্যে খুব একটা পার্থক্য ছিল না এবং ভারতীয় হিন্দুরা মুসলিম রাজস্ব নীতি সামান্য রদ বদলের মাধ্যমে গ্রহণ করিতে মোটেই অসুবিধার সম্মুখীন হয় নাই। মুসলিম ও হিন্দু রাজস্ব-প্রথার অপূর্ব সংমিশ্রণ ঘটাইয়া দিল্লীর সুলতানগণ মুসলিম রাজস্ব-ব্যবস্থা ভারতে সফলতার সহিত প্রবর্তন করিতে আন্তরিক প্রচেষ্টা চালান।

আইন বিশেষজ্ঞদের মতানুসারে, দিল্লী সালতানাতে রাজস্বের দুইটি উৎস ছিল—ধর্মীয় ও বৈষয়িক।[৩] পবিত্র কোরআনের নির্দেশানুযায়ী ধর্মীয় কর শুধু মুসলিমদিগকে দিতে হইত, কারণ অমুসলমানদিগের ইসলামের নীতি পালন করা বাধ্যতামূলক ছিল না। সকল ধর্মীয় কর-ই জাকাত নামক করের অন্তর্ভুক্ত ছিল। বৈষয়িক কর ছিল খারাজ ও জিজিয়া। মুসলিম রাষ্ট্রে অমুসলমানদিগকে উপরোক্ত করদ্বয় দিতে হইত।

দিল্লী সুলতানী আমলে রাষ্ট্রের আয়ের উৎসগুলির মধ্যে একটি উৎস ছিল গানিমত। ইহা অবশ্য কোন কর নহে; ইহা ছিল যুদ্ধ-লব্ধ সামগ্রী—যুদ্ধে লুণ্ঠিত দ্রব্য। আইনসম্মতভাবে সমগ্র লুটের মাল সংগৃহীত ও একত্রিত করিবার পর, ইহার এক-পঞ্চমাংশ রাষ্ট্রের অংশ হিসাবে নির্ধারিত ছিল এবং

১ ইনশা-ই-মাহরু, দ্বিতীয় পত্র; জালাম-বিন-মুহম্মদ-বিন ওবাইদ্‌-উল্লাহ্‌ আল্‌-কায়ানী: নসা'ইহ্‌ শাহরুখি, ১৯৮।

২ কোরায়েশী: এস. অ্যাড্‌মিনিস্ট্রেশন্‌, পৃ: ৯৫।

৩ পি. নিকোলাস্‌ অ্যাগ্‌নাইড্‌স্‌: মুহামেডান্‌ থিয়রিজ অফ ফাইন্যান্স, পৃঃ ২০০

বাকী চারি-পঞ্চমাংশ যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারী সৈন্যদের মধ্যে সমভাবে বণ্টন করিয়া দেওয়া হইত।[১] তবে সুলতান অথবা সামরিক অধিনায়ক যদি ভাগ-বণ্টনের পূর্বে কোন একটি তরবারি কিংবা একটি পশু কিংবা একটি মূল্যবান জিনিস নিজের ব্যবহারের জন্য পছন্দ করিয়া গ্রহণ করেন, তবে উহা ন্যায়সঙ্গত ছিল। ইহাকে বলে 'সাফিয়াহ্'[২] এবং ইহাকে ভাগ-বণ্টনের সময় বিবেচনা করা হইত না।[৩] সরকারী রাজস্ব তহবিলে যে অংশ যাইত, উহাকে 'খুমস্' বলা হয়। ক্রমশঃ দিল্লী সালতানাতে একটি রীতির উদ্ভব হয় যে এক-পঞ্চমাংশ সৈন্যদের মধ্যে বণ্টন করা হইত এবং চারি-পঞ্চমাংশ সরকারী রাজস্ব তহবিলে জমা দেওয়া হইত। কিন্তু ফিরোজশাহ তুঘলকের উলামাগণ উক্ত বণ্টন-নীতি অবৈধ বলিয়া গণ্য করেন। সুতরাং সুলতান ভাগ-বণ্টনের পূর্ব-নীতি পুনঃ প্রবর্তন করেন।[৪] এই আমলে যুদ্ধ-লব্ধ সামগ্রী ভাগ-বণ্টনের সময়, পদাতিক সৈন্যের অপেক্ষা অশ্বারোহী সৈন্যকে দুইগুণ ও সময় সময় তিনগুণ বেশী দেওয়া হইত।[৫]

আর্থিক দিক হইতে সচ্ছল মুসলিমগণ ইসলামী আইনের নির্দেশানুযায়ী করের নির্ধারিত হার অনুসারে জাকাত প্রদান করিত। ইহা দ্বারা স্বীয় সম্পদে, ধন-দৌলতে দীন-দুঃখীদিগকে অংশীদার রূপে গ্রহণ করাকে তাহারা

১ প্রাক-ইসলামী যুগে আরবদের মাঝে গানিমাতের বণ্টন অন্যরকম ছিল, যেমন গোত্র-প্রধানের জন্য মোট যুদ্ধ-লব্ধ সামগ্রীর এক-চতুর্থাংশ নির্দিষ্ট ছিল এবং বাকী তিন-চতুর্থাংশ যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারী সৈন্যদের মধ্যে সমভাবে বণ্টন করিয়া দেওয়া হইত। তবে পদাতিক সৈন্য একভাগ পাইলে, অশ্বারোহী সৈন্যকে দুইভাগ দেওয়া হইত। আরব শাসন-ব্যবস্থায় নবীর আমলে, এই গানিমাতের ভাগ-বণ্টনের সামান্য পরিবর্তন সাধিত হয়। যেমন রাষ্ট্রের জন্য এক-পঞ্চমাংশ ও সৈন্যদের মাঝে সংবণ্টনের জন্য বাকী চারি-পঞ্চমাংশ নির্ধারিত হয়। বিস্তারিত আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য—এস. এ. কিউ. হুসাইনি : অ্যারাব্ অ্যাড্‌মিনিস্ট্রেশন্, প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায়।

২ কোরায়েশী : এস. অ্যাড্‌মিনিস্ট্রেশন, পৃঃ ৯৯।

৩ মুদাব্বির ; আদব-উল-মুলুক, ১১১-১১৩।

৪ ফুতুহাত-ই-ফিরোজশাহী (শেখ আবদুর রশিদ কর্তৃক অনূদিত), পৃঃ ৬ ; ইনশা-ই-মাহরু, পঞ্চদশ চিঠি ; সিরাত-ই-ফিরোজশাহী, পৃঃ ১২৬।

৫ হাজী আবদুল হামিদ মুহাব্বির গজনভী : দস্তুর-উল-আল্‌বাব, পৃঃ ৫৭ ; ঐতিহাসিক আবু ইউসুফ বলেন যে আরব শাসন-ব্যবস্থায় নবীর আমলে অশ্বের জন্য দুইভাগ ও অশ্বারোহীর জন্য একভাগ দেওয়া হইত। তাই তাঁহার মতে, অশ্বারোহী সৈন্য পাইত তিনভাগ এবং পদাতিক সৈন্য পাইত একভাগ।—আবু ইউসুফ : কিতাব-উল-খারাজ, পৃঃ ৩৯।

ধর্মীয় নির্দেশ মনে করিত। জাকাত প্রদান করা ধর্ম ও ন্যায়পরায়ণতার কাজ; এই ধর্মীয় বাধ্যবাধকতা সুলতানকে অবশ্যই কার্যকরী করিতে হইত, কারণ জাকাত প্রদান করা কোর-আন শরীফের স্পষ্ট নির্দেশ পালন ব্যতীত আর কিছু নহে।[১] জাকাত দেওয়া ফরজ অর্থাৎ বাধ্যতামূলক। আইনানুসারে মুসলিমদের রাষ্ট্রের প্রতি দেয় সব প্রকারের কর-ই এই জাকাত নামক করের পর্যায়ভুক্ত ছিল। স্বর্ণ-রৌপ্য, পশু, ব্যবসার পণ্যসামগ্রী, শস্য-সম্পত্তি ইত্যাদির উপর জাকাত প্রযোজ্য ছিল। অবশ্য এই সকল সম্পদের আয় ন্যূনতম একটি নির্দিষ্ট সীমা অতিক্রম করিলে, জাকাত দেওয়া বাধ্যতামূলক হয়—এই নির্দিষ্ট সীমাকে 'নিসাব' বলা হয়।[২]

সময় সময় জাকাত ও সাদকাহ্ সমার্থ বলিয়া ভুল করা হয়। কিন্তু সাদ্‌কাহর প্রকৃত অর্থ হইতেছে স্বেচ্ছায় ভিক্ষা প্রদান; আর জাকাত কোরআনের নির্দেশ অনুযায়ী বাধ্যতামূলক কর। জাকাত (ক) ভূমি-শস্য, ফল, খেজুর, আঙ্গুর ইত্যাদি; (খ) জীব-জন্তু অর্থাৎ উষ্ট্র, গবাদি গৃহপালিত পশু, ইত্যাদি; (গ) স্বর্ণ-রৌপ্য এবং (ঘ) ব্যবসার পণ্য দ্রব্যাদির উপর নির্দিষ্ট বিভিন্ন হারে ধার্য করা হয়।

শস্য কর্তন ও সংগৃহীত হইবার পর পরই ভূমি হইতে উৎপন্ন শস্যের উপর মুসলিমদিগকে জাকাত দিতে হইত এবং এক বৎসরের অবিরত অধিকার ভোগের পর, অন্যান্য প্রকারের জিনিসের উপর জাকাত দেওয়ার রীতি প্রচলিত ছিল। তবে সম্পত্তি, আয় ও অপরাপর জিনিসের আইন অনুসারে একটি নির্দিষ্ট ন্যূনতম সংখ্যা ছিল, যাহার উপর জাকাত ধার্য করা বৈধ ছিল। ইহাই হইল 'নিসাব', যাহা পূর্বে বলা হইয়াছে। যখন পাঁচটি গাধার বোঝার[৩] অপেক্ষা অধিক পরিমাণ কোন ব্যক্তির ভূমি হইতে ফসল উৎপাদিত হইত, তখন শুধু তাহাকে আইনসম্মতভাবে ভূমি-শস্যের উপর জাকাত দিতে হইত।

---

১ কোরায়েশী: এস. অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, পৃ: ৯৫।

২ 'হিদায়াহ' (চার্লস হ্যামিলটন কর্তৃক অনূদিত ও স্ট্যানডিশ গ্রোভ কর্তৃক সম্পাদিত), পৃ: ২ নিসাব অত্যন্ত কম। উদাহরণ স্বরূপ, ৫২ তোলা ৬ মাশাতে এক নিসাব হয়।—কোরায়েশী: এস. অ্যাড্‌মিনিস্ট্রেশন, পৃ: ৯৬ পাদটীকা।

৩ 'ওয়াসক' প্রায় ৩২৩ পাউণ্ড গমের পরিমাণের সমান।—এস্. এ. কিউ হুসাইনি: অ্যাড-মিনিস্ট্রেশন আণ্ডার দি মোগলস্ পৃ: ৯০ পাদটীকা।

জীব-জন্তুর জন্যও একটি ন্যূনতম সংখ্যা ছিল, যাহার উপর জাকাত ধার্য ন্যায়সঙ্গত ছিল; যেমন উষ্ট্রের ন্যূনতম সংখ্যা পাঁচ, গবাদি পশুর ন্যূনতম সংখ্যা তিরিশ এবং ভেড়া, ছাগলের ন্যূনতম সংখ্যা চল্লিশ হইলে, উহাদের মালিকের জাকাত দেওয়া ফরজ—অর্থাৎ বাধ্যতামূলক বলিয়া গণ্য হইবে। দুই শত দিরহামের কম মূল্যের স্বর্ণ অথবা রৌপ্যের উপর কোন জাকাত দিতে হইত না।[১]

প্রাকৃতিক বৃষ্টি বা নদী-খালের পানি দ্বারা কোন জমির চাষাবাদ হইলে, ঐ প্রকার জমির উৎপন্ন শস্যের উপর শতকরা দশভাগ জাকাত দিতে হইত—ইহাকে 'ওশর' বলা হয়। আরবী শব্দ 'ওশরে'র অর্থ হইতেছে এক-দশমাংশ। কিন্তু শারীরিক পরিশ্রমের দ্বারা জল সেচনের মাধ্যমে যে জমিতে চাষাবাদ হয়, ঐ জমির উৎপাদিত শস্যের উপর শতকরা পাঁচভাগ জাকাত দেওয়ার নিয়ম ছিল।[২] স্বর্ণ-রৌপ্য ও পণ্যদ্রব্যের উপর আড়াই শতাংশ জাকাত ধার্য করা হইত।

জাকাতের ধার্য ও আদায়ের নিয়ম আরব শাসন-ব্যবস্থায় হজরত মুহম্মদ (সঃ) স্থির করিয়াছিলেন এবং এই নিয়মাবলী কঠোরভাবে পালিত হইত। এমনকি খলিফা পর্যন্ত কাহারও জাকাত প্রদান মওকুফ করিতে পারিতেন না।

মুসলিম ভারতে সুলতানী আমলে রাষ্ট্রের আয়ের অন্যতম উৎস হিসাবে, কোর-আন শরীফের নির্দেশ অনুযায়ী মুসলিমদের উপর জাকাত ধার্য করা হইত এবং রীতিমত আদায় করা হইত; কিন্তু ঘটনাপঞ্জীতে স্পষ্টভাবে ইহার বর্ণনা দেওয়া নাই।[৩] তবে মুসলিম অর্থ ও রাজস্ব-ব্যবস্থার ইতিহাসে, কর হিসাবে জাকাত একটি অপরিহার্য অঙ্গ; হয়ত বা এই কারণেই ঘটনাপঞ্জী লেখকগণ ফলাও করিয়া বিস্তারিতভাবে ইহার উল্লেখ করা প্রয়োজন মনে করেন নাই। মধ্যযুগের পর্যটক ইবনে বতুতা তাঁহার ভ্রমণকাহিনীতে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন যে, সুলতান আলাউদ্দীন খল্‌জী গৃহপালিত গবাদি পশুর উপর জাকাত ধার্য করেন নাই।[৪] সুলতান ফিরোজশাহ তুঘলকের আমলে জাকাত

---

১ হুসাইনি: এ. অ্যাড্‌মিনিস্ট্রেশন, পৃঃ ১০।

২ আবু ইউসুফ: কিতাব-উল-খারাজ, পৃঃ ২১; আল্-বালাজুরী: ফুতুহ-আল্-বুল্‌দান (দ্যা গুজ্ সম্পাদিত), পৃঃ ৭০-৭১; আল্-তাবারী: তারিখ-উল-উম্মি-ওয়া-আল্-মুলুক, পৃঃ ৭১৮ ১৭৭২; হিদায়াহ, পৃঃ ১৭; হুসাইনি: এম. অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, পৃঃ ৯৩।

৩ হুসাইনি: এম. অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, পৃঃ ৯২।

৪ ইবনে বতুতা: ট্র্যাভলস্ ইন্ এশিয়া অ্যাণ্ড আফ্রিকা, তৃতীয়, পৃঃ ১৮৪।

রাষ্ট্রের নিয়মিত করের তালিকাভুক্ত ছিল এবং জাকাত ধার্য ও আদায়ের জন্য তিনি একটি পৃথক কোষাগারের প্রবর্তন করেন।[১] সুলতান সিকান্দর লোদীর আমলে শস্যের ক্ষণস্থায়ী ঘাট্‌তির দরুন, শস্যের উপর জাকাত ধার্য বিলোপ সাধিত হয় এবং পরবর্তী কোন সুলতান ইহার পুনঃপ্রবর্তন করেন নাই।[২]

ভারতীয় মুসলিম ইতিহাসের গোড়ার দিকে, মুসলিম বিজয়ীগণ মুসলিমদের জমিকে 'ওশরি' জমি হিসাবে গণ্য করেন। যাহারা স্বেচ্ছায় ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে, তাহাদের সকলের জমিকে মুহম্মদ-বিন-কাসিম 'ওশরি' জমি বলিয়া স্বীকৃতি দেন।[৩] একইভাবে কুতুবউদ্দীন আইবেক্ নির্দেশ দেন যে মুসলিমদের অধিকৃত সমস্ত জমিকে 'ওশরি' জমি গণ্য করিয়া, জমির মালিকদিগকে জমির উর্বরতার তারতম্য অনুযায়ী উৎপন্ন-শস্যের দশভাগের একভাগ অথবা বিশভাগের একভাগ ভূমি-রাজস্ব দিতে হইবে।[৪] পরবর্তী সুলতানদের আমলেও 'ওশরি' জমি ছিল। ফিরোজশাহ নিশ্চিতভাবে 'আল-ওশরে'র কথা উল্লেখ করেন এবং 'তুহ্‌ফাত-উল-কিরামে' লিপিবদ্ধ আছে যে তাঁহার সময়ের আইন বিশেষজ্ঞগণ 'ওশরি, জমির কিছু এলাকা নির্দিষ্ট করিয়া দেন।[৫] পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে, অস্থায়িভাবে খাদ্যশস্যের অভাবের জন্য সিকান্দর লোদী 'ওশরি' জমির 'ওশর' কর রদ করেন এবং পরবর্তী কোন সুলতান ইহা আর পুনর্ধার্য করেন নাই।

মুসলিম শাসকগণ অমুসলমানদের নিকট হইতে মাথা-পিছু কর আদায় করিতেন; ইহাকে 'জিজিয়া' বলা হয়। মুসলিমরা প্রথম এই কর উদ্ভাবন করে নাই। প্রাক-মুসলিম যুগে পারসিকদের মধ্যে 'গেজিট'[৬] নামে এবং রোমানদের মাঝে 'ট্রিবুটুম্ ক্যাপিটিস্'[৭] নামে এই প্রথা পূর্বেই প্রবর্তিত ছিল। যাহারা

---

১ ফুতুহাত-ই-ফিরোজশাহী, ৩০০; ফিকাহ-ই-ফিরোজশাহী (মওলানা মুজাফফর কিরামীর সংগৃহীত তথ্যাদি ভিত্তিক), ৪১০।

২ মিরাট-ই-জাহান-নুমাহ, ৩৪০; কোরায়েশী: এস. অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, পৃঃ ৯৩; বদায়ূনী: মুন্তাখাব-উত-তাওয়ারিখ, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ৩১৭।

৩ মুহম্মদ আলী-বিন-হাজী-বিন-আবুবকর কুফি: চাচ-নামা (ইহাকে ফাতে-নামা ও মিনহাজ-উল-মাসালিক অর্থাৎ সিন্ধুর ইতিহাসও বলা হয়), ১৩৯।

৪ তারিখ-ই-ফখরউদ্দীন মুবারকশাহ স্যার-ই-ডেনিসন্ কর্তৃক সম্পাদিত), পৃঃ ৩৩-৩৪।

৫ ফিকাহ-ই-ফিরোজশাহী, ৪১০-৪২০; ফুতুহাত-ই-ফিরোজশাহী, ৩০০; আলী শেরকানী: তুহফাত-উল্-কিরাম, ২৫৮; কোরায়েশী: এস. অ্যাডমিনিস্ট্রেশন্, পৃঃ ৯৯।

৬ খুদাবখশ: দি অরিয়েন্ট, পৃঃ ৬৫; আমীর আলী: দি স্যার‍্যাসেন্স্, পৃঃ ৬৩।

৭ আল্-তাবারী: তারিখ-উল্-উম্মি-ওয়া-আল্-মুলুক, ২৬৬৩-২৬৬৫।

রোমান নাগরিক ছিল না, রোমান শাসন কর্তাগণ তাহাদের উপর উক্ত কর ধার্য করিয়াছিলেন। মুসলিমরা পারসিক ও রোমানদের অনুসরণ করিয়াই মুসলিম রাষ্ট্রে অমুসলমানদের উপর উক্ত মাথা-পিছু কর ধার্য করে। কোর-আন শরীফে খারাজের মত এই জিজিয়া শব্দটি একটি কর হিসাবে ব্যবহৃত হইয়াছে এবং প্রাচীন লেখকরা এই শব্দের কোন বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন নাই।[১] মুসলিম রাষ্ট্রে বসবাসকারী অমুসলমানদের বাধ্যতামূলকভাবে মুসলিম সামরিক বাহিনীতে যোগদান না করিবার পরিবর্তে এবং মুসলিম রাষ্ট্র কর্তৃক অমুসলমানদের জান-মালের নিরাপত্তা বিধান করিবার জন্য, অমুসলমানদের উপর 'জিজিয়া কর' ধার্য করা হইত। যদি কোন অমুসলমান স্বেচ্ছায় মুসলিম সামরিক বাহিনীতে যোগদান করিত, কিংবা যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করিত, তাহা হইলে ঐ বৎসরের জন্য তাহাকে জিজিয়া মওকুফ করিয়া দেওয়া হইত। এমনকি কোন দেশ জয় করিবার পর, যতক্ষণ পর্যন্ত বিজিতদের জান-মালের নিরাপত্তা বিধান করিতে পারিতেন না, ততক্ষণ পর্যন্ত ঐ অধিকৃত অঞ্চলে অমুসলমানদের উপর মুসলিম শাসকগণ জিজিয়া আরোপ করিতেন না; এই নিদর্শন মুসলিম শাসন-ব্যস্থার ইতিহাসে বিরল নহে।[২]

নীতিগতভাবে সামরিক চাকুরী সকল মুসলিমদের জন্য বাধ্যতামূলক ছিল, এবং খলিফার প্রতিনিধি হিসাবে, সুলতান রাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা বিধানে যে-কোন মুসলিমকে ধর্মীয় কর্তব্য পালনে সামরিক বিভাগে যোগদানের আহ্বান করিতে পারিতেন। এই ধর্মীয় কর্তব্য অমুসলমানদিগের জন্য প্রযোজ্য নহে, কারণ তাহারা ইসলামের আইন-কানুন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নহে। সুতরাং সামরিক বাহিনীতে যোগদান না করিবার পরিবর্তে তাহাদিগকে জিজিয়া কর দিতে হইত। স্বভাবতঃ তাহাদের মধ্যে যাহারা স্বেচ্ছায় মুসলিম সেনাবাহিনীতে

---

১ এমন কি জিজিয়া শব্দটিকে যখন একটি বিশেষ অর্থ দেওয়া হইত, তখনও কর ও রাজস্ব হিসাবে ইহা শিথিলভাবে ব্যবহৃত হইত।—খুসরু : কিরান-উস-সা'দিন, পৃঃ ৩৫; হাজী গজনভী : দস্তুর-উল-আল্বাব, পৃঃ ৬৬।

২ সাইপ্রাস জয় করিবার পর, খলিফা ওসমান সাইপ্রাস অধিবাসীদের উপর জিজিয়া কর ধার্য করেন নাই। কারণ খলিফা তখনও নিশ্চিত ছিলেন না যে তিনি তাহাদিগকে বহিরাক্রমণ হইতে রক্ষা করিতে পারিবেন কিনা।—হুসাইনি : এম. অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, পৃঃ ৯৬।

যোগদান করিয়া লড়াই করিত, তাহাদিগকে এই কর দিতে হইত না। মুসলিম রাষ্ট্রে বসবাস করিবার বিশেষ সুবিধা প্রাপ্তির বিনিময়ে, অমুসলমান-দিগকে জিজিয়া দিতে হইত, ইহা কেহ মনে করিলে, সম্পূর্ণরূপে ইতিহাসের সত্যতার অপলাপ হইবে; কারণ ইহা যদি সত্য হইত, তাহা হইলে মহিলা ও শিশুদের উপরও অবশ্যই এই কর ধার্য করা হইত। অমুসলিম হইলেও, মহিলা ও শিশুদিগের এই কর মওকুফ করিয়া দেওয়া হইয়াছে, কারণ তাহাদিগকে যুদ্ধ করিতে হইত না।[১] বৃদ্ধ, পঙ্গু, অন্ধ ও যাহারা তাহাদের জীবিকা নির্বাহ করিয়া এই কর দিতে অসমর্থ, তাহাদের জন্য এই কর মওকুফ ছিল। এমনকি মঠধারী সন্ন্যাসী, পুরোহিত, ধর্মযাজক যাহারা জীবিকা অর্জন না করিয়া শধু আধ্যাত্মিক সাধনায় সর্বদা নিমগ্ন থাকেন, তাহাদিগকেও এই কর হইতে মুক্তি দেওয়া হইয়াছে। আর্থিক সঙ্গতিসম্পন্ন হিসাবে যাহারা এই জিজিয়া কর দিতে বাধ্য, তাহাদিগকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়াছে। সমাজের নিম্নতম শ্রেণীর প্রত্যেককে মাথা-পিছু এক দিনার, মধ্যমশ্রেণীর প্রত্যেককে দুই দিনার এবং ধনী শ্রেণীর প্রত্যেককে চারি দিনার বাৎসরিক জিজিয়া দেওয়ার নিয়ম ছিল।[২]

ভারতে সিন্ধুদেশ জয় করিবার পর, বিজয়ী মুহম্মদ-বিন-কাসিম হিন্দুদিগকে প্রথমে 'জিম্মি' ও 'মু'আহিদ' অর্থাৎ 'মিত্র' ও 'আশ্রিত' রূপে স্বীকৃতি প্রদান করেন এবং মুসলিম-বিশ্বে সার্বজনীনভাবে স্বীকৃত হারে তিনি উহাদিগের উপর জিজিয়া ধার্য করেন।[৩] দিল্লীর সুলতানগণ তাঁহাদের নিজেদের মুদ্রার মূল্যের মাধ্যমেই এই কর আরোপ করেন এবং তিন শ্রেণীর জন্য যথাক্রমে দশ, বিশ ও চল্লিশ টংকা ধার্য করেন।[৪]

একটি আধুনিক মতানুযায়ী, আলাউদ্দীন খল্‌জী হিন্দুদের নিকট হইতে জিজিয়া আদায় করিতেন না এবং তাহাদিগকে 'জিম্মি' বলিয়াও স্বীকার করিতেন না। কিন্তু এই অভিমতের সমর্থন কোন ঘটনাপঞ্জীতে পাওয়া যায় না। এই কথা সত্য নহে, কারণ মুসলিমও নহে কিংবা জিম্মিও নহে,

---

১ অ্যাগ্‌নাইড্‌স্: মুহামেডান্ থিয়রিজ পৃ: ৩৯৯।

২ এন্‌সাইক্লোপীডিয়া অফ্ ইসলাম, প্রথম খণ্ড, ১০৫১।

৩ কুফি: চাচ-নামা, পৃ: ২০৮-২০৯; কোরায়েশী: এস. অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, পৃ: ৯৭।

৪ আফিফ: ফিরোজশাহী, পৃ: ৩৮৩।

এমন কেহ মুসলিম রাষ্ট্রে বাস করিতে পারে না।[১] বস্তুতঃপক্ষে, কাজী মুগিস্ আলাউদ্দীনের সহিত কথোপকথনে হিন্দুদিগকে 'জিম্মি' শব্দে আখ্যায়িত করিলে, সুলতান ইহাতে কোন প্রতিবাদ করেন নাই।[২]

উলামাদের সহিত আলাপ-আলোচনার পর, ফিরোজশাহ তুঘলকই প্রথমবারের মত, ব্রাহ্মণদের উপরও জিজিয়া কর ধার্য করেন; খুব সম্ভবতঃ তিনি ব্রাহ্মণশ্রেণীর মধ্যে যাহারা একচেটিয়াভাবে ধর্ম সাধনায় নিবেদিত থাকে না, তাহাদিগকে তিনি সন্ন্যাসী বা পুরোহিতের স্বীকৃতি দিতেন না। সুলতানের এই নূতন ব্যবস্থায় রাজধানী দিল্লীতে রাজনৈতিক অসন্তোষ, চাঞ্চল্য ও বিক্ষোভের সৃষ্টি হয়। কিন্তু সুলতান কঠোর, অটল ও সংকল্পে স্থির ছিলেন এবং অবশেষে দিল্লীর ধনী হিন্দুরাই ব্রাহ্মণদের পক্ষে এই কর দিতে লাগিলেন। পরবর্তী আবেদন-নিবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে, সুলতান ব্রাহ্মণদের জন্য এই করের হার হ্রাস করেন।[৩] প্রাক মোগল আমলে দিল্লী সুলতানী শাসনকালে, ভারতে অমুসলমানগণ এই-ই প্রথম ফিরোজশাহের নব-ব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে, জিজিয়া কর প্রবর্তনের বিরুদ্ধে বিরক্তিবোধ ও ক্ষোভ প্রকাশ করেন।[৪] সুতরাং ইহা বলা বাহুল্য যে জিজিয়া কর নিরূপণ অবশ্যই খুব শিথিল ছিল।[৫] তদুপরি, হিন্দুদের নিকট মাথা-পিছু কর অপরিচিত ছিল না; উদাহরণস্বরূপ, কনৌজের গহরওয়ার বংশের শাসনাধীনে 'তুরুশকাদণ্ড' নামে জিজিয়ার মতই একটি কর প্রচলিত ছিল।[৬] কয়েকটি রাজপুত রাষ্ট্রেও প্রত্যেকের উপর এক টাকা করিয়া মাথা-পিছু কর ধার্য করা হইয়াছিল।

রাষ্ট্রের আয়ের প্রধান উৎস সর্বদাই ছিল ভূমি-রাজস্ব; বলা বাহুল্য, ইহা ছিল ভারতের আর্থিক সংগতির মেরুদণ্ড স্বরূপ। সকল মুসলিম রাষ্ট্রে ভূমি-রাজস্ব নিরূপণের জন্য, সকল আবাদী জমিকে বৈধভাবে বিভিন্ন শ্রেণীতে

১ আর. লেভী: দি সোশিয়লজি অফ ইসলাম, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ: ২৬৩। গ্রন্থকার বলেন যে, আলাউদ্দীন হিন্দুদিগের উপর জিজিয়া ধার্য করেণ নাই, কারণ তিনি তাহাদিগকে জিম্মির পর্যায়ভুক্ত করিতে রাজী ছিলেন না।—কোরায়েশী: এস. অ্যাডমিনিস্ট্রেশন পৃ: ৯৮ পাদটীকা।

২ বারনী: ফিরোজশাহী, পৃ: ২৯০।

৩ আফিফ: ফিরোজশাহী, পৃ: ৩৮২-৩৮৪।

৪ কোরায়েশী: এস. অ্যাড্মিনিস্ট্রেশন, পৃ: ৯৭।

৫ ত্রিপাঠিও এই অভিমত সমর্থন করেন।—ত্রিপাঠি: এম. অ্যাড্মিনিস্ট্রেশন্ পৃ: ২৯০-২৯১।

৬ ইউ. এন. ঘোষাল: দি অ্যাগ্রেরিয়্যান সিস্টেম ইন্ এন্শেন্ট ইণ্ডিয়া পৃ: ৬৭, ৬৮।

বিভক্ত করা হইত। প্রধান শ্রেণীবিভাগগুলি ছিল, যেমন (ক) ‘ওশরি, (খ) খারাজি, ও (গ) সুল্হি।[১] অন্যান্য শ্রেণীবিভাগ এতটা সার্বজনীন স্বীকৃতি লাভ করে নাই। সাধারণতঃ ‘ওশরি জমি’ বলিতে বুঝায়, (ক) জাজিরাত-উল্-আরবের জমি, (খ) যে সমস্ত জমির মালিকগণ স্বেচ্ছায় ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিবার পরও নিজেদের জমির মালিক হিসাবে বলবৎ রহিয়াছে; (গ) যে সকল জমি সামরিক শক্তি দ্বারা অধিকৃত হইয়াছে এবং মুসলিম সৈন্যদিগের মধ্যে বণ্টন করা হইয়াছে[২], ইত্যাদি। কোন মুসলিম অমুসলমানের খারাজি-জমি ক্রয় করিলে, ঐ জমি তখন কোন্ শ্রেণীভুক্ত হইবে, ইহা লইয়া অবশ্য চিন্তাবিদ্‌দের মধ্যে মতের পার্থক্য রহিয়াছে, যেমন আবু হানিফা বলেন, ইহা খারাজি-ই থাকিবে; অন্যদিকে মালিক বলেন যে ইহা ‘ওশরি’ হইবে।[৩] যদি একজন জিম্মি ‘ওশরি জমি’ ক্রয় করে, তাহা হইলে ইহা খারাজি জমিতে রূপান্তরিত হইবে।

পরবর্তীকালের লেখকগণ সুলতানী আমলে ভূ-সম্পত্তি বিষয়ক ব্যবস্থায়, ‘ওশরি’ জমির অস্তিত্বের উল্লেখ করেন নাই। প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ডব্লু. এইচ. মোরল্যাণ্ডও মন্তব্য করিয়াছেন যে, মুসলিম শাসকগণ চিরাচরিত নিয়মানুযায়ী, অধিকৃত ভারতে অমুসলমানদিগের জমির মালিকানা সম্পূর্ণভাবে উচ্ছেদ করিয়া, মুসলিমদের মধ্যে সকল ভূমি বণ্টন করিয়া দেন নাই; বণ্টন করিলেও উহা খুবই নগণ্য ছিল। বলিতে গেলে, জমি হিন্দু অধিবাসীদের অধিকারে ছিল; সুতরাং সমগ্র দেশটি খারাজি জমির শ্রেণীভুক্ত ছিল।[৪] তবে ইহাও সত্য যে ‘ওশরি জমির পরিমাণ খুব বেশী না হইলেও, তখন ‘ওশরি জমির অস্তিত্ব ছিল। যাহারা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিয়াছিল, সিন্ধু বিজয়ী মুহম্মদ-বিন-কাসিম তাহাদের জমি ‘ওশরি জমি বলিয়া স্বীকৃতি দিয়াছিলেন।[৫] একইভাবে তথাকথিত মামলুক বংশের প্রথম সুলতান কুতুবউদ্দীন আইবেক নির্দেশ দিয়াছিলেন যে মুসলিমদের অধিকারভুক্ত সমস্ত

১ কোরায়েশী: এস. অ্যাড্‌মিনিস্ট্রেশন, পৃঃ ১০০।

২ ডবলু এইচ মোরল্যাণ্ড: দি অ্যাগ্‌রেরিয়্যান্ সিস্‌টেম্ অফ মুসলিম ইণ্ডিয়া, পৃঃ ১৪।

৩ ফিকাহ-ই-ফিরোজশাহী, ৪১৪।

৪ মোরল্যাণ্ড: দি অ্যাগ্‌রেরিয়্যান্ সিস্‌টেম, পৃঃ ১৪।

৫ কুফি: চাচ-নামা, ১৩৯।

জমিকে 'ওশরি'রূপে গণ্য করিতে হইবে এবং মুসলিমগণ জমির উৎপাদিত শস্যের দশভাগের একভাগ অথবা বিশভাগের একভাগ রাজস্ব দিতে হইবে।[১] এই আদেশ অবশ্য পাঞ্জাবের লাহোর অঞ্চলে প্রযোজ্য ছিল। পরবর্তী সুলতানদের আমলেও 'ওশরি জমির অস্তিত্ব বজায় ছিল। ফিরোজশাহ তুঘলক নিশ্চিতভাবে ভূমি-রাজস্ব ব্যবস্থায় 'ওশরের' কথা উল্লেখ করেন এবং তাঁহার আমলের আইন বিশেষজ্ঞগণও 'ওশরি জমি সংক্রান্ত প্রশ্নে একাধিক সিদ্ধান্ত প্রদান করেন। তুহ্‌ফাত-উল-কিরামে বর্ণিত আছে যে আইন বিশারদগণ কিছু নির্দিষ্ট অঞ্চলকে 'ওশরি বলিয়া স্থির করেন।[২]

সুল্‌হি শব্দটি একটি বিশেষ অর্থে কিছু নির্দিষ্ট অঞ্চলের জমি সম্পর্কে ব্যবহৃত হয়। এই অঞ্চলের জমির মালিকদের সহিত মুসলিমদের চুক্তিপত্র সম্পাদিত হয়। এইরূপ জমিগুলি ছিল বিশেষ করিয়া ভারতের বাহিরে; সুতরাং ইহা আমাদের খুব দৃষ্টি আকর্ষণ করে না।[৩]

কোন কোন লেখক 'আরজ-ই-মুম্‌লিকাত' নামক আরেক প্রকারের জমির উল্লেখ করিয়াছেন। ইহা ছিল অধিকৃত জমি কিংবা সন্ধির মাধ্যমে প্রাপ্ত ও সরকারী রাজস্ব বিভাগ দ্বারা গৃহীত জমি।[৪] এই জাতীয় জমি ব্যক্তিগত মালিকানাধীন হইতে পারিত না, বিক্রয় করা যাইত না, কিংবা ওয়াক্‌ফে রূপান্তরিত করা যাইত না।[৫] ভারতীয় কোন লেখক এই শ্রেণীর জমির উল্লেখ করেন নাই এবং ভারতে ইহার কখনও অস্তিত্বও ছিল না। রাজস্বের দিক হইতে, 'আরজ-ই-মুমলিকাতে'র কোন গুরুত্ব নাই এবং ইহা খারাজী জমির অনুরূপ ছিল।

আরামাইক্‌ ভাষায় খারাজ শব্দ নবীর আমলের পূর্বেই শাসন-ব্যবস্থায় ব্যবহৃত হইয়াছে। পারসিকদের মধ্যে খারাজ নামে এবং রোমানদের মধ্যে 'ট্রিবুটুম সোলি' নামে এই কর প্রবর্তিত ছিল।[৬] প্রথম দিকে মুসলিমগণ

১ তারিখ-ই-ফখরউদ্দীন মোবারকশাহ, পৃঃ ৩৩-৩৪।

২ কানী: তুফাত-উল্‌-কিরাম, ২৫৮; দস্‌তুর-উল্‌-আল্‌বাব, পৃঃ ৩০, ৬০-৬১।

৩ আইন, প্রথমখণ্ড, পৃঃ ২৯৩-২৯৪।

৪ কোরায়েশী: এস. অ্যাড্‌মিনিস্ট্রেশন, পৃঃ ১০২।

৪ অ্যাগ্‌নাইডস্‌: মুহামেডান থিয়রিজ, পৃঃ ৩৭৬।

৬ পারস্যবাসীরাও খারাজ শব্দটি ব্যবহার করিত।—হুয়াট': এনশেন্ট পারশিয়া, পৃঃ ১৫৭-১৫৮; কোরায়েশী: এস. অ্যাড্‌মিনিস্ট্রেশন্‌, পৃঃ ১০২ পাদটীকা।

খারাজকে একটি কর অর্থে ব্যবহার করিত, কিন্তু পরবর্তীযুগে ইহা ভূমি-রাজস্ব হিসাবে গণ্য হয়। বলপূর্বক অধিকৃত জমি কিন্তু উহা মুসলিম সৈন্যদের মধ্যে বণ্টন করা হয় নাই, বরঞ্চ অমুসলমান মালিকদিগকে কিংবা অন্যত্র হইতে আগত অমুসলমান বসবাসকারীদিগকে দেওয়া হইয়াছে, এমন সকল জমিকে খারাজী জমি বলা হয়।[১] ইহা ব্যতীত, যদি একজন জিম্মি 'ওশরি জমি ক্রয় করে, তবে ইহা খারাজী জমিতে পরিণত হয়।[২] যদি খারাজী জমির মালিক ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তরিত হন, তবু তাহার জমি খারাজী থাকিয়া যায়।[৩] খারাজী পানি দ্বারা কোন মুসলিম কোন জমির উৎকর্ষ সাধন করিলেও, ঐ জমি খারাজীই বিবেচিত হয়।[৪]

মুসলিম লেখকগণ খারাজকে দুই প্রকারে বিভক্ত করেন, (ক) খারাজ-ই-ওয়াজিফাহ্, এবং (খ) খারাজ-ই-মুকাসিমাহ্।[৫]

মুসলিম ভারতের রাজস্ব ব্যবস্থায় খারাজ শব্দটিকে বিনাদ্বিধায় ভূমি-রাজস্ব কিংবা আরও সংক্ষেপে রাজস্ব বলিয়া অনুবাদ করা যায়।[৬] মূল অর্থে রাজস্ব হইতেছে ভূমির উৎপন্ন-শস্যের এক অংশ।

হিন্দু ভারতে কৃষককে তাহার জমির উৎপাদিত ফসলের নির্দিষ্ট অংশ রাষ্ট্রকে অবশ্য দিতে হইত—এই মৌলিক নীতি সার্বজনীনভাবে স্বীকৃত ছিল এবং নীতি-শাস্ত্র রাজার এই কর ধার্য করিবার অধিকারকে অকুণ্ঠ স্বীকৃতি দিয়াছে। সুতরাং খারাজের এই মৌলিক নীতি হিন্দু সমাজে দৃঢ়রূপে বদ্ধমূল ছিল।[৭]

কোন কোন লেখকের মতে, ভূমির উৎপন্ন-শস্য কর্তনের পর, সঠিক পরিমাণ শস্যকে কৃষক ও রাষ্ট্রের মধ্যে বণ্টন করিয়া দেওয়া ছিল, অতি সহজ ও প্রাচীন, সর্বাপেক্ষা নিরাপদ ও ন্যায়সঙ্গত পন্থা।[৮] এক কথায়, ইহাকে শস্যের বণ্টন ব্যবস্থা—'শেয়ারিং প্রথা' বলা যাইতে পারে। এই প্রথা নানাভাবে প্রচলিত ছিল, যেমন বণ্টন শস্যের ওজনের মাধ্যমে, কিংবা শস্যের সমস্তূপের মাধ্যমে,

১ অ্যাগ্নাইডস্: মুহামেডান্ থিয়রিজ্, পৃ: ৩৬৬-৩৬৮; আইন, প্রথম খণ্ড, পৃ: ২৯৪।
২ ফিকাহ্-ই-ফিরোজশাহী, ৪১৬।
৩ দস্তুর-উল্-আল্বাব, পৃ: ৬৪।
৪ আইন, প্রথম খণ্ড, পৃ: ২৯৪; কোরায়েশী: এস. অ্যাড্মিনিস্ট্রেশন, পৃ: ১০৩।
৫ ইস্পাহানী: মুলুক-উল্-মুলুক, ৯৩।
৬ মোরল্যাণ্ড: দি অ্যাগরেরিয়ান্ সিস্টেম, পৃ: ১৫ ও অ্যাপেণ্ডিক্স্ 'এ' পৃ: ২০৯-২১০।
৭ শুক্রনীতি, পৃ: ১৪৯; বিষ্ণু স্মৃতি (জুলিয়াস জুলি কর্তৃক ইংরেজীতে অনূদিত—'দি ইন্স্টিটিউট্ অফ বিশ্নু), পৃ: ২২-২৩।
৮ কোরায়েশী: এস. অ্যাড্মিনিস্ট্রেশন, পৃ: ১০৪।

কিংবা আবাদী জমি ভাগের মাধ্যমে। এই পদ্ধতির সাফল্যের জন্য বহু সংখ্যক লোকের সহযোগিতার প্রয়োজন ছিল। এই পদ্ধতিতে সর্বাপেক্ষা বড় অসুবিধা ছিল এই যে, সর্বদা এত বেশী সংখ্যক লোক নিয়োজিত রাখা সম্ভব ছিল না। তদুপরি শস্য কর্তন ও সংগ্রহ করিয়া কৃষক ও রাষ্ট্রের মধ্যে অংশ ভাগাভাগি করিবার ঠিক পূর্ব মুহূর্তে, প্রাকৃতিক দুর্যোগের জন্য জমির সমস্ত পাকা শস্যের ক্ষতি হইবারও সম্ভাবনা থাকে। উহাতে রাষ্ট্র ও কৃষক উভয়কেই বিপুল ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয়। বারনী বণ্টন পদ্ধতির প্রশংসা করিয়া বলেন যে, এই পদ্ধতিতে দুর্যোগের ফলে শস্য বিনাশের কথা কিংবা বিভিন্ন অঞ্চলের জমিতে সন্তোষজনক ফসল বা অসন্তোষজনক ফসল উৎপাদনের বিষয়টির বিবেচনা নিষ্প্রয়োজন।[১]

উপরোক্ত বণ্টন প্রথার অসুবিধা দূরীভূত করিবার উদ্দেশ্যে, একটি নূতন পদ্ধতির উদ্ভব হয়। অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ তাহাদের জ্ঞান ও বুদ্ধিমত্তার দ্বারা শস্য-কর্তন ও সংগ্রহের পূর্বেই, জমির শস্য পরিদর্শন করিয়া জমিতে সম্ভাব্য কি পরিমাণ শস্য হইতে পারে, উহা নির্ধারণ করেন। এমনকি বারংবারের অভিজ্ঞতার দরুন, শস্যের পরিমাণ নির্ধারণও প্রায় সঠিক হইত এবং প্রাথমিক পর্যায়েই শস্যের মূল্য নির্ধারণ করাও সম্ভবপর হইত। এই পদ্ধতিকে মূল্য-নির্ধারণ প্রথা বলা হয়।[২]

পরবর্তীকালে আরেকটি নূতন পদ্ধতির উদ্ভব ঘটে। সাধারণভাবে জমি জরিপ করিবার পর জমির উর্বরতা-শক্তির তারতম্য বিবেচনা করিয়া, কি পরিমাণ জমিতে কী পরিমাণ শস্য উৎপন্ন হইতে পারে এবং উহার মূল্য কত হইতে পারে—এই তথ্যের ভিত্তিতে রাষ্ট্রের রাজস্বের হার নির্ধারণ করা হইত। এইভাবে বিভিন্ন জাতীয় মাটিতে উৎপাদিত বিভিন্ন প্রকারের শস্যের উপর রাজস্ব-হারের তালিকা রাষ্ট্র প্রণয়ন করিতে পারিত। এই পদ্ধতিটি সম্পূর্ণরূপে জরিপের উপর নির্ভরশীল; সুতরাং ইহাকে জরিপ রীতি বলিয়া অভিহিত করা যায়।[৩] এক কথায় বলা যায় যে, জমি জরিপ করিবার পর, প্রত্যেকটি এলাকার উপর আংশিক নগদ এবং আংশিক উৎপাদিত দ্রব্যের মাধ্যমে, রাজস্বের হার নির্ধারিত হইত—ইহাই ছিল জরিপ পদ্ধতি।[৪] মুসলিম ভারতের বিভিন্ন অংশে বণ্টন-ব্যবস্থা, মূল্য-নির্ধারণ পদ্ধতি ও জরিপের রীতি—এই তিন প্রথাই প্রচলিত ছিল, ইহাতে

১ বারনী: ফিরোজশাহী, পৃ: ৪২৯।
২ কোরায়েশী: এস. অ্যাড্‌মিনিস্ট্রেশন্, পৃ: ১০৪।
৩ মোরল্যাণ্ড: দি অ্যাগ্রেরিয়ান্ সিস্টেম্, পৃ: ৭, ১৫।
৪ মোরল্যাণ্ড: পূর্বোক্ত, পৃ: ১৫ পাদটীকা; বণ্টন-ব্যবস্থা ও জরিপের রীতির বিস্তারিত আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য—আবু ইউসুফ: কিতাব-উল্-খারাজ, পৃ: ৫৩।

কোন সন্দেহের অবকাশ নাই। মোরল্যাণ্ড ও আবুল ফজলের গ্রন্থে উক্ত পদ্ধতি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা রহিয়াছে। আইন-ই-আকবরীতে উল্লেখ আছে যে, প্রাক-মুসলিম যুগেও হিন্দু-ভারতে এই পদ্ধতি প্রচলিত ছিল।[১]

উপরে বর্ণিত পদ্ধতিসমূহ ইসলামী আইনের বিরোধী ছিল না। শেয়ারিং— বণ্টন-ব্যবস্থা 'খারাজ-ই-মুকাসিমাহ,' পদ্ধতির অনুরূপ। মূল্য-নির্ধারণ পদ্ধতি বণ্টন ব্যবস্থার উন্নতরূপ মাত্র ; বিশেষ অর্থে 'হাজর'[২] বলা হয়। আরব শাসন-ব্যবস্থায় আব্বাসীয় আমল হইতে 'খারাজ-ই-মুকাতিয়াহ' পদ্ধতি চালু ছিল। এই পদ্ধতির মাধ্যমে কৃষক একটি নির্দিষ্ট বৎসরের জন্য রাষ্ট্রকে একটি নির্ধারিত পরিমাণ নগদ টাকা কিংবা তৎপরিবর্তে সমপরিমাণ শস্য প্রদান করিতে পারিত।[৩] এই পদ্ধতি অবশ্য 'খারাজ-ই-ওয়াজিফাহ,' পদ্ধতি হইতে পৃথক ছিল। নিঃসন্দেহে বলা চলে যে হিন্দুদের জরিপ পদ্ধতির মতই, মুসলিমগণ 'খারাজ-ই-মুকাতিয়াহ,' পদ্ধতি প্রবর্তন করে। ভারতে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠিত হইবার প্রারম্ভিককালে, মুসলিমদের সংখ্যাস্বল্পতার জন্য, মুসলিম শাসকগণ বণ্টন-পদ্ধতিতে ভূমি-রাজস্ব আদায়ের জন্য, অসংখ্য অমুসলমানকে এই কাজে নিযুক্ত করেন। অমুসলমানদের অভিজ্ঞতা, নৈপুণ্য ও দক্ষতা এই কাজের সাফল্যের সহায়ক ছিল। এইভাবে দিল্লী সুলতানী আমলে ভূমি-রাজস্ব ব্যবস্থায় হিন্দু পদ্ধতিকে চূড়ান্তভাবে নূতন পরিবেশে কার্যকরী করা হইয়াছিল।[৪]

হাসান নিজামী ও মিনহাজ-উস-সিরাজ সুলতানী আমলে ভূ-সম্পত্তি বিষয়ক নীতি ও পদ্ধতি সম্পর্কে তাহাদের গ্রন্থে বিশেষ আলোচনা করেন নাই ; সম্ভবতঃ তাহাদের নূতন কিছু বলিবার ছিল না। এই আমলের প্রারম্ভিককালে কোন নূতন রাজস্ব-সংস্কার সাধিত হয় নাই ; বলিতে গেলে পুরাতন পদ্ধতিই বলবৎ ছিল। বারনী অবশ্যই এই আমলের রাজস্ব শাসন-ব্যবস্থা সম্পর্কে উৎসাহী ছিলেন। তিনিই প্রথম আলাউদ্দীন খল্‌জীর প্রশাসনিক সংস্কারাদি সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গিয়া কর নিরূপণ পদ্ধতির উল্লেখ করেন।[৫] তাহার মতে, আলাউদ্দীনের সময়ে জরিপের রীতি প্রবর্তিত হয়। তবে আলাউদ্দীন এই

---

১ আইন, তৃতীয় খণ্ড, পঞ্চম আইন ; ঘোষাল : দি অ্যাগ্‌রেরিয়্যান সিস্‌টেম্‌, পৃঃ ২৬-২৭।
২ দস্‌তুর-উল্‌-আল্‌বাব, পৃঃ ৫০।
৩ আমীর আলী : দি স্যার‍্যাসেন্‌স্‌, পৃঃ ৪২৭-৪২৮।
৪ কোরায়েশী : এস. অ্যাড্‌মিনিস্ট্রেশন, পৃঃ ১০৬।
৫ বারনী : ফিরোজশাহী, পৃঃ ২৮৭।

পদ্ধতি আবিষ্কার করেন নাই ; পূর্ব-পদ্ধতিই বলবৎ রাখেন। তাঁহার আমলে বণ্টন-ব্যবস্থা অপেক্ষা জরিপের রীতি অনেক বেশী জনপ্রিয় ছিল বটে, তবুও তাঁহার কঠোরতা বণ্টন-পদ্ধতির বিলুপ্তি ঘটাইতে পারে নাই।

গিয়াসউদ্দীন তুঘলক ভূ-সম্পত্তি বিষয়ক সমস্যা সম্পর্কে আরও উদার নীতি অবলম্বন করিয়া, জরিপ পদ্ধতির পরিবর্তে শস্য বণ্টন প্রথার প্রয়োগ অধিকতর বাঞ্ছনীয় বিবেচনা করেন এবং এই বণ্টন-পদ্ধতিই দেশে সাধারণভাবে প্রবর্তন করেন।[১] রাজ্যের রাজস্ব-ব্যবস্থার পুনর্গঠনের জন্য, তিনি বণ্টন-ব্যবস্থার সমর্থনে জরিপের রীতি পরিত্যাগ করেন। কর নির্ধারণ পদ্ধতির পরিবর্তনের কারণ-স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, ইহা দ্বারা তিনি কৃষকদিগকে নূতন প্রথার প্রভাব হইতে মুক্তি দেন এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগে বা অন্য কোন কারণে জমির ফসল আশানুরূপ না হইলেও কিংবা ফসল বিনষ্ট হইলেও শস্যের ভাগ বণ্টনের প্রকোপ হইতে তাহাদিগকে নিষ্কৃতি দেন।[২] তবে ইহা ভুল হইবে যদি ধারণা করা হয় যে জরিপ প্রথা সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হইয়াছিল, কারণ পরবর্তী আমলে এই পদ্ধতিকে আরও বিস্তৃত ও ব্যাপক করিবার জন্য প্রচেষ্টা চলিয়াছিল।[৩] যাহা হউক, শেরশাহের রাজত্বকালের পূর্বে জরিপ পদ্ধতিকে সার্বজনীন পদ্ধতিতে রূপান্তরিত করিবার জন্য, সত্যিকারের প্রচেষ্টা করা হয় নাই। বলা বাহুল্য, গিয়াসউদ্দীনের শাসন আমলে জরিপের রীতি সাময়িকভাবে অদৃশ্য হইলেও, দুই শতাব্দী পরেই শেরশাহের রাজত্বকালে এই পদ্ধতি পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়।[৪]

জরিপের রীতির কিছু অনিবার্য ফলাফল ছিল। কর-নিরূপণ নীতি মধ্যম ধরনের হওয়া বাঞ্ছনীয়, কারণ প্রাকৃতিক দুর্যোগে আশাপ্রদ ফসল উৎপাদিত না হইলে কৃষকরা যেন ভূমি-রাজস্ব প্রদানে অহেতুক অসুবিধার সম্মুখীন না হয়। বস্তুতঃপক্ষে, সামগ্রিক বা আংশিকভাবে শস্যের বিনাশ ঘটিলে, দিল্লীর সুলতানগণ নির্দয়ভাবে কৃষকদের নিকট হইতে নির্ধারিত ভূমি-রাজস্ব আদায় করিতেন না ; কৃষকদিগকে অপেক্ষাকৃত কম কর প্রদানের অনুমতি দিতেন।[৫] ইহা নিঃসন্দেহে

১ বস্তুতঃপক্ষে, জরিপের রীতি 'জাটাকা'তে উল্লিখিত আছে। —কাম-জাটাকা, চতুর্থ, পৃঃ ১০৯ ; কোরায়েশী : এস. অ্যাড্‌মিনিস্ট্রেশন, পৃঃ ১০৭ পাদটীকা।

২ মোরল্যাণ্ড : দি অ্যাগ্রেরিয়্যান সিস্টেম্, পৃঃ ৪০।

৩ সহরিন্দী : তারিখ-ই-মোবারকশাহী, পৃঃ ১০২।

৪ মোরল্যাণ্ড : পূর্বোক্ত পৃঃ ৪১।

৫ দস্তুর-উল্-আল্বাব, পৃঃ ৬৬।

কৃষকদের প্রতি সুযোগ-সুবিধা দানের নিদর্শন।[১] শস্য সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হইলে, ঐ জমির উপর খারাজ নির্ধারণ করা হইত না।[২] এই অভিমত মোরল্যাণ্ড সমর্থন করিয়াছেন।[৩] শেরশাহের সুপ্রতিষ্ঠিত নীতি ও সারগর্ভ নির্দেশ ছিল যে, কর-নিরূপণের সময় কৃষকদের প্রতি সদয় হওয়া উচিত কিন্তু কর আদায়ের সময় কঠোর হওয়া বাঞ্ছনীয়।[৪] তবে ইহা নিঃসন্দেহে বলা চলে যে, তাঁহার রাজত্বকালে রাজস্ব আদায়ের সময় কৃষকদিগকে কোন সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা হয় নাই। বিভিন্ন অঞ্চলের জন্য কর-নিরূপণের ফর্দ তৈয়ার করিয়া, রাষ্ট্রের প্রাপ্য করের দাবি চূড়ান্তভাবে নির্ধারিত করা রাষ্ট্রের দায়িত্ব।[৫] কর-নিরূপণের তালিকা প্রণয়ন পূর্ব-অভিজ্ঞতাভিত্তিক ও সময় সময় সংশোধন-সাপেক্ষ ছিল। শেরশাহের আমলে রাজস্বের নির্দিষ্ট হারের তালিকা আবুল ফজল কর্তৃক 'আইন-ই-আকবরী'তে সুরক্ষিত আছে।[৬] এই তালিকা পরীক্ষা করিয়া দেখা যায় যে, রাষ্ট্রের রাজস্বের হার উৎপাদিত শস্যের গড়পড়তা ভিত্তিক ছিল। বিভিন্ন অঞ্চলের সর্বোচ্চ, মধ্যম ও সর্বনিম্ন পরিমাণ উৎপাদিত শস্য যোগ করিবার পর, সমগ্র শস্যকে তিন দিয়া ভাগ করিয়া গড়পড়তা শস্যের পরিমাণ নির্ণয় করা হইত এবং এই গড়পড়তা শস্যের উপর রাষ্ট্রের করের পরিমাণ হিসাব করা হইত।[৭]

ইহা ভাবিলে ভুল হইবে যে, রাষ্ট্রের রাজস্ব নগদের মাধ্যমে প্রদান করিলেই শুধু জরিপের নীতি কার্যকরী হয়। কৃষককে শুধু নগদ অর্থের মাধ্যমে রাষ্ট্রের কর মিটাইতে হইবে, এমন কিছু উক্ত প্রথায় বাধ্যতামূলক নহে। প্রতি একক এলাকায় গড়পড়তা শস্যের পরিমাণ নির্ধারণ করা এই প্রথার মৌলিক নীতি। 'খারাজ-ই-মুকাতিয়াহ'র সঙ্গে ইহার সাদৃশ্য আছে। রাষ্ট্র ও কৃষকের মধ্যে

---

১ রাষ্ট্রের নির্ধারিত করের সমগ্র কিংবা আংশিক পরিত্যাগ করাকে 'নজর' বলা হয়। —দস্তুর, পৃঃ ৩৬ ; আমীর খসরু বলিয়াছেন যে আলাউদ্দীন খল্‌জী অনেক টাকা মাফ করিয়া দিয়াছেন। —খসরু : খাজাইন-উল্-ফুতাহ্, পৃঃ ১৫।

২ ফিকাহ্-ই-ফিরোজশাহী, ৪১৬।

৩ মোরল্যাণ্ড : দি অ্যাগ্রেরিয়্যান্ সিস্টেম্, পৃঃ ২৩০ পাদটীকা।

৪ সারওয়ানী : তারিখ-ই-শেরশাহী, ৮-৯ ; দস্তুর-উল্-আল্‌বাবে সুযোগ-সুবিধা প্রদানের কথা উল্লেখ আছে। ইহাকে বিশেষ অর্থে 'মুসামাহাত' বলা হয়। —দস্তুর, পৃঃ ৩৬।

৫ ফিরোজশাহ তুঘলকের রাজত্বকালে কর নিরূপণের ফর্দকে 'কানুন' বলা হইত। —দস্তুর, পৃঃ ৩৫।

৬ আইন; তৃতীয় খণ্ড, একাদশ আইন ; মোরল্যাণ্ড : দি অ্যাগ্রেরিয়্যান্ সিস্টেম্, পৃঃ ৭৬।

৭ এক সিকান্দরি বিঘা পরিমাণ বেশী উর্বর শ্রেণীর জমিতে ১৮ মণ গম ; মধ্যম শ্রেণীর জমিতে ১২ মণ ; সর্বনিম্ন শ্রেণীর জমিতে ৮ মণ ৩৫ সের ; মোট পরিমাণ=৩৮ মণ ৩৫ সের ; তিন দিয়া ভাগ করিলে গড়পড়তা শস্য=১২ মণ ৩৮⅓ সের—কোরায়েশী : এস. অ্যাড্‌মিনিস্ট্রেশন, পৃঃ ১০৯ পাদটীকা ; বিশেষ দ্রষ্টব্য—আইন, তৃতীয় খণ্ড, নবম আইন।

আরও অধিক পক্ষপাতশূন্য বন্দোবস্ত জরিপ পদ্ধতি নিশ্চিত করিতে পারে।[১] শস্য কিংবা নগদ অর্থের মাধ্যমে রাষ্ট্র ইহার গড়পড়তা শস্যের অংশ আদায় করিতে পারিত।

প্রাচীন হিন্দুদের রাজস্ব-ব্যবস্থা উপরোক্ত দুইটি পদ্ধতির একটি সংমিশ্রণ ছিল বলিয়া মনে হয়; কারণ রাষ্ট্র শস্যের মাধ্যমে রাজস্বের কিছু অংশ দাবি করিত, যাহাকে 'ভাগা' বলা হয়, আবার নগদের মাধ্যমেও বাকী অংশ দাবি করিত, যাহাকে 'হিরানয়া' বলা হয়। কৃষকদের মধ্যে কেহ কেহ নগদে, আবার কেহ কেহ শস্যের মাধ্যমে রাজস্ব প্রদান করিত।[২]

দিল্লী সালতানাতের রাজস্ব-ব্যবস্থায় সর্বদা নগদে ভূমি-রাজস্ব প্রদানের রীতি প্রবর্তিত ছিল না বলিয়া মনে হয়। দুইজন সুলতানের আমলে সাম্রাজ্যের বৃহত্তর অংশে জরিপ পদ্ধতি বলবৎ ছিল। আলাউদ্দীনের রাজত্বকালে কৃষকদিগকে নগদে ভূমি-রাজস্ব দিবার জন্য উৎসাহিত করা হইত এবং শেরশাহের রাজস্ব-নির্ধারণের তালিকায় নগদে রাজস্ব প্রদানের কোন উল্লেখ ছিল না।[৩] ফিরোজশাহ্ কোন কোন এলাকায় কৃষকদিগকে রাজস্ব অর্ধেক নগদে ও বাকী অর্ধেক শস্যের মাধ্যমে প্রদান করিতে উৎসাহিত করেন।[৪] রাষ্ট্র নিজের স্বার্থেও কৃষকদের সুবিধার্থে কখনও নগদে, কখনও বা শস্য প্রদানের মাধ্যমে রাজস্ব দাবি করিত। সুতরাং সাধারণভাবে বলা চলে যে রাজস্ব প্রদানের পদ্ধতি রাষ্ট্র ও কৃষকদের পারস্পরিক স্বার্থ, তাহাদের সুযোগ-সুবিধা ও আপোষ মীমাংসার উপর নির্ভরশীল ছিল। তবে ইহা সত্য যে কৃষকগণ রাজস্ব ফসলের মাধ্যমে প্রদান করিলে স্বাভাবিকভাবেই রাষ্ট্রকে সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশে শস্য সংরক্ষণের জন্য শস্যাগারের ব্যবস্থা করিতে হইত।[৫]

সুলতানী আমলের রাষ্ট্র উৎপাদিত শস্যের কত অংশ রাজস্ব হিসাবে গ্রহণ করিত, ইহা একটি বিতর্কমূলক সমস্যা। হিন্দুদের চিরাচরিত নীতি ও মুসলিম

---

১ কোরায়েশী: এস. অ্যাড্‌মিনিস্ট্রেশন, পৃ: ১১০।

২ ইউ. এন. ঘোষাল: কন্ট্রিবিউশনস্ টু দি হিস্টরি অফ দি হিন্দু রেভিনিউ সিসটেম্ পৃ: ৩৭-৩৮, ৬১-৬২ 'হিরাণয়া'র প্রকৃতি তর্কবিতর্কমূলক।—কোরায়েশী: এস. অ্যাড্‌মিনিস্ট্রেশন, পৃ: ১১০ পাদটীকা।

৩ আইন, তৃতীয় খণ্ড, একাদশ আইন; বিশেষ দ্রষ্টব্য—কোরায়েশী: এস. অ্যাড্‌মিনিস্ট্রেশন, অ্যাপেণ্ডিক্স্ 'সি'।

৪ ইনশা-ই-মাহরু, চিঠি নং ৩১।

৫ তাত্তাভী: তারিখ-ই-আল্‌ফি, দ্বিতীয়, ৩২।

আইনের আলোকে, এই সমস্যাটি নিরপেক্ষভাবে পরীক্ষা করা প্রয়োজন। হিন্দু অর্থনীতি বিশারদগণ বলেন যে, রাষ্ট্রকে উৎপাদিত শস্যের এক-ষষ্ঠাংশ রাষ্ট্রের অংশ হিসাবে দাবি করা উচিত এবং এই অভিমতের উপর নির্ভর করিয়া হিন্দু-ভারতে রাষ্ট্রের অংশ এক-ষষ্ঠাংশ ছিল বলিয়া ধারণা করা হয়।[১] হিন্দু আমলে ভূমি-রাজস্ব এক-ষষ্ঠাংশ ছিল বলিয়া হিন্দু লেখকদের বারংবার মন্তব্য পরবর্তী-কালে আল্-বেরুনীর মত বিদেশী পর্যবেক্ষকগণকে বিভ্রান্ত করিয়াছে।[২] বাস্তব প্রমাণ আছে যে, হিন্দু ভারতে রাষ্ট্রের রাজস্বের দাবি এক-ষষ্ঠাংশের অপেক্ষা আরও বেশী ছিল।[৩] জাটাকাতে উচ্চ হারের রাজস্ব নির্ধারণের উল্লেখ আছে এবং কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রেও বলা হইয়াছে যে জল-সেচনের সুযোগ-সুবিধা থাকিলে রাষ্ট্রের করের দাবি বৃদ্ধি করা হইত।[৪] শুক্রনীতির মতানুযায়ী, অনুর্বর ও শিলাময় ভূমি হইতে এক-ষষ্ঠাংশ রাজস্ব আদায় করা উচিত; পক্ষান্তরে, যে ভূমি, পুকুর, খাল ও পাতকূয়ার পানি দ্বারা অথবা বৃষ্টির পানি কিংবা নদীর পানি দ্বারা জল-সেচনের মাধ্যমে চাষাবাস করা হয়, ঐ জমিতে যথাক্রমে এক-তৃতীয়াংশ, এক-চতুর্থাংশ অথবা অর্ধাংশ রাজস্ব, শাসনকর্তা ধার্য করিতে পারেন।[৫] প্রাচীন হিন্দু রাষ্ট্র-শাসন-ব্যবস্থা সম্পর্কে আলোচনার মাধ্যমে একজন আধুনিক লেখক মন্তব্য করিয়াছেন যে, ভূমি-রাজস্ব ও জল-সেচন ফি বাবদ একজন কৃষককে তাহার উৎপাদিত শস্যের শতকরা চল্লিশ হইতে সাতান্ন ভাগ রাষ্ট্রকে দিতে হইত।[৬] কৌটিল্যের সময়েও জল-সেচন ফি বাবদ উৎপাদিত শস্যের এক-পঞ্চমাংশ হইতে এক-তৃতীয়াংশ পর্যন্ত নেওয়া হইত।[৭] তবে বাস্তবিকই সারা হিন্দু-ভারতের জন্য ভূমি-রাজস্ব ও জল-সেচন করের হারের একটি নির্দিষ্ট নিয়ম নির্ধারণ করা খুবই কষ্টকর। উত্তর-ভারতে হিন্দু শাসন আমলের শেষদিকে, কৃষকের

---

১ বিষ্ণু, তৃতীয়, পৃ: ২২-২৩।

২ আল্-বেরুনী: কিতাব-উল্‌হিন্দ, পৃ: ২৭৬; হিওয়েন সাং: ট্রাভেল্‌স (ভ্রমণকাহিনী), প্রথম, পৃ: ১৭৬।

৩ সি. এইচ. আই. চতুর্থ খণ্ড, পৃ: ৪৫৩।

৪ কাম-জাটাকা, তৃতীয়, পৃ: ৯; কোরায়েশী: এস. অ্যাড্‌মিনিস্ট্রেশন, পৃ: ১১১।

৫ শুক্রনীতি, পৃ: ১৪৭-১৪৮।

৬ বি. কে. সরকার: দি পলিটিক্যাল্ ইন্‌ষ্টিটিউশন্‌স্ অ্যাণ্ড থিয়রিজ্ অফ দি হিন্দুস্, পৃ: ১২৪।

৭ কৌটিল্য: অর্থশাস্ত্র, পৃ: ১৪০।

করের বোঝা অসহনীয় হইয়া পড়িয়াছিল ; যদিও নীতির দিক হইতে মোটমাট উৎপাদিত শস্যের শুধু এক-ষষ্ঠাংশ ছিল ভূমি-রাজস্ব।[১]

ভারতে মুসলিম শাসন-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হইবার পর, দিল্লী সুলতানগণকে তাঁহার ভূমি-রাজস্ব নির্ধারণ করিবার ব্যাপারে, উপরোক্ত হিন্দু আমলের অবস্থার সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল। দেশবাসীকে মুসলিম শাসন-ব্যবস্থার সঙ্গে সহযোগিতা করিতে উৎসাহিত করিবার জন্য স্বাভাবিকভাবেই মুসলিম শাসকগণ ভূমি-রাজস্বের সম্ভাব্য নিম্নতম হার ধার্য করেন, যেমন অন্যান্য মুসলিম দেশে জিম্মিদের উপর আরোপিত হয়।[২] মুসলিমদিগকে এক-দশমাংশ ভূমি-রাজস্ব 'ওশর দিতে হইত, অমুসলমানদের উপর 'ওশরের দ্বিগুণ অর্থাৎ এক-পঞ্চমাংশ ভূমি-রাজস্ব নির্ধারিত হইলে, হিন্দু আমলের তথাকথিত এক-ষষ্ঠাংশ ভূমি-রাজস্বের অপেক্ষা খুব বেশী হারের রাজস্ব নিরূপিত হয় নাই বলিলেই চলে ; বিশেষ করিয়া যখন মুসলিম বিজয়ীরা আর কোন অধিক বিরক্তিজনক উপকর তাহাদের উপর ধার্য করেন নাই।[৩]

দিল্লী সালতানাতের প্রারম্ভিক যুগে দেশের স্বাভাবিক অবস্থায় রাষ্ট্রের ভূমি-রাজস্বের দাবি এক-পঞ্চমাংশ ছিল।[৪] সমসাময়িক কালের রচিত গ্রন্থ 'তারিখ-ই-ফখরউদ্দীন মুবারকশাহ' ও অন্যান্য গ্রন্থে ইহার সুস্পষ্ট উল্লেখ আছে। 'তারিখ-ই-ফখরউদ্দীন মুবারকশাহ' অনুযায়ী, কুতুবউদ্দীন আইবেক্ ভূমি রাজস্ব হিসাবে মুসলমানদের উপর এক-দশমাংশ 'ওশর এবং অমুসলমান-দের উপর এক-পঞ্চমাংশ খারাজ ধার্য করেন।[৫]

বারনীর ভ্রমণকাহিনীতে বিশদভাবে লিখিত আছে যে, আলাউদ্দীন খল্‌জী অমুসলমানদের নিকট হইতে জমির উৎপাদিত শস্যের অর্ধেক দাবি করেন।[৬] মোরল্যাণ্ড-এর মতেও, আলাউদ্দীন জরিপের রীতির মাধ্যমে জমির উৎপাদিত

---

১ সি. ভি. বৈদ্য : হিস্টরী অফ মেডিয়ীভ্যাল্ হিন্দু ইণ্ডিয়া, তৃতীয় খণ্ড, পৃ. ১৪০ ; সরকার : দি পলিটিক্যাল ইন্‌স্টিটিউশন্‌স্, পৃঃ ১১৫-১১৬ ; আল্-বেরুনী : কিতাব-উল্-হিন্দ, পৃঃ ২৭৬।

২ অ্যাগ্‌নাইড্‌স্ : মুহাম্মেডান্ থিয়রিজ, পৃঃ পৃঃ ৩৭৩. ৩৭৮ ; আমীর আলী : দি স্যারা-সেন্‌স্, পৃঃ ৪২৭।

৩ কোরায়েশী : এস. অ্যাড্‌মিনিস্ট্রেশন, পৃঃ ১১৩ ; বিস্তারিত আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য— কোরায়েশী : এস. অ্যাড্‌মিনিস্ট্রেশন্, অ্যাপেণ্ডিক্স্ 'এইচ'।

৪ পূর্বোক্ত, পৃঃ ১১৩-১১৪।

৫ পূর্বোক্ত, পৃঃ ১১৩।

৬ বারনী : ফিরোজশাহী পৃঃ ২৮৭।

ফসলের অর্ধেক রাজস্ব অর্থাৎ রাষ্ট্রের অংশ নির্ধারণ করেন এবং রাষ্ট্রের অংশ সামগ্রিক বা আংশিক শস্যের মাধ্যমে সংগ্রহ করেন।[১] বৈদেশিক আক্রমণ হইতে দেশকে রক্ষা করিতে এবং আভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলা দমন করিতে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। বলা বাহুল্য, দেশের আর্থিক অসুবিধার সময়ই তিনি ভূমি-রাজস্ব শতকরা পঞ্চাশভাগ ধার্য করিয়াছিলেন। রাষ্ট্রের করের এই দাবি অস্বাভাবিক ছিল সন্দেহ নাই। এই অপরিমিত রাজস্বের হার অনির্দিষ্ট কালের জন্য বলবৎ থাকিতে পারে না। পরবর্তী সময় কুতুবউদ্দীন মুবারকশাহ উচ্চ হারের খারাজ ও রাজস্বের দাবি উচ্ছেদ করেন।[২]

গিয়াসউদ্দীন তুঘলক রাজস্ব শাসন-ব্যবস্থায় তাৎপর্যপূর্ণ সংস্কার সাধন করেন। রাষ্ট্রের রাজস্বের দাবি, ভূমি-রাজস্ব কত ছিল, ইহা লইয়া তর্কের অবতারণার অবকাশ রহিয়াছে। বারনীর মতে, উক্ত সুলতানের শাসন আমলে ভূমি-রাজস্ব উৎপাদিত শস্যের এক-দশমাংশের অধিক ছিল না বা অন্য কথায় বলা যায় যে, রাষ্ট্রের অংশ উৎপাদিত ফসলের শতকরা দশ ভাগের বেশী বৃদ্ধি করা হয় নাই।[৩] কোন কোন ঐতিহাসিক এই প্রসঙ্গে ভিন্নমত পোষণ করেন। যুক্তির অবতারণা করিয়া তাহারা বলেন যে, সুলতানী আমলে তখন পর্যন্ত স্বাভাবিক অবস্থায়, রাষ্ট্রের রাজস্বের দাবি ছিল উৎপাদিত ফসলের এক-পঞ্চমাংশ এবং ইহা খুব উচ্চহারের ছিল না।[৪] সুতরাং ইহা অবিশ্বাস্য মনে হয় যে, গিয়াসউদ্দীন ভূমি-রাজস্ব এক দশমাংশেরও নিম্নতর হারে ধার্য করায়, রাষ্ট্রের আয় অর্ধেক হ্রাস পায়। আইন বিশারদদের নির্দেশানুযায়ী, দেশের স্বাভাবিক অবস্থায় খারাজ হইতেছে 'ওশরের দ্বিগুণ অর্থাৎ ফসলের এক-পঞ্চমাংশ। সুতরাং ইহাও অস্বাভাবিক মনে হয় যে, সুলতান আইন বিশারদদের নির্দেশের বিরুদ্ধে কোন কাজ করিবেন।

পরবর্তী সুলতান মুহম্মদ-বিন-তুঘলক দোয়াব অঞ্চল ব্যতীত দেশের অন্য কোথায়ও খারাজের স্বাভাবিক হার পরিবর্তন করেন নাই। এই কথা সত্য যে, তিনি দোয়াব অঞ্চলে কর বৃদ্ধি করেন, তবে ইহার বিশেষ কারণ ছিল, যেমন তিনি ঐ অঞ্চলের সমৃদ্ধিশালী জনগণের রাষ্ট্রবিদ্রোহী কার্যকলাপ দমন

---

১ মোরল্যাণ্ড : দি অ্যাগ্রেরিয়্যান্ সিস্টেম, পৃঃ ৩৮।

২ বারনী : ফিরোজশাহী, পৃঃ ৩৮৩।

৩ পূর্বোক্ত, পৃঃ ৪২৯।

৪ কোরায়েশী : এড. অ্যাড্মিনিষ্ট্রেশন্, পৃঃ ১১৫।

করিতে দৃঢ়সংকল্প ছিলেন এবং মোঙ্গল আক্রমণকারীদের সঙ্গে তাহাদের যোগ-সাজস ছিল বলিয়াও তিনি সন্দেহ করিতেন। ইহা ব্যতীত তাঁহার অমিত-ব্যয়ের ফলে তিনি আর্থিক অনটনে ছিলেন এবং ঐ হেতু তিনি নদীমাতৃক উর্বর ও সমৃদ্ধ অঞ্চল দোয়াবে কর বৃদ্ধি করেন। পরিণতি ছিল অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক। তবে তিনি কি পরিমাণ কর বৃদ্ধি করিয়াছিলেন, ইহা নির্ধারণ করা সহজসাধ্য নহে, কারণ ইহাও ছিল একটি বিতর্কমূলক বিষয়। এই বর্ধিত করের পরিমাণ সম্পর্কে বারনী, ফিরিশতা ও হাজী দবির নানা ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ দিয়াছেন।[১] মোরল্যাণ্ড মনে করেন যে অনিয়মিতভাবে রাষ্ট্রের কর বৃদ্ধি পাইয়াছিল; তবে, যাহা হউক, এই কর বৃদ্ধির প্রকৃত হার খুব অতিরিক্ত ও অপরিমিত হওয়া সম্ভব ছিল না।[২] করের হার খুব সম্ভব শতকরা পাঁচ হইতে দশভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছিল। সুলতান কৃষকদিগকে অগ্রিম টাকা দেন এবং তাহাদিগকে কৃষিকার্যে উৎসাহ প্রদান করিয়া স্বীয় ভুল সংশোধন কল্পে সম্ভবতঃ তিনি নিজেই পরবর্তী সময়ে করের হার হ্রাস করেন।[৩] ইহা নিঃসন্দেহে বলা চলে যে, অন্যান্য অঞ্চলে সুলতান উৎপাদিত শস্যের এক-পঞ্চমাংশ রাজস্ব দাবি করেন।[৪]

কোন কোন ঐতিহাসিক বিশ্বাস করেন যে, ফিরোজশাহ তুঘলক এক-দশমাংশ রাজস্ব ধার্য করেন; কিন্তু তাঁহার সময়ের ঘটনাবলী ও নানাবিধ তথ্য নিরপেক্ষ-ভাবে পরীক্ষা করিরা দেখিলে ইহা পরিলক্ষিত হয় যে, এই সুলতানও প্রচলিত পুরাতন রাজস্ব হারই আরোপ করেন। সুলতান রাজস্বের হার নির্ধারণ করিতে সংযম, মিতাচার ও ধৈর্য অবলম্বন করেন—ইহার উর্ধ্বে বারনী সুলতান সম্পর্কে আর কিছু মন্তব্য করেন নাই।[৫] ফুতুহাত-ই-ফিরোজশাহীতে সুলতানের নিজস্ব উক্তি এবং সুলতানের এক-দশমাংশ কর নির্ধারণ প্রসঙ্গে 'সিরাত-ই-ফিরোজ-শাহীতে' বিতর্কমূলক অভিমত লিপিবদ্ধ আছে। তবে 'দস্তুর-উল্-আল্বাব-ফি-'ইলম্-ই-আল্-হিসাবে' স্পষ্টভাবে বলা হইয়াছে যে, সাধারণভাবে জমির উপর উৎপন্ন-শস্যের এক-পঞ্চমাংশ রাজস্ব তখন ধার্য করা হইয়াছিল। ভূমি-রাজস্বের উক্ত হার সুলতানী শাসনের প্রারম্ভিককাল হইতে অন্ততঃপক্ষে ফিরোজশাহের

১ বিশেষ দ্রষ্টব্য—কোরায়েশী: এস. অ্যাড্মিনিস্ট্রেশন্, পৃঃ ১১৬ পাদটীকা।
২ পূর্বোক্ত, পৃঃ ১১৬।
৩ বারনী: ফিরোজশাহী, পৃঃ ৪৮২।
৪ কাসা'ইদ্-ই-বদর-ই-চাচ্, পৃঃ ৭।
৫ বিশেষ আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য—কোরায়েশী: এস. অ্যাড্মিনিস্ট্রেশন, অ্যাপেণ্ডিক্স্ 'ডি,' 'ই'।

রাজত্বকাল পর্যন্ত বলবৎ ছিল ; শুধু একটি ব্যতিক্রম ঘটিয়াছিল যখন আলাউদ্দীন উৎপাদিত ফসলের অর্ধাংশ রাজস্ব বিশেষভাবে দাবি করিয়াছিলেন।[১]

মুসলিম ভারতের একজন অতি উল্লেখযোগ্য সুলতান শেরশাহ সুরীই ছিলেন একমাত্র শাসনকর্তা, যিনি দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করিবার পূর্বে, অপেক্ষাকৃত ছোট প্রশাসনিক একক পরগণার রাজস্ব শাসন-ব্যবস্থা পরিচালনার অভিজ্ঞতা অর্জন করিয়াছিলেন।[২] এই সুলতানের রাজত্বকাল পর্যন্ত ভূমি-রাজস্বের হার পরিবর্তনের আর কোন কথা শোনা যায় না। আব্বাস সারওয়ানী, ইলিয়ট ও ডাওসন্ উল্লেখ করিয়াছেন যে 'কৃষককে এক অংশ ও প্রধান ব্যক্তিকে অর্ধাংশ দেওয়া হইত'।[৩] ইহা দ্বারা ইঙ্গিতে ইহাই প্রকাশ করে যে, রাষ্ট্র উৎপাদিত শস্যের এক-তৃতীয়াংশ রাজস্ব হিসাবে দাবি করিত। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে আবুল ফজলের আইন-ই-আকবরীতে শেরশাহের আমলের রাষ্ট্রের রাজস্বের হার নির্ধারণের ফর্দ সংযোজিত আছে। তবে উহা দ্বারা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় না যে, শেরশাহ এক-তৃতীয়াংশ দাবি করিয়াছিলেন।[৪] বলা হয় যে, অন্য আর কোন কর, উপকর বা শুল্ক ধার্য না করিয়া, শুধু উৎপাদিত শস্যের এক-চতুর্থাংশ রাজস্ব ধার্য করিবার জন্য, শেরশাহ মুলতানের গভর্ণর হায়বত খানকে নির্দেশ দিয়াছিলেন। মুলতানের পূর্ববর্তী অর্থ নৈতিক অবনতির প্রতি সুবিবেচনা করিয়া অত্যন্ত সহানুভূতিশীল দৃষ্টিভঙ্গিতে, তিনি ঐ অঞ্চলের প্রতি সদয় মনোভাব প্রদর্শন করেন।[৫] ঐ অঞ্চলের রাজস্বের হার হ্রাসকরণ সুলতানের অসাধারণ অনুগ্রহের একটি নিদর্শন ব্যতীত আর কিছু নহে। অনেকে যুক্তির অবতারণা করেন যে, তিনি অন্যান্য শুল্ক বা করের হার হ্রাস করিয়াছিলেন—ভূমি-রাজস্বের নহে।[৬]

প্রমাণ পাওয়া যায় যে, মোগল সম্রাট আকবরই প্রথম উৎপাদিত ফসলের এক-তৃতীয়াংশ রাজস্ব দাবি করেন। তাঁহার পূর্বপুরুষ তৈমুর তাঁহার রাজ্যের কিছু অঞ্চলে উৎপন্ন-শস্যের এক-তৃতীয়াংশ রাজস্ব আদায় করিতেন।[৭] সম্রাট

---

১ কোরায়েশী : এস. অ্যাড্মিনিস্ট্রেশন, পৃঃ ১১৭-১১৮।

২ বিস্তারিত আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য—কালিকারঞ্জন কানুন গো : শেরশাহ।

৩ ইলিয়ট অ্যাণ্ড ডাওসন্ : হিস্টরি অফ ইণ্ডিয়া, চতুর্থ খণ্ড, পৃঃ ৪১৩-৪১৪ ; মোরল্যাণ্ড : অ্যাগ্রেরিয়্যান সিস্টেম, পৃঃ ৭৬ ; কোরায়েশী : এস. অ্যাড্মিনিস্ট্রেশন, পৃঃ ১১৮।

৪ আইন, তৃতীয় খণ্ড, একাদশ আইন।

৫ মোরল্যাণ্ড : দি অ্যাগ্রেরিয়ান্ সিস্টেম, পৃঃ ৭৫।

৬ খাজা নি'মাত-উল্লা'হ : তারিখ-ই-খান জাহান-ই-ওয়া মাখ্জান-উল্-আফগানী কর্তৃক ডোরন অনূদিত হিস্টরি অফ দি আফগানস্, পৃঃ ১৩৫।

৭ তুজুকাত-ই-তিমুরী, পৃঃ ৩৬২।

বাবর এক শতের পরিবর্তে একশত তিরিশ দাবি করেন,[১] অর্থাৎ তাঁহার দাবি মোটামুটি উৎপাদিত ফসলের এক-চতুর্থাংশে বর্ধিত হইয়াছিল। সুতরাং নিঃসন্দেহে বলা চলে যে আকবর ভূমি-রাজস্ব এক-তৃতীয়াংশে বর্ধিত করেন। আবুল ফজল আকবরের রাজস্ব বৃদ্ধির যৌক্তিকতা সমর্থনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিয়া উল্লেখ করেন যে, সম্রাট জিজিয়াসহ আরও কর উচ্ছেদ করিয়াছিলেন।[২] ইহাও অসম্ভব নহে যে সময় সময় জিজিয়া খারাজের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া বিবেচিত হইত।[৩]

কখনও কখনও গ্রাম্য প্রধান গ্রামের কৃষকদের পক্ষ হইতে শতকরা একটি নিদিষ্ট পরিমাণ কর রাষ্ট্রকে প্রধান করিয়া, কর সংগ্রহকারীর ভূমিকা পালন করিতেন। এই গ্রাম্য প্রধান ব্যতীতও, অন্যান্য কর সংগ্রহকারীও ছিল; তাহারা বেশ অনেকখানি অঞ্চলের জন্য একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ রাষ্ট্রকে প্রদান করিত।[৪] উক্ত পদ্ধতি কখনও ত্রুটিমুক্ত হইতে পারে না এবং ইহা দ্বারা রাষ্ট্রের আর্থিক ক্ষতি ও কৃষকদের দুর্দশার সম্ভাবনা ছিল। কর সংগ্রহকারীরা অত্যাচার-উৎপীড়নের দ্বারা গরীব কৃষকদের নিকট হইতে রাজস্ব আদায় করিয়া, কখনই রাষ্ট্রকে রীতিমত নির্দিষ্ট হারে কর প্রদান করিত না; ইহাতে স্বাভাবিকভাবেই রাষ্ট্রের রাজস্বের আয়ের প্রচুর ক্ষতি হইত।

মুসলিমদের ভারতে আগমনের পূর্বে, হিন্দু আমলে শতকরা নির্দিষ্ট হারে কর সংগ্রহকারীর প্রথা অজানা ছিল না।[৫] দিল্লী সালতানাতের প্রারম্ভিক যুগে, সুলতানগণের স্থানীয় অবস্থা খুব বেশী জানা ছিল না বলিয়া, উক্ত কর আদায় পদ্ধতি তাঁহারা গ্রহণ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু এই পদ্ধতি রাজ্যের কত অংশ কি মাত্রায় কার্যকরী ছিল, উহা নির্ণয় করা সম্ভব নহে। আলাউদ্দীন খল্‌জী, যিনি ভূমি সমর্পণ, হস্তান্তরকরণ ও স্বত্ব-বিনিয়োগের বিপক্ষে ছিলেন, তিনি অবশ্যই কর সংগ্রহকারী পদ্ধতি প্রচলনের পক্ষপাতী ছিলেন না। তাঁহার রাজত্বকালে এই পদ্ধতির কোন চিহ্ন পরিলক্ষিত হয় না।[৬] কিন্তু তাঁহার উত্তরাধিকারীদের

১ তুজুক-ই-বাবুরী (ওয়াকেয়াত-ই-বাবুরী-বাবুর-নামা) (মিসেস্ এ. এস্. বেভেরিজ্ কর্তৃক অনূদিত মেমোয়ারস্ অফ বাবুর, লণ্ডন ১৯২১), দ্বিতীয়, পৃঃ ৩৪৫।

২ আইন, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ৩০০—৩০১।

৩ দস্‌তুর-উল্-আল্‌বাব, পৃঃ ৬৬-৬৭ ইহা প্রমাণ সাপেক্ষ।

৪ বারনী: ফিরোজশাহী, পৃঃ ৪২৯।

৫ পল্ ম্যাসন্ আওয়ার সেল্, এম. আর. ডোবি: এন্‌শেণ্ট্ ইণ্ডিয়া অ্যাণ্ড্ ইণ্ডিয়ান সিভিলাইজেশন্, পৃঃ ১০৩; এই পুস্তকে বলা হইয়াছে যে গ্রামের করের জন্য গ্রামানীকে দায়ী করা হইত—কোরায়েশী: এস. অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, পৃঃ ১২১ পাদটীকা।

৬ মোরল্যাণ্ড: দি অ্যাগ্‌রেরিয়ান সিস্‌টেম, পৃঃ ৩১।

শাসন আমলে উক্ত পদ্ধতি প্রচলিত ছিল। গিয়াসউদ্দীন তুঘলক ইহার বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করেন, এবং রাজস্ব-সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ সংস্কার সাধন করেন।[১] মুহম্মদ-বিন-তুঘলকের রাজত্বকালে আর্থিক অসুবিধার দরুন, উক্ত পদ্ধতির পুনঃ-প্রকোপ পরিলক্ষিত হয়। তাঁহার সময় এই পদ্ধতি ক্রমশঃ অতি মন্দ অবস্থায় পরিণত হয়। বারনীর মতে, এই কর সংগ্রহকারীদের কীর্তিকলাপ তখন খুবই অসন্তোষজনক প্রমাণিত হয় এবং ফলে রাষ্ট্র রাজস্বের আয় হইতে বঞ্চিত হয়। সুলতানের শাস্তি প্রদানের ভয়ে, তাহারা গত্যন্তর না দেখিয়া অনেক সময় বিদ্রোহী হইয়া উঠে। ইহার ফলে রাষ্ট্রের রাজস্বের ক্ষতি সাধিত হয়; রাষ্ট্র তাহাদের নিকট হইতে যথারীতি রাজস্ব আদায় করিতে অসমর্থ হয়।[২] কিন্তু ফিরোজশাহ্ তুঘলক নির্মম হস্তে এই পদ্ধতি নিরোধ করেন। তৈমুরের আক্রমণের পর, সাইয়েদ ও লোদী আমলে এই পদ্ধতি রাজ্যের সামান্য অংশে পুনর্জীবিত হইয়াছিল বটে, তবে ইহা অস্বাভাবিকভাবে বিস্তার লাভ করিতে পারে নাই; জায়গীরের অধিকারী সম্রান্ত ব্যক্তিদের উপর লোদী নেতৃত্ব নির্ভরশীল ছিল। জায়গীরদারগণ নিজেদের জায়গীর পরিচালনা করিয়া নিজেরা সমস্ত লাভ অর্জন করিবার জন্য স্বাভাবিকভাবে উদগ্রীব ছিলেন।[৩] রাজ্য শাসনে অভূতপূর্ব পারদর্শী শেরশাহ ঐ জাতীয় কর সংগ্রহকারীদিগকে আদৌ সহ্য করিতেন না,[৪] সুতরাং স্বাভাবিকভাবেই এই পদ্ধতির বিলুপ্তি ঘটে।

পরিব্রাজক হিওয়েন সাঙের মতে, মুসলিমদের ভারত অধিকারের পূর্বেই হিন্দু ভারতে, চাকুরীতে সরাসরি নগদে বেতন প্রদানের পরিবর্তে, রাজ্যের মন্ত্রী ও রাজ-কর্মচারীদিগের প্রত্যেককে একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলে ভূমি সমর্পণ, হস্তান্ত-করণের মাধ্যমে, পরোক্ষভাবে বেতন প্রদান করিবার রীতি সাধারণভাবে প্রচলিত ছিল।[৫] এই কথা সত্য যে, আব্বাসীয় খলিফাদের আমলে আরব রাজস্ব ব্যবস্থায় উক্ত ভূমি সমর্পণ পদ্ধতির উন্নতি ঘটে এবং খেলাফতের পতনের যুগে অন্যান্য অঞ্চলেও এই পদ্ধতির উদ্ভব ঘটিয়াছিল।[৬] পরবর্তী-কালে গজনী ও ঘুরী শাসকগণ এই পদ্ধতি বিস্তৃতভাবে কার্যকরী করেন।

১ বারনী: ফিরোজশাহী, পৃঃ ৪২৯।

২ পূর্বোক্ত, পৃঃ ৪৮৭-৪৮৮।

৩ লোদী বংশের ইতিহাস এই ধারণা জন্মায় যে বৃহৎ জায়গীরের মালিক অভিজাত সম্প্রদায়ের সমর্থনে আফগান ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত ছিল।—কোরায়েশী: এস. অ্যাড্‌মিনিস্ট্রেশন, পৃঃ ১১২ পাদটীকা।

৪ মোরল্যাণ্ড: দি অ্যাগ্‌রেরিয়ান সিস্‌টেম, পৃঃ ৪৯।

৫ ঘোষাল: অ্যাগ্‌রেরিয়ান্‌ সিস্‌টেম।

৬ লেভী: সোসিয়লজি অফ ইসলাম; প্রথম খণ্ড, পৃঃ ৩৪৩।

দিল্লী সালতানাত প্রতিষ্ঠিত হইবার পর, নূতন রাজ্যকে উপযুক্ত নিয়ন্ত্রণাধীনে আনিবার জন্য, সর্বাপেক্ষা সহজ পদ্ধতি ছিল অভিজাত সম্প্রদায়ের মধ্যে 'ইক্তা' প্রদান করা অর্থাৎ ভূমি সমর্পণের মাধ্যমে জায়গীর প্রদান করা।[১] সুলতানী আমলে সর্বদাই এই জমি সমর্পণ-হস্তান্তকরণ পদ্ধতি প্রচলিত ছিল ; যদিও কোন কোন সুলতান এই পদ্ধতি বহুলাংশে সীমাবদ্ধ রাখিয়াছিলেন। বিশেষ করিয়া আলাউদ্দীন খল্জী তাঁহার সুস্পষ্ট রাজস্ব সংস্কারের মাধ্যমে ভূমি সমর্পণ পদ্ধতি প্রচলন রদ করেন ; কারণ তাঁহার মতে, 'ইক্তা' প্রদান করিলে ইক্তাদারের কেন্দ্রীয় শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইয়া উঠিবার সম্ভাবনা থাকে। নিঃসন্দেহে বলা চলে যে, 'ইক্তা' প্রথা তাঁহার রাজস্বনীতির অনুকূলে ছিল না। ইক্তা প্রদান পদ্ধতির প্রচলন তাঁহার আমলে সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হইয়াছিল,[২] ইহা মনে হয় না। সাম্রাজ্যের অন্ততঃ কিছু অংশে এই পদ্ধতি বলবৎ ছিল।[৩] তিনি নীতির দিক হইতে ভূমি সমর্পণ পদ্ধতির বিরোধী ছিলেন এবং সম্ভবতঃ তিনি ইহা মনে প্রাণে অপছন্দ করিতেন। শামস্-ই-সিরাজ আফিফ বলেন যে, সুলতান জায়গীর প্রথার নিন্দা করিতেন।[৪] এই পদ্ধতিতে রাজনৈতিক বিপদের সম্ভাবনা নিহিত ছিল, কারণ সম্পত্তি-স্বত্ব নিয়োগীগণ স্থানীয় লোকের যোগসাজসে সরকারের বিরোধী দল[৫] সৃষ্টি করিয়া ক্রমশঃ ক্ষমতাশালী প্রভাবশালী হইয়া, কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইয়া উঠিতে পারিতেন। তিনি তাঁহার বিশাল সেনাবাহিনীকে নগদে বেতন প্রদান করিতেন এবং এমনকি উচ্চপদস্থ সামরিক কর্মকর্তাদিগকেও তিনি বড় আয়তনের জায়গীর প্রদান করিয়াছেন, এইরূপ তথ্য পাওয়া যায় না। তবে ইক্তা প্রথা সম্পূর্ণভাবে লোপ পাইয়াছিল, ইহা বলিলে অবশ্য ভুল হইবে। কিন্তু ইহা স্পষ্ট যে, এই পদ্ধতির প্রচলন সাময়িকভাবে হইলেও স্থগিত ছিল। কুতুবউদ্দীন মুবারক শাহের শাসন আমলে রাজস্ব নীতি ও ব্যবস্থায় কোন নূতনত্বের পরিচয় পাওয়া যায় না। তিনি ইক্তা প্রথা প্রচলনে উদারনীতি অবলম্বন করিয়া মুক্তহস্তে জায়গীর প্রদান করেন।[৬]

---

১ আফিফ : ফিরোজশাহী, পৃঃ ৯৫।
২ ত্রিপাঠি : এম্. অ্যাডমিনিস্ট্রেশন্, পৃ: ২৩৭।
৩ বারনী : ফিরোজশাহী, পৃঃ ৩২৮-৩২৯।
৪ আফিফ : ফিরোজশাহী, পৃঃ ৯৫।
৫ মোরল্যাণ্ড : দি অ্যাগ্রেরিয়ান্ সিস্টেম্, পৃ: ৩৯।
৬ বারনী : ফিরোজশাহী, পৃঃ ৩৮২।

গিয়াসউদ্দীন তুঘলক রাজস্ব-ব্যবস্থা পুনর্গঠন করিলেও ভূমি সমর্পণ পদ্ধতিতে হস্তক্ষেপ করেন নাই। মুহম্মদ-বিন-তুঘলকের রাজত্বকালে কর সংগ্রহকারী প্রথা ও জায়গীর প্রথা সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য রাজস্ব-ব্যবস্থাপনা বলিয়া মনে করা যাইতে পারে।[১] ইহা নিশ্চিতভাবে বলা যাইতে পারে যে, তাঁহার শাসন আমলে সকল উচ্চপদস্থ রাজকর্মকর্তাকে শহর ও গ্রামের জমি সমর্পণ করিয়া, ঐ ভূমি-রাজস্বের দ্বারা তাহাদের ব্যক্তিগত বেতন প্রদান করা হইত।[২]

ফিরোজশাহ তুঘলকের সময় জায়গীর প্রদানের সংখ্যা আরও অনেক গুণ বৃদ্ধি পায়; ক্রমশঃ ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণ শুরু হওয়ার ফলে, ভূমি সমর্পণের প্রকৃতিতে পরিবর্তন ঘটে এবং উক্ত কারণে জায়গীরের আয়তন বড় হইতে থাকে। প্রতাপশালী জায়গীরদারদের নিজ নিজ জায়গীর এক-একটি রাজ্যে পরিণত হওয়ার উপক্রম হয়।[৩] দিল্লী সালতানাতের কেন্দ্রীয় শক্তি ক্রমশঃ দুর্বল হইয়া পড়ে।

তুঘলক শাসনের অবসানের পর, যখন সাইয়েদ সুলতানগণ সাম্রাজ্যে শৃঙ্খলা আনিবার জন্য সচেষ্ট হইলেন, তখন লোদী ও অন্যান্য আফগান সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ ক্ষমতাবান ও প্রভাবশালী হইয়া উঠেন এবং তাঁহারা বিরাট বিরাট অঞ্চলের অধিকারী হন। বলা বাহুল্য, এই লোদী-আফগানদের শাসন আমলে, আফগানরা সমগ্র সাম্রাজ্যকে বৃহৎ বৃহৎ জায়গীরে বিভক্ত করেন।[৪] এই আফগান ভূ-সম্পত্তির অধিকারী জায়গীরদারগণ তাহাদের নিজ নিজ জায়গীরের শাসন-ব্যবস্থা পরিচালনায় এবং তাহাদের অধীনস্থ কৃষক-দিগের তত্ত্বাবধানে প্রায় স্বাধীন হইয়া পড়েন।[৫] এই আমলে জায়গীর প্রথার প্রতি আফগান কর্মকর্তাদের দৃষ্টিভঙ্গির এমন পরিবর্তন ঘটে যে তাহারা তাহাদের জায়গীরের উপর তাহাদের বংশগত অধিকার দাবি করেন,[৬] অর্থাৎ জায়গীরদারগণ তাহাদের জায়গীরকে বংশগত সম্পত্তি[৭] বলিয়া গণ্য করিতেন।

---

১ মোরল্যাণ্ড : দি অ্যাগরেরিয়্যান্ সিস্টেম্।

২ ইলিয়ট অ্যাণ্ড ডাওসন্ : দি হিস্টোরী অফ ইণ্ডিয়া, তৃতীয় খণ্ড, পৃঃ ৫৭৮।

৩ আফিফ : ফিরোজশাহী, পৃঃ ২৯৬।

৪ কোরায়েশী : এস. অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, পৃঃ ১২৩।

৫ মোরল্যাণ্ড : দি অ্যাগ্রেরিয়্যান্ সিস্টেম্, পৃঃ ৬৮; পূর্বে জায়গীরদার নিজ জায়গীরের রাজস্বের উপর অধিকার ছিল, কিন্তু জায়গীর শাসন পরিচালনা করিবার অধিকার ছিল না। —ইম্পীরিয়্যাল্ গ্যাজিটীয়ার অফ ইণ্ডিয়া, দ্বিতীয়, পৃ: ৩৬৫; কোরায়েশী : এস. অ্যাড-মিনিস্ট্রেশন্, পৃঃ ১২৩ পাদটীকা।

৬ ইলিয়ট্ ও ডাওসন : হিস্টরি অফ ইণ্ডিয়া, চতুর্থ খণ্ড, পৃঃ ৩২৭।

৭ কোরায়েশী : এস. অ্যাডমিনিস্ট্রেশন্, পৃঃ ১২৩।

ভূমি-সমর্পণ প্রসঙ্গে জানা প্রয়োজন যে, একটি নির্দিষ্ট প্রদত্ত এলাকায় কি পরিমাণ শস্য উৎপাদিত হইলে কি পরিমাণ রাষ্ট্রের আয়ের সম্ভাবনা আছে, ইহাকেই বিশেষ অর্থে মূল্য-নিধারণ বলা হয়।[১] মাসালিক-উল-আবসার' ভূমি-সমর্পণের উপর প্রচুর আলোকপাত করিয়াছে।[২] সরকারী কর্তৃপক্ষের মতে, কি পরিমাণ ফসল পাওয়া যাইবে, ইহার আন্দাজের উপর ভিত্তি করিয়া অবশ্য ভূমি সমর্পিত হইত; তবে আশা অনুযায়ী ফসল লাভ করাও ভূমি প্রাপ্তকারীর ভাগ্য। সুতরাং ভূমি প্রাপ্তকারীর স্বার্থ বিবেচনা করিয়াই রাষ্ট্র ভূমি সমর্পণ করিত। ইহা নিশ্চিতভাবে জানা যায় যে, ভূমি প্রাপ্তকারী তাহার জমি হইতে আশাতীত প্রচুর ফসল পাইলেও মুহম্মদ-বিন-তুঘলক কিংবা সিকান্দর লোদী জায়গীরদারের নিকট হইতে ফসলের উদ্বৃত্ত অংশ দাবি করিতেন না।[৩] কিন্তু ফিরোজশাহ তুঘলক উদ্বৃত্ত অংশ দাবি করিতেন—তবে কোথায়ও ঘাটতি হইলে, তিনি ভূমি প্রাপ্তকারীকে ক্ষতি পূরণ করিতেন।[৪]

রাজস্ব শাসন-ব্যবস্থার সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য, রাজস্ব-এককে সাম্রাজ্য-বিভক্তি-করণ অপরিহার্য। সুলতানী আমলের প্রথম দিকের ইতিহাসবিদ্‌গণ রাজস্ব আদায়ের উদ্দেশ্যে, রাজস্ব-এককে সাম্রাজ্য-বিভক্তিকরণের বিশেষ উল্লেখ করেন নাই। শেরশাহের সাফল্যজনক শাসনাধীনে সাম্রাজ্য-বিভক্তিকরণ স্পষ্ট পরিলক্ষিত হয়। সাম্রাজ্য বিভক্ত করিবার পর সর্বোর্ধ্বে ছিল 'ইক্‌লিম' অর্থাৎ প্রদেশ। প্রত্যেকটি প্রদেশকে জিলায় বিভক্ত করা হয়—ইহাকে বলা হয় সরকার, শিক, কসবাহ্‌, খিত্তাহ, এমনকি ইক্‌তা।[৫] লাহোরে অবশ্য একটি জিলাকে 'সাওয়াদ'[৬] বলা হইত। প্রত্যেকটি জিলাকে পরগণায় বিভক্ত করা হয়।

---

১ মোরল্যাণ্ড: অ্যাগ্রেরিয়ান্ সিস্টেম্, পৃঃ ৫৬।

২ ইলিয়ট অ্যাণ্ড ডাওসন: হিস্টরি অফ ইণ্ডিয়া, তৃতীয় খণ্ড, পৃঃ ৫৭৭।

৩ আবদুল্লাহ্: তারিখ-ই-দাউদী, ২৬।

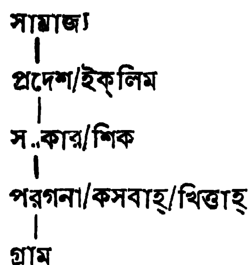
৪ দস্তুর-উল্-আল্বাব, পৃঃ ৩০।

৫ হুসাইনি: এম. অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, পৃঃ ১১৫।

৬ আইন, পৃঃ ৩৭৭।

উড়িষ্যা ও বাংলাদেশে অবশ্য সরকার ও পরগণার মধ্যে যথাক্রমে 'দস্তুর' ও 'জাওয়ার' ছিল।[১] পুনরায় পরগনাকে গ্রামে বিভক্ত করা হয়।

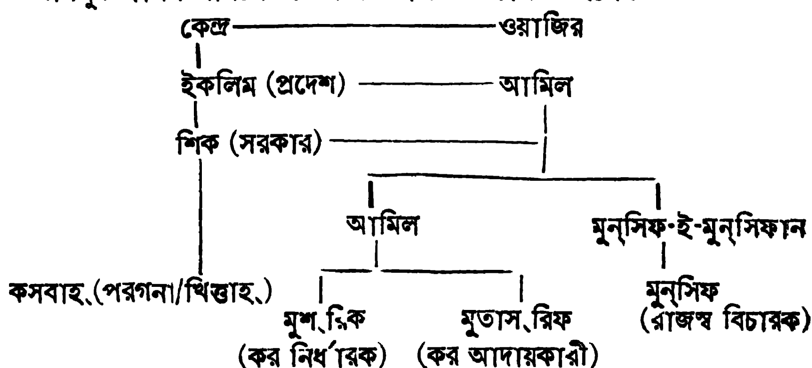
সুলতানী আমলে রাজস্ব-একক:



আব্বাসীয় ও সামানীয় রাজস্ব-ব্যবস্থার অনুকরণে, গজনী ও ঘূর সুলতানগণ রাজস্ব বিভাগ সংগঠন করেন। কেন্দ্রীয় অর্থ ও রাজস্ব দপ্তর ওয়াজিরের অধীনে এবং প্রতি প্রদেশ প্রাদেশিক অর্থমন্ত্রী অর্থাৎ 'সাহিব-ই-দিওয়ান'-এর ব্যবস্থাপনায় ছিল। প্রতি জিলায় ছিলেন আমিল নামক রাজস্ব আদায়কারী, ক্ষুদ্রতম রাজস্ব-একক প্রতি গ্রামে ছিলেন গ্রাম্য প্রধান 'মুকাদ্দাম' অথবা 'রইস'।

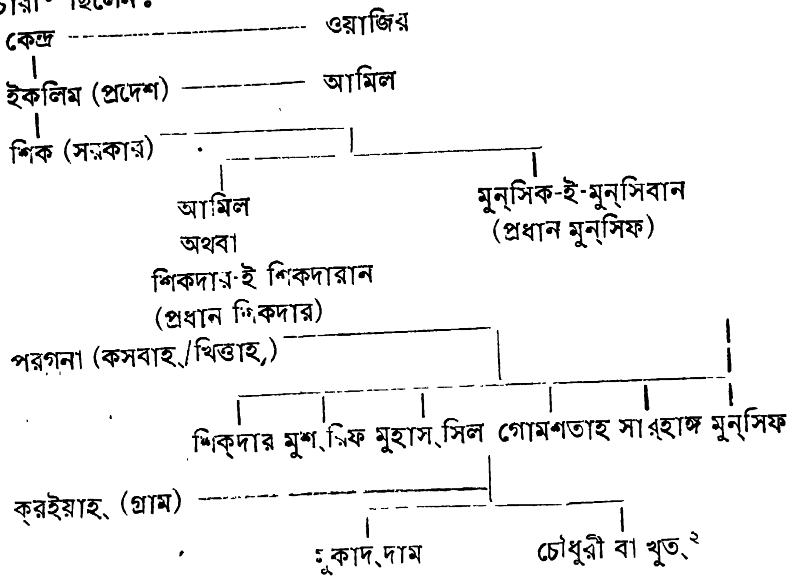
মুসলিম ভারতে মামলুক—তথাকথিত দাস বংশের শাসন আমলে রাজস্ব ব্যবস্থার পূর্ণ বিবরণ পাওয়া যায় না। তবে বারনী কিঞ্চিৎ উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি প্রদেশকে 'ইক্‌লিম' বলেন।[২]

মামলুক শাসন আমলে নিম্নলিখিত রাজস্ব-কর্মচারী[৩] ছিলেন:



১ আইন, পৃ: ৩৭৭।
২ বারনী: ফিরোজশাহী, পৃ: ৫১-৫২।
৩ হুসাইনি: এম্‌. অ্যাডমিনিস্ট্রেশন্‌, পৃ: ১১৭।

বারনী খল্‌জী ও তুঘলক আমলের রাজস্ব-ব্যবস্থা সম্পর্কে সম্যক ধারণা প্রদান করেন। খল্‌জী ও তুঘলক আমলে বিভিন্ন রাজস্ব-এককে নিম্নলিখিত রাজস্ব-কর্মচারী[১] ছিলেন :



শেরশাহের আমলের রাজস্ব-ব্যবস্থা সম্পর্কে আব্বাস সারওয়ানী ও কালিকা-রঞ্জন কানুনগো তাঁহাদের প্রসিদ্ধ গ্রন্থে বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছেন।[৩]

রাজস্ব-সংস্কার শেরশাহের শ্রেষ্ঠ কীর্তির অন্যতম এবং তাঁহার মৌলিক প্রতিভার যথার্থ পরিচায়ক। তিনি রাজস্ব-সংস্কারে মৌলিকত্ব ও উদ্ভাবনী শক্তির পরিচয় দিয়াছেন। নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, যুক্তিসঙ্গত, বিজ্ঞান-সম্মত ও উদারনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত শেরশাহের রাজস্ব-সংস্কারাদি ভারতে শাসন-ব্যবস্থার ইতিহাসে উচ্চ ও গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করিয়া আছে। তিনি সর্বপ্রথম 'কবুলিয়াত' ও 'পাট্টা' প্রথা প্রচলন করেন।[৪] কৃষকগণ তাহাদের অধিকার, দাবি ও দায়িত্ব

---

১ হুসাইনি : এস. অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, পৃঃ ১১৮।

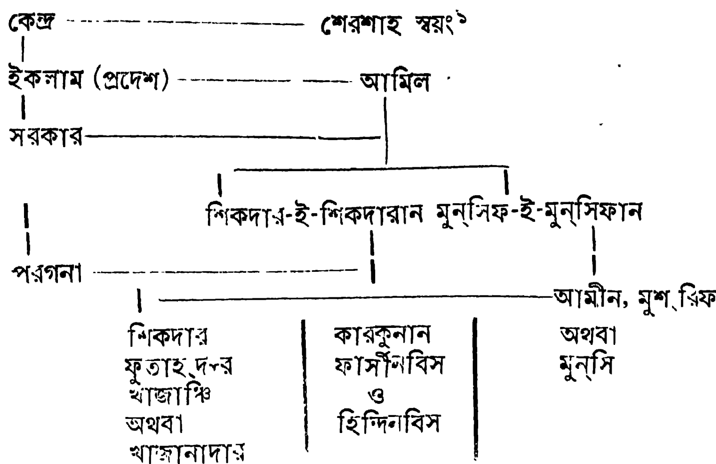
২ চৌধুরী অথবা খুত্‌ ছিলেন গ্রামের রাজস্ব আদায়করণ ব্যবস্থায় মধ্য ব্যক্তি; চৌধুরীরা সচরাচর হিন্দু ছিলেন। —হুসাইনি : এস. অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, পৃঃ ১১৮ পাদটীকা।

৩ শেরশাহের রাজস্ব-ব্যবস্থার বিস্তারিত আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য—সারওয়ানী : তারিখ-ই-শেরশাহী; কানুন গো : শেরশাহ, দ্বাদশ অধ্যায়; আলীম : ভারতে মুসলিম রাজত্বের ইতিহাস, পৃঃ ২০৫-২০৭।

৪ কানুনগো : শেরশাহ, পৃঃ ৩৭৪।

বর্ণনা করিয়া কবুলিয়াত সম্পাদন করিয়া দিত, আর সরকারের পক্ষ হইতে জমির উপর কৃষকের স্বত্ব স্বীকার করিয়া পাট্টা দেওয়া হইত।

শেরশাহের আমলে বিভিন্ন রাজস্ব-এককে নিম্নলিখিত রাজস্ব কর্মচারী ছিলেন:



কোন মুসলিম উইল না করিয়া এবং উত্তরাধিকারীবিহীন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করিলে, তাহার সম্পত্তি রাষ্ট্রের অধিকারভুক্ত হইত; কিন্তু একজন জিম্মি উক্ত অবস্থায় মারা গেলে, তাহার সম্পত্তি তাহার নিজ সম্প্রদায়ের[২] আয়ত্তাধীনে আসিত।

বিভিন্ন সম্প্রদায় ও শ্রেণীর লোক সুলতানকে উপহার ও উপঢৌকন প্রদান করিত; এই উপঢৌকন ছিল রাষ্ট্রের আয়ের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উৎস। কোন লোক সুলতানকে সম্মান প্রদর্শন করিবার জন্য সাক্ষাৎ করিতে আসিলে সুলতানকে উপঢৌকন দিবার রীতি ছিল, যেমন 'ফকিহ' একটি কোর-আন শরীফ, ফকির নামাজ পড়িবার জন্য একটি জায়নামাজ কিংবা মিস্ওয়াক, আমীর অশ্ব, উষ্ট্র বা অস্ত্র[৩] ইত্যাদি সুলতানকে উপঢৌকন দিত।

সুলতানকে মূল্যবান উপহার দিবার এই প্রথা, দিল্লী সুলতানী শাসনের প্রারম্ভিককাল হইতেই প্রচলিত ছিল। হাসান নিজামী বলেন যে, মুকাদ্দাম ও অন্যান্য অভিজাত ব্যক্তিগণ সুলতান কুতুবউদ্দীনকে সম্মান প্রদর্শনের জন্য

---

১ শেরশাহ নিজেই ছিলেন তাঁহার রাজস্ব-মন্ত্রী অর্থাৎ তিনি নিজে রাজস্ব-মন্ত্রীর কাজ করিতেন। —হুসাইনি: এম. অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, পৃ: ১১৮।

২ খুদা বখ্শ; দি রেনেসাঁস অফ ইসলাম, পৃ: ১১২।

৩ ইবনে বতুতা: ট্রাভ্লস্, দ্বিতীয়, পৃ: ৩৪।

মূল্যবান উপঢৌকন প্রদান করিতেন।[১] উচ্চপদস্থ সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ও রাজ-কর্মকর্তগাণ অত্যুৎকৃষ্ট উপঢৌকন যেমন স্বর্ণ-রৌপ্য ও মূল্যবান পাথরে অলঙ্কৃত পত্র সুলতানকে উপহার দিতেন। ইবনে বতুতা বলেন যে, মুহম্মদ-বিন-তুঘলককে তাঁহার প্রধানমন্ত্রী মহামূল্যবান মণি-মুক্তা, পদ্মরাগ-মণি, চুনী-পান্না খচিত ও অলঙ্কৃত পাত্র [২] সসম্ভ্রমে উপহার প্রদান করেন। আফিফ বলেন যে, ফিরোজশাহ্ সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের দেয় টাকা হইতে, উপঢৌকনের মূল্য কাটিয়া রাখিবার জন্য রাজস্ব-মন্ত্রীকে নির্দেশ দিয়াছিলেন।[৩]

সুলতানী আমলে রাজস্ব-ব্যবস্থায় ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয় একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। প্রাক-মুসলিম যুগে হিন্দু-ভারতেও উক্ত বৈশিষ্ট্য রাজস্ব ব্যবস্থায় পরিলক্ষিত হয়। সুলতানগণের অপরিমিত সঞ্চিত ধন ছিল ; উহা শুধু জরুরী অবস্থায়, সংকট পরিস্থিতিতে ব্যবহৃত হইত।[৪] সুলতানদের মধ্যে শুধু শেরশাহ্ দুর্ভিক্ষের সময় ত্রাণ-তহবিল প্রতিষ্ঠা করেন।[৫]

সুলতানী আমলেও রাজস্ব-ব্যবস্থার একটি প্রধান অঙ্গ ছিল আয়-ব্যয়ের আর্থিক আগাম হিসাব। বিভিন্ন উৎস হইতে রাষ্ট্রের বাৎসরিক প্রত্যাশিত আয় ও ব্যয়ের মোটামুটি পরিমাণ কেন্দ্রীয় রাজস্ব দপ্তরের জানা থাকিত। এই তথ্যের উপর নির্ভর করিয়া, কেন্দ্রীয় রাজস্ব মন্ত্রণালয় বাৎসরিক আয়-ব্যয়ের আর্থিক আগাম হিসাব প্রণয়ন করিত। রাষ্ট্রের বিভিন্ন আয়ের উৎস পূর্বে বিস্তারিত আলোচিত হইয়াছে। রাষ্ট্রের প্রধান ব্যয়ের খাত ছিল রাজ-পারিবারিক সংগঠন, প্রশাসন ব্যবস্থা, সামরিক বাহিনী, দাতব্য প্রতিষ্ঠান, সমাজ সেবা, পূর্তকার্য, কৃষি উন্নয়ন, সুলতান প্রদত্ত পুরস্কার, উপহার ইত্যাদি। জাকাত ও 'ওশর হইতে প্রাপ্ত অর্থ দাতব্য প্রতিষ্ঠানের জন্য এবং অন্যান্য কর হইতে প্রাপ্ত অর্থ রাষ্ট্রের অন্যান্য নানাবিধ ব্যয়ের জন্য নির্দিষ্ট ছিল। এই কথা সত্য যে, সুলতানী আমলের আয়-ব্যয়ের আর্থিক আগাম হিসাবের একটি বিস্তারিত নিখুঁত চিত্র অঙ্কন করা সম্ভব নহে।[৬]

---

১ হাসান নিজামী : তাজ-উল্-মা'আছির, ১৪১-১৪২।
২ ইবনে বতুতা : ট্রাভ্‌ল্‌স্, দ্বিতীয়, পৃঃ ১৭।
৩ আফিফ : ফিরোজশাহী, পৃঃ ২৬৯।
৪ নিজাম-উল্-মুলক : সিয়াসত-নামা, পৃঃ ১৭৩।
৫ মুহম্মদ কবির-বিন-শেখ ইসমাইল : আফসানাহ্-ই-শাহান, ১৩৩।
৬ কোরায়েশী : এস. অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, পৃঃ ১৩৩।

সপ্তম অধ্যায়

সামরিক শাসন-ব্যবস্থা

যে-কোন দেশকে আভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলা, বিদ্রোহ ও বৈদেশিক আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবার জন্য এবং দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব অটুট রাখিবার জন্য সুসংগঠিত এবং শক্তিশালী সেনাবাহিনীর প্রয়োজনীয়তা সর্বস্বীকৃত।[১] দিল্লী সালতানাত এমনভাবে অবস্থিত ছিল যে, সুলতানগণ সেনাবাহিনীর সংগঠন ও রক্ষণাবেক্ষণে উদাসীন থাকিতে পারিতেন না, কিংবা সেনাবাহিনীকে অবহেলা করা তাঁহাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না।

ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে ১২২১ খ্রীস্টাব্দে মধ্য-এশিয়ার মোঙ্গল শক্তি নব-প্রতিষ্ঠিত দিল্লী সালতানাত আক্রমণ করিয়াছিল। মুসলিম শাসনের প্রারম্ভিক কালেই দিল্লী সালতানাতকে মোঙ্গল শক্তি-বিস্তারের প্রতিক্রিয়া ও প্রতিঘাত অনুভব করিতে হয় এবং উত্তর-পশ্চিম দিক হইতে অনবরত বৈদেশিক আক্রমণকে[২] প্রতিরোধ ও প্রতিহত করিয়া সালতানাতকে রক্ষা করিতে হয়। সালতানাতের চরম শত্রু ছিল মোঙ্গল শক্তি। সুতরাং সালতানাতের প্রতিরক্ষার জন্য একটি সুপ্রতিষ্ঠিত সৈন্যবাহিনী অপরিহার্য ও অত্যাবশ্যকীয় ছিল। পক্ষান্তরে, দিল্লী সাম্রাজ্যের সীমা বিস্তারের জন্য, মহাপরাক্রমশালী সুলতান আলাউদ্দীন খল্‌জী প্রথমবারের মত বিন্ধ্যাপর্বত অতিক্রম করিয়া, দাক্ষিণাত্য বিজয়ের জন্য এক বিরাট সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করেন এবং অপর একজন উচ্চাভিলাষী সুলতান মুহম্মদ-বিন-তুঘলক খুরাসান ও ইরাক অধিকার করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করেন।[৩] অতএব দেশকে বহিরাক্রমণ হইতে রক্ষা করা এবং দেশের সীমা বিস্তারের জন্য শক্তিশালী সৈন্যবাহিনীর প্রয়োজনীয়তা সুলতানগণ অনুভব করিতেন। বলা বাহুল্য, সুলতান ছিলেন সাধারণতঃ রণচাতুর্যে দক্ষ, সামরিক কৌশলে পটু একজন সামরিক নেতা এবং আইনসম্মতভাবে তিনি ছিলেন

১ নিজামী : তাজ-উল্-মা'আছির, ৯।

২ মিনহাজ : ফিরোজশাহী, পৃঃ ১৭১ ; জালালউদ্দীন খওয়ারজম শাহের অভিযান উল্লেখযোগ্য।—কোরায়েশী : এস. অ্যাড্‌মিনিস্ট্রেশন, পৃঃ ১৩৬ পাদটীকা।

৩ বারনী : ফিরোজশাহী, পৃঃ ৪৭৬।

সেনাবাহিনীর সর্বাধিনায়ক। সামরিক বিষয়ে তাঁহার সহকারী ছিলেন না'ইব-উল্-মুলক। তাঁহাকে মালিক না'ইবও বলা হয়।[১] কেহ কেহ তাঁহাকে 'আমরিয়াত' নামে অভিহিত করেন।[২]

সুলতানী আমলে কেন্দ্রীয় শাসন-ব্যবস্থায় সামরিক মন্ত্রণালয়ের নাম ছিল দিওয়ান-ই-আরজ। এই দপ্তরের প্রধান ছিলেন আরিজ-ই-মুমালিক; তাহার নেতৃত্বে এই বিভাগ পরিচালিত হইত। সামরিক বিষয়াদির সার্বিক প্রশাসন-ব্যবস্থার সুষ্ঠু পরিচালনা এবং সেনাবাহিনীর সংগঠন, রক্ষণাবেক্ষণ ও তত্ত্বাবধানের পূর্ণ দায়িত্বে তিনি নিযুক্ত ছিলেন।[৩] তিনি সামরিক বিষয়ক নানাবিধ কর্তব্য ও দায়িত্ব পালন করিতেন। নূতন সৈন্য সংগ্রহকারী প্রধান হিসাবে তিনি প্রত্যেক নব-নিযুক্ত সৈন্যের বেতন নির্ধারণ করিতেন। প্রত্যেক নব প্রবেশী, পদ প্রার্থী তাহাদের নৈপুণ্য, দক্ষতা ও পরাক্রম আরিজ-ই-মুমালিকের উপস্থিতিতে সফলতার সহিত প্রদর্শন করিতে পারিলে, তাহাদিগকে নিয়মিত বেতন-তালিকাভুক্ত করা হইত।[৪] অন্ততঃপক্ষে বৎসরে একবার তিনি সৈন্য-বাহিনী পরিদর্শন করিতেন এবং প্রত্যেক সৈন্যের অস্ত্রশস্ত্র, সরঞ্জাম ও অশ্বের অবস্থা পরীক্ষা করিয়া দেখিতেন।[৫] সৈন্যবাহিনীতে সৈন্যদের পদোন্নতি ও পদাবনতি আরিজের উপর নির্ভর করিত। তিনি সৈন্যদের নামের ফর্দ রাখিতেন; উপরন্তু বার্ষিক সৈন্যবাহিনী পর্যবেক্ষণ ও পরিদর্শনের পর সৈন্য-দের বেতন পুনঃপরীক্ষা ও সংশোধন করা হইত।[৬] সৈন্যদের ভূমি-সমর্পণের মাধ্যমে কিংবা নগদ টাকার দ্বারা বেতন প্রদানের সুপারিশ করিবার দায়িত্ব তাঁহার দপ্তরের ছিল।[৭] সামরিক অভিযানের সার্বিক প্রস্তুতির দায়িত্ব আরিজের উপর ন্যস্ত ছিল।[৮] যদিও সুলতান নিজে অভিযানের সৈন্যাধ্যক্ষ মনোনীত করিতেন, তথাপি সাধারণতঃ সৈন্য নির্বাচনের দায়িত্ব ছিল আরিজের।[৯] প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধে আরিজ নিজে সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে থাকিতেন; তবে কখনও কখনও

---

১ আল্-কাল্ কাশান্দী: সুবাহ্-উল্-আ'শা, পৃঃ ৬৭-৬৮।
২ উমরি: মাসালিক-উল্-আবসার, পৃঃ ৩০-৩১; কোরায়েশী: এস. অ্যাড্মিনিস্ট্রেশন, পৃঃ ১৩৬ পাদটীকা।
৩ খুসরু: খাজা'ইন-উল্-ফুতুহ, পৃঃ ৫০।
৪ ইবনে বতুতা: রিহ্লাত, দ্বিতীয়, ৯; উৎবী: তারিখ-ই-ইয়ামিনী, পৃঃ ১০৪-১০৫।
৫ আফিফ: ফিরোজশাহী, পৃঃ ২৯৯-৩০০।
৬ বারনী: ফিরোজশাহী, পৃঃ ৬২, ১০১-১০২।
৭ কোরায়েশী: এস. অ্যাড্মিনিস্ট্রেশন, পৃঃ ১৩৭।
৮ বারনী: ফিরোজশাহী, পৃঃ ৬০।
৯ খুসরু: খাজা'ইন-উল্-ফুতুহ, পৃঃ ৫০।

তিনি তাঁহার মনোনীত সহকারী[১]কে সৈন্যবাহিনীর সহিত প্রেরণ করিতেন। সামরিক বাহিনীর সরবরাহ ও যানবাহন তদারক করিবার দায়িত্ব ছিল আরিজের। সৈন্যদের রসদ যোগাইবার দপ্তরও তাঁহার তত্ত্বাবধানেই ছিল। যুদ্ধ বিজয়ের পর, যুদ্ধলব্ধ-সামগ্রী ও লুণ্ঠিত দ্রব্যাদির সংগ্রহ ও একত্রিকরণ আরিজ তদারক করিতেন এবং প্রধান সেনাপতির উপস্থিতিতে যথারীতি লুণ্ঠিত সামগ্রী বণ্টন করিতেন।[২] আদব-উল্-মুলুকে ফখর-ই-মুদাব্বির সুলতানী আমলে সৈন্যবাহিনীর বাৎসরিক পর্যবেক্ষণ ও পরিদর্শন অনুষ্ঠানের একটি বিস্তারিত বর্ণনা দিয়াছেন। বার্ষিক সামরিক প্রদর্শনীতে পদাতিক ও অশ্বারোহী বাহিনীর নিয়মিত পদক্ষেপ ও শৃঙ্খলাবদ্ধ অগ্রগমন, আরিজ কিভাবে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করিতেন উক্ত বিবরণীতে উহার একটি নিখুঁত চিত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে।

সুলতান গিয়াসউদ্দীন বলবনের শাসন আমলে, আরিজ সৈন্যদের সহিত সদয় ব্যবহার করিতেন এবং এমনকি তিনি ব্যক্তিগতভাবে নিজস্ব সম্পদ হইতে সাহায্য পাইবার উপযুক্ত সৈন্যকে আর্থিক সাহায্য প্রদান করিতেন। যদিও তিনি দয়াশীল ব্যক্তি ছিলেন, কিন্তু তিনি সেনাবাহিনীতে বিশৃঙ্খলা, অরাজকতা, কাজে শৈথিল্য প্রদর্শন, অকর্মণ্যতা প্রশ্রয় দিতেন না ; বরঞ্চ তিনি সৈন্যদের নৈপুণ্য ও দক্ষতার উচ্চমানের উপর জোর দিতেন।[৪] কিন্তু সুলতান ফিরোজশাহ তুঘলকের অবিবেচনাপ্রসূত অনুকম্পা ও সহিষ্ণুতা প্রদর্শনের দরুন, সৈন্যবাহিনীর শৃঙ্খলার মান ব্যাহত হইয়াছিল এবং সৈন্যদের কর্মদক্ষতা হ্রাস পাইয়াছিল। সেনাবাহিনীতে শৈথিল্যভাব এত বেশী ছিল যে, এমনকি বাৎসরিক সামরিক কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠানে অসংখ্য সৈন্য অনুপস্থিত থাকিত।[৫]

মোটকথা, আরিজ ছিলেন একজন উচ্চ দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন রাজকর্মকর্তা এবং তিনি তাঁহার নিজ পদকে সমগ্র সাম্রাজ্যের অভিভাবকত্বের দায়িত্বে নিয়োজিত বলিয়া বিবেচনা করিতেন।[৬] এই দায়িত্বপূর্ণ কাজে অসংখ্য সহকারী

---

১ বারনী : ফিরোজশাহী, পৃ: ৩২৬।

২ দিওয়ান-ই-ফাররুখী (আই. ও. পাণ্ডুলিপি ১৮৪১), ২৬।

৩ মুদাব্বির : আদব-উল্-মুলুক, ৮১-৮২ ; কোরায়েশী : এস. আডমিনিস্ট্রেশন, পৃ· ১৩৭।

৪ বারনী : ফিরোজশাহী, পৃ: ১১৫।

৫ আফিফ : ফিরোজশাহী, পৃ: ২৯৯-৩০১।

৬ বারনী : ফিরোজশাহী, পৃ: ১১৬।

তাঁহাকে সাহায্য করিত এবং কেন্দ্রে ও প্রদেশে তাঁহার প্রতিনিধি নিযুক্ত ছিল।[১]

আলাউদ্দীন খল্জীর রাজত্বকালে তাঁহার রাজ কবিগণ দিওয়ান-ই-আরজ হইতে বেতন লাভ করিতেন,[২] এই মর্মে বারনীর মন্তব্যের অর্থ উপলব্ধি করা খুব কষ্টকর। উক্ত অভিমত অনুযায়ী বলা যাইতে পারে যে, সামরিক ও বেসামরিক সকল কর্মচারীর বেতন আরিজের দপ্তর প্রদান করিত। ইহাতে যদি ঐতিহাসিক সত্যতা নিহিত থাকে, তাহা হইলে স্বাভাবিকভাবেই অনুমান করা সম্ভব যে, মোগল আমলের বেসামরিক কর্মচারীদিগকে সামরিক বাহিনীর বেতনের তালিকাভুক্ত করিয়া, 'মনসব' প্রদানের প্রথার গোড়াপত্তন আলাউদ্দীন খল্জীর সময় হইয়াছিল।[৩]

পরিশেষে, ইহা যথার্থভাবে বলা যাইতে পারে যে, দিওয়ান-ই আরজ—সামরিক বিষয়-সংক্রান্ত দপ্তরটি ছিল সৈন্যবাহিনীর জীবনীশক্তির উৎস।[৪]

সুলতানী আমলে আলাউদ্দীন খল্জী সর্বপ্রথম ১৩১৩ খ্রীস্টাব্দে অশ্বকে জলন্ত লৌহ দ্বারা চিহ্নিতকরণ অর্থাৎ 'দাগ' প্রথা প্রবর্তন করেন। এই 'দাগ' প্রথার প্রচলনের দরুন সৈন্যগণ সামরিক প্রদর্শনীতে একই অশ্ব দুইবার প্রদর্শন করিতে কিংবা নির্ধারিত অশ্বের পরিবর্তে দুর্বল অশ্ব উপস্থিত করিতে পারিত না।[৫] এই 'দাগ' প্রথা প্রচলনের সকল কৃতিত্ব আলাউদ্দীন খল্জীর। কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর পর, এই প্রথা প্রচলনের হ্রাস প্রাপ্তির কথা বলা হয়।[৬] কেহ কেহ বলেন যে, মুহম্মদ-বিন-তুঘলকের সময় এই প্রথা প্রচলিত ছিল।[৭] ফিরোজশাহ্ তুঘলক সম্ভবতঃ এই প্রথা পরিত্যাগ করেন। শেরশাহ ১৫৪২ খ্রীস্টাব্দে এই প্রথা পুনঃপ্রবর্তন করেন, কারণ মোগল সাম্রাজ্য পুনরুদ্ধারের ভয় ও বিপদ তাঁহার মনে সদা জাগ্রত ছিল।[৮] কোন কোন ঐতিহাসিক বলেন

---

১ বারনী: ফিরোজশাহী, পৃ: ৩২৬।
২ পূর্বোক্ত, পৃ: ৩৬০।
৩ কোরায়েশী: এস. অ্যাড্মিনিস্ট্রেশন, পৃ: ১৩৮।
৪ পূর্বোক্ত, পৃ: ১৩৮।
৫ বারনী: ফিরোজশাহী, পৃ: ৩৬০।
৬ উইলিয়াম আইরভিন্: দি আর্মি অফ দি ইণ্ডিয়ান মোগলস্, পৃ: ৪৬।
৭ উমরি: মাসালিক-উল্-আবসার, পৃ: ২৭।
৮ সারওয়ানী: শেরশাহী, ৬৮; খাজা নিয়ামতউল্লাহ হিরাতী: তারিখ-ই-খানজাহানী, ১৬৭; কনবু: মদন-ই-আখবর-ই-আহমদী, ১১০; সুজন রায়: খুলাসাত-উত্-তাওয়ারিখ, ২০৫-২০৬।

যে, এই 'দাগ' প্রথা প্রকৃতপক্ষে উম্মাইয়া খলিফাদের আমলে আরব শাসন-ব্যবস্থায় শুরু হয়।[১] অন্যান্য ইতিহাসবিদ্‌দের মতে, এই 'দাগ' প্রথার অঙ্কুর দ্বাদশ খ্রীস্টাব্দে ট্রানসোক্সিয়ানাতে অশ্ব শাবককে জলন্ত লৌহ দ্বারা চিহ্নিত-করণের রীতির মধ্যে নিহিত আছে।[২]

সুলতানী আমলে দিওয়ান ই-আরজ প্রত্যেক সৈন্যের বর্ণনামূলক তালিকা প্রস্তুত করিত; ইহাকে 'হুলিয়া' প্রথা বলা হয়। সৈন্যবাহিনীতে কেহ যোগদান করিলে, তাহার নাম, পিতার নাম, বংশ অথবা বর্ণ জাতি, আদিবাস এবং ব্যক্তিগত চেহারার বিস্তারিত বিবরণ তালিকাভুক্ত করা হইত।[৩] আলাউদ্দীনের শাসন আমলে 'দাগ' প্রথার ন্যায়, 'হুলিয়া' প্রথাও প্রচলিত ছিল। কিন্তু ফিরোজশাহ 'দাগ' প্রথার মত 'হুলিয়া' প্রথার প্রচলন রহিত করেন, কারণ তিনি সৈন্য দিগকে সৈন্যসমাবেশের অনুষ্ঠানে প্রতিকল্প অশ্ব প্রেরণ করিবার অনুমতি প্রদান করেন।[৪] সিকান্দর লোদী 'হুলিয়া' প্রথার পুনঃপ্রবর্তন সমর্থন করেন এবং তখন হইতে এই প্রথা 'চেহ্‌রা' প্রথা নামে অভিহিত হয়।[৫] এই 'চেহ্‌রা' প্রথা দ্বারা সৈন্য ও অশ্ব উভয়েরই বর্ণনামূলক তালিকা যথাক্রমে 'চেহরাহ্‌-ই-তাবিনান' ও 'চেহরাহ্‌-ই-আস্‌পান' রাখা হয়।[৬]

সামরিক কর্মকর্তা ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ যাহারা নির্দিষ্ট সংখ্যক সৈন্য ও অশ্ব নিজেদের তত্ত্বাবধানে রাখিবার জন্য রাজকোষ হইতে বেতন ও ভাতা গ্রহণ করিতেন, তাহারা সরকারকে প্রবঞ্চনা ও প্রতারণা করিয়া সৈন্য-সমাবেশ অনুষ্ঠান দিনে[৭] নির্দিষ্ট সংখ্যক সুশিক্ষিত সৈন্য ও অশ্ব প্রদর্শন করিতেন না; ইহাতে নিয়মিতভাবে রাজকোষের অর্থের অপচয় হইত। প্রবঞ্চনা ও প্রতারণা[৮] নিবারণ করিবার উদ্দেশ্যেই, 'দাগ' ও 'হুলিয়া' উভয় প্রথা প্রবর্তিত হইয়াছিল। সৈন্য সংগ্রহ, তালিকাভুক্তিকরণ ও পরিদর্শন এতবেশী গুরুত্বপূর্ণ ছিল যে,

---

১ জায়দান: তামাদ্দুন-উল্‌-ইসলামী, পৃ: ১৩০।
২ ই. জি. ব্রাউন্‌: আরুজি—'চাহার মুকালাহ্‌'—জার্নাল অফ দি রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটি (জে. আর. এ. এস্‌), ১৮৯৯, পৃ: ৭৭১, ৭৭৬।
৩ আইর্‌ভিন্‌: আর্মি, পৃ: ৪৭-৪৮।
৪ কোরায়েশী: এস. অ্যাড্‌মিনিস্ট্রেশন, পৃ: ১৩৮।
৫ আহল উল্লাহ্‌ মুস্‌তাকি: ওয়াকিয়াত-ই-মুস্‌তাকি, ৩২ ৩৩।
৬ আইরভিন: আর্মি পৃ: ৪৮-৪৯।
৭ সার্ওয়ানী: শেরশাহী, ৬৮।
৮ গোলাম হুসেন সলিম: সিয়ার-উল্‌-মুতাখ্‌খিরিন (র‍্যায়মণ্ড্‌ হাজী মুস্তাফা কর্তৃক অনুদিত), প্রথম, পৃ: ৬০৯, পাদটীকা।

কয়েকজন সুলতান ব্যক্তিগতভাবে নিজেরা এই সমস্ত কর্তব্য পালন করিতেন।[১]

সাম্রাজ্যের বিভিন্ন এলাকার সামরিক প্রয়োজনীয়তা ও যুদ্ধের পক্ষে উপযোগিতার গুরুত্ব বিবেচনা করিয়া, সুলতানী আমলে সৈন্যবাহিনীকে নির্দিষ্ট-স্থানে নিয়োজিত করিবার সামরিক নীতি সুলতানগণ অবলম্বন করেন। তৎকালীন ভারতে যানবাহনের অসুবিধার ফলেই, সৈন্যবাহিনীর বিস্তীর্ণ বিভাজনের প্রয়োজন ছিল। সাম্রাজ্যের কোন অঞ্চলে বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতা সৃষ্টি হইলে কিংবা বিদ্রোহ দেখা দিলে, প্রতিবেশী এলাকা হইতে অতিরিক্ত সৈন্যবাহিনী সাহায্য দানের জন্য সমাবেশ করা হইত। সম্মিলিত সৈন্যবাহিনীর দ্বারাও যদি তাহাদের পক্ষে বিদ্রোহ দমন অসম্ভব হইয়া পড়িত এবং অবস্থার জটিলতা বৃদ্ধি পাইত তাহা হইলে শেষ অবলম্বন রাজধানীতে নিয়োজিত শক্তিশালী সেনাদলকে অতি সত্বর ঐ এলাকায় প্রেরণ করা হইত।

দিল্লীতে অবস্থিত সেনাদল 'হাশম ই-কাল্‌ব' নামে অভিহিত ছিল। রাজকীয় ক্রীতদাস ও জন্‌দার জাতীয় প্রহরী, 'খিসা'ই-খেল্‌' নামক রাজপরিবারের সেনাদল, 'আফওয়াজ-ই কাল্‌ব' নামক সরাসরি রাজকীয় সামরিক অধিনায়কত্বের নিয়ন্ত্রণাধীন সেনাদল দ্বারা রাজধানীর কেন্দ্রীয় 'হাশম-ই কাল্‌ব' সুগঠিত ছিল। প্রদেশের অথবা প্রাদেশিক রাজধানীর সদর দপ্তরের সেনাদল 'হাশম-ই আত্‌রাফ' নামে পরিচিত ছিল।[২] তদানীন্তন মুসলিম ভারতে উত্তর পশ্চিম সীমান্তের সামরিক গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। বৈদেশিক আক্রমণ এই সীমান্ত দিয়া সংগঠিত হইত। সুতরাং এই গুরুত্বপূর্ণ সীমান্ত অঞ্চলে রাজ-পরিবারের যুবরাজ এবং রণ-চাতুর্যে দক্ষ সেনাপতির নেতৃত্বে বাছাইকৃত বিশস্ত, রণপটু ও শক্তিশালী সেনাদল অবস্থান করিত। গিয়াসউদ্দীন বলবন ও আলাউদ্দীন খল্‌জী তাঁহাদের সর্বাধিক সমরদক্ষ ও যোগ্যতাসম্পন্ন পুত্রগণকে উক্ত সীমান্তে প্রেরণ করিতেন।[৩]

সুলতানী আমলে অশ্বারোহী ছিল সামরিক বাহিনীর মেরুদণ্ড। পদাতিক বাহিনীতে অসংখ্য পাইক ছিল। তাহারা অবশ্য বেশীর ভাগই ছিল হিন্দু সম্প্রদায়ভুক্ত, ক্রীতদাস, মজুর ও নিম্ন পর্যায়ের লোক। তবে দিল্লী সালতানাতের ইতিহাসে তাঁহারা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। একবার তাহারা আলাউদ্দীন

---

১ কোরায়েশী : এস. অ্যাডমিনিস্ট্রেশন্‌, পৃঃ ১৩৯ ; সারওয়ানী : শেরশাহী, ৬৯।
২ মিনহাজ : নাসিরী, পৃঃ ৩১৩।
৩ বারনী : ফিরোজশাহী, পৃঃ ১০৮, ২৩৮।

খলজীর জীবন রক্ষা করে।[১] পরবর্তীকালে মালিক কাফুরের বিরুদ্ধে এই পাইকদের ষড়যন্ত্র কুতুবউদ্দীন মুবারক শাহের দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করিতে সক্রিয় সাহায্য করিয়াছিল।[২] অশ্বারোহী ও পদাতিক বাহিনী ব্যতীত সুলতানদের অধীনে গোলন্দাজ হস্তিবাহিনী এবং অত্যধিক শক্তিশালী বাহিনী ছিল। গিয়াস-উদ্দীন বলবন যুদ্ধক্ষেত্রে একটি হস্তীকে পাঁচশত অশ্বারোহী সৈন্যের সমান বিবেচনা করিতেন।[৩] একটি রণহস্তী বেশ কিছু সংখ্যক সশস্ত্র সৈনিককে বহন করিতে এবং শত্রু নিধনে সক্ষম ছিল। একটি সামরিক অভিযানে ফিরোজশাহ তুঘলক সৈন্যদের নদী অতিক্রম করিতে সহায়ক হিসাবে হস্তী ব্যবহার করেন।[৪] জানা যায় যে, মুহম্মদ-বিন-তুঘলকের অধীনে ৩,০০০ (তিন সহস্র) হস্তী ছিল।[৫]

বিশেষ লক্ষণীয় যে দিল্লী সুলতানদের অধীনে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ সামরিক বাহিনী ছিল, অশ্বারোহী বাহিনী, ইহার পর হস্তিবাহিনী, তারপর গোলন্দাজ বাহিনী এবং সর্বশেষে পদাতিক বাহিনী।

সুলতানী আমলে অশ্বারোহী বাহিনী ছিল সর্বাধিক শক্তিশালী এবং সামরিক বাহিনীর শক্তির প্রধান উৎস। দিল্লী এই অশ্বারোহী বাহিনীর-ই দুর্ধর্ষ মোঙ্গল আক্রমণকারীদিগকে সাফল্যের সঙ্গে প্রতিহত করে এবং তাহাদের অন্তরে ভয়ের সঞ্চার করে।[৬] বারবোসা তাহার ভ্রমণ-কাহিনীতে সুলতানী আমলের অশ্বারোহী বাহিনীর ভূয়সী প্রশংসা করেন। তিনি গুজরাটে অশ্বারোহী সৈনিকদের রণ-কৌশল, চাতুর্য ও দক্ষতা দেখিয়া অতীব মুগ্ধ হন। তিনি তাহার ভ্রমণ-বৃত্তান্তে দিল্লীর অশ্বারোহী সৈনিকদের অস্ত্রশস্ত্র ও অশ্বের সাজসরঞ্জামের প্রশংসা করেন এবং বিস্তারিত বিবরণ দেন।[৭] অন্যান্য ভ্রমণকারী লেখক দিল্লী সালতানাতের অশ্বারোহী সৈন্যদের ক্ষিপ্রতা ও রণ-নৈপুণ্যের উল্লেখ করেন।[৮]

সুলতানী আমলে তিন জাতীয় অশ্বারোহী সৈনিক ছিল, যেমন মুরাত্তাব, সাওয়ার ও দো-আস্পাহ্ অর্থাৎ নিজস্ব দুই অশ্বের অধিকারী সৈন্য, নিজস্ব এক

---

১ বারনী : ফিরোজশাহী, পৃঃ ২৭৩।
২ পূর্বোক্ত, পৃঃ ৩৭৬-৩৭৭।
৩ বইহাকী : তারিখ-ই-বইহাকী, পৃঃ ৩৪৯।
৪ আফিফ : ফিরোজশাহী, পৃঃ ১১১।
৫ ইলিয়ট অ্যাণ্ড্ ডাওসন্ : হিস্টরি অফ ইণ্ডিয়া তৃতীয় খণ্ড, পৃঃ ৫৭৬-৫৭৭।
৬ বারনী : ফিরোজশাহী, পৃঃ ৩২০-৩২৩।
৭ বারবোসা : বুক অফ ডুয়ার্ট বারবোসা (এম. এল. ডেম্স্ কর্তৃক অনূদিত ও সম্পাদিত), প্রথম খণ্ড, পৃঃ ১১৯, ২৩২।
৮ উমরি : মাসালিক্-উল্-আবসার, পৃঃ ২৭।

অশ্বের অধিকারী সৈন্য এবং নিজের কোন অশ্ব নাই এমন সৈন্য।[১] ফিরিশ্‌তা বলেন যে, মুইজউদ্দীন মুহম্মদ ঘুরী বিশ সহস্র দো আস্‌পাহ্‌, সিহ্‌-আস্‌পাহ্‌ অশ্বারোহী সৈন্য লইয়া লাহোর আক্রমণ করেন।[২] আলাউদ্দীনের রাজত্বকালে মুরাত্তাব অশ্বারোহী বাহিনীর উল্লেখ আছে। অশ্বারোহী বাহিনীতে অশ্ব সরবরাহের ঘাটতি না হয়, সেইজন্য ভারতের সঙ্গে তখন আরব দেশ, তুর্কীস্তান ও রাশিয়ার অশ্ব সরবরাহের ব্যবসা ছিল। দিল্লী নগরী ও ইহার সন্নিকটবর্তী অঞ্চলে আলা-উদ্দীনের সত্তর সহস্র (৭০,০০০) অশ্ব ছিল।[৩] ফিরোজশাহ্‌ সেনাবাহিনীর উন্নতির দিকে অবহেলা করিয়া থাকিলেও, তাঁহার আমলে বিরাট পাইক বাহিনী ছিল।[৪]

সুলতানী আমলে সামরিক বাহিনীর একটি ক্ষমতাশালী বিভাগ ছিল হস্তিবাহিনী। হস্তীর আকৃতি ও শক্তি শত্রুর প্রাণে ভয়ের সঞ্চার করে। গজনী ও সাসানিয়া সুলতানগণ যুদ্ধে হস্তীর ব্যবহার করেন। বইহাকী বলেন যে, সুলতান মাসুদের সময়ে এক সহস্র ছয়শত সত্তরটি (১৬৭০) হস্তী ছিল।[৫] সুলতানগণ যুদ্ধক্ষেত্রে হস্তীবাহিনীর প্রয়োজনীয়তা ও মূল্য সঠিক-ভাবে অনুভব করেন। গিয়াসউদ্দীন বলবন যুদ্ধক্ষেত্রে একটি হস্তী পাঁচশত অশ্বারোহী সৈনিকের কর্মদক্ষতার সমান[৬] বিবেচনা করিতেন। একটি বৃহৎ শক্তিশালী রণহস্তী অনেক সশস্ত্র সৈন্য বহন করিতে পারে। যুদ্ধক্ষেত্রে রণহস্তী অশ্বারোহী ও পদাতিক সৈন্যের ঊর্ধে থাকিয়া, শত্রুসেনার ব্যূহ ভেদ করিতে সক্ষম ছিল।[৭] বার্‌বোসা বলেন যে, হস্তীপৃষ্ঠে নিরাপদ স্থলে উপবিষ্ট সৈন্যগণ সহজেই শত্রুসেনার সহিত লড়াই করিতে পারিত এবং হস্তীগুলি এত চমৎকারভাবে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত ছিল যে, উহারা যুদ্ধক্ষেত্রের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া, সরাসরি শত্রুদের অশ্ব ও যোদ্ধাদিগকে আক্রমণ করিতে সক্ষম

---

১ বিস্তারিত আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য—কোরায়েশী : এস. অ্যাড্‌মিনিস্ট্রেশন, অ্যাপেণ্ডিক্স্‌ জে' পৃঃ ২৫০-২৫১।

২ মুহম্মদ কাসিম ফিরিশতা : গুলশান-ই-ইব্রাহিমী (জন্‌ ব্রিগ্‌স্‌ কর্তৃক অনূদিত হিস্টরী অফ দি রাইজ্‌ অফ দি মোহামেডান্‌ পাওয়ার ইন ইণ্ডিয়া) প্রথম খণ্ড, পৃঃ ২৯০; দিল্লী সুলতানী আমলে সিহ্‌-আস্‌পাহর কোন উল্লেখ নাই। ইহা ফিরিশ্‌তার মিথ্যা বর্ণনা ও বাহ্য শোভার অংশবিশেষ।—কোরায়েশী : এস. অ্যাড্‌মিনিস্ট্রেশন, পৃঃ ১৪১ পাদটীকা।

৩ বারনী : ফিরোজশাহী : পৃঃ ২৬২।

৪ আফিফ : ফিরোজশাহী, পৃঃ ৩৩৯-৩৪০।

৫ বইহাকী : তারিখ-ই-বইহাকী, পৃঃ ৩৪৯।

৬ বারনী : ফিরোজশাহী, পৃঃ ৫৩।

৭ ইবনে বতুতা : রিহলাত, দ্বিতীয়, পৃঃ ৩৫।

ছিল।[১] নিকিতিনএর মতে, হস্তিপৃষ্ঠ ছিল সৈন্যদের নিকট একটি দুর্গ স্বরূপ।[২] মুহম্মদ-বিন-তুঘলক ও ফিরোজশাহ তুঘলকের বিরাট হস্তিবাহিনী ছিল এবং তাঁহারা হস্তিবাহিনীাক বিশেষ গুরুত্ব দিতেন। ফিরোজশাহ যখন দ্বিতীয়বারে বঙ্গদেশের বিরুদ্ধে অভিযানে অগ্রসর হন, তখন তাঁহার সঙ্গে ছিল চারিশত সত্তরটি হস্তী।[৩] মুহম্মদশাহ বাহমনীর হস্তিশালায় তিন সহস্র হস্তী ছিল এবং শরকী বংশের সুলতান মাহমুদ এক সহস্র চারিশত হস্তীসহ দিল্লীর বিরুদ্ধে অগ্রসর হইয়াছিলেন।[৪] একমাত্র সুলতানদেরই হস্তীর একচেটিয়া অধিকার ছিল।[৫] শুধু রাজঅনুমতি পাইলে, একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি একটি হস্তী নিজ আয়ত্তে রাখিতে পারিতেন।[৬] হস্তীর নিয়মিত সরবরাহের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা হইত। যদিও তৎকালীন ভারতে হস্তীর সাফল্যজনক প্রজনন ও প্রতিপালনের ব্যবস্থা জানা ছিল, তথাপি রাজধানী দিল্লীতে ইহার অভাব অনুভূত হইত।[৭] হস্তী সরবরাহের প্রধান এলাকা ছিল বাংলাদেশ। এমনকি বাংলাদেশের স্বাধীন শাসকগণ পর্যন্ত দিল্লীতে হস্তী প্রেরণ বন্ধ রাখিতে পারেন নাই।[৮] সিংহল হইতে দক্ষিণ-ভারত ও গুজরাট হস্তী আমদানি করিত; কিন্তু সিংহলী হস্তী কখনও দিল্লীতে প্রেরিত হইত কিনা তাহা জানা নাই। অসংখ্য হস্তীর রক্ষণাবেক্ষণের জন্য দিল্লীতে একটি বিরাট প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন হইয়াছিল এবং 'শাহনাহ্-ই-ফিল' সামরিক শাসন-ব্যবস্থায় একজন গুরুত্বপূর্ণ রাজকর্মচারী ছিলেন। সাধারণতঃ দুইজন শাহনাহ্ হস্তী প্রতিষ্ঠানের পরিচালনার দায়িত্বে নিযুক্ত ছিলেন।[৯]

---

১ বারবোসা: প্রথম খণ্ড, পৃঃ ১১৮।
২ এ. নিকিতিন: ইণ্ডিয়া ইন দি ফিফ্‌টিনথ্‌ সেঞ্চুরি, পৃঃ ১২।
৩ আফিফ: ফিরোজশাহী, পৃঃ ১৪৪।
৪ আবদুল্লাহ: তারিখ-ই-দাউদী, পৃঃ ৭৯।
৫ বারনী: ফিরোজশাহী, পৃঃ ৫৯৪।
৬ কোরায়েশী: এস. অ্যাড্‌মিনিস্ট্রেশন, পৃঃ ১৪৩।
৭ আবদুর রাজ্জাক-বিন-ইশাক আস্-সমরকন্দী: মাত্‌লা-উস্-সা'দাইন (আই. ও পাণ্ডুলিপি ২৭০৪) দ্বিতীয়, ২৪৪।
৮ পুত্র বুঘরা খানকে লাখ্‌টির সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করিয়া উপদেশ ছলে, সুলতান বলবন বলেন যে দিল্লীতে মধ্যে মধ্যে হস্তী প্রেরণ করিবে, যাহাতে দিল্লীর সম্রাটকে বাংলাদেশে অশ্ব প্রেরণ বন্ধ করিতে না হয়।—বারবোসা: বুক্ অফ ডুয়াার্ট' বারবোসা, প্রথম, পৃঃ ১৮১।
৯ বারনী: ফিরোজশাহী, পৃঃ ২৪, ১২৬, ৪২৪।

সুলতানী আমলে পদাতিক বাহিনী একেবারেই নগণ্য ছিল না।[১] পদাতিক বাহিনী সামরিক বাহিনীরই অংশ ছিল। পূর্বে বলা হইয়াছে যে, পদাতিক সৈন্যকে 'পাইক' বলা হয় এবং তাহারা বেশীর ভাগ হিন্দু[২] ও নিম্ন শ্রেণীর লোক ছিল। তাহাদের চাকুরীর প্রয়োজন ছিল, কিন্তু অশ্ব সরবরাহ করিবার সামর্থ্য ছিল না। তাহাদিগকে ব্যক্তিগত রক্ষক, প্রহরী, দ্বাররক্ষক, গুপ্তচর, পাল্কী বাহক এই সমস্ত কাজে ব্যবহার করা হইত। ওরমি মন্তব্য করিয়াছেন যে, তাহাদিগকে খুব বিশ্বাস করা যাইত না।[৩] আইরভিন্ সমালোচনা করিয়া বলিয়াছেন যে, সংক্ষেপে এই পদাতিক বাহিনী ছিল 'অর্ধ সশস্ত্র নিম্ন শ্রেণীর লোকের ভিড় ছাড়া আর কিছুই নহে'।[৪] বারবোসা দাক্ষিণাত্যের পদাতিক সৈন্যের বর্ণনা[৫] করিয়া বলেন যে, পদাতিক সৈন্যেরা তরবারি, ছোরা ও তীর-ধনুক'[৬] ব্যবহার করিত। এই পদাতিক সৈন্যদের অধিকাংশ বাংলাদেশ হইতে আসিত।[৭] কোন কোন লেখক 'পায়াক-বা-আসপ্' নামে অভিহিত এক শ্রেণী সৈন্যের উল্লেখ করেন। 'পায়াক-বা-আসপ্'-এর অর্থ অশ্বসহ পদাতিক সৈন্য।[৮] সুলতানী আমলের প্রারম্ভিক যুগে, কোন কোন সুলতান যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করিবার জন্য পদাতিক সৈন্যকে কখনও কখনও অশ্ব সরবরাহ করিতেন।

সুলতানী আমলে অশ্বারোহী সৈন্য দুইটি তরবারি, একটি ছোরা, লম্বা তীরযুক্ত দুই বা তিনটি তুর্কী ধনুক দ্বারা সজ্জিত থাকিত। শেরশাহ অবশ্য তাঁহার পদাতিক সৈন্যদিগকে অপ্রচলিত বন্দুক বিশেষ (পলিতা দিয়া বারুদে আগুন লাগান হইত) সরবরাহ করেন।[৯]

সুলতানী আমলে গোলন্দাজ বাহিনীর গোলা-বারুদ ব্যবহার অবশ্য লক্ষ্য করা যায়, কিন্তু ইহার ব্যবহার দাক্ষিণাত্য ব্যতীত অন্যত্র তখনও বহুল প্রচলিত

---

১ খুসরু : খাজা'ইন-উল্-ফুতুহ্, পৃঃ ৩১০।
২ বারবোসা : বুক্ অফ ডুয়াট বারবোসা, প্রথম, পৃঃ ১৮১।
৩ ওরমি : হিস্টরিক্যাল ফ্র্যাগ্‌মান্টস্ অফ দি মোগল এম্পায়ার, পৃঃ ৪১৭।
৪ আইরভিন : আর্মি, পৃঃ ১৬২।
৫ কোরায়েশী : এস. অ্যাডমিনিস্ট্রেশন্, পৃঃ ১৪৪।
৬ ধনুক শব্দটি সংস্কৃত শব্দ 'ধনুশ' হইতে উৎপত্তি হইয়াছে ; 'ধনুশ'এর অর্থ ধনুক।—বারনী : ফিরোজশাহী, পৃঃ ৫২।
৭ বারনী : ফিরোজশাহী, পৃঃ ৫৯৩।
৮ মিনহাজ : নাসিরী, পৃঃ ২৫৭।
৯ হুসাইনি : এম. অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, পৃঃ ১৬২।

হয় নাই। কয়লা হইতে চোয়ান দাহ্য তৈলবিশেষ ও গ্রীক আগ্নেয়াস্ত্র-বারুদ[১] ব্যবহার প্রাচীনকাল হইতে প্রচলিত ছিল। সুলতানী আমলে ইহাদের ব্যবহার সম্পূর্ণ অপরিচিত ছিল না। দিল্লী সৈন্যবাহিনী ছোট হাতবোমা, আতশবাজি ও ক্ষেপণাস্ত্র মোঙ্গল দিগ্বিজয়ী নেতা তৈমুরের বিরুদ্ধে ব্যবহার করিয়াছিল।[২] ঐ সময় গোলা বারুদের বিরুদ্ধে সর্বোৎকৃষ্ট প্রতিষেধক হিসাবে সিরকা ব্যবহৃত হইত।[৩] ত্রয়োদশ শতাব্দীতে 'কুশকানজির' শব্দের ব্যবহার দেখা যায়। পঞ্চদশ শতাব্দীতে এই শব্দটি দ্বারা স্থূল আকারের কামান বুঝাইত।[৪] কেহ কেহ বলেন যে, আলাউদ্দীন খলজীর আমলে গোলা বারুদের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। অবশ্য ইহা নিঃসন্দেহে বলা চলে যে, সুলতানী আমলে আগ্নেয়াস্ত্র, কামান, গোলা বারুদের ব্যবহার উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি ঘটে নাই। অনেকের মতে, গুজরাট ও দাক্ষিণাত্য প্রদেশে এই আগ্নেয়াস্ত্রের উন্নতি সাধিত হয়।[৫] লোদী বংশের শেষ সুলতান ইব্রাহীম লোদী মধ্যএশিয়ার বীরযোদ্ধা বাবরের বিরুদ্ধে পানিপথের প্রথম যুদ্ধে আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার করিতে সক্ষম হন নাই, কারণ তাঁহার আদৌ কোন আগ্নেয়াস্ত্র ছিল না।[৬]

শেরশাহ গোলা বারুদের গুরুত্ব সম্যক উপলব্ধি করেন। তিনি তাঁহার আগ্নেয়াস্ত্র বন্দুকের শক্তির দ্বারা মোগল সেনাবাহিনীকে পরাজিত করিয়া, বাংলাদেশের অধিকর্তা হইয়াছিলেন। তিনি ও তাঁহার উত্তরাধিকারিগণ নিজেরাই নিজেদের বন্দুক তৈয়ার করিতেন এবং ঐ সময় বেশ কিছু সংখ্যক বৃহৎ আকারের বন্দুক তৈয়ার হইয়াছিল।[৭]

সুলতানী আমলে দুর্গ ও সামরিক ঘাঁটি অবরোধের জন্য ব্যবহৃত বিভিন্ন ধরনের যুদ্ধ ইঞ্জিনের কথা ঘটনাপঞ্জীতে উল্লেখ করা হইলেও কোথায়ও ইহার বিস্তারিত আলোচনা পাওয়া যায় না। 'মাঘরিবি' পাশ্চাত্য খেলাফত হইতে গৃহীত হয় এবং ইহা কামান[৮] বুঝায়। শত্রুর দুর্গের দেওয়াল পুনঃ

---

১ গ্রীক আগ্নেয়াস্ত্রের ইতিহাস জানিবার জন্য দ্রষ্টব্য—ইনান্ : ডিসাইসিভ মোমেন্টস্ ইন্দি হিস্টরি অফ ইসলাম. পৃঃ ১০৯—১২১ ; সুলতানী আমলে আন্দাজ বাহিনীর বিস্তারিত আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য—দি ইসলামিক কালচার, জুলাই, ১৯৬১।

২ খুসরু : খাজাইন-উল্-ফুতুহ, পৃঃ ৮৫ ; কোরায়েশী : এস. অ্যাড্মিনিস্ট্রেশন, পৃঃ ১৪৪।

৩ জে. এ. এস. বি., ১৮৭৬, পৃঃ ৩০—৩৪।

৪ ইস্লামিক কাল্চার, অক্টোবর ১৯৩৭, পৃঃ ৪৭৫ ; জার্ন্যাল অফ ইণ্ডিয়ান হিস্টরি, ১৯৩৬, পৃঃ ১৮৫,

৫ কোরায়েশী : এস. অ্যাড্মিনিস্ট্রেশন, পৃঃ ১৪৫।

৬ তুজুক-ই-বাবুরী, দ্বিতীয়, পৃঃ ১৮৩-১৮৮।

৭ আকবর-নামা, প্রথম, পৃঃ ১৫১।

৮ ইসলামিক কালচার, অক্টোবর ১৯৩৮, পৃঃ ৪০৫-৪১৮।

সজোরে আঘাত করিয়া ধ্বংস করিবার জন্য, কয়লা হইতে চোয়ান দাহ্য তৈলবিশেষ এবং গ্রীক আগ্নেয়াস্ত্র-বারুদ সমেত প্রস্তর-গোলক নিক্ষেপ করিতে 'মানজনিক' ও 'আর্‌রাদাহ্' ব্যবহৃত হইত।[১] দুর্গ অবরোধের উদ্দেশ্যে সৈন্যদের অগ্রগতির পথ দুর্গের পদস্থল পর্যন্ত শুষ্ক ও সহজ করিবার জন্য, দুর্গের চারিদিকের পরিখা বালু ও মাটির বস্তা একের পর এক স্তূপীকৃত করিয়া ভরিয়া ফেলিবার কৌশল তাহাদের জানা ছিল।[২] বারুদ দ্বারা দুর্গ ভূমিসাৎ করিবার অভিপ্রায়ে, উহার দেওয়ালের নীচে বিস্ফোরক স্থাপন করিবার পদ্ধতিও অজ্ঞাত ছিল না। শেরশাহ কালিঞ্জর দুর্গ অবরোধের সময় বিস্ফোরক ব্যবহার করিয়াছিলেন।[৩] রজ্জু, ফাঁস-দড়ি, মই লাগাইয়া দেওয়ালে আরোহণ করিবার নিয়মও প্রচলিত ছিল।[৪] দুর্গ প্রাচীর ধ্বংসের জন্য 'আন-নাক্কাবুন' ও 'আল্ কাবাশ' ব্যবহৃত হইত।

সামরিক বাহিনীর তৎপরতায় সন্ধানী লোক ('স্কাউট') একটি বিশেষ ভূমিকা পালন করে। ইহাদিগকে বলা হয় 'তালাই'য়াহ্' অথবা 'ইয়াজকি'।[৫] সামরিক অভিযানে পর্যবেক্ষণ করা, গোপনে শত্রুদের সংবাদ সংগ্রহ করা এবং নির্ধারিত অনুসন্ধান অভিযানে লিপ্ত থাকা ছিল তাহাদের কর্তব্য ও দায়িত্বের অন্যতম। শত্রুদের শক্তি-সামর্থ্যের যথার্থ মূল্যায়ন করিয়া তাহাদিগকে সঠিক সংবাদ সরবরাহ করিতে হইত। এই গুরুত্বপূর্ণ কাজ সম্পাদনের জন্য, তাহাদিগকে বিশেষ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হইত। তাহারা ছিল হাল্কা ধরনের সৈনিক বিশেষ। তাহাদিগকে গুপ্তচর ভাবিলে ভুল হইবে। গুপ্তচর সৈনিক ছিল না। তাহারা বিভিন্ন ছদ্মবেশে শত্রুদের মধ্যে মিশিয়া অতি সহজে গোপন সংবাদ সংগ্রহ করিত।[৬]

মুসলিম সৈন্য বাহিনীতে আহত সেনিকদিগের অনুসরণকারী ভ্রাম্যমান হাসপাতাল থাকিবার ব্যবস্থা সকল সময়েই ছিল। দিল্লী সুলতানী আমলেও

---

১ ঘটনাপঞ্জী লেখকগণ 'মানজানিক'কে 'মনগোনেল'ও বলিতেন।—কোরায়েশী : এস. অ্যাড্-মিনিস্ট্রেশন, পৃঃ ৮৪৬ পাদটীকা।

২ খুসরু ' খাজইন-উল-ফুতুহ, পৃ ৫৪,৯৮

৩ আব্দুল্লাহ তারিখ-ই-দাউদী, ৯৮।

৪ বারনী ফিরোজশাহী, পৃ ৩২৯।

৫ 'তালাই'য়াহ' একটি আরবী শব্দ, আর 'ইয়াজ্‌কি' একটি তুর্কী শব্দ। মিনহাস 'তালাই'য়াহ্'-শব্দ ব্যবহার করেন।—নাসিরী, পৃঃ ২৮৮। কিন্তু বারনী 'ইয়াজ্‌কি' শব্দ ব্যবহার করেন।—ফাতাওয়া-ই-জাহান্দারী, ১৮০ ; কোরায়েশী : এস. অ্যাড মিনিস্ট্রেশন, পৃঃ ১৫০, পাদটীকা।

৬ মুদাব্বির : আদব-উল্-মুলুক, ১২৭।

এই ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল।[১] যুদ্ধক্ষেত্রে আহত সৈন্যদের শুশ্রূষাকারী সেবকদলও ছিল। সামরিক বাহিনীর সাজ-সরঞ্জামের মধ্যে সামরিক বাদক দল অন্যতম ছিল।[২] ফিরোজশাহ্ তুঘলকের আমলে হস্তিপৃষ্ঠে বিরাট বিরাট ঢাক যুদ্ধক্ষেত্রে নেওয়া হইত।[৩]

মুসলিম সামরিক বাহিনীতে পতাকা ব্যবহার একটি পুরাতন রীতি।[৪] দিল্লী সুলতানদের সেনাবাহিনীতে বিভিন্ন আকারের, বিভিন্ন ধরনের ও বিভিন্ন রঙের পতাকা ব্যবহৃত হইত। কুতুবউদ্দীন আইবেকের পতাকায় নবচন্দ্র, অগ্নিবর্ষী, পক্ষযুক্ত কল্পিত সর্পবিশেষ ও সিংহের আকৃতি অঙ্কিত ছিল। ফিরোজশাহের পতাকাতেও অগ্নিবর্ষী, পক্ষযুক্ত, কল্পিত সর্পবিশেষ অঙ্কিত ছিল।[৫] এই সুলতানের সময় এত বড় ও ভারী পতাকা তৈয়ার করা হইত যে, উহা হস্তিপৃষ্ঠে বহন করিতে হইত এবং উহা দুই-তিন ক্রোশ দূর হইতে দেখা যাইত।[৬] গিয়াসউদ্দীন তুঘলকের পতাকায় মৎস্য-আকৃতি অঙ্কিত ছিল। সুলতানী ইতিহাসে এই সময়ে প্রথম 'মাহি-মারাতিব'-এর উল্লেখ আছে।[৭] পরবর্তী সময়ে 'মাহি-মারাতিব' আরও বেশী প্রচলিত হয়।[৮] সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদেরও নিজস্ব পতাকা ছিল। মুহম্মদ-বিন-তুঘলকের আমলে, একজন খান সাতটি পতাকা ও একজন আমীর তিনটি পতাকা বহন করিবার অনুমতি লাভ করেন।[৯] অবশ্য আল্-উমরি বলেন যে, খান-আমীরদের নয়টি পতাকা বহন করিবার অনুমতি ছিল।[১০] আফিফও বলেন যে, বাংলাদেশের শামস্-উদ্দীনের সঙ্গে যুদ্ধের সময় ফিরোজশাহ্ তুঘলক ও তাঁহার সেনাপতিদের পাঁচশত পতাকা ছিল।[১১]

রোমান সেনাবাহিনী দশমিক ভিত্তিতে সংগঠিত ছিল। মুসলিম ইতিহাসের প্রারম্ভিক কাল হইতে রোমান পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া মুসলিম সেনাবাহিনী

১ আমীর আলী : দি স্যারাসেন্স্, পৃঃ ৪৩৩ ; খুসরু : তুঘলক-নামা, পৃঃ ১০২।
২ খুসরু : খুজ'ইন-উল্-ফুতাহ, পৃঃ ১০১-১০২।
৩ আফিফ : ফিরোজশাহী, পৃঃ ৩৭০।
৪ উমাইয়ারা লাল রংয়ের পতাকা এবং আব্বাসীয়রা কাল রংয়ের পতাকা ব্যবহার করিত।—মিনহাজ : নাসিরী, পৃঃ ১২৭ ; খুসরু : তুঘলকনামা, পৃঃ ১৩৩।
৫ আফিফ : ফিরোজশাহী, পৃঃ ৩৬৯-৩৭০।
৬ পূর্বোক্ত।
৭ খুসরু : তুঘলকনামা, পৃঃ ১২২।
৮ তারিখ-ই-মুবারকশাহী, পৃঃ ২৩৭।
৯ আল্-কাল্কাশান্দী : সুবাহ্-উল্-'আশা, পৃঃ ৭৭।
১০ উমরি : মাসালিক-উল্-আবসার, পৃঃ ৩৬।
১১ আফিফ : ফিরোজশাহী, পৃঃ ১১৫।

দশমিক ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করা হয়।[১] আবদুল আজিজের মতে, দুর্ধর্ষ মোঙ্গল নেতা চেঙ্গিজ খানের সেনাবাহিনীও দশমিক ভিত্তিতে সংগঠিত ছিল।[২] এই পদ্ধতি গজনী সুলতানদের আমলেও প্রচলিত ছিল এবং তাঁহাদের নিকট হইতে এই পদ্ধতি দিল্লী সুলতানদের সেনাবাহিনীতে প্রবর্তিত হয়।

বুগরা খান তাঁহার পুত্র কাইকুবাদের প্রতি শেষ উপদেশে সামরিক ধাপ ব্যাখ্যা করেন। একজন 'সারখেল্'-এর অধীনে দশজন অশ্বারোহী সৈন্য ছিল; একজন সিপাহ্সালার দশজন 'সারখেল্' পরিচালনা করিতেন; একজন আমীর দশজন সিপাহসালারকে আদেশ করিতেন; একজন মালিকের দশজন আমীরের উপর কর্তৃত্ব ছিল এবং একজন খানের অধীনে দশজন মালিক ছিলেন।[৩] আমীর খুসরু তাঁহার কিরান-উস্ সা'দাইন গ্রন্থে বলেন যে, ছাজ্জু খানের অধীনে কয়েক সহস্র সৈন্য ছিল।[৪] আল্-কাল্কাশান্দীর 'সুবাহ্-উল আশা' দশমিক পদ্ধতির সমর্থন করিয়া উল্লেখ করেন যে, একজন খানের অধীনে দশ সহস্র কিংবা ততোধিক, একজন মালিকের অধীনে এক সহস্র, একজন আমীরের অধীনে একশত এবং একজন সিপাহসালারের অধীনে এক শতের কম অশ্বারোহী সৈন্য থাকিত।[৫] বারনী বারংবার তাঁহার তারিখ-ই-ফিরোজশাহী গ্রন্থে 'আমীরান-ই-পান্জাহ্', 'আমীরান-ই-সাদাহ্' ও 'আমীরান-ই-হাজারাহ্'-এর উল্লেখ করেন।[৬] আমীর খুসরু বলেন যে, কাইকুবাদের রাজত্বকালে, 'পাঁচ সহস্র বিখ্যাত মালিক' একশত সহস্রেরও অধীক সৈন্য পরিচালনা করেন।[৭] ইসলাম শাহ শূর পর্যায়ক্রমে ৫০, ১৫০, ২০০ ও ২৫০ সৈন্যের সেনাপতিদের অধীনে, তাঁহার সামরিক বাহিনী গঠন করেন। উচ্চপদস্থ সামরিক কর্মকর্তাদের প্রত্যেকের অধীনে পাঁচ, দশ অথবা বিশ সহস্র সৈন্য দেওয়া হইত।[৮]

---

১ জায়দান: তামাদ্দুন-ই-ইসলামী, পৃঃ ১৩০।

২ আবদুল আজিজ: দি মন্সব্দারি সিস্টেম্ অ্যাণ্ড্ দি মোগল আর্মি, পৃঃ ১৭৫-১৭৮।

৩ বারনী: ফিরোজশাহ, পৃঃ ১৪৫।

৪ খুসরু: কিরান-উস্-সা'দাইন, পৃঃ ১০১।

৫ আল্-কাল্কাশান্দী: সুবাহ্-উল্-'আশা, পৃঃ ৬৭; ইলিয়ট ও ডাওসন্: হিস্টরি অফ ইণ্ডিয়া, তৃতীয়, পৃঃ ৫৭৬-৫৭৭।

৬ বারনী: ফিরোজশাহী, পৃঃ ৪৯৫।

৭ খুসরু: কিরান-উস্-সা'দাইন, পৃঃ ৩৫০।

৮ আবদুল্লাহ: তারিখ-ই-দাঊদী, ১০৩; কোরায়েশী: এ্যাড্মিনিস্ট্রেশন, পৃঃ ১৪৫।

মুসলিম সামরিক বাহিনীতে সৈন্যদের বেতন বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ধরনের ছিল।[১] মুসলিম ভারতে সুলতানী আমলের প্রারম্ভিক যুগে, মুসলিম সৈন্যদের বেতন ও ভাতা সম্পর্কে খুব স্পষ্ট ও নির্দিষ্টভাবে কিছু জানা যায় না। আলা-উদ্দীন খলজীর সময় সম্পূর্ণভাবে সাজসরঞ্জামে সজ্জিত অশ্বারোহী সৈন্য বাৎসরিক দুইশত চৌত্রিশ (২৩৪) টংকা বেতন পাইত।[২] উক্ত বেতনে অশ্বারোহী সৈন্য রাখিতে সুলতানকে কঠোরভাবে দ্রব্যসামগ্রীর মূল্য নিয়ন্ত্রণ করিতে হইয়াছিল। কিন্তু অমিতব্যয়ী মুহম্মদ-বিন-তুঘলক সৈনিকের খাদ্য, পোশাক ও অশ্বের শুষ্ক খাদ্যসহ, প্রত্যেক অশ্বারোহী সৈন্যকে প্রায় পাঁচ-শত টংকা বেতন প্রদান করেন।[৩] আল্-উমরির রচিত 'মাসালিক-উল-আমসারে' সুলতানী আমলে সামরিক কর্মকর্তাদের বেতনের বিস্তারিত বর্ণনা আছে, যেমন একজন খান এক লক্ষ, একজন মালিক পঞ্চাশ হইতে ষাট সহস্র, একজন আমীর তিরিশ হইতে চল্লিশ সহস্র, একজন সিপাহসালার বিশ সহস্র কিংবা ঐ পরিমাণ, এবং একজন সামান্য সামরিক কর্মচারী এক হইতে দশ সহস্র টংকা বাৎসরিক বেতন পাইত।[৪] সৈনিকগণ রাষ্ট্রের কোষাগার হইতে সরাসরি বেতন পাইত।[৫] সুলতানী আমলের অধিকাংশ সময়ে সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদিগকে ভূমি সমর্পণ করা হইত, কিন্তু সৈনিকগণ সাধারণতঃ নগদে তাহাদের বেতন পাইত।[৬] এই ইক্‌তা প্রথার মাধ্যমে সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ তাহাদের সরকারী নির্দিষ্ট বেতনের অপেক্ষা অনেক বেশী বেতন লাভ করিতেন।[৭] সামরিক কর্মকর্তাদের ব্যক্তিগত নগদ বেতনের পরিবর্তে, তাহাদিগকে জায়গীর দেওয়া হইত এবং ইহাতে তাহাদের অধীনস্থ সৈন্যদের বেতন অন্তর্ভুক্ত ছিল না।[৮] ফিরোজশাহ

---

১ উমাইয়া ও আব্বাসীয় আমলে মুসলিম সৈন্যদের বেতনের বিশেষ আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য—ইবন-উল্-আছির : তারিখ-উল্-কামিল (টনবারগ্ কর্তৃক সম্পাদিত) ষষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ১৮৭।

২ কোরায়েশী : এস. অ্যাড্‌মিনিস্ট্রেশন, পৃঃ ২৫০-২৫১।

৩ পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৫৪।

৪ উমরি : মাসালিক-উল্-আবসার, পৃঃ ২৯ ; আল্-কালকাশান্দীর সুবাহ্-উল্-'আশাতে বলা হইয়াছে যে, একজন খান দুই লক্ষ টংকা এবং একজন সৈন্য এক হইতে দশ সহস্র টংকা বেতন পাইত।—সুবাহ্-উল্-'আশা, পৃঃ ৭১ ; কিন্তু ইহা কম সম্ভাব্য—কোরায়েশী : এস. অ্যাড্‌মিনিস্ট্রেশন, পৃঃ ১৫৪ পাদটীকা।

৫ উমরি : মাসালিক-উল্-আবসার, পৃঃ ২৮।

৬ ইলিয়ট ও ডাওসন্ : হিস্টরি অফ ইণ্ডিয়া, তৃতীয় খণ্ড, পৃঃ ৫৭৯।

৭ পূর্বোক্ত, পৃঃ ৫৭৭।

৮ উমরি : মাসালিক-উল্-আবসার, পৃঃ ২৮।

তুঘলকের আমলে নগদ বেতন প্রদানের পরিবর্তে সৈন্যদিগকে ভূমি সমর্পণ করা হইত, এবং এই জায়গীর প্রদান প্রথা পুনর্জীবিত হইয়া এমন একটি পর্যায়ে উপনীত হয় যে, সুলতান ইহাকে প্রায় বংশগত করিয়া ফেলেন।[১]

সুলতানী আমলে সৈন্যদিগকে বেতন প্রদান ব্যতীতও, অতিরিক্ত প্রলোভনে কাজে উৎসাহিত করিবার জন্য, নানা ধরনের পুরস্কার ও সম্মান-চিহ্ন বিতরণ করা হইত,[২] যেমন :

(১) উপাধি : 'ইখলাস খান', 'রা'দান্দাজ খান' ;
(২) বিশিষ্ট পদের সম্মানের প্রতীক স্বরূপ লম্বা, ঢিলা পোশাক : 'খিল্'আত' ;
(৩) উপহার : অলঙ্কার, মণিবসান তরবারি, ছোরা, পাল্কী, অশ্ব ইত্যাদি ;
(৪) দামামা ;
(৫) পতাকা ও নিদর্শন-চিহ্ন।

সুলতানী আমলে সৈন্য-সংখ্যা সকল সময় এক ছিল না ; কখনও কখনও কমিয়াছে আবার কখনও কখনও বাড়িয়াছে। গজনীর সুলতান মাহমুদ এক লক্ষ বিশ সহস্র অশ্বারোহী সৈন্য[৩] লইয়া ভারত অভিযানে আসিয়াছিলেন। আলাউদ্দীন খল্জীর অধীনে চারশত পঁচাত্তর সহস্র অশ্বারোহী সৈন্য[৪] ছিল এবং কথিত আছে যে, মুহম্মদ-বিন তুঘলকের অশ্বারোহী বাহিনীতে ছিল নয়শত সহস্র সৈন্য।[৫] কাইকুবাদ তাঁহার পিতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ অভিযানে অগ্রসর হইবার জন্য একশত সহস্র অশ্বারোহী সৈন্য[৬] প্রস্তুত করিয়াছিলেন। আফিফ তাঁহার রচিত 'তারিখ- ই-ফিরোজশাহী' গ্রন্থে উল্লেখ করেন যে, ফিরোজশাহের অধীনে তাঁহার ক্রীতদাস ব্যতীতই নব্বই সহস্র সৈন্য[৭] মোতায়েন ছিল। তিনি একশত আশী সহস্র ক্রীতদাস সংগ্রহ করেন ; তন্মধ্যে কয়েক সহস্র ক্রীতদাস বেসামরিক কাজে

১ আফিফ : ফিরোজশাহী, পৃঃ ৯৫-৯৬ ; ফুতুহাত-ই-ফিরোজশাহী, পৃঃ ২১-২২ ; সিরাত-ই-ফিরোজশাহী, পৃঃ ১৫১।
২ হুসাইনি : এম. অ্যাড্মিনিস্ট্রেশন, পৃঃ ১৫৩।
৩ সি. এইচ. আই, তৃতীয় খণ্ড, পৃঃ ১৮।
৪ ফিরিশতা, প্রথম, পৃঃ ২০০।
৫ আল্-কাল্কাশান্দী : সুবাহ-উল্-'আশা, পৃঃ ৬৬।
৬ খুসরু : কিরান-উস্-সা'দাইন, পৃঃ ৩৫, ৪৭।
৭ আফিফ : ফিরোজশাহী, ২৯৮।

নিয়োগ করেন।[১] মধ্য-এশিয়ার বিখ্যাত যোদ্ধা বাবরের পঁচিশ সহস্র অশ্বারোহী সৈন্যের বিরুদ্ধে প্রথম পানিপথের যুদ্ধে, ইব্রাহীম লোদী এক লক্ষ সৈন্য সমাবেশ করেন।[২] শেরশাহের অধীনে শুধু রাজধানীতে ছিল পঁচিশ সহস্র গোলন্দাজ সৈন্য এবং গুরুত্বপূর্ণ দুর্গগুলিতে ছিল আরও কয়েক সহস্র।[৩] প্রায় এক লক্ষ পদাতিক সৈন্য ছাড়াও শেরশাহের স্থায়ী সেনাবাহিনীতে মোট সৈন্য-সংখ্যা ছিল প্রায় তিন লক্ষ অশ্বারোহী।[৪] দিল্লী সুলতানদের নৌ-যান ছিল; ইহাকে 'বহর' বলা হইত এবং ইহা আমীর ই-বহরের অধীনে থাকিত। ইহা পুলিশের কর্তব্য পালন এবং পরিবহণ কাজে ব্যবহৃত হইত।[৫]

মুসলিম শাসকগণ সেনাবাহিনীতে কখনও একটি বিশেষ জাতির প্রাধান্য ও অগ্রগণ্যতা প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টাকে বাধা প্রদান করিতেন, যাহাতে কোন একটি বিশেষ শ্রেণীর উপর তাঁহাদিগকে সার্বিকভাবে নির্ভর করিতে না হয়।[৬] গজনী সুলতানদের অধীনে সামরিক বাহিনীতে হিন্দুরা গুরুত্বপূর্ণ উচ্চপদে নিয়োজিত ছিল।[৭] সালজুকদের বিরুদ্ধে গজনী সুলতানদের পক্ষে হিন্দু সৈন্য লড়াই করিয়াছে।[৮] কুতুবউদ্দীন আইবেক অশ্বারোহী বাহিনীতে হিন্দুদিগকে নিযুক্ত করেন।[৯] গিয়াসউদ্দীন বলবনের অধীনে এত অধিক সংখ্যক হিন্দু অশ্বারোহী সৈন্য ছিল যে, তাঁহার আরিজ জনপ্রিয় 'রাওয়াত আরজ' নামে অভিহিত ছিলেন।[১০] আমীর খুসরু কাইকুবাদের রাজত্বকালেও হিন্দু অশ্বারোহী সৈন্যের উল্লেখ করেন।[১১] যখন মালিক ছাজ্জু জালালউদ্দীন খল্‌জীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হন, তখন অসংখ্য হিন্দু অশ্বারোহী সৈন্য[১২] সুলতানের সাহায্যে অগ্রসর হয়। হিন্দু সৈন্যরা শুধু নাসিরউদ্দীন খুসরুর পক্ষে লড়াই করেন নাই, তাহারা বিরোধী

---

১ আফিফ: ফিরোজশাহী, পৃঃ ২৭০।
২ এন্‌ সাইক্লোপীডিয়া অফ ইসলাম, তৃতীয় খণ্ড, পৃঃ ২২৬।
৩ মুশ্‌তাকী: ওয়াকিয়াত-ই-মুশ্‌তাকী, ৪৯।
৪ পরমাত্মা শরণ: দি প্রভিন্‌শল্‌ গভর্ণমেণ্ট অফ দি মোগলস্‌, পৃঃ ২৫৪।
৫ কোরায়েশী: এস. অ্যাড্‌মিনিস্ট্রেশন, পৃঃ ১৫৬।
৬ কাইকাউস: কাবুস-নামা, পৃঃ ১৭১-১৭২।
৭ বইহাকী: তারিখ-ই-বইহাকী, পৃঃ ৬১৩, ৭৫৬।
৮ পূর্বোক্ত, পৃঃ ৭৫৬।
৯ তারিখ-ই-ফখরউদ্দীন মুবারকশাহী, পৃঃ ৩৩।
১০ সমসাময়িক সাহিত্যে 'রাওয়াত'-এর অর্থ একজন হিন্দু অশ্বারোহী সৈন্য।—খুসরু: খাজা'ইন-উল্‌-ফুতুহ, পৃঃ ৯১, ৯৫; কোরায়েশী: এস. অ্যাড্‌মিনিস্ট্রেশন, পৃঃ ১৫২ পাদটীকা।
১১ খুসরু: কিরান-উস্‌-সা'দায়িন, পৃঃ ৩৬।
১২ বারনী: ফিরোজশাহী, পৃঃ ১৮২।

গিয়াসউদ্দীন তুঘলকের পক্ষেও যুদ্ধ করিয়াছে।[১] তাঁহার সেনাবাহিনীতে গজ, তুর্কী, মোঙ্গল, গ্রীক, রুশ, পারসিক, তাজিক ও হিন্দু সৈন্য ছিল।[২] মুহম্মদ-বিন-তুঘলকের সেনাবাহিনীতে ছিল তুর্কী, খল্‌জী, পারসিক এবং ভারতীয় সৈন্য। এমনকি শেরশাহ, যিনি আফগানদের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন, তিনিও তাঁহার সামরিক বাহিনীতে অন্যান্য জাতির লোককে বর্জন করেন নাই। অনেকে মনে করেন যে তিনি আফগানদের প্রতি বিশেষ সহানুভূতিশীল ছিলেন এবং তাহাদের সম্পর্কে সহৃদয় বিবেচনা প্রদর্শন করিতেন, কারণ তিনি আফগান পুনরুজ্জীবনের নেতা হিসাবে দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন।[৩]

ভারতে আগমনের পূর্বেই রণকৌশল, যুদ্ধ-চাতুর্য, যুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্য বিন্যাসের বিভিন্ন পদ্ধতি এবং শ্রেণীবদ্ধভাবে সৈন্য সমাবেশের প্রথা মুসলিমদের জানা ছিল। যুদ্ধক্ষেত্রে পঞ্চ-পক্ষ সৈন্য বিন্যাস পারসিক ও রোমানদের মধ্যে প্রথম প্রচলিত ছিল। মুসলিমগণ এই পদ্ধতি তাহাদের নিকট হইতে গ্রহণ করে। কেন্দ্র, দুই পক্ষ—বাম ও ডান, অগ্রগামী সৈন্য ও পশ্চাৎরক্ষী সৈন্য—যুদ্ধক্ষেত্রে এই পঞ্চ-পক্ষ সৈন্য-বিন্যাসের রীতি নবীর আমলেও জানা ছিল।[৪] এই সৈন্য-বিন্যাসের সঙ্গে দুইটি 'জিনাহ্' অর্থাৎ পার্শ্বে অবস্থিত সৈন্যদল সংযোজিত হইয়া একটি পূর্ণাঙ্গ সৈন্য-বিন্যাস পদ্ধতি উদ্ভাবিত হয়। সৈন্য-বিন্যাসের এই পূর্ণাঙ্গ পদ্ধতি দিল্লী সুলতানী আমলে প্রচলিত ছিল।[৫] আল্-কাল্‌কাশান্দীর সুবাহ্-উল্-'আশাতে বর্ণিত আছে যে, সুলতান উলামা পরিবেষ্টিত হইয়া সৈন্য সমাবেশের কেন্দ্রে দাঁড়াইতেন। তাঁহার সম্মুখে ও পশ্চাতে তীরন্দাজ বাহিনী থাকিত। তাঁহার দুই পার্শ্বে বাম ও ডানে সৈন্য-পক্ষ থাকিত; সম্মুখভাগে হস্তিবাহিনী—ইহার অগ্রে থাকিত সশস্ত্র ক্রীতদাস বাহিনী।[৬] এই বর্ণনা অসমাপ্ত হইলেও, ফখর-ই-মুদাব্বিরের রচিত আদব-উল্-মুলুক গ্রন্থে উল্লিখিত সৈন্য সমাবেশের রীতির ইঙ্গিতের সহিত মিল আছে। আদব-উল্-মুলুকের মতে, হস্তি-

১ খুস্রু : তুঘলক-নামা, পৃঃ ১২৮, ১৩১।

২ পূর্বোক্ত।

৩ সারওয়ানী : শেরশাহী, ৬৯ ; কোরায়েশী : এস. অ্যাড্‌মিনিস্ট্রেশন, পৃঃ ১৫২।

৪ খুদা বখশ্ : ওরিয়েন্ট. পৃঃ ৯১।

৫ নিজামী : তাজ-উল্-মা'আছির, ৫১ 'জিনাহ্'-এর আক্ষরিক অর্থ ডানা ; ডান ও বাম ডানাকে 'মইমনাহ্' ও 'মইসরাহ্' বলা হয়। সুতরাং জিনাহ প্রকৃতপক্ষে পার্শ্বে অবস্থিত সৈন্যদল বুঝায়।—কোরায়েশী : এস. অ্যাড্‌মিনিস্ট্রেশন, পৃঃ ১৪৯ পাদটীকা।

৬ আল্-কাল্‌কাশান্দী : সুবাহ্-উল্-'আশা, পৃঃ ৭৬।

বাহিনীর সম্মুখে চারি সারি পদাতিক বাহিনী থাকিত।[১] শত্রুর অতর্কিত আক্রমণের সম্মুখে ইহারা পর্বতের মত এক বিরাট বাধা স্বরূপ ছিল। ইহা উল্লেখযোগ্য যে, ইব্রাহীম লোদী ও রাণাসঙ্গের বিরুদ্ধে, বাবর উক্ত সৈন্য-বিন্যাসের পদ্ধতি কার্যকরীভাবে প্রয়োগ করেন।[২] বলাবাহুল্য, সর্বদাই পাশাপাশি ঘন শ্রেণীবদ্ধভাবে সারি সারি সেনাদল সন্নিবেশিত করা হইত।[৩]

দিল্লীর সুলতানগণ সৈন্যবাহিনীর নিয়মিত প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা, শৃঙ্খলা রক্ষা ও নৈতিক চরিত্রের উপর গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন। ইহা অনস্বীকার্য যে, ভারতে সংখ্যা গরিষ্ঠ হিন্দুদের বিরুদ্ধে মুসলিম সেনাবাহিনীর বিজয়ের অন্যতম কারণ ছিল, তাহাদের শৃঙ্খলাবোধ, মনোবল, নিয়মনিষ্ঠা ও সাহস।

---

১ মুদাব্বির : আদব-উল্-মুলুক, ৯৪।

২ এল. এফ. রাশব্রুক উইলিয়ামস্ : অ্যান্ এম্পায়ার বিল্ডার অফ দি সিক্সটিন্থ সেঞ্চুরি, পৃঃ ১২৯-১৩২, ১৪৯-১৫২।

৩ কোরায়েশী : এস. অ্যাড্মিনিস্ট্রেশন্, পৃঃ ১৪৯।

অষ্টম অধ্যায়

বিচার ও পুলিশী শাসন-ব্যবস্থা

ধর্ম-বিষয়ক মন্ত্রণালয় দিওয়ান-ই-রিসালাত সদর-উস্-সুদুরের অধীনে ছিল। তিনি কাজী-ই-মুমালিক অর্থাৎ সাম্রাজ্যের প্রধান বিচারপতিও ছিলেন।[১] বিচার মন্ত্রণালয় দিওয়ান-ই-কাজা সরাসরিভাবে প্রধান কাজীর অধীনে ছিল। দিল্লীর সুলতানগণ ধর্ম-বিষয়ক মন্ত্রণালয়কে বিশেষ গুরুত্ব দিতেন।[২] সদর-উস্-সুদুর ছিলেন একজন অত্যন্ত সম্মানিত রাজকর্মকর্তা; তিনি অতীব মর্যাদা-সম্পন্ন ব্যক্তি এবং প্রবল ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। সাধারণতঃ কাজী-ই-মুমালিক সাম্রাজ্যের প্রধান বিচারপতির কর্তব্য ও দায়িত্ব পালন করিতেন, সদর-উস্-সুদুরের পদেও তিনি নিয়োজিত ছিলেন। এইভাবে একই ব্যক্তি দিওয়ান-ই-রিসালাত ও দিওয়ান-ই-কাজার সভাপতিত্ব করিতেন।[৩] সময় সময় একজন অসাধারণ বাক্‌পটু ধর্ম-প্রচারককে খাতিব-উল্-খুতাবা পদে নিয়োগ করা হইত।[৪] তিনি রাজদরবারে উচ্চস্থানের অধিকারী ছিলেন। তিনি সদর-উস্-সুদুরের অধীনস্থ ছিলেন। দিওয়ান-ই-রিসালাতের প্রধান হিসাবে, তিনি নামাজ পরিচালনা ও সাম্রাজ্যের মস্‌জিদ ইত্যাদি রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ধর্মপ্রচারক ও ইমাম নিযুক্ত করিতেন। দিল্লী সুলতানী আমলের গোড়ার দিকে যখন মুসলিম জনসংখ্যা অপেক্ষাকৃত কম ছিল, তখন সময় সময় কাজা, খিতাবত, ইমামত, হিসবাহ্ ও এমনকি দাদ্‌বেকি বিভাগগুলির দায়িত্বে একই ব্যক্তিকে মনোনীত করা হইত।[৫] ইমাম ও এই জাতীয় ব্যক্তিদিগকে ভূমি-সমর্পণের মাধ্যমে প্রায়ই পারিশ্রমিক দেওয়া হইত।[৬] যেহেতু ধর্ম-সংক্রান্ত ও আইন-সংক্রান্ত বিষয়াদি একই ব্যক্তির হস্তে প্রায়শঃ কেন্দ্রীভূত ছিল এবং

---

১ আল্-কাল্‌কাশান্দী: সুবাহ্-উল্-আশা, পৃ: ৭২।

২ নিজামী: তাজ-উল্-মা'আছির, ১০।

৩ উমরি: মাসালিক্-উল্-আবসার, পৃ: ৩২; কোরায়েশী: এস. অ্যাড্‌মিনিস্ট্রেশন, পৃ: ৮৫।

৪ ইবনে বতুতা: রিহ্‌লাত, দ্বিতীয়, পৃ: ৩৬, ৫৯।

৫ নিজাম-উল্-মুলক: সিয়াসত-নামা, পৃ: ৪১; ইনশা-ই-মাহরু, সপ্তম পত্র; কুল্লিয়াত-ই-হাসান সাজ্জী দেহলভী (মাসুদ আলী মাহভী কর্তৃক সম্পাদিত), পৃ: ৩৯০।

৬ ইনশা-ই-মাহরু, একুশতম চিঠি; ভূমি-সমর্পণ পদ্ধতির বিস্তারিত আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য—কোরায়েশী: এস. অ্যাড্‌মিনিস্ট্রেশন, পৃ: ২৩৮-২৪০।

একজন প্রধানের অধীনে কাজ করা বাঞ্ছনীয় বিবেচনায়, কাজী-ই-মুমালিক ও সদর-উস্-সুদুরের পদে একই ব্যক্তিকে নিযুক্ত করা হইত। ইহা ব্যতীত, একজন কাজীর সরকারী কর্তব্য প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্যের দিক হইতে ধর্মীয় কাজ বলিয়া সর্বদাই বিবেচিত হইত; সুতরাং ইহাই স্বাভাবিক যে, প্রধান কাজী রাষ্ট্রের প্রধান ধর্মীয় মর্যাদাসম্পন্ন উচ্চপদস্থ ব্যক্তিও ছিলেন।[১] প্রাদেশিক কাজী নিজ নিজ এলাকায় সদরের কাজ করিতেন।

সদর-উস্-সুদুরের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ কাজ ছিল সুলতানের নিকট রাষ্ট্রীয় বৃত্তি প্রদানের জন্য উচ্চশিক্ষিত ও বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তিদিগের নাম সুপারিশ করা, যাহাতে তাহারা নির্ধারিত বৃত্তি লাভ করিয়া জ্ঞান-সাধনায় ও বিদ্যা-চর্চায় একনিষ্ঠভাবে মনোযোগী হইতে পারেন।[২] শিক্ষা-দীক্ষার পৃষ্ঠপোষক হিসাবে, জনশিক্ষার প্রসার ও উন্নতিকল্পে তাঁহার প্রভাব প্রকটভাবে পরিলক্ষিত হয়। তিনি যতটা ছিলেন জনমত নিয়ন্ত্রণকারী, তার চেয়েও বেশী ছিলেন শিক্ষার অভিভাবক।

জনশিক্ষার পৃষ্ঠপোষকরূপে বিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয়ের শিক্ষা-দীক্ষার উপর সদর-উস্-সুদুরের কর্তৃত্ব থাকিলেও, কবি ও গায়কদের উপর তাঁহার কোন প্রভাব ছিল না। রাষ্ট্রের পৃষ্ঠপোষকতায় লালিত অসংখ্য সুফি ও ফকির শেখ-উল্-ইসলামের অধীনে ছিলেন।[৩] আল্-কাল্কাশান্দী শেখ-উল্-ইসলামকে 'শেখ-উস্-শুউখ' উপাধিতে অভিহিত করেন। তাহার মতে, এই উপাধি শেখ উস্-ইসলামের পদের কার্যাবলীর সহিত অধিকতর সঙ্গতি-সম্পন্ন মনে হয়।[৪] কোন কোন মুসলিম রাষ্ট্রে শেখ-উল্ ইসলাম ধর্ম-বিষয়ক দপ্তরের সমস্ত কাজের সুষ্ঠু সম্পাদনের জন্য দায়ী ছিলেন; কিন্তু দিল্লী সালতানাতে তিনি এতটা ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন না।[৫] সম্ভবতঃ তাঁহার সুপারিশের ফলে উপযুক্ত সুফি ও ফকিরদিগকে রাষ্ট্র বৃত্তি প্রদান করিত। কয়েকজন শেখ এতটা স্বাধীন-চেতা ছিলেন যে সুলতানকে সমালোচনা করিতে ভয় পাইতেন না; উদাহরণ স্বরূপ, সাধক পুরুষ নিজামউদ্দীনের নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে। কোন কোন আধুনিক লেখক নিজামউদ্দীনের দৃঢ় স্বাধীনতা-স্পৃহার সমালোচনা করেন এবং

১ কোরায়েশী: এস. অ্যাড্মিনিস্ট্রেশন, পৃঃ ১৭৬।
২ বারনী: ফিরোজশাহী, পৃঃ ৫৮০।
৩ হাসান 'আলা সাজ্জি: কাওয়াইদ-উল্-ফুওয়াদ্, পৃঃ ৬৭।
৪ আল্-কাল্কাশান্দী: সুবাহ্-উল্-আশা, পৃঃ ৬৮।
৫ তুজুকাত-ই-তিমুরী, পৃঃ ১৭৬-১৭৮; কোরায়েশী: এস. অ্যাড্মিনিস্ট্রেশন, পৃঃ ১৯০।

অভিযোগ করেন যে, তিনি রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রে সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন।[১] ফিরোজশাহ্ তুঘলকের পানাসক্তির জন্য শেখ কুতুবউদ্দীন প্রকাশ্যে ভৎর্সনা করেন।[২] এই সুলতান শেখ-উল্-ইসলামকে অত্যন্ত সম্মান প্রদর্শন করিতেন। শেখ উল্-ইসলামকে তাঁহার শাসন আমলে রাজদরবারে রীতিমত যোগদান না করিলেও চলিত। যখনই তিনি সুলতানের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইতেন, তাঁহাকে সুলতান বিনয় ও নম্রতার সহিত স্বাগত অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করিতেন।[৩] মুহম্মদ-বিন তুঘলকের সময় শেখ উল্ ইসলাম সদর-উস্ সুদুরের সমান বেতন পাইতেন অর্থাৎ ষাট সহস্র টংকা বৃত্তি লাভ করিতেন।[৪] তবে ইহা সত্য যে, শেখ উল্-ইসলাম সদর-উস্-সুদুরের অধীনে ছিলেন।[৫]

ভারতে মুসলিম বিচার-ব্যবস্থা সম্পর্কে প্রচুর ভুল ধারণা রহিয়াছে। নিরপেক্ষ সমালোচনামূলক বিশ্লেষণের মাধ্যমে ভুল ধারণা মোচন করা অত্যাবশ্যক। বলাবাহুল্য, মুসলিম রাষ্ট্র ধর্ম-জাতি-বর্ণ নির্বিশেষে জনসাধারণের শান্তি ও নিরাপত্তা বিধান করে। বিচার-ব্যবস্থায় আইনের চোখে, শাসনকর্তার চোখে মুসলিম ও অমুসলমান সম্প্রদায়ভুক্ত সকলেই সমান। মুসলিম বিচার-ব্যবস্থার মূলনীতি ছিল নিরপেক্ষতা ও ন্যায়পরায়ণতা। মুসলিম শাসনকর্তা অত্যাচার ও উৎপীড়ন হইতে বিরত থাকিবেন ; এই নির্দেশ ইসলামে নিহিত আছে।[৬]

দিল্লীর সুলতানী আমলের বিচার-ব্যবস্থার ইতিহাসে প্রধান আইন বলবৎকারী ও রাষ্ট্রপ্রধান হিসাবে, সুলতান নিরপেক্ষতা ও ন্যায়পরায়ণতার নীতি গ্রহণ করিয়া বিচার ব্যবস্থার সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য, তিন ধরনের সরকারী কাজ সম্পাদন করিতেন। তিনি ছিলেন ধর্ম-বিশ্বাসীদের রক্ষাকর্তা ও তাঁহার

১ ফিরিশ্তা, প্রথম, পৃ: ২২। তিনি সাধক নিজামউদ্দীনকে শেখ-উল্-ইসলাম বলিয়াছেন। ষড়যন্ত্র ও চক্রান্তের অভিযোগের জন্য বিশেষ দ্রষ্টব্য—সি. এইচ. আই. তৃতীয় খণ্ড, পৃ: ১২৮ ; কোরায়েশী : এস. অ্যাড্মিনিস্ট্রেশন, পৃ: ১৯০ পাদটীকা।

২ ফিরোজশাহ ফকিরগণকে অতীব সম্মান প্রদর্শন করিতেন।—সিরাত-ই-ফিরোজশাহী, পৃ: ১৬০ ; কোরায়েশী : এস. অ্যাড্মিনিস্ট্রেশন, পৃ: ১৯০ পাদটীকা।

৩ আফিফ : ফিরোজশাহী, পৃ: ২৮৬-২৮৭।

৪ ইলিয়ট ও ডাওসন : হিস্টরী অফ ইণ্ডিয়া, তৃতীয় খণ্ড, পৃ: ৫৭৮-৫৭৯।

৫ ইবনে বতুতা : রিহলাত, দ্বিতীয়, পৃ: ৯১।

৬ হজরত মুহম্মদ (দঃ) বলিয়াছেন, অন্যায় ও অবিচারের দরুন-ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির আবেদন (এমনকি আবেদনকারী যদি একজন কাফিরও হয়), আল্লাহ কখনও উহা নাকচ করেন না।—আকবর-নামা, তৃতীয় খণ্ড, পৃ: ২৫৭।

প্রজাবৃন্দের মধ্যে বিবাদ-বিসম্বাদের বিচারক অর্থাৎ মধ্যস্থতার দ্বারা তাহাদের বিবাদ মীমাংসাকারী ; তিনি ছিলেন আমলাতন্ত্র-প্রধান ; তিনি ছিলেন সামরিক বাহিনীর সর্বাধিনায়ক।[১] দিওয়ান-ই-মাজালিম, দিওয়ান-ই-সিয়াসত ও দিওয়ান-ই-কাজার মাধ্যমে তিনি বিচার-কার্য পরিচালনা করিতেন।

সুলতান স্বয়ং কিংবা তাঁহার অধীনস্থ সামরিক নেতা রাজদ্রোহীদের সামরিক আদালতে বিচার করিতেন ; যদিও এই প্রসঙ্গে তাঁহারা অভিজ্ঞ আইন-বিশারদদের সিদ্ধান্ত অর্থাৎ রায় গ্রহণ করা প্রয়োজন মনে করিতেন—ইহাতে অবশ্য কিছু ভুল বুঝার সম্ভাবনা রহিয়াছে। তবে প্রকৃতপক্ষে, সুলতান কিংবা তাঁহার অধীনস্থ কর্মকর্তা রাজদ্রোহীদের বিচারে সামরিক আদালতের মত কাজ করিতেন।[২] এইভাবে যুদ্ধবন্দী, রাজদ্রোহী ও সামরিক অপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের বিচারের জন্য দিওয়ান-ই-সিয়াসতের উদ্ভব হয়।[৩] এই দিওয়ান-ই-সিয়াসতে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য মুফ্‌তি এবং ঘটনার অনুসন্ধানের জন্য মুতাফাহ্‌হিস নামক দুই শ্রেণীর কর্মচারী নিয়োগ করা হইত। ইহা ব্যতীত, প্রশাসনিক কর্মচারী ও কেরানী যথাক্রমে আমীর ও মুসাসারিফ পদে নিযুক্ত ছিল।[৪]

আরব শাসন-ব্যবস্থার প্রাথমিক যুগে, দিওয়ান-ই-মাজালিমের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ লক্ষ্য করা যায়। আব্বাসীয় খলিফাগণ নিজেরা জনগণের অভাব-অভিযোগ শ্রবণ করিতেন এবং তাঁহাদের ওয়াজিরদিগকে মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করিতে নির্দেশ দিতেন।[৫] হিন্দু ভারতে হিন্দু রাজারাও দরবারে জনগণের অভাব-অভিযোগ শ্রবণ করা তাঁহাদের অন্যতম কর্তব্য ও দায়িত্ব বলিয়া বিবেচনা করিতেন।[৬] মিনহাজের রচিত তবাকাত-ই-নাসিরীতে উল্লেখ আছে যে, দিল্লী সুলতানী আমলে আমীর-ই-দাদ দিওয়ান-ই-মাজালিমে সভাপতিত্ব করেন ; সুলতান ব্যক্তিগতভাবে উপস্থিত না থাকিলেই উক্ত নিয়ম কার্যকরী হইত।[৭]

১ কোরায়েশী : এস. অ্যাড্‌মিনিস্ট্রেশন, পৃ: ১৫৭।
২ পূর্বোক্ত, পৃ: ১৫৭ পাদটীকা।
৩ বারনী : ফিরোজশাহী, পৃ: ৪৯৭।
৪ কোরায়েশী : এস. অ্যাড্‌মিনিস্ট্রেশন, পৃ: ১৫৮।
৫ জায়দান : তামাদ্দুন-উল্-ইসলামী, পৃ: ১৮৭-১৮৯।
৬ বি. কে. সরকার : পলিটিক্যাল ইন্সটিটিউশন্‌স্, পৃ: ১৭৬।
৭ মিনহাজ: নাসিরী, পৃ: ২৭৪-২৭৬।

সরকারের নিকট জনগণের অভিযোগ পেশ করিবার একটি নির্দিষ্ট রীতি ছিল, যেমন অনুনয়কারী প্রথমে হাজিবের নিকট অভিযোগ করিয়া প্রতিকার লাভে ব্যর্থ হইলে, সে কাজী-ই-মুমালিকের শরণাপন্ন হইতে পারিত। প্রার্থনাকারীর সর্বশেষ আশ্রয় ছিলেন সুলতান এবং সুলতানের সাক্ষাৎ লাভের সুযোগ পাওয়া খুব কষ্টকর ছিল না।[১] সুলতানের নিকট সরাসরি অভিযোগ পেশ করিতে পারিলে ফলোৎপাদক হইত। ইলতুৎমিশের রাজপ্রাসাদে শিকলসহ ঘণ্টার কথা ইবনে বতুতা উল্লেখ করিয়াছেন।[২] তিনি আরও বলিয়াছেন যে, মুহম্মদ বিন-তুঘলক স্বয়ং প্রতি সোমবার ও বৃহস্পতিবার প্রার্থনাকারীদের অভাব-অভিযোগ শ্রবণ করিতেন।[৩] আল্-কাল্কাশান্দীর সুবাহ্-উল-'আশাতে মাজালিম আদালতের একটি বর্ণনামূলক চিত্র পাওয়া যায়। বর্ণনায় স্পষ্ট পরিলক্ষিত হয় যে, সুলতান তাঁহার দেহরক্ষী ও রাজকর্মচারীদের দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া, স্বর্ণ-খচিত উচ্চ সিংহাসনে উপবিষ্ট হন। কাজী-ই-মুমালিক সুলতানকে আইন-সংক্রান্ত উপদেশ দিবার জন্যে সুলতানের পার্শ্বে আসন গ্রহণ করেন। যখন বিচারালয়ের ঘোষক বিচার শুরু হইবার কথা ঘোষণা করে, তখন অভিযোগকারিগণ সম্মুখে পদক্ষেপ করিয়া সসম্ভ্রমে তাহাদের অভিযোগ পেশ করে।[৪] সিকান্দর লোদীর আমলে মাজালিম আদালতে ওয়াজির সভাপতিত্ব করিতেন এবং বারজন বিদ্বান আইনজ্ঞ ব্যক্তিদের সহযোগিতায় কাজী তাঁহার আইন-সংক্রান্ত উপদেশ দিতেন।[৫] মাজালিম বিচারালয়ে রাজকর্মচারীদের বিরুদ্ধে অভিযোগও শ্রবণ করিয়া যথারীতি বিচার করা হইত।

সিয়াসত ও মাজালিম বিভাগের সহিত দিওয়ান-ই-কাজার যোগাযোগ ছিল; কিন্তু ইহার প্রধান সংস্রব ছিল দেওয়ানী মোকদ্দমা নিষ্পত্তিকরণ। কাজী-ই-মুমালিক ছিলেন দিওয়ান-ই-কাজার প্রধান; তাঁহাকে কাজী-উল্-কুজ্জাতও বলা হইত।[৬] সুলতানী আমলে তিনি প্রায় একরূপ সদর-উস্-সুদুরই ছিলেন এবং তিনি কেন্দ্রীয় সরকারের অতি গুরুত্বপূর্ণ উচ্চপদস্থ রাজকর্মকর্তাদের অন্যতম ছিলেন।

১ দিওয়ান-ই-হাসান সাজ্জী, পৃঃ ৪২।
২ ইবনে বতুতা : রিহলাত, দ্বিতীয়, পৃঃ ২১।
৩ কোরায়েশী : এস. অ্যাড্মিনিস্ট্রেশন্, পৃঃ ১৫৮।
৪ আল্-কাল্কাশান্দী : সুবাহ্-উল্-'আশা, পৃঃ ৭৩।
৫ আবদুল্লাহ্ : তারিখ-ই-দাউদী, ৩৬।
ঘটনাপঞ্জী ও সমসাময়িক সাহিত্যে দিওয়ান-ই-কাজার উল্লেখ আছে।—খুসরু : খাজা'ইন-উল্-ফুতুহ, পৃঃ ৭।

তাঁহার অত্যধিক কাজের চাপ প্রশমিত করিবার জন্য, তিনি একজন না'ইবের সাহায্য লাভ করিতেন। এই না'ইবও একজন উচ্চপদস্থ ব্যক্তি ছিলেন।[১] মুহম্মদ-বিন-তুঘলকের অধীনে প্রধান কাজী বাৎসরিক ষাট সহস্র টংকা বেতন ভোগ করিতেন।[২] বলাবাহুল্য, আইন-সংক্রান্ত বিষয়াদি, বিচার-ব্যবস্থা ও ধর্ম-সক্রান্ত বিষয়াদির প্রশাসন তাঁহার দায়িত্বে ছিল। তিনি নিম্ন আদালত হইতে প্রেরিত পুনর্বিচার প্রার্থনা ও আপীল শ্রবণ করিতেন এবং স্থানীয় কাজী-দেরকে নিয়োগ করিতেন।[৩] রাজধানীর জন্য একজন পৃথক কাজী নিয়োগ করা হইত।[৪] রাজধানীর উক্ত কাজীর পদটিকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হইত। সুলতান নিজে ইবনে বতুতাকে এই পদে নিযুক্ত করেন এবং ইবনে বতুতা বাৎসরিক বার সহস্র টংকা বেতন লাভ করেন।[৫]

কাজীর পদটি ছিল খুবই দায়িত্বপূর্ণ। প্রথমদিকে কাজীর দায়িত্ব ছিল কলহ-বিবাদের মীমাংসা করা; পরবর্তী পর্যায়, তাঁহার বৈধকর্তৃত্বের অধিক্ষেত্র বিশেষভাবে বিস্তার লাভ করিলে তাঁহাকে অন্যান্য দায়িত্বভার গ্রহণ করিতে হয়, যেমন অনাথ, মাতৃপিতৃহীন শিশুদের ও উম্মত্তদের সম্পত্তি তদারক করা, ইচ্ছাপত্র বা উইল দ্বারা অপরকে সমর্পিত সম্পত্তি কার্যকর করা এবং ওয়াক্‌ফ সম্পত্তি তত্ত্বাবধান করা[৬] ইত্যাদি। আইনের মর্যাদা রক্ষা করিতে এবং অপরাধীকে উপযুক্ত শাস্তি প্রদান করিতে কাজীকে সাহায্য ও সহযোগিতা করা স্থানীয় কর্মচারীদের কর্তব্য ছিল।[৭] কাজীগণ সরাসরিভাবে কেন্দ্রীয় সরকার দ্বারা নিয়োজিত হইতেন এবং গভর্নরদের আওতা হইতে সম্পূর্ণরূপে স্বাধীন ছিলেন।[৮] শরিয়াত ও 'আদাহ্' অনুযায়ী, কাজীকে বিচারকার্য সম্পাদন করিতে হইত। গুরুতর অপরাধে দোষী সাব্যস্ত ব্যক্তি, দণ্ডাজ্ঞা-প্রাপ্ত আসামী, পূর্বে বিচারালয়ে মিথ্যা সাক্ষ্যদানকারী কিংবা পক্ষপাতিত্বে সন্দেহভাজন ব্যক্তি ব্যতীত সকল মুসলিমই বিশ্বস্ত সাক্ষী হিসাবে আদালতে

---

১ বারনী : ফিরোজশাহী, পৃঃ ৩৫১।
২ ইলিয়ট ও ডাওসন্ : হিস্টরি অফ ইণ্ডিয়া, তৃতীয় খণ্ড, পৃঃ ৫৭৮।
৩ খুসরু : ই'জাজ-ই-খুসরুভী, দ্বিতীয়, পৃঃ ১৩।
৪ মিনহাজ : নাসিরী, পৃঃ ২২০।
৫ ইবনে বতুতা : রিহ্‌লাত, দ্বিতীয়, পৃঃ ৮১-৮২।
৬ জায়দান : তামাদ্দুন-উল্‌-ইসলামী; পৃঃ ১৮৩-১৮৭।
৭ নিজাম-উল্‌-মুলক : সিয়াসত-নামা, পৃঃ ৩৮।
৮ আমীর আলী : দি স্যার‍্যাসেন্‌স্, পৃঃ ৬২।

গ্রহণযোগ্য ছিল। আরও নূতন সাক্ষ্য-প্রমাণের উপর ভিত্তি করিয়া কিংবা সত্য-নির্ধারণের জন্য বিভিন্ন মতের তুলনা করিয়া, কিংবা এমনকি স্বীয় যুক্তি-তর্কের উপর নির্ভর করিয়া, কাজী নিজের সিদ্ধান্ত ও রায়কে পুনঃপরীক্ষা করিয়া সংশোধন করিতে পারিতেন।[১] বাদী-বিবাদীপক্ষ সালিসীর মাধ্যমে রফা করা অর্থাৎ নিজেরাই আপোষে বিবাদ নিষ্পত্তি করা—মুসলিম বিচার-ব্যবস্থায় গ্রহণযোগ্য ছিল; ইহাতে কোন বাধা ছিল না; অবশ্য আপোষ-নিষ্পত্তিতে যেন আইন ভঙ্গ করা না হয়, সেইদিকে দৃষ্টি রাখিতে হইত।

বিচার-ব্যবস্থার সহিত আমীর-ই-দাদ নামক একজন গুরুত্বপূর্ণ কর্মকর্তা জড়িত ছিলেন। রাজধানীতে একজন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তারূপে তিনি গভীর রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ করিতে পারিতেন।[২] পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, সুলতানের অনুপস্থিতিতে আমীর-ই-দাদ মাজালিম আদালতে সভাপতিত্ব করেন এবং সুলতানের উপস্থিতিতে তিনি ইহার শাসন-সংক্রান্ত কাজের দায়িত্ব পালন করেন।[৩] সাধারণতঃ বিদ্বান, ন্যায়পরায়ণ ও কর্তব্যবোধ-সম্পন্ন ব্যক্তিকে উক্ত পদে নিযুক্ত করা হইত এবং তাঁহাকে উচ্চহারে বেতন দেওয়া হইত, কারণ তাঁহাকে গভর্নর ও সেনাপতিদের বিরুদ্ধে অভিযোগের বিচার করিতে হইত।[৪] মুহম্মদ-বিন-তুঘলক তাঁহার আমীর-ই-দাদকে পঞ্চাশ সহস্র টংকা বেতন প্রদান করিতেন। প্রদেশে ও সেনাবাহিনীতে আমীর ই-দাদের কয়েকজন সহকারী ছিলেন।[৫] কাজীর সভাপতিত্বে আদালতের প্রশাসনিক-ব্যবস্থায়, আমীর-ই-দাদের ভূমিকা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। আদালতের রায় পালনের নিমিত্ত নির্দেশ-পত্র বা হুকুমনামা, কাজীর সিদ্ধান্ত কার্যে পরিণত করা ছিল আমীর-ই-দাদের প্রধান কর্তব্য। কাজীর দণ্ডাদেশ কার্যকরী করা ছিল তাঁহার দায়িত্বের অন্যতম।[৬] মস্‌জিদ, সেতু, সরকারী দালান ইত্যাদি রক্ষণাবেক্ষণ করাও তাঁহার দায়িত্ব ছিল। তিনি কোতোয়াল, পুলিশ ও মুহ্‌তাসিবগণকে নিয়ন্ত্রণ করিতেন।[৭]

---

১ জে. এ. এস. বি, ১৯১০, পৃঃ ৩০৭-৩২৬।
২ দিল্লীর সিংহাসন দাবি করিবার জন্য, ইলতুৎমিশকে আমন্ত্রণ করিবার দলের নেতা ছিলেন আলী ইসমাইল।—সহরিন্দী: তারিখ-ই-মুবারকশাহী, পৃঃ ১৬।
৩ মিনহাজ: নাসিরী, পৃঃ ২৭৪-২৭৬।
৪ ইবনে বতুতা: রিহ্‌লাত, দ্বিতীয়, পৃঃ ৪৮১।
৫ বারনী: ফিরোজশাহী, পৃঃ ৩৫৮, ৩৬১।
৬ ইনশা-ই-মাহরু, উনবিংশতম চিঠি।
৭ মুদাব্বির: আদব-উল্-মুলুক, ৪৫-৪৬।

মুসলিমদের মধ্যে পৈতৃক সম্পত্তি, উত্তরাধিকার, বিবাহ, বিবাহ-বিচ্ছেদ সংক্রান্ত মামলার বিচার মুসলিম-আইন অনুযায়ী এবং হিন্দুদের মধ্যে উক্ত বিষয়াদি সম্পর্কিত মোকদ্দমার বিচার হিন্দু-আইন অনুযায়ী পরিচালিত হইত। ফৌজদারী, সাক্ষ্য প্রদান-সংক্রান্ত ও চুক্তি-সংক্রান্ত মুসলিম-আইন হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের জন্যই প্রযোজ্য ছিল।[১] অমুসলমানদের মধ্যে কলহ-বিবাদের মামলার বিচার সাধারণ আদালতে পরিচালিত হইত; শুধু বিচারের সিদ্ধান্ত দেশাচার আইনভিত্তিক ছিল। মুসলিম ও অমুসলমানদের মধ্যে মোকদ্দমার বিচার নিরপেক্ষতার নীতি অনুসারে পরিচালিত হইত। সার্বিকভাবে গ্রামের বিচার ব্যবস্থা গ্রাম্য প্রধানের উপর ন্যস্ত ছিল। হিন্দু মামলাকারীদের মধ্যে খুব কম সংখ্যক মামলাই আদালতে বিচারের জন্য প্রেরিত হইত, কারণ গ্রাম্য পঞ্চায়েৎ সাধারণতঃ উক্ত মামলা-মোকদ্দমার বিচার করিয়া মীমাংসা করিত। এই গ্রাম্য পঞ্চায়েতের বিচার-প্রথা বৃটিশ আমল পর্যন্ত প্রচলিত ছিল।

ইসলাম ধর্মীয় ও নৈতিক-শিক্ষা পালিত হইতেছে কিনা তাহা যিনি পর্যবেক্ষণ করেন এবং যিনি অপরাধ অনুসন্ধান করিয়া অপরাধীকে শাস্তি প্রদান করেন তিনি হইতেছেন মুহ্তাসিব।[২] মুহ্তাসিবকে সাধারণতঃ বলা হয় যে, তিনি ছিলেন জনসাধারণের সামাজিক ও নৈতিক আচার-ব্যবহারের সমালোচক অর্থাৎ গণ-নৈতিক চরিত্রের নিয়ন্ত্রণকারী।[৩] এই নাম, পদবী ও খেতাবের যথার্থ মর্যাদা রক্ষা করা তাঁহার কর্তব্য ছিল। তিনি প্রকাশ্য আইন ভঙ্গ ও নিয়ম লঙ্ঘনকে বাধা দিতেন। মূলতঃ তিনি ছিলেন নৈতিক উপদেষ্টা। জনসাধারণের নৈতিক চরিত্র রক্ষা করা, সামাজিক অসাধুতা, ব্যবসা-বাণিজ্য সম্বন্ধীয় শঠতা ও বঞ্চনা প্রতিরোধ করা এবং অন্যায়, অসততার বিরুদ্ধে নিরোধ-মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা ছিল তাঁহার অন্যান্য প্রধান কর্তব্যের একটি। তবে জনসাধারণের নৈতিক চরিত্র রক্ষা করিতে গিয়া, কাহারও পারিবারিক গোপনীয়তা ব্যাহত করিবার ক্ষমতা যেমন তাঁহার ছিল না, তেমনি কাহারও

---

১ হুসাইনি: এম. অ্যাড্মিনিস্ট্রেশন, পৃঃ ১৯৬।

২ মুহ্তাসিব পদটি খলিফা আল্-মাহদি প্রবর্তন করেন এবং এই গুরুত্বপূর্ণ পদটি তাঁহার উত্তরাধিকারীদের আমলেও প্রচলিত ছিল। আল্-মাওয়ার্দী তাঁহার আল্-আহকাম-উস্-সুলতানিয়াহ্ গ্রন্থে মুহ্তাসিবের বহুবিধ কর্তব্য ও দায়িত্ব বিশ্লেষণ করেন এবং বলেন যে মুহ্তাসিব ছিলেন দুই প্রকারের, যথা—স্বেচ্ছাসেবক ও বেতনভোগী।—হুসাইনি: এস. অ্যাড্মিনিস্ট্রেশন্, পৃঃ ২১০।

৩ কোরায়েশী: এস. অ্যাড্মিনিস্ট্রেশন, পৃঃ ১০, ১১, ১৬৫।

বিরুদ্ধে গুপ্তচরের মত কাজ করিবার অধিকারও তাঁহার ছিল না, কিংবা তিনি শিষ্টতা ও শালীনতার সীমাও অতিক্রম করিতে পারিতেন না।[১] আইনের ঘোরতর লঙ্ঘন ও প্রকাশ্যে বিধিবহির্ভূত কার্যের বিরুদ্ধে সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণের সঙ্গেই শুধু তিনি প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিলেন।[২] তাঁহার কর্তব্য ছিল অবৈধ কাজ-কর্ম দমন করা এবং অন্যায়কারীকে শাস্তি দেওয়া। তিনি ছিলেন গণ-শালীনতার রক্ষাকর্তা এবং শক্তিশালীর বিরুদ্ধে দুর্বলের অধিকার-রক্ষক।[৩]

জনগণের প্রার্থনা আরাধনা সঠিকভাবে পরিচালিত হইতেছে কিনা উহা লক্ষ্য রাখা, কাহাকেও যেন প্রকাশ্য স্থানে মাতাল অবস্থায় না দেখা যায় উহার প্রতিবিধান করা, উগ্র মদ, উত্তেজক সুরা প্রকাশ্যভাবে যেন তৈয়ার ও বিক্রয় না হয়—উহা প্রতিরোধ করা, কেহ যেন কাহাকেও প্রতারণা-প্রবঞ্চনা না করে উহা পর্যবেক্ষণ করিয়া প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা ইত্যাদির দায়িত্ব ছিল মুহ্‌তাসিবের।[৪] জুয়া খেলা, অবৈধ বিবাহ ও অশিষ্ট-অশালীন কাজ-কর্ম বন্ধ করাও তাঁহার কর্তব্য ছিল।[৫] ঋণীকে ঋণ পরিশোধ করিতে বাধ্য করাও ছিল তাঁহার কর্তব্যের অন্যতম। যদি ঋণী ঋণ পরিশোধ করিতে অসম্মত হয়, তাহা হইলে বিষয়টি কাজীর আদালতে পেশ করা হইত, কারণ মুহ্‌তাসিব একজন কাজী অর্থাৎ বিচারক ছিলেন না।[৬] কাজী ও মুহ্‌তাসিবের কার্য ও ক্ষমতায় প্রধান পার্থক্য ছিল এই যে, মুহ্‌তাসিবের স্বতঃস্ফূর্ত হস্তক্ষেপের ক্ষমতা ছিল; পক্ষান্তরে মামলাকারী কাজীর নিকট আবেদন না করা পর্যন্ত, কাজী কোন আইনগত পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে পারিতেন না। মুহতাসিব ছিলেন একজন প্রশাসনিক কর্মকর্তা, আর কাজী ছিলেন একজন বিচারক।[৭]

ক্রীতদাস ও গার্হস্থ্য দাস-দাসীদের প্রতি অসদ্ব্যবহার, অত্যাচার-উৎপীড়ন প্রতিরোধ করা এবং গৃহপালিত পশুকে নির্দয় ব্যবহার হইতে রক্ষা করা ছিল মুহ্‌তাসিবের দায়িত্ব।[৮] তিনি কুড়ান ছেলে, পরিত্যক্ত শিশুদের পরিচর্যা

১ বিশেষ আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য—আল্-মাওয়ার্দী : আল্-আহকাম-উস্-সুলতানিয়াহ, বিংশতম অধ্যায়।

২ আল্-মাওয়ার্দী . আহকাম-উস্-সুলতানিয়াহ্, পৃঃ ২৪৩-২৪৪।

৩ নিজাম-উল্-মুলুক : সিয়াসত নামা, পৃঃ ৩৯।

৪ আল্-মাওয়ার্দী : আহকাম-উস্-সুলতানিয়াহ্, পৃঃ ২৩৯-২৪১।

৫ কোরায়েশী : এস. অ্যাড্‌মিনিস্ট্রেশন্, পৃঃ ১৬৪।

৬ ভন্ ক্রিমার, পৃঃ ২৯২-২৯৬।

৭ জে. আর. এ. এস. ১৯১৬, পৃঃ ৭৭-১০১।

৮ জায়দান : তমাদ্দ ন-ই-ইসলামী, পৃঃ ১৮৯-১৯০।

ও লালন পালনের সুবন্দোবস্ত করিতেন।[১] জনগণের সুবিধার্থে পানি সরবরাহ, শহর-নগরের প্রাচীর রক্ষা, সরকারী দালান-কোঠা রক্ষণাবেক্ষণ করাও ছিল তাঁহার কর্তব্য।[২] সার্বিকভাবে, জনগণের সুযোগ-সুবিধা প্রদানের প্রতি তাঁহার দৃষ্টি ছিল সদা জাগ্রত। রাস্তাঘাটের উন্নতিসাধন, নৌকা চলাচলের সুবিধা প্রদান, রাস্তাঘাটে আলোর বন্দোবস্ত, বাজার-হাট, হাসপাতাল ও সরাইখানার রক্ষণাবেক্ষণ, স্বাস্থ্যকর ব্যবস্থার উৎকর্ষসাধন ইত্যাদি জনহিতকর, জনকল্যাণময় কার্যাবলীর দায়িত্বে তিনি ন্যস্ত ছিলেন।[৩] সংক্ষেপে বলা যাইতে পারে যে, নাগরিকদের পৌরজীবনের সুযোগ-সুবিধা প্রদানের জন্য মুহ্‌তাসিব দায়ী ছিলেন।[৪]

রাষ্ট্র মুহ্‌তাসিবকে তাঁহার কর্তব্য ও দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালন করিবার সুবিধার্থে, তাঁহাকে একটি ছোট বেসামরিক বাহিনী প্রদান করে।[৫] মুহ্‌তাসিব পদকে গিয়াসউদ্দীন বলবন অত্যন্ত গুরুত্ব প্রদান করেন এবং বলেন যে, কল্যাণময়ী সরকারের সাফল্যের জন্য অভিজ্ঞ ও কর্মঠ মুহ্‌তাসিব অপরিহার্য। আলাউদ্দীন খল্‌জী মদ্য-পান, জুয়া-খেলা ও অন্যান্য অশালীন-অশোভন কাজ-কর্ম অত্যন্ত কঠোর ও দৃঢ় হস্তে দমন করেন। মুহম্মদ-বিন-তুঘলক অন্যায়কারী ও অপরাধীদিগকে তাঁহার স্বাভাবিক কঠোরতা ও নিষ্ঠুরতা দ্বারা শাস্তি প্রদান করেন।[৬] আমীর খসরু আলাউদ্দীন খল্‌জীর হিস্‌বাহ্‌র ভূয়সী প্রশংসা করিয়া বলেন যে, সুলতানের বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণের দরুন, দিওয়ান-ই-রিয়াসাত সুগঠিত হয়।[৭] গিয়াসউদ্দীন তুঘলকের শাসনাধীনে হিস্‌বাহ্‌ অত্যন্ত কর্মনিপুণ ছিলেন।[৮] হিস্‌বাহ্‌র কর্মদক্ষতা ও নিষ্ঠা প্রশংসার দাবিদার। ইবনে বতুতা মুহম্মদ-বিন-তুঘলকের রাজত্বকালের মুহ্‌তাসিবের কর্মপটুতা লক্ষ্য করিয়া মুগ্ধ হন। সুলতানের মুহ্‌তাসিব অত্যন্ত আত্মমর্যাদা-সম্পন্ন রাজকর্মকর্তা ছিলেন এবং তিনি বাৎসরিক আট সহস্র টংকা বেতন পাইতেন।[৯] সুলতান স্বয়ং সময় সময়

---

১ ভন ক্রিমার, পৃ: ২৯২-২৯৬।
২ আল্‌ মাওয়ার্দী : আহকাম-উস্‌-সুলতানিয়াহ্‌; পৃ: ২৪৩-২৪৪।
৩ জায়দান : তমাদ্দুন-ই-ইসলামী, পৃ: ১৮৯-১৯০।
৪ কোরায়েশী : এস. অ্যাড্‌মিনিস্ট্রেশন, পৃ: ১৬৫।
৫ নিজাম-উল্‌-মুলক : সিয়াসত-নামা, পৃ: ৩১।
৬ ইসামী : ফুতুহ্‌-উস্‌-সালাতিন, পৃ: ৩০৫-৩০৬।
৭ খুসরু : খাজা'ইন-উল্‌-ফুতুহ্‌, পৃ: ১৮-১৯।
৮ বারনী : ফিরোজশাহী, পৃ: ৪৪১।
৯ ইবনে বতুতা : রিহ্‌লাত, দ্বিতীয়, পৃ: ৩৪।

মুহ্‌তাসিবের কাজ করিতেন এবং মুসলিমগণ ইসলামের রীতিনীতি মানিয়া চলে কিনা উহা তীক্ষ্ণভাবে পর্যবেক্ষণ করিয়া, তিনি অপরাধীকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদান করিতেন। তাঁহার আমলে ব্যভিচারে দোষী সাব্যস্ত রাজপরিবারের কোন এক মহিলাকে প্রস্তর নিক্ষেপ করিয়া হত্যা করা হয়। তিনি মাতালকে আশী বেত্রাঘাত ও তিন মাসের নিঃসঙ্গ কারাবাসের শাস্তি প্রদান করেন।[১] ধর্মভীরু ও ধর্মপরায়ণ ফিরোজশাহ তুঘলক ইহ্‌তিসাবের কঠোরতা লাঘব করেন নাই। তিনি নিজে ফুতুহাত-ই-ফিরোজশাহীতে বলেন যে, তিনি তাঁহার বিবেচনায় অবৈধ ও অবাঞ্ছিত কার্যকলাপ নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন।[২]

মুহ্‌তাসিব জনগণের স্বার্থ রক্ষাকারীরূপে, হাট-বাজার তত্ত্বাবধান করেন, ওজন ও মাপ পরিদর্শন করেন এবং তিনি ত্রুটিপূর্ণ দাড়িপাল্লা ব্যবহারকারী ও ভেজাল খাদ্য-বিক্রয়কারীকে শাস্তি প্রদান করেন।[৩] 'রইস' নামে একজন নিম্নপদস্থ কর্মচারীর উপর হাট বাজার নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। তিনি উৎপাদনকারী, বিক্রেতা ও ক্রেতা উভয়ের স্বার্থই যাহাতে অক্ষুণ্ণ থাকে, ঐ দিকে লক্ষ্য রাখিয়া ভোগ্য-পণ্যের ন্যায্য মূল্য নির্ধারণ করেন।[৪] সুতরাং চাহিদা ও সরবরাহের নিয়ম কানুন সম্পর্কে সম্যক ধারণা এবং হাট-বাজার পরিচালনার অভিজ্ঞতা থাকা তাহার প্রয়োজন ছিল।[৫] এই দপ্তরকে দিওয়ান-ই-রিয়াসত বা 'আদল বলা হইত।[৬] সুলতানী আমলে বরাবরই দিওয়ান-ই-রিয়াসত ছিল। তবে আলাউদ্দীন খল্‌জীর সময় দিওয়ান-ই-রিয়াসত ছিল অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণের এক ফলোৎপাদক অস্ত্র স্বরূপ। সাইয়েদ, লোদী-সুরী শাসন আমলেও দিওয়ান-ই-রিয়াসতের অস্তিত্ব পরিলক্ষিত হয়। লোদী

---

১ ইবনে বতুতা রিহলাত, দ্বিতীয়, পৃঃ ৩৪, ৫২, ৫৪, ১০৬।

২ ফিরোজশাহ তুঘলক স্ত্রীলোকদিগের সমাধি পরিদর্শন নিষিদ্ধ করেন।—ফুতুহাত-ই- ফিরোজ-শাহী, পৃঃ ২; ইনশা-ই মাহরু, সপ্তম পত্র।

৩ জে. আর. এ. এস, ১৯১৬; আলাউদ্দীন খল্‌জীর সতর্ক ব্যবস্থা গ্রহণের দরুন, দিওয়ান-ই-রিয়াসতের সীলমোহরযুক্ত লৌহ-নির্মিত ওজন-একক হাট-বাজারে সাধারণভাবে ব্যবহৃত হইত।—কোরায়েশী: এস. অ্যাড্‌মিনিস্ট্রেশন, পৃঃ ১৬৯ পাদটীকা।

৪ সময় সময় মুহতাসিব স্বয়ং 'রইস'-এর কাজ করিতেন। ইবনে বতুতা মুহ্‌তাসিব ও 'রইস' নামক দুইটি পদকে সমার্থক মনে করেন।—ইবনে বতুতা: রিহলাত, দ্বিতীয়, পৃঃ ২৬; কখনও কখনও হাট-বাজার নিয়ন্ত্রণকারী অমুসলমান ছিল; সে মুহতাসিবের ধর্মীয় কর্তব্য পালন করিতে পারিত না।—কোরায়েশী: এস. অ্যাড্‌মিনিস্ট্রেশন, পৃঃ ১৬৯ পাদটীকা।

৫ আদব-উল্‌-মুলক, ৪৬।

৬ বইহাকী: তারিখ-ই-বইহাকী, পৃঃ ৩৫২।

আমলে খাদ্য-সামগ্রী প্রচুর পাওয়া যাইত এবং ইহাদের মূল্যও কম ছিল, তথাপি 'আদল দপ্তরটির বিলুপ্তি ঘটে নাই।[১]

দিল্লী সালতানাতের শুরু হইতেই, সুলতানগণ তাঁহাদের রাজ্যে শান্তি-শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা বিধানের জন্য উদগ্রীব ছিলেন[২] এবং এইজন্য তাঁহারা চেষ্টার ত্রুটি করেন নাই। দেশে শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখিবার জন্য পুলিশী শাসন-ব্যবস্থার উদ্ভব হইয়াছিল। পুলিশ-বিভাগের নিত্য-কর্ম কোতোয়াল সম্পাদন করিতেন এবং খেলাফতের আমলে আরব শাসন-ব্যবস্থায় 'সাহিব-ই-শুরতা'র[৩] সঙ্গে তাহার সাদৃশ্য রহিয়াছে। কোতোয়ালের টহলদার পুলিশ বাহিনী রাত্রিতে নগর পাহারা দিত এবং জনসাধারণের রাস্তা-ঘাট চৌকি দিত। সুষ্ঠুভাবে কর্তব্য ও দায়িত্ব পালনের জন্য কোতোয়াল জনগণের সহযোগিতা কামনা করিতেন। কেহ যেন অপরাধী ও দোষীকে আশ্রয় না দেয় উহা লক্ষ্য রাখিবার জন্য তিনি নগরের প্রতি এলাকায় স্থানীয় নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদিগকে দায়িত্ব প্রদান করেন। তিনি নগরের প্রত্যেক এলাকার অধিবাসীদের নাম-ঠিকানা সম্বলিত তালিকা-গ্রন্থ রাখেন, তাহাদের কাজ-কর্ম ও জীবিকা নির্বাহের উপায় ইত্যাদির খোঁজখবর রাখেন; এমনকি প্রত্যেক নূতন আগমনকারী ও বিদায় গ্রহণকারীর হিসাব রাখেন।[৪] তিনি ছিলেন মূলতঃ একজন নগররক্ষী। তাহার বৈধ কর্তৃত্বের এখ্‌তিয়ার গ্রাম্য অঞ্চলেও বিস্তৃত ছিল।[৫] তিনি একজন ম্যাজিস্ট্রেটের ভূমিকাও পালন করিতেন।[৬] তবে তিনি সামরিক কর্মকর্তা ছিলেন না এবং তাহার বাহিনী মূলতঃ কর্তব্যের বৈশিষ্ট্যের দিক হইতে বেসামরিক ছিল।[৭] কিন্তু সামরিক অধিকর্তা রূপে, তাঁহার সামরিক ক্ষমতার উল্লেখও কোন কোন ইতিহাসে লক্ষ্য করা যায়।[৮] শেরশাহ স্থানীয় দায়িত্ববোধ নীতির ভিত্তিতে তাঁহার পুলিশ-বাহিনী সংগঠন করিয়াছিলেন।[৯]

মুসলিম বিচার-ব্যবস্থায় ন্যায়পরায়ণতা, সততা, নিষ্ঠা ও নিরপেক্ষতার নীতি ও আদর্শ ইসলামের ইতিহাসের শুরু হইতেই পরিলক্ষিত হয়।[১০] দিল্লীর সুলতানগণ

---

১ আবদুল্লাহ: তারিখ-ই-দাউদী, ২৪, ৬৩; কোরায়েশী: এস. অ্যাড্‌মিনিস্ট্রেশন, পৃঃ ১৭৩।
২ নিজামী: তাজ-উল্-মা'আছির, ৮০, ৮৪।
৩ 'শাহনাহ্'ও বলা হইত।—কুল্লিয়াত-ই-হাসান সাজ্জী দেহলভী, পৃঃ ৪২।
৪ কোরায়েশী: এস. অ্যাড্‌মিনিস্ট্রেশন্, পৃঃ ১৭৩।
৫ গজনভী: দস্তুর-উল্-আল্বাব, পৃঃ ৩১।
৬ আমীর আলী: দি স্যারাসেন্স্, পৃঃ ৬৩, ৪১৯।
৭ কোরায়েশী: এস. অ্যাড্‌মিনিস্ট্রেশন, পৃঃ ১৭৩।
৮ বারনী: ফিরোজশাহী, পৃঃ ১৩৫-১৩৬, ৩০২।
৯ শরণ: দি প্রভিন্‌শল গভর্নমেণ্ট, পৃঃ ৩৯৫।
১০ হজরত মুহম্মদ (দ:) বলিয়াছেন যে, এক মুহূর্তের নিরপেক্ষ বিচার সম্পাদন সত্তর বৎসরের সাধনার অপেক্ষা উত্তম।—শিহাবউদ্দীন আহমদ: নিহায়াত-উল্-আরব, পৃঃ ৩৩; সিরাত-ই-ফিরোজশাহী, পৃঃ ১৬১; মিথ্যা বিশ্বাস সত্ত্বেও রাজ্যের অস্তিত্ব বজায় থাকে, কিন্তু অন্যায়-অবিচার হইলে রাজ্য টিকিতে পারে না।—নিজাম-উল্-মুলক. সিয়াসত-নামা, পৃঃ ৮।

ন্যায়-বিচার করা তাঁহাদের প্রাথমিক কর্তব্য বলিয়া বিবেচনা করিতেন।[১] ফিরোজশাহ তুঘলক ঘোষণা করেন যে, তাঁহার সাম্রাজ্যের সর্বত্র ন্যায়-বিচার প্রবর্তনের জন্য, তাঁহার সমস্ত কর্মশক্তি ও উদ্যম প্রয়োগ করিবেন।[২] মধ্যযুগে কোন সরকারই দুর্নীতি, অসাধু প্রবণতা, নীতিহীন প্রবৃত্তি, নৈতিক অবনতি ও অন্যায়-অবিচার সমূলে বিনষ্ট করিতে পারে নাই, কিন্তু দিল্লী সালতানাত ন্যায়-বিচার-ব্যবস্থার একটি সুসংগঠিত দপ্তর পরিচালনা করিতে সক্ষম হয়। বিচার-পদ্ধতিতে মোকদ্দমা পরিচালনার কার্যবিবরণী প্রকাশ্যকরণ এবং বিভিন্ন কর্মচারীর মধ্যে দায়িত্ব ও ক্ষমতা বিভক্তিকরণ দ্বারা, সুলতানগণ বিচার-ব্যবস্থায় কর্মকর্তাদের ক্ষমতা হ্রাস করিয়া ভারসাম্য রক্ষার নীতি[৩] প্রবর্তন করিতে সমর্থ হন। ইহাতে কোন সন্দেহ নাই যে, সুলতানগণ বিচারকার্যে অত্যন্ত ন্যায়পরায়ণ ও নিরপেক্ষ ছিলেন। অধ্যবসায়ীর মনোভাব লইয়া,[৪] বিচার-বিভাগীয় কর্মকর্তাগণ নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করিতেন। কয়েকজন সুলতান ন্যায়-বিচারের চরম পরকাষ্ঠা প্রদর্শন করেন, যেমন ঃ মাতাল অবস্থায় একজন গভর্নরের হত্যার অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত হইলে, গিয়াসউদ্দীন বলবন তাহাকে চরম শাস্তি প্রদান করিতে দ্বিধাবোধ করেন নাই। এক ঘটনায় মুহম্মদ-বিন-তুঘলকের বিরুদ্ধে কাজীর বিচারালয়ে নালিশ পেশ করা হইলে, সুলতান স্বয়ং বিবাদীরূপে কাজীর আদালতে উপস্থিত হন এবং তাঁহার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রমাণিত হইলে, তাঁহাকে শাস্তি প্রদান করার জন্য তিনি আদালতকে বিশেষভাবে অনুরোধ করেন।[৫] বারনীর রচিত তারিখ-ই-ফিরোজশাহী নামক গ্রন্থে, ন্যায়-বিচার, আইন ও কাজীর প্রতি এই সুলতানের সম্মান প্রদর্শনের অনেক দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। ধর্মভীরু ও ন্যায়পরায়ণ সুলতান হিসাবে, ফিরোজশাহ তুঘলকের বিচারকার্যে নিরপেক্ষ নীতি অবলম্বনের অনেক দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা যায়, যেমন তাঁহার একজন প্রিয় ব্যক্তি হত্যার অভিযোগে অপরাধী সাব্যস্ত হইলে, তাহাকে তিনি মৃত্যুদণ্ড[৬] প্রদান করিতেও দ্বিধা করেন নাই। মৃত্যুদণ্ডের প্রতি তাঁহার চরম ঘৃণার মনোভাব থাকা সত্ত্বেও তিনি এই প্রচণ্ড কঠোরতা প্রদর্শন করিতে কুণ্ঠিত হন নাই।[৭]

---

১ ইনশা-ই-মাহরু, প্রথমপত্র।

২ কোরায়েশী : এস. অ্যাড্‌মিনিস্ট্রেশন, পৃঃ ১৬২ পাদটীকা।

৩ পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৬৩।

৪ বারনী : ফিরোজশাহী, পৃঃ ৪৪।

৫ পূর্বোক্ত, পৃঃ ৪০, ৪৪-৪৫ ; ইবনে বতুতা : রিহলাত, তৃতীয়, পৃঃ ২৮৫।

৬ আফিফ : ফিরোজশাহী, পৃঃ ৫০৩-৫০৮।

৭ নিজামউদ্দীন : তবাকাত-ই-আকবরী, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ২৩৮-২৩৯ ; ইনশা-ই-মাহরু, প্রথম পত্র ; সিরাত-ই-ফিরোজশাহী, পৃঃ ১২০।

নবম অধ্যায়

প্রাদেশিক ও স্থানীয় শাসন-ব্যবস্থা

দিল্লী সুলতানী আমলে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রশাসনিক কাঠামোতে প্রাদেশিক প্রধান বিভিন্ন নামে পরিচিত ছিলেন। মুসলিম আইন বিশারদগণ প্রাদেশিক গভর্নর পদকে দুইটি প্রধান ভাগে বিভক্ত করেন, যেমন 'ইমারত-ই-আম্মাহ্' কিংবা 'তাফয়িদ' এবং 'ইমারাত-ই-খাস্সাহ্'। প্রথম প্রকারের গভর্নর সীমিত ক্ষমতা এবং দ্বিতীয় প্রকারের গভর্নর অসীম ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। সাফল্যজনক বিদ্রোহের মাধ্যমে শক্তি প্রয়োগ দ্বারা অসীম ক্ষমতাসম্পন্ন গভর্নরপদ লাভ করিলে, ইহাকে 'ইমারাত-ই-ইসতিলা'[১] বলা হয়।

ঘটনাপঞ্জী লেখকগণও প্রাদেশিক গভর্নরকে বিভিন্ন নামে অভিহিত করিয়াছেন, যেমন 'ওয়ালি' ও 'মুক্তি'—পদমর্যাদায় ওয়ালি মুক্তির অপেক্ষা উচ্চতর। যে-কোন গভর্নরকে মুক্তি বলা যাইত, কিন্তু একজন ছোট প্রাদেশিক প্রধানকে ওয়ালি কখনও বলা যাইত না। হাসান নিজামী তাঁহার তাজ-উল্-মা'আছিরে সাধারণতঃ গভর্ণর পদের জন্য 'আয়ালাত' অথবা 'ওয়ালায়াতদারি' শব্দ ব্যবহার করেন। সুলতানী আমলের প্রারম্ভিককালে, গভর্নরদিগকে সম্ভবতঃ বেশী ক্ষমতা দিতে হইত।[২] বারনী অবশ্য লাখ্নতির গভর্নর কিংবা যে-কোন গভর্নরের জন্য ওয়ালি শব্দ ব্যবহার করেন।[৩] মোরল্যাণ্ডের মতে, ওয়ালি ও মুক্তি পদের পার্থক্য স্পষ্টভাবে দেখাইবার জন্য সঠিক তথ্য পাওয়া যায় না। তিনি মনে করেন যে, শব্দ দুইটি বলিতে গেলে, বস্তুতঃপক্ষে সমার্থক বা তুলার্থবোধক।[৪] আইন বিশেষজ্ঞগণ অসীম ক্ষমতার অধিকারী গভর্নর অর্থাৎ আমীরকে নিজ এলাকায় আধা-স্বাধীন শাসনকর্তা[৫] বিবেচনা করেন। তিনি সীমাহীন ক্ষমতার

---

১ কোরায়েশী: এস. অ্যাড্মিনিস্ট্রেশন্, পৃ: ১৯৪।

২ নিজামী: তাজ-উল্-মা'আছির, ৪৮, ১২৪; কোরায়েশী: এস. অ্যাড্মিনিস্ট্রেশন্, পৃ: ১৯৭ পাদটীকা।

৩ বারনী: ফিরোজশাহী, পৃ: ৮২, ৯১।

৪ মোরল্যাণ্ড্: দি অ্যাগ্রেরিয়্যান সিস্টেম্, পৃ: ২২২; কোরায়েশী: এস. অ্যাড্মিনিস্ট্রেশন্, পৃ: ১৯৭ পাদটীকা।

৫ সুলতান গিয়াসউদ্দীন বলবন তাঁহার পুত্র বুঘরা খানকে আধা-স্বাধীন শাসনকর্তারূপে বাংলার নূতন গভর্নর পদে নিযুক্ত করেন।—বারনী: ফিরোজশাহী, পৃ: ৯৬।

অধিকারী হইয়া সামরিক বাহিনী সংগঠন, বিচারক নিয়োগ, কর আদায় ও মুসলিম আইন শরিয়াত প্রয়োগ করেন ; তিনি ছিলেন ইসলাম ধর্ম-বিশ্বাসের রক্ষাকর্তা। খুব সম্ভবতঃ ওয়ালি শব্দটি অসাধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন গভর্নরের জন্য ব্যবহৃত হইত। এই জাতীয় গভর্নরের সংখ্যা কম ছিল। সালতানাতের অধিকাংশ অঞ্চলে সীমিত ক্ষমতার অধিকারী গভর্ণর মুক্‌তি দ্বারা শাসনকার্য পরিচালিত হইত। সীমিত ক্ষমতার অধিকারী গভর্নর সেনাবাহিনী তদারক, অপরাধী ও বিদ্রোহীদের শাস্তি প্রদান, দেশের নিরাপত্তা বিধান প্রভৃতি কাজে ন্যস্ত থাকিতেন। তাঁহাকে ধর্মবিষয়, বিচার-ব্যবস্থা ও কর নির্ধারণে হস্তক্ষেপ করিতে দেওয়া হইত না। তাঁহাকে মুসলিম জনগণের আধ্যাত্মিক নেতা হিসাবে নামাজ পরিচালনার অধিকার দেওয়া হইত না। উক্ত দপ্তরগুলি সরাসরি কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে রাখা হইত। সুলতান নিজে কাজী ও রাজস্ব কর্মকর্তা নিয়োগ করিতেন।[১] সালতানাতে প্রাদেশিক শাসন-ব্যবস্থার ইতিহাসে উপরোক্ত সকল শ্রেণীর গভর্নরের নজির পাওয়া যায়।

তাজ-উল্-মা'আছিরে গভর্ণরের প্রধান কর্তব্য ও দায়িত্বের বিস্তারিত বর্ণনা পাওয়া যায় ঃ

(ক) প্রধান প্রশাসনিক কর্তা ;

(খ) আইন-কানুন, চিরাচরিত প্রথা, রীতি-নীতি রক্ষা ও বলবৎকরণ ;

(গ) উলামা, যোদ্ধা ও বেসামরিক কর্মচারীদের কাজ তত্ত্বাবধায়ন ;

(ঘ) বিদ্যোৎসাহী ও ধার্মিক ব্যক্তিদিগকে সাহায্য প্রদান ;

(ঙ) সৈন্যবাহিনী রক্ষণাবেক্ষণ, শান্ত ও সুখী অবস্থায় রাখা ;

(চ) দিওয়ান-ই-ওয়াজিরাতের কাজ কর্ম তদারক ;

(ছ) কৃষিকার্যের উন্নতি ও উৎপাদন বৃদ্ধিকরণ ;

(জ) ন্যায়-বিচার করা ও দুর্বলকে শক্তিশালীর অত্যাচার, উৎপীড়ন হইতে রক্ষা করা ;

(ঝ) বিচারালয়ের সিদ্ধান্ত, রায়কে কার্যকরীকরণ ;

(ঞ) রাস্তাঘাটের নিরাপত্তা বিধান ; ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার ও দেশের সমৃদ্ধি আনয়ন[২] ;

---

১ জায়দান : তমাদ্দুন-ই-ইসলামী, পৃঃ ১০৯-১১১ ; ইস্পাহানী : মুলুক-উল্-মুলুক, ১৮ ; ভন্ ক্রিমার, পৃঃ ২২৭, ২৭৫, ২৮৫ ; আল্ মাওয়ার্দী : আহকাম-উস্-সুলতানিয়াহ্, পৃঃ ২৮-৩২ ৮

২ ইনশা-ই-মাহরু, প্রথমপত্র।

(ট) পূর্ত-কার্য তত্ত্বাবধায়ন[১] ইত্যাদি ;

প্রদেশের সেনাবাহিনীতে নূতন সৈন্য নিয়োগ এবং সামরিক বাহিনী তত্ত্বাবধান করিবার দায়িত্ব ছিল প্রাদেশিক আরিজগণের। সেনাবাহিনীতে প্রাদেশিক আরিজগণের কর্তৃত্বের দরুন, গভর্নরদের সামরিক ক্ষমতা হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। প্রাদেশিক আরিজরা ছিলেন কেন্দ্রীয় সরকারের আরিজ-ই-মুমালিকের অধীনস্থ এবং তাহাদিগকে কেন্দ্রের সদর দপ্তরে নিয়মিত প্রতিবেদন পেশ করিতে হইত।

প্রাদেশিক রাজস্ব-ব্যবস্থা সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য, ওয়াজিরের সুপারিশক্রমে প্রত্যেক প্রদেশে সুলতান একজন সাহিব-ই দিওয়ান নিয়োগ করেন।[২] সাহিব-ই-দিওয়ানকে সুবিধার্থে 'খাজাহ্' বলা হইত। সাধারণতঃ তিনি ছিলেন একজন দক্ষ হিসাবরক্ষক ; তাহার কর্তব্য ছিল হিসাব-নিকাশ রাখা এবং লিখিত বিস্তারিত বিবৃতি সদর দপ্তরে পেশ করা।[৩] এই বিস্তারিত বিবরণীর উপর ভিত্তি করিয়া, ওয়াজিরের দপ্তর মুক্তির সহিত হিসাব নিষ্পত্তি করে। সরকারী-ভাবে খাজা গভর্নরের অধীনস্থ ছিলেন বটে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে, সুলতান কর্তৃক সরাসরি নিয়োগ লাভের দরুন ও ওয়াজিরের সহিত যোগাযোগ থাকার দরুন, খাজা ক্ষমতাবান ছিলেন এবং প্রাদেশিক শাসন-ব্যবস্থায় তাহার উপস্থিতি গভর্নরের ক্ষমতার উপর একটা বাধা-স্বরূপ ছিল, ইহা অস্বীকার করা চলে না। ইবনে বতুতা প্রাদেশিক শাসন-ব্যবস্থার কাঠামোতে ওয়ালি-উল্-খারাজ ও আমীরের উল্লেখ করেন। ইহাতে কোন সন্দেহ নাই যে প্রথমোক্ত ব্যক্তি ছিলেন খাজা এবং শেষোক্ত ব্যক্তি ছিলেন গভর্নর।[৪]

সুলতানী আমলে শাসন-ব্যবস্থার সুবিধার্থে, প্রদেশকে শিক কিংবা সরকার-এ বিভক্ত করা হয় কিনা, ইহা নিয়া মতদ্বৈধতা রহিয়াছে। মোরল্যাণ্ড অবশ্য চতুর্দশ শতাব্দীতে শিক শব্দটি প্রদেশের সমার্থকরূপে ব্যবহার করিয়াছেন।[৫]

---

১ কোরায়েশী : এস. অ্যাড্‌মিনিস্ট্রেশন্, পৃ: ১৯৮-১৯৯।

২ বারনী : ফিরোজশাহী, পৃ: ৩৮ ; আবদুল্লাহ্ : তারিখ-ই-দাউদী, ১৯-২০।

৩ সাহিব-ই-দিওয়ান শব্দটি হিসাব রক্ষককে বুঝায় ; সাহিব—কর্মকর্তা ; দিওয়ান—দপ্তর। বড় প্রদেশে সময় সময় তাহাকে ওয়াজিরও বলা হয়।—বারনী : ফিরোজশাহী, পৃ: ৫০২ ; কোরায়েশী : এস. অ্যাড্‌মিনিস্ট্রেশন্, পৃ: ২০১ পাদটীকা।

৪ ইবনে বতুতা : রিহলাত, দ্বিতীয়, পৃ: ৯০। ইবনে বতুতা রাজস্ব কর্মকর্তা ক্ষমতাবান ছিলেন বুঝাইবার জন্য, ওয়ালি শব্দ ব্যবহার করেন।—কোরায়েশী : এস. অ্যাড্‌মিনিস্ট্রেশন্, পৃ: ২০১।

৫ মোরল্যাণ্ড্ : দি অ্যাগ্রেরিয়ান সিস্টেম, পৃ: ২৫।

কুতুবউদ্দীন আইবেকের সময় বৃহৎ 'ওযেলায়াত'কে 'তরফ্' নামে ছোট প্রশাসনিক এককে বিভক্তকরণের কথা উল্লেখ আছে।[১] বারনী মুহম্মদ-বিন-তুঘলকের রাজত্বকালের ইতিহাসে প্রশাসনিক একক হিসাবে শিক শব্দ ব্যবহার করেন। উদাহরণস্বরূপ, সুলতান দাক্ষিণাত্য প্রদেশকে চারিটি শিক-এ বিভক্ত করেন।[২] চতুর্দশ শতাব্দীতে প্রদেশকে শিক-এ ভাগ করা হয়; কিন্তু এই সুলতানের মৃত্যুর পর রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতার সময়, শিক সম্ভবতঃ লোপ পায়।[৩] এই শিক কখনও সার্বজনীন ছিল না বলিয়া মনে হয়। কেবল-মাত্র যে প্রদেশকে সহজে শাসন করা যাইত না, উহাকে শিক প্রশাসনিক এককে বিভক্ত করা হইত।[৪] ইবনে বতুতা 'হাজর' শব্দ ব্যবহার করেন, ইহা আমীরের অধীনে ছিল এবং ওয়ালি-ই-খারাজ আমীরকে সাহায্য করিতেন। তবে এই 'হাজর' প্রশাসনিক একক শিক বলিয়া মনে হয় না।[৫] ক্রমে এই শিক প্রশাসনিক একক সরকাররূপে পরিগণিত হয়। শিক অথবা সরকার-এর পরবর্তী ক্ষুদ্র প্রশাসনিক একক ছিল পরগনা। কতকগুলি গ্রামের সমন্বয়ে[৬] সংগঠিত পুরাতন 'কসবাহ্'এর সহিত মোরল্যাণ্ড যথার্থভাবে নূতন পরগণাকে সনাক্ত করেন।[৭] ইবনে বতুতা একশত গ্রামের সমন্বয়কে 'সাদি' বলিয়া উল্লেখ করেন। তাহার হিন্দপাত সাদি দিল্লীর শহরতলী অঞ্চলে ইন্দ্রপাত পরগনা ব্যতীত আর কিছুই নহে।[৮] সমসাময়িক অন্য কোন ঐতিহাসিক, লেখক কিংবা পর্যটক 'সাদি' নামে প্রশাসনিক এককের উল্লেখ করেন নাই। ইবনে বতুতা পরগনাকে 'সাদি' বলিয়াছেন। 'সাদি' শব্দ সরকারীভাবে ব্যবহৃত হয় নাই বলিয়াই

---

১ নিজামী : তাজ-উল্-মা'আছির' ১৯১, ২৫৪; ইনশা-ই-মাহরু, দ্বিতীয় পত্রে 'তরফ' শব্দটি ব্যবহৃত হইয়াছে।—কোরায়েশী : এস. অ্যাড্মিনিস্ট্রেশন্, পৃঃ ২০২ পাদটীকা।

২ বারনী : ফিরোজশাহী, পৃ: ৫০২।

৩ কোরায়েশী : এস. অ্যাড্মিনিস্ট্রেশন্, পৃঃ ২০২।

৪ পূর্বোক্ত, পৃ: ২০৩।

৫ ইবনে বতুতা : রিহলাত, দ্বিতীয়, পৃঃ ৫০।

৬ কতকগুলি গ্রামের সমন্বয়ে সংগঠিত প্রশাসনিক একক প্রসঙ্গে শুক্রনীতি, বিষ্ণু-স্মৃতি, মনুর ধর্ম শাস্ত্র ও কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে উল্লেখ আছে।—শুক্রনীতি, পৃঃ ২৫; বিষ্ণুস্মৃতি, তৃতীয় খণ্ড, পৃঃ ৭-১৫; মনুর ধর্মশাস্ত্র (এ. সি. বারনেল্ কর্তৃক ইংরেজীতে অনূদিত দি লজ্ অফ মনু), সপ্তম, পৃ: ১১৫-১১৯; কৌটিল্য : অর্থশাস্ত্র, পৃঃ ৪৯।

৭ মোরল্যাণ্ড : দি অ্যাগ্রেরিয়্যান্ সিস্টেম, পৃ: ১৮-১৯ সংস্কৃত ভাষায় সরবান শিলালিপিতে পরগণার জন্য 'প্রতিগণা' শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে।—এপিগ্রাফিয়া ইণ্ডিকা, জানুয়ারী ১৮৮৯ প্রথম খণ্ড, পৃঃ ৯৩-৯৫; কোরায়েশী : এস. অ্যাড্মিনিস্ট্রেশন, পৃঃ ২০৩ পাদটীকা

৮ ইবনে বতুতা : রিহলাত, দ্বিতীয়, ৭৮।

সম্ভবতঃ সমসাময়িক গ্রন্থপঞ্জীর লেখকগণ উহা উল্লেখ করেন নাই।[১] সুলতানী আমলে ক্ষুদ্রতম প্রশাসনিক একক ছিল গ্রাম।

সুলতানী আমলে উচ্চ প্রশাসনিক একক ছিল শিক বা সরকার। শিক-এর শাসন-ব্যবস্থার বিস্তারিত বর্ণনা দিবার মত প্রচুর তথ্য ও উপকরণ গ্রন্থপঞ্জীতে পাওয়া যায় না। তবে অবশ্য সরকার-এর শাসন-ব্যবস্থা সম্পর্কে কিছু তথ্য সংগ্রহ করা যায়। এই প্রশাসনিক কাঠামোতে শিকদার-ই-শিকদারান অর্থাৎ প্রধান শিকদার, মুন্‌সিফ-ই-মুন্‌সিফান অর্থাৎ প্রধান মুন্‌সিফ কিংবা প্রধান কর নির্ধারণ কর্মকর্তা এবং খাজাঞ্চী বা খাজানাদার[২] অর্থাৎ কোষাধ্যক্ষ ছিলেন উচ্চ কর্মকর্তাবৃন্দ। কারকুন[৩] ও ফোতাদার[৪] অপরিহার্য ছিলেন। তবে কোন কোন গ্রন্থপঞ্জী লেখক উহাদের উল্লেখ করেন নাই; খুব সম্ভবতঃ তাহাদিগকে কেরানী ভাবিয়া বিশেষ গুরুত্ব দেন নাই।[৫] তৎকালীন সরকারী সংবাদ প্রেরণ ব্যবস্থাকে বিদেশী পরিব্রাজকগণ ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। সংবাদ প্রেরণ পদ্ধতি দুই প্রকারের ছিল, যথা অশ্বের মাধ্যমে ডাক প্রেরণ ও বাহকের মাধ্যমে ডাক প্রেরণ অর্থাৎ ডাকহরকরা।[৬] উক্ত পদ্ধতিতে শিক বা সরকার হইতে রাজধানীতে সদর দপ্তরে সাধারণতঃ সংবাদ প্রেরণ করা হইত। ইহা ব্যতীত সংবাদ লেখকও ছিলেন। তাহাদিগকে মোটামুটি দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়, যথা বারিদ, গোয়েন্দা ও গুপ্তচর। বারিদ ছিল আধুনিক সংবাদপত্রের সংবাদ দাতার অনুরূপ এবং তাহারা কেন্দ্রে নিয়মিত সংবাদ প্রেরণ করিত। আর গোপনে সংবাদ সংগ্রহ করিয়া কেন্দ্রে প্রেরণের জন্য গোয়েন্দা ও গুপ্তচর নিযুক্ত ছিল।

ইবনে বতুতা পরগনার (কসবাহ) শাসন-ব্যবস্থায় প্রধান কর্মকর্তাদের নাম, যথা মুতাসার্‌রিফ[৭] অর্থাৎ রাজস্ব-আদায়কারী, চৌধুরী[৮] অর্থাৎ কৃষকদের

১ কোরায়েশী: এস. অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, পৃ: ২০৪।

২ খাজানাদারের বিস্তারিত আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য—কোরায়েশী: এস. অ্যাড্‌মিনিস্ট্রেশন্, পৃ: ২৫৯-২৬০।

৩ কারকুনের আক্ষরিক অর্থ কর্মী—'নবিস্‌ইনদাহ' অর্থাৎ কেরানীর সমকক্ষ।—কোরায়েশী: এস. অ্যাড্‌মিনিস্ট্রেশন্, পৃ: ২৬০।

৪ 'ফোতাহ্‌দার' এর অর্থ কোষাধ্যক্ষ।—কোরায়েশী: এস. অ্যাড্‌মিনিস্ট্রেশন্, পৃ: ২৬০।

৫ কোরায়েশী: এস. অ্যাড্‌মিনিস্ট্রেশন্, পৃ: ২৬০।

৬ ইবনে বতুতা: রিহ্‌লাত, দ্বিতীয়, পৃ: ৩-৪।

৭ পূর্বোক্ত, পৃ: ৭৮।

৮ কোরায়েশী: এস. অ্যাড্‌মিনিস্ট্রেশন্, পৃ: ২০৮।

প্রতিনিধি ও কানুনগু[১] অর্থাৎ কর নির্ধারণের ফর্দ-রক্ষক উল্লেখ করিলেও, নিম্নপদস্থ কর্মচারীদের পদের নাম তাহার দৃষ্টি আকর্ষণ করে নাই। বারনী অবশ্য পরগনা শাসন-ব্যবস্থার নিম্নপদস্থ কর্মচারীদের নাম উল্লেখ করেন; কিন্তু তিনি ইহার বিস্তারিত বর্ণনা দেন নাই।[২] তিনি মুতাস্‌রিফকে আমিল বলিয়া আখ্যায়িত করেন। তিনি পরগনা প্রশাসনিক কাঠামোতে মুশ্‌রিফ মুহাস্‌সিল, গোমশ্‌তাহ্‌, সরহাঙ্গ প্রভৃতি নিম্নপদস্থ কর্মচারীদের নাম সংযোজন করেন।[৩] মুশরিফ ছিলেন পরিদর্শনকারী যিনি জমির উৎপন্ন-ফসল সরেজমিনে দেখিয়া সরকারের অংশ নিরূপণ করেন। মুহাস্‌সিল কৃষকদের নিকট হইতে নগদে কিংবা শস্যের মাধ্যমে সরকারী রাজস্ব গ্রহণ করে।[৪] গোমশ্‌তাহ্‌ ছিল একজন নিম্নতম কর্মচারী এবং সরহাঙ্গ ছিল আধুনিক কালের আপিসের চাপরাসী বা পিয়ন। তাহারা কৃষক কিংবা মুকাদ্দামদিগকে সরকারী হুকুম ও 'সমন' প্রদান করিত।[৫]

শেরশাহের আমলে পরগনা শাসন-ব্যবস্থায় আমিল বা মুতাস্‌রিফ শিকদার[৬] নামে অতিহিত হয়। শিকদার ছিলেন পরগনার প্রশাসনিক প্রধান। মুশরিফকে তখন আমিল অথবা মুনসিফ বলা হইত। তাহারা ছিলেন পরগনার রাজস্ব আদায়কারী কর্মকর্তা। মুহাস্‌সিল তখন ফোতাহ্‌দার, খাজাঞ্চী অথবা খাজানাহ্‌দার নামে পরিচিত ছিলেন; অবশ্য এইগুলি সকলই কোষাধ্যক্ষের সমার্থক বা তুল্যার্থবোধক। দুই শ্রেণীর কারকুন—কারকুন হিন্দীনবিস ও কারকুন ফার্সীনবিস—যথাক্রমে হিন্দী ও ফার্সী ভাষায় হিসাব-নিকাশ রাখিত, যাহাতে রাষ্ট্র ও কৃষক উভয়ই আর্থিক লেন-দেন সম্পর্কে নিজেদের অবস্থা জানিতে পারে।[৭]

সুলতানী আমলে ক্ষুদ্রতম প্রশাসনিক একক ছিল গ্রাম। গ্রামের স্থানীয় শাসন-ব্যবস্থা ও পরগনা শাসন-ব্যবস্থায় হিন্দুদের প্রভাব সর্বাপেক্ষা বেশী অনুভূত হয়। স্থানীয় হিন্দু কর্মচারিগণ অনেক সময় পুরাতন পদবী লইয়াই,

১ দস্‌তুর-উল্‌-আল্‌বাব, পৃঃ ৩৪।
২ বারনী: ফিরোজশাহী, পৃঃ ২৮৮-২৮৯, ৪৩১।
৩ ইবনে বতুতা 'আমিল'এর উল্লেখ করেন।—ইবনে বতুতা: রিহলাত, দ্বিতীয়, পৃঃ ১৪।
৪ আবদুল্লাহ: তারিখ-ই-দাউদী, পৃঃ ৩৬।
৫ বারনী: ফিরোজশাহী, পৃঃ ২৮৮।
৬ কোরায়েশী: এস. অ্যাডমিনিস্ট্রেশন্‌, ২০৯।
৭ পূর্বোক্ত, পরিশিষ্ট, পৃঃ ২৫৯-২৬০।

মুসলিম আমলে গ্রামের শাসন-ব্যবস্থা পরিচালনা করে। মুহম্মদ-বিন-কাসিমের সিন্ধু বিজয়ের পর, নাগরিকবৃন্দ ও গ্রামবাসীদিগকে নিজ নিজ এলাকার কর আদায়কারী কর্মচারী নিজেদের যোগাইবার অনুমতি দেওয়া হইয়াছিল এবং রাজস্ব-ব্যবস্থায় শিক্ষিত ব্রাহ্মণগণের সক্রিয় অংশ গ্রহণ করা তখন অপরিহার্য হইয়া পড়ে। ছোট ছোট এলাকার শাসন ও রাজস্ব আদায় সার্বিকভাবে হিন্দুদের হস্তে ন্যস্ত ছিল।[১] গজনীর সুলতান মাহমুদ, দিল্লীর সুলতান কুতুবউদ্দীন আইবেক ও অন্যান্য সুলতান এই চিরাচরিত রীতি অনুসরণ করেন।

কেন্দ্রীয় সরকার গ্রাম্য প্রধানের মাধ্যমে কৃষকগণের সহিত যোগাযোগ রক্ষা করিত। এই গ্রাম্য-প্রধানকে মুকাদ্দাম[২] অথবা 'মুখিয়া'[৩] বলা হয়। মুকাদ্দাম ছিলেন গ্রামের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি। মুখিয়া একটি হিন্দু উপাধি; ইহা ফার্সী গ্রন্থপঞ্জীতে পাওয়া যায় না। কিন্তু এই উপাধি প্রাক-মুসলিম যুগে হিন্দু-ভারতে প্রচলিত ছিল। গ্রামের হিসাব রক্ষক ছিল পাটোয়ারী। সে গ্রামের রাজস্বের হিসাব নিকাশ রাখিত।[৪] পাটোয়ারী পদ স্মরণাতীত কাল হইতে প্রচলিত এবং কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে 'গোপা'[৫] নামে ইহার উল্লেখ আছে। আর একটি পদ ছিল 'খুত্'। এই পদটি কি ছিল, ইহা লইয়া বারনী, ব্লকম্যান্ ও মোরল্যাণ্ড-এর মধ্যে মতানৈক্য রহিয়াছে। মোরল্যাণ্ড সম্ভবতঃ যথার্থভাবে বলিয়াছেন যে, গ্রাম্য-প্রধান মুকাদ্দমের মতই, খুত্ সুলতানের অধীনস্থ একজন হিন্দু প্রধান ব্যক্তি ছিলেন।[৬] ভারতে মুসলিম শাসনের শুরু হইতে, মুকাদ্দম ও খুত্ উভয়েই নানা সুযোগ-সুবিধা ভোগ করিতেন এবং আরাম-আয়াসে জীবন যাপন করিতেন।[৭]

সংক্ষেপে বলা যাইতে পারে যে, সুলতানী আমলে প্রদেশিক সরকার ছিল কেন্দ্রীয় সরকারের একটি অবিকল প্রতিচ্ছবি।[৮] গভর্ণর ছিলেন সুলতানের প্রতিনিধি ও প্রদেশের প্রশাসনিক প্রধান। কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের

---

১ কুফি: চাচ-নামা (ফাতে-নামা), পৃঃ ২১০; কার্নী: তুহফাত-উল্-কিরাম, ২৫৯
২ বারনী: ফিরোজশাহী, পৃঃ ২৮৮, ২৯১।
৩ কোরায়েশী: এস. অ্যাড্মিনিস্ট্রেশন্, পৃঃ ২০৭।
৪ বারনী: ফিরোজশাহী, পৃঃ ২৮৮।
৫ কৌটিল্য: অর্থশাস্ত্র, পৃঃ ৫০, ১৭৩।
৬ মোরল্যাণ্ড: দি অ্যাগ্রেরিয়্যান্ সিস্টেম, পৃঃ ২২৫-২২৬।
৭ কোরায়েশী: এস. অ্যাড্মিনিস্ট্রেশন্, পৃঃ ২০৭-২০৮।
৮ পূর্বোক্ত, পৃঃ ১১।

অনুলিপি প্রদেশেও দেখা যায়। সাধারণতঃ প্রাদেশিক দপ্তরগুলি কেন্দ্রীয় সরকার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ছিল কিন্তু দূরবর্তী ও অসুবিধাজনক প্রদেশগুলিতে প্রাদেশিক সরকারই উহা নিয়ন্ত্রণ করিত।

ক্ষুদ্রতম প্রশাসনিক একক ছিল গ্রাম। কতকগুলি গ্রামের সমন্বয়ে পরগনা ও কয়েকটি পরগনার সমন্বয়ে শিক গঠিত ছিল। এই আমলের শেষ দিকে শিক-ই সরকার নামে অভিহিত হয়। উক্ত শাসন-ব্যবস্থার একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হইতেছে যে, দিল্লী সুলতান হিন্দু গণ্যমান্য ব্যক্তিদিগকে শাসন-ব্যবস্থার নানা পদে নিয়োগ করিয়াছিলেন। স্থানীয় শাসন-ব্যবস্থা প্রায় হিন্দুদের হাতে ন্যস্ত ছিল।

বড় বড় শহরের স্থানীয় প্রশাসন ব্যবস্থা রাজধানীর শাসন কাঠামোর ছাঁচে গড়িয়া উঠিয়াছিল। গ্রাম্য সম্প্রদায়গুলি তাহাদের প্রচলিত রীতি-নীতি, আচার-ব্যবহার মানিয়া চলিত। মুসলিম শাসকগণ তদানীন্তন প্রচলিত শাসন ব্যবস্থাকেই নিজেদের নূতন প্রয়োজন অনুযায়ী পরিবর্তনের দ্বারা উপযোগী করিয়া লইয়াছিলেন।[১]

১ কোরায়েশী: এস. অ্যাড্মিনিস্ট্রেশন, পৃ: ১১।

দ্বিতীয় খণ্ড

মোগল আমলে শাসন-ব্যবস্থা

প্রথম অধ্যায়

মোগল শাসন-ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য

মধ্যযুগীয় ভারতে মোগল শাসন-ব্যবস্থার সংগঠন, কর্মধারা, নীতি-প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের বিভিন্ন দিক পর্যালোচনা করিয়া, ইহার প্রকৃতি, বৈশিষ্ট্য ও লক্ষ্য বিশ্লেষণের মাধ্যমে কোন মন্তব্য করা এক দুরূহ কাজ। বলা বাহুল্য, ঐতিহাসিক সমসাময়িক ফার্সীতে প্রকাশিত গ্রন্থাদি ও অপ্রকাশিত মূল্যবান পাণ্ডুলিপি, তৎকালীন সরকারী নথি-পত্র, দলিল দস্তাবেজ, মুদ্রা ও শিলালিপি হইতে গবেষণামূলক তথ্যাবলী সংগ্রহ করিয়া, উহার নিরপেক্ষ বিচারের মাধ্যমে তর্কমূলক বিষয়ে স্বাধীন সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে প্রভূত জ্ঞান, পাণ্ডিত্য ও অভিজ্ঞতা প্রয়োজন।

মোগল সাম্রাজ্যের প্রশাসন পদ্ধতির শিক্ষাগত কৌতূহল ব্যতীত, ইহা আমাদের নিকট নানাভাবে আরও বেশী আকর্ষণীয়। এই ধরনের শাসন-ব্যবস্থা, রীতি-নীতি, নিয়ম-কানুন, প্রশাসনিক যন্ত্র, এমনকি উপাধি পর্যন্ত, সাম্প্রতিককালে কয়েকটি স্বাধীন হিন্দু-রাষ্ট্রে অনুসরণ করা হইয়াছে।[১] এমন কি হিন্দু ধর্মমতের রক্ষণশীলতার একজন গোঁড়া সমর্থক শিবাজীও এই মোগল শাসন-পদ্ধতি মহারাষ্ট্রে প্রথমে অবিকলভাবে প্রচলন করেন[২] এবং শুধু শেষ জীবনে তিনি তাঁহার দরবারে ফার্সী উপাধিস্থলে সংস্কৃত উপাধি চালু করিয়া, তাঁহার রাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থায় 'একটি হিন্দুধরন' প্রদানের প্রচেষ্টা করেন; কিন্তু তাঁহার রাষ্ট্রে সরকারী দপ্তরের নাম, নথি-পত্র, অধঃস্তন কর্মচারীবৃন্দের উপাধি ইত্যাদির দেশীয় সঠিক মারাঠি শব্দ না পাওয়ার জন্য ঐগুলি ইসলামী ধরনেরই রহিয়া যায়। এইভাবে মোগল শাসন-পদ্ধতি এক সময় বলিতে গেলে ভারতের সর্বত্র বিস্তার লাভ করে। আধুনিক ভারতে বৃটিশ শাসন-ব্যবস্থার কাঠামো ও সংগঠনে, মোগল প্রশাসন পদ্ধতির চিহ্ন ও প্রভাব স্পষ্ট পরিলক্ষিত হয়। বৃটিশ সরকার পুরাতন পদ্ধতির ভিত্তিতেই নূতন

---

১ যদুনাথ সরকার : মোগল অ্যাড্‌মিনিস্ট্রেশন, পৃঃ ২।

২ পূর্বোক্ত, পৃঃ ৩।

শাসন প্রণালী প্রবর্তন করেন। আমাদের বর্তমানের মূল অতীতে নিহিত। সুতরাং আধুনিক ভারতে মোগল প্রভাব উপেক্ষা করা চলে না।

প্রখ্যাত ঐতিহাসিক আচার্য যদুনাথ সরকার ভারতে মোগল সরকারের প্রকৃতি, উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সমালোচনা করিয়া, অনেক মূল্যবান কিন্তু তর্ক-সাপেক্ষ মন্তব্য করিয়াছেন, উহার সামান্য উল্লেখ করা হইল। তিনি মন্তব্য করেন যে, মোগল শাসন প্রকৃতিগতভাবে ছিল একটি সামরিক শাসন বিশেষ এবং তাহা হইলে স্বাভাবিকভাবে ইহা ছিল একটি কেন্দ্রীভূত স্বৈরতন্ত্র। তিনি আরও মন্তব্য করেন যে, জন-শিক্ষাকে সমর্থন দেওয়া রাষ্ট্রের লক্ষ্য ছিল না; শিল্প-কলা ও সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা, উৎসাহ প্রদান সম্পূর্ণরূপে সম্রাটের ব্যক্তিগত ব্যাপার ছিল। তাঁহার মতে, সংক্ষেপে বলা চলে যে, মোগল শাসন আমলে একটি আধুনিক রাষ্ট্রের সমাজ-কল্যাণ সম্বন্ধীয় কার্যকলাপাদি রাষ্ট্রের দায়িত্ব না হইয়া, গণ-সম্প্রদায়ের উপর ছাড়িয়া দেওয়া হয়। তিনি আরও বলেন যে, রাজস্ব-সংগ্রহ পুলিশ শাসন-ব্যবস্থা পরিচালনা করিয়া মোগল সম্রাটগণ সন্তুষ্ট থাকিতেন।[১] তাঁহার মতে, মোগল সরকারের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য ছিল চরমভাবে সীমিত, জড়বাদ সম্বন্ধীয় অর্থাৎ বস্তুতান্ত্রিক এবং প্রায় উচ্চ-আদর্শহীন।[২] কিন্তু মোগল শাসন-ব্যবস্থার ইতিহাস পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে এবং নিরপেক্ষ বিচারে, উক্ত চরম অভিমতে নিঃসন্দেহে আংশিক সত্যতা থাকিলেও, সম্পূর্ণভাবে উহা উদার দৃষ্টিভঙ্গিতে গ্রহণযোগ্য নহে এবং উক্ত মন্তব্যের যৌক্তিকতাও প্রমাণিত হয় না।

মোগলরা ভারতে আসিয়াছিল বিজয়ী হিসাবে, সামান্য স্বেচ্ছাচারী হওয়া অস্বাভাবিক কিছু নহে; তবে দীর্ঘ দিনের মোগল শাসন আমলে ইহা সুস্পষ্ট যে, মোগল সম্রাটগণ জন-হিতৈষী, জন-কল্যাণময়, সদয় ও বদান্য ছিল এবং তাহাদের শাসন-ব্যবস্থার মূল উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য ছিল জনসাধারণের উপকার সাধন। মোগল সম্রাটগণ এক নায়কত্বে ও স্বৈরতন্ত্রে এমনকি অকাট্যতে সম্ভবতঃ বিশ্বাসী ছিলেন; সুতরাং তাঁহাদের শাসন-ব্যবস্থায় জন-কল্যাণময়ী স্বেচ্ছাচারিতার প্রবল প্রভাব পরিলক্ষিত হওয়াই স্বাভাবিক। এক কথায়, মোগল শাসন-পদ্ধতিকে বল্গাহীন

১ সরকার: এম. অ্যাড্‌মিনিস্ট্রেশন, পৃঃ ৪-৫।

২ পূর্বোক্ত, পৃঃ ৫।

স্বৈরতন্ত্র না বলিয়া, ইহাকে জনহিতৈষী ও জ্ঞানদীপ্ত ইচ্ছাতন্ত্রে আখ্যায়িত করা যায়।[১]

মোগল বিজয়ীরা ভারতে আসিয়াছিলেন এমন একটি শাসন-পদ্ধতির গৌরবময় ঐতিহ্য লইয়া যে উহা শতাব্দীর পরীক্ষা-নিরীক্ষায় অতীব সাফল্যজনক প্রমাণিত হইয়াছিল, যেমন হইয়াছিল ইরাকের আব্বাসীয় খলিফাদের শাসন-প্রণালী ও মিশরের ফাতেমীয় খলিফাদের শাসন-পদ্ধতি। যদুনাথ সরকারের মতে, মোগল শাসন-পদ্ধতি ছিল ভারতীয় ও বহির্ভারতীয় উপকরণের একটি অপূর্ব সংমিশ্রণ, কিংবা আরও সঠিকভাবে বলা যায় যে, ইহা ছিল ভারতীয় কাঠামোতে ফার্সী-আরবীয় পদ্ধতি।[২] মোগল সরকারের প্রশাসনিক মূলনীতি, ধর্মীয় নীতি, রাজস্ব নিয়ম-কানুন, দপ্তর সংগঠন এবং কর্মচারীদের উপাধি ছিল সরাসরি বহির্ভারত হইতে আমদানিকৃত। কিন্তু ভারতে তৎকালীন প্রচলিত পুরাতন রীতি-নীতি যাহার সহিত শাসিত জনসাধারণ অধিক পরিচিত, মোগলদের দ্বারা উহা উপেক্ষিত না হইয়া প্রয়োজন অনুযায়ী উহা মোগল শাসন-ব্যবস্থায় সংমিশ্রিত হয়। স্থানীয় প্রয়োজনকে বিবেচনা করিয়া, আমদানিকৃত শাসন-প্রণালীকে উপযোগী করিয়া তুলিবার জন্য উহাকে সামান্য রূপান্তর করা হয়। বস্তুতঃপক্ষে, মোগল শাসন-ব্যবস্থার প্রধান উপাদানগুলি যতটা ছিল ইসলামী ততটা ছিল ভারতীয় ও মোগল।[৩] দরবার, ওয়াজিরাত, সামন্তপ্রথা ভিত্তিক সেনাবাহিনী ইত্যাদি খেলাফতের প্রারম্ভিক শাসন-ব্যবস্থায় পরিলক্ষিত হয় না, কিন্তু খুৎবাতে শাসনকর্তার নাম উল্লেখ, সৈন্যাধ্যক্ষ, বিচারপতি ও অর্থমন্ত্রীর পদ, সংবাদ-লেখক, জিজিয়া কর ইত্যাদি ইসলামী শাসন-ব্যবস্থা হইতে গৃহীত। মীর বখশীর পদটি অবশ্য ভারতে মোগলদের নিজস্ব।[৪]

ভারতে মোগল সরকারের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হইতেছে যে, ইহা ছিল সম্পূর্ণরূপে ধর্ম-নিরপেক্ষ।[৫] সরকারের প্রকৃতির দিক হইতে শাসন-প্রণালীতে ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদ প্রাধান্য লাভ করায়, সম্রাটগণ বিভেদ নীতির আশ্রয় না লইয়া, জনসাধারণের সকল সম্প্রদায়ের স্বার্থরক্ষার কার্যে সচেষ্ট

১ হুসাইনি: এম. অ্যাড্‌মিনিস্ট্রেশন, পৃঃ ২।
২ সরকার: এম. অ্যাড্‌মিনিস্ট্রেশন, পৃঃ ৩।
৩ হুসাইনি: এম. অ্যাড্‌মিনিস্ট্রেশন, পৃঃ ২।
৪ পূর্বোক্ত, পৃঃ ২।
৫ পূর্বোক্ত, পৃঃ ২-৩।

ছিলেন। নীতির দিক হইতে, মোগল শাসনাধীনে সকল সম্প্রদায়ের লোকই আইনের চোখে সমান ছিল।

ভারতে মোগল খান 'বড়-খান'—ইসলামী আরব শাসন-ব্যবস্থার খলিফাদের হইতে পৃথক ছিলেন। মোগল খানগণ ছিলেন কেবলমাত্র রাজনৈতিক ও সামরিক নেতা—ধর্মীয় নেতা নহে। খলিফাদের সার্বভৌমত্ব শরিয়াত আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ছিল, কিন্তু মোগল সম্রাটদের ঐ ধরনের কোন বাধা ছিল না বলিয়া অনেকে মনে করেন। সম্রাট ছিলেন শুধু রাজনৈতিক সার্বভৌম শাসন-কর্তা।[১] সম্ভবতঃ ভারতে একমাত্র আওরঙ্গজেব ব্যতীত, মোগল সম্রাটগণের কেহই ইসলামের পতাকাবাহী ও সর্বজয়ী বলিয়া দাবি করিতেন না। মোগল সম্রাটদের শাসনের মূল উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য ছিল কল্যাণব্রতী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করিয়া জনগণের মঙ্গল সাধন করা।

মোগল শাসন-পদ্ধতির আর একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, মোগল সরকারের উদ্ভব বস্তুতঃ সামরিক চরিত্রের উপর ভিত্তিশীল ছিল।[২] যদিও সময় সময় ইহা নিজেকে ভারতীয় পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাওয়াইয়া লইয়াছে, তথাপি শেষ অবধি ইহার সামরিক প্রকৃতি অক্ষুণ্ণ ছিল। মোগল শাসন-প্রণালীর একটি বিশেষ তাৎপর্য ছিল যে, সরকারের প্রত্যেক কর্মচারীকে সেনাবাহিনীর তালিকাভুক্ত করিয়া, একটি নির্দিষ্ট সংখ্যক অশ্বারোহী সৈন্যের মনসব প্রদান করা হইত এবং ঐ মনসব-ই তাহার বেতন ও পদমর্যাদার মাত্রা নির্ধারণ করিত। এইভাবে বেসামরিক কর্মচারিগণের বেতনও সামরিক পদের উপর নির্ভরশীল ছিল।[৩]

ভারতে মুসলিম শাসন-ব্যবস্থার, বিশেষ করিয়া মোগল শাসন-পদ্ধতির আর একটি বৈশিষ্ট্য ছিল যে, মোগল সম্রাটগণ অমুসলমানদিগকে সরকারী গুরুত্বপূর্ণ উচ্চপদে নিয়োগ করিতেন।[৪] মোগল রাজস্ব-ব্যবস্থায় ভারতের শতাব্দী-পুরাতন পদ্ধতি ও সনাতন নীতির প্রয়োগ পরিলক্ষিত হয় এবং সম্রাট-গণ রাজস্ব-ব্যবস্থাপনায় হিন্দু কর্মচারী নিয়োগ করেন। সপ্তদশ শতাব্দীতে

---

১ ত্রিপাঠি: এম. অ্যাড্‌মিনিস্ট্রেশন, পৃঃ ১০৬।

২ সরকার: এম. অ্যাড্‌মিনিস্ট্রেশন, পৃঃ ৮।

৩ বিশেষ আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য—দি এন্‌সাইক্লোপীডিয়া অফ ইসলাম, তৃতীয় খণ্ড, পৃঃ ৬২৭; আজিজ: মনসবদারি সিস্টেম, পৃঃ ২।

৪ বইহাকী: তারিখ-ই-বইহাকী; ইলিয়ট ও ডাওসন্: হিস্ট্রী অফ ইণ্ডিয়া, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ১২৮।

মোগল সাম্রাজ্যে সার্বিক রাজস্ব-ব্যবস্থা সনাতন হিন্দু রীতি-নীতি ও ইসলামী পদ্ধতির উপকরণের সংমিশ্রণে সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হয়।[১] আকবর জিজিয়া করের বিলোপ সাধন করিয়া এবং অমুসলমানদিগকে অধিক সংখ্যক দায়িত্বপূর্ণ সামরিক ও বেসামরিক পদে নিয়োগ করিয়া, মোগল শাসন-ব্যবস্থায় একটি প্রশংসনীয় ভূমিকা পালন করেন এবং প্রশাসনিক ক্ষেত্রে বিশেষ উল্লেখযোগ্য অবদান রাখিয়া যান।

যদুনাথ সরকার মোগল বিচার-ব্যবস্থার সমালোচনা করিয়া তীব্র মন্তব্য করেন। তাঁহার মতে, মোগলদের আইন ও বিচারের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গির বিরোধী এবং দেশে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা ও বিচারের সুষ্ঠু পরিচালনায়, মোগল সরকার ছিল সর্বাপেক্ষা দুর্বল এবং সময়ের অগ্রগতির সহিত সঙ্গতি রাখিয়া ইহার উন্নতি ও সম্প্রসারণে অসমর্থ।[২] কিন্তু অন্যান্য ঐতিহাসিকদের অভিমত হইল, বিচার-ব্যবস্থার সুষ্ঠু পরিচালনায় ন্যায়পরায়ণতা, সততা, নিষ্ঠা ও নিরপেক্ষতার নীতি অবলম্বনের জন্য, মোগলরা ভারতের ইতিহাসের বিশেষ সম্মানের স্থান অধিকার করিয়া আছেন।[৩] মোগলদের কঠোর বিচার-নীতির প্রয়োগের ক্ষেত্রে রাজস্ব-সম্পর্ক, আত্মীয়-স্বজন, বংশ বা পদমর্যাদার কোন বিবেচনা করা হইত না।[৪] মোগল আইনে এবং বিচারের ক্ষেত্রে জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সকলের সমান অধিকার ছিল। দোষী সাব্যস্ত হইলে কেহ শাস্তির হাত হইতে রেহাই পাইত না। এই নিরপেক্ষতার নীতি নিঃসন্দেহে মোগল আইন ও বিচার-ব্যবস্থার একটি প্রশংসনীয় বৈশিষ্ট্য।

পরিশেষে, কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে, ভারতে মোগল কেন্দ্রীয় শাসন-ব্যবস্থার একটি বিশেষ দিক হইতেছে, মোগল সরকারের প্রশাসনিক নীতিতে গণতান্ত্রিক উপাদানের সম্পূর্ণ অভাব।[৫] যদুনাথ সরকার বলেন যে, মোগল সরকার ছিল একটি চরম কেন্দ্রীভূত স্বৈরতন্ত্র ও স্বেচ্ছাচারিতার প্রতীক।[৬]

---

১ সরকার : এম. অ্যাড্‌মিনিস্ট্রেশন, পৃঃ ৯।
২ পূর্বোক্ত, পৃঃ ১২।
৩ হুসাইনি : এম. অ্যাড্‌মিনিস্ট্রেশন্, পৃঃ ৫।
৪ শরণ : দি প্রভিন্‌শ্‌ল গভর্নমেন্ট, পৃঃ ৩৬৭ ; তুজুক-ই-জাহাঙ্গীরী (রোজার ও বেভেরিজ কর্তৃক ইংরেজীতে অনুবাদ—মেমোয়ারস্ অফ জাহাঙ্গীর) দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ২১১।
৫ হুসাইনি : এম. অ্যাড্‌মিনিস্ট্রেশন, পৃঃ ১।
৬ সরকার : এম. অ্যাড্‌মিনিস্ট্রেশন, পৃঃ ১১।

বলা বাহুল্য, সম্রাট ছিলেন সার্বিক প্রশাসনিক যন্ত্রের প্রাণশক্তি, অর্থাৎ এক কথায়, তিনি ছিলেন নিরঙ্কুশ ক্ষমতা-সম্পন্ন শাসনকর্তা। যেখানে সরকার ছিল অনিয়ন্ত্রিত, সেখানে চূড়ান্ত ক্ষমতা ও প্রভুত্ব কেন্দ্রীভূত ছিল এক হস্তে, ইহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই।

দ্বিতীয় অধ্যায়

স ম্রা ট

ভারতে মোগল শাসন আমলে, মুসলিম-বিশ্বের খেলাফতের বৈধ সার্বভৌমত্বের প্রতি নামেমাত্র স্বীকৃতি প্রদানের প্রথার অবসান ঘটে[১] এবং বিশ্ব-বরেণ্য তৈমুরের বংশধর মোগল সম্রাটদের শাসনাধীন ভারত অবিভাজ্য মুসলিম-বিশ্বের অংশ বলিয়া আর বিবেচিত হয় না। বিশ্ব-বিজয়ী চেঙ্গিজ খানের গর্বিত বংশধর মোগল সম্রাটগণ পৃথিবীতে কাহাকেও নিজেদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া স্বীকার করেন নাই। সার্বভৌমত্ব ছিল তাঁহাদের জন্মগত অধিকার; ইহা কোন অস্পষ্ট সনাতন নিয়ম দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নহে।[২] অধিকন্তু সকল মুসলিমকে এক খলিফার শাসনাধীনে থাকিতে হইবে, এইরূপ পুরাতন মতবাদ ইতিহাসের ক্রম-বিবর্তন ও ক্রমবিকাশের দরুন, আজ অচল হইয়া পড়িয়াছে।[৩] পৌরাণিক কাহিনীতে বর্ণিত 'আলোর সন্তান'[৪] তৈমুরের মতে, যেহেতু সৃষ্টিকর্তা এক ও তাঁহার কোন অংশীদার নাই, সেইহেতু তাঁহার বিশ্বে তাঁহার প্রদত্ত 'ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি' হইবেন মাত্র একজন।[৫] শাসনকর্তার ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি সম্পর্কে জনসাধারণ অনুভব করিবে যে, তাহাদের শাসনকর্তা কাহারও প্রভাবাধীন নহে।[৬] মোগল সম্রাটগণ নিজদিগকে সর্বোচ্চ, সর্বোৎকৃষ্ট ও সর্বেসর্বা ভাবিতেন। তাঁহাদের মতে, রাজার পদমর্যাদা সৃষ্টিকর্তার দান।[৭] তাঁহাদের মধ্যে সার্বভৌমত্বের পূর্ণ বিকাশ লাভ ঘটে।

প্রথম মোগল সম্রাট বাবরের দৃষ্টিভঙ্গি ধর্মীয় প্রভাবান্বিত হওয়ার অপেক্ষা, অধিকতর রাজনৈতিক ও বাস্তবমুখী ছিল; কারণ তৈমুরের বংশধরগণ খলিফার

---

১ কোরায়েশী: এস. অ্যাড্‌মিনিস্ট্রেশন্., পৃঃ ৩৮।

২ ত্রিপাঠি: এম. অ্যাড্‌মিনিস্ট্রেশন্., পৃঃ ১০৫।

৩ ইবনে খালদুন: আল্-মুকাদ্দমাহ্, প্রথম, পৃঃ ৩৯৬; হুসাইনি: এম. অ্যাড্‌মিনিস্ট্রেশন্., পৃঃ ২৩।

৪ ত্রিপাঠি: এম. অ্যাড্‌মিনিস্ট্রেশন., পৃঃ ১০৫।

৫ হুসাইনি: তুজুক-ই-তিমুরী, পৃঃ ৮৬-৮৮।

৬ পূর্বোক্ত, পৃঃ ২২০-২২১।

৭ ইবনে হাসান: দি সেন্ট্রাল স্ট্রাকচার অফ দি মোগল এম্পায়ার্, পৃঃ ৬০।

বৈধ শ্রেষ্ঠত্বে বিশ্বাসী ছিলেন না। তাঁহারা ছিলেন মুক্ত ও স্বাধীনচেতা সম্রাট। নিম্নমানের ওসমানী খলিফাদিগকে স্বীকৃতি দিবার মত মনোবৃত্তি তাঁহাদের ছিল না, কারণ তাঁহারা নিজেদের তুলনামূলকভাবে অধিক উন্নত ও মর্যাদাসম্পন্ন বিবেচনা করিতেন। সম্রাট হুমায়ূন নিজেকে ঐশ্বরিক ক্ষমতার অধিকারী ভাবিয়া স্বর্গীয় ক্ষমতা লাভের উচ্চ দাম্ভিকতার দাবি করেন।[১] কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে, হুমায়ূন তাঁহার রাজ্যকে তাঁহার ব্যক্তিগত সম্পত্তি বলিয়া মনে করিতেন।[২]

মহামতি সম্রাট আকবরের সার্বভৌমত্বের সমস্যা ছিল বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। চেঙ্গিজ খানের মহা গর্বিত বংশধর আকবর তাঁহার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া কাহাকেও স্বীকার করিতেন না। ইহা ব্যতীত; হুমায়ুন ইতিপূর্বেই অন্য কাহারও প্রাধান্য স্বীকৃতি দিবার কোন অবকাশ রাখেন নাই। সুতরাং আকবর নিজেকে সর্বশক্তিমান সম্রাট ভাবিতেন। মনু, ভীষ্ম ও কৌটিল্য হিন্দুদের রাজনৈতিক মতবাদের উল্লেখ করিয়া বলেন যে, রাজার ক্ষমতায় ঈশ্বরত্ব, দেবত্বের উপাদান নিহিত ; মনুষ্য আকারে তিনি দেবতা।[৩] সমগ্র পৃথিবী সৃষ্টিকর্তার নিকট যেমন মস্তক অবনত করে, তেমনি সর্বশক্তিমান রাজার নিকটও মস্তক অবনত করে।[৪] আবুল ফজলের মতে, মোগল সম্রাটদের সার্বভৌমত্ব ছিল আল্লাহ হইতে নিঃসৃত আলো ও সূর্যরশ্মি বিশেষ অর্থাৎ ঐশ্বরিক জ্যোতি।[৫] মোগল সম্রাটগণ, বিশেষ করিয়া আকবর ও শাহজাহান নিজেদেরকে 'হজরত-ই-পাদশাহ্ জিল্-ই-ইলাহি'[৬]—'পৃথিবীতে আল্লাহর প্রতিবিম্ব, প্রতিচ্ছায়া', অর্থাৎ সরাসরি আল্লাহর প্রতিনিধি মনে করিতেন। আকবর মনে করিতেন যে, তিনি পৃথিবীতে আল্লাহর প্রতিবিম্বরূপে আল্লাহর নিকট হইতে প্রত্যক্ষভাবে ক্ষমতার-আলো লাভ করেন। তিনি শুধু আল্লাহকেই ভয় করেন এবং আল্লাহর প্রতি তাঁহার পূর্ণ বিশ্বাস ছিল। তিনি শুধু আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা করেন এবং আল্লাহর সাহায্য

১ ত্রিপাঠি : এম. অ্যাড্‌মিনিস্ট্রেশন্., পৃ: ১১৭ ; পারস্যে হুমায়ূনের দাম্ভিকতার মিথ্যা দাবির জন্য তাঁহাকে বিদ্রূপ করা হয়।—আফজাল-উল্-তাওয়ারিখ্ (হিস্টরি অফ দি রেন্ অফ শাহ তাহ্‌মাস্‌প্), ১১৩।

২ তাঁহার জীবন রক্ষাকারী এক ভিস্তিওয়ালাকে হুমায়ূন সাময়িকভাবে সার্বভৌম ক্ষমতা অর্পণ করিয়াছিলেন।—দ্রষ্টব্য, নিজামউদ্দীন : তবাকাত-ই-আকবরী ; হুসাইনি : এম. অ্যাড্-মিনিস্ট্রেশন্., পৃ: ২৪।

৩ ইবনে হাসান : সেন্ট্রাল স্ট্রাকচার্, পৃ: ৫৯।

৪ ইউ. এন. ঘোষাল : এ হিস্টরি অফ হিন্দু পলিটিক্যাল থিয়রিজ., পৃ: ১৮১-১৮৩।

৫ আইন, প্রথম খণ্ড, পৃ: ৩।

৬ আকবর নামা, পৃ: ১৩৬।

সরাসরিভাবে লাভ করেন। তাই তাঁহার পরিবেশে তিনি ছিলেন সর্বেসর্বা; শাসনকর্তারূপে তাঁহার ক্ষমতা ছিল অনিয়ন্ত্রিত ও অবিভাজ্য।[১] মোট কথা, তিনি ছিলেন আধ্যাত্মিক ও পার্থিব ক্ষমতার এক অপূর্ব প্রতীক। জাহাঙ্গীরও সার্বভৌমত্বকে আল্লাহর দান মনে করিতেন। জাহাঙ্গীর ও শাহজাহান অবশ্য নিজদিগকে ইসলামী আইনের ঊর্ধ্বে ভাবিতেন না।[২] আবুল ফজলের মতে, আদর্শ সম্রাটরূপে, তাঁহারা ছিলেন বুদ্ধিমান, বিদ্যোৎসাহী, নিষ্ঠাবান, ন্যায়পরায়ণ এবং ধর্মভীরু।[৩]

ইহা সর্বজনবিদিত যে, হিন্দু লেখকদের মধ্যে প্রধানতঃ মনু রাজাকে ঈশ্বরত্ব, দেবত্ব প্রদান করেন। তুর্কী, ইরানী ও মোঙ্গল সকলেই সম্রাটের স্থানকে একজন নেতার ঊর্ধ্বে মনে করেন। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, মোগল সম্রাটদের ঐশ্বরিক বা প্রায়-ঐশ্বরিক ক্ষমতা লাভের অনেক প্রমাণ আছে। ঐশ্বরিক ক্ষমতা লাভের দাবিদার সম্রাটগণ স্বেচ্ছাচারী শাসনকর্তায় পরিণত হওয়া স্বাভাবিক। ইহা অনস্বীকার্য যে, সম্রাটগণ স্বেচ্ছাচারী শাসক ছিলেন বটে, তবে তাঁহাদের স্বেচ্ছাচারিতা জনগণের মঙ্গল সাধনের আন্তরিক ইচ্ছা ও জনকল্যাণের মনোবৃত্তি দ্বারা বহুলাংশে প্রভাবান্বিত ছিল। নিঃসন্দেহে তাঁহারা ছিলেন জনহিতৈষী ও প্রজারঞ্জক সম্রাট। তাঁহাদের ছিল 'বিরাট অন্তঃকরণ' ও প্রজাবৃন্দের প্রতি 'পিতৃসুলভ ভালবাসা',[৪] অকৃত্রিম দরদ ও প্রাণভরা মমতা। সম্রাটদের মধ্যে প্রায় সকলই বিশ্বাস করিতেন যে, রাজার জন্য সর্বোৎকৃষ্ট আরাধনা হইতেছে প্রজাবৃন্দের প্রতি তাঁহার কর্তব্য ও দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করা।[৫] আল্লাহর প্রতিনিধিরূপে, আল্লাহ প্রদত্ত ক্ষমতা ও অধিকার বলে, সম্রাট রাজ্য শাসন করিতেন। সার্বভৌমত্ব একটি দান এবং সম্রাট আল্লাহর নির্বাচিত। সম্রাট পদের প্রতীক লম্বা, ঢিলা রাজকীয় পোশাক পরিধান করা তাঁহাকেই মানায়। তিনি তাঁহার পরিবেশে সবার ঊর্ধ্বে ছিলেন। তিনি ছিলেন রাষ্ট্রপ্রধান, সরকার-প্রধান, সেনাবাহিনীর সর্বাধিনায়ক, ন্যায়-বিচারের উৎস, প্রধান বিচারপতি, প্রধান আইন-প্রণয়নকারী, আইন বিধান-কর্তা, ও সাম্রাজ্যে বিধিসংগত ক্ষমতা ও প্রভুত্বের চূড়ান্ত অধিকারী।[৬]

১ আইন, তৃতীয়, পৃঃ ৬; ইবনে হাসান: সেন্ট্রাল স্ট্রাকচার, পৃঃ ৬২।
২ আবদুল হামিদ খান লাহোরী: পাদশাহ্-নামা (বাদশাহ্-নামা), প্রথম, পৃঃ ১৩০।
৩ ইবনে হাসান: সেন্ট্রাল্ স্ট্রাক্চার্, পৃঃ ৬২।
৪ আইন, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ৪।
৫ আকবর-নামা, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ৫০৭; হুসাইনি: এম. অ্যাড্মিনিস্ট্রেশন্, পৃঃ ৩০।
৬ ইবনে হাসান: সেন্ট্রাল্ স্ট্রাকচার্, পৃঃ ৬৫।

মোগল সম্রাটগণ রাজ্যশাসনের কাজে একনিষ্ঠভাবে আত্মনিয়োগ করেন এবং কর্তব্য ও দায়িত্ব পালনে তাঁহারা অতি নিষ্ঠাবান ছিলেন, ইহা সন্দেহাতীতভাবে বলা চলে। শেরশাহ ছিলেন নিজেই নিজের মন্ত্রী এবং রাষ্ট্রের কর্তব্যকাজ নিজেই সমাধা করিতেন। কিন্তু তাঁহার নিয়মিত কর্তব্য-তালিকা নির্ণয় করা সম্ভব নহে।

প্রথম মোগল সম্রাট বাবরের রাজত্বকালে মোগল সাম্রাজ্যের গোড়াপত্তনের যুগে, একটি স্থিতিশীল, স্থায়ী সরকারের উদ্ভব তখনও ঘটে নাই; সুতরাং রাজ্য শাসনের খুঁটিনাটির প্রতি দৃষ্টি রাখিবার প্রয়োজনীয়তা তিনি তখন অনুভব করেন নাই। পরবর্তী সম্রাট হুমায়ূন আমোদ-প্রমোদ বিলাসী ছিলেন বলিয়া, রাষ্ট্রের কর্তব্য-কাজে কঠোর পরিশ্রম করিতে যতটা সাধনার প্রয়োজন, উহার অভাব তাঁহার মধ্যে পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু সম্রাট আকবর শুধু সরকারের প্রশাসনিক নিয়ম-পদ্ধতি নিয়ন্ত্রণ করিয়া ক্ষান্ত হন নাই, তিনি রাষ্ট্রের কর্তব্য ও দায়িত্ব পালনে তাঁহার নিজের নিত্য-কর্তব্য-কর্মের ধারার যথাযথ তালিকা নিরূপণ করেন।[১] এত সময়-নিষ্ঠার সহিত তিনি তাঁহার নিত্য-কর্ম পালন করিতেন যে, ইহা ক্রমে মোগল রাজবংশে একটি ঐতিহ্যগত আদর্শ রীতিতে পরিণত হয়। সঠিকভাবে বলা চলে যে, আকবর রাষ্ট্রের নিত্য-কর্ম সম্পাদনের জন্য দৈনিক তিনবার নিজেকে নিয়োজিত করিতেন।[২] প্রতিদিন সকালে তিনি রাজদরবারে উপস্থিত হইলে জনসাধারণ সম্রাটের সহিত সাক্ষাৎ করিবার সুযোগ লাভ করিত। অপরাহ্নে তিনি কেন্দ্রীয় সরকারের তত্ত্বাবধানে রক্ষিত জীব-জন্তু পরিদর্শন করিতেন এবং কারখানার কাজ-কর্ম তদারক করিতেন। রাত্রিতে তিনি বেসরকারীভাবে পণ্ডিত, জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তিদের সহিত নানা বিষয়ে আলাপ-আলোচনা করিতেন। অনেক সময়, জরুরী অবস্থায়, রাষ্ট্রের সরকারী কাজও তিনি রাত্রিতে সম্পাদন করিতেন।[৩] মহান সম্রাট গভীর রাত্রিতে বিশ্রামের অবসর পাইতেন। সম্রাট জাহাঙ্গীরের নিত্য-কর্মের তালিকা তাঁহার আত্মজীবনীতে স্পষ্ট উল্লেখ নাই। বলাবাহুল্য, তিনি তাঁহার পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করেন। সম্রাট শাহজাহান রাষ্ট্রের দৈনন্দিন সরকারী কাজে অত্যধিক

১ আইন, প্রথম খণ্ড, পৃ: ১৫৫।
২ ইবনে হাসান: সেন্ট্রাল স্ট্রাকচার, পৃ: ৬৬।
৩ পূর্বোক্ত, পৃ: ৬৬।

মনোনিবেশ করেন। তাঁহার রাজত্বকালের গ্রন্থপঞ্জী লেখকগণ আবুল ফজলের অপেক্ষা অধিক সঠিকভাবে তাঁহার নিত্য-কর্মের তালিকার বিস্তারিত বর্ণনা দেন। যদুনাথ সরকারও মোগল সম্রাটের নিত্য-নৈমিত্তিক জীবন ধারার উপর প্রচুর আলোকসম্পাত করিয়াছেন।[১]

আকবর ঝরোকা-দর্শন রীতি প্রবর্তন করেন। কোন বাধা-বিঘ্ন, ব্যাঘাত ও হস্তক্ষেপ ব্যতীত, জনসাধারণকে সম্রাটের সহিত সাক্ষাৎ লাভের সুযোগ প্রদানের উদ্দেশ্যে[২] এই ঝরোকা-দর্শন প্রথার উদ্ভব ঘটে। বদায়ুনীর মতে, আকবরের প্রবর্তিত উক্ত ঝরোকা-দর্শনে হিন্দু প্রথার প্রভাব পরিলক্ষিত হয়।[৩] প্রতিদিন প্রত্যুষে সূর্যোদয়ের পরই সম্রাট ঝরোকায় উপস্থিত হইলে, সৈনিক ব্যবসায়ী, শিল্পী, কৃষক, মজদুর, দীন-দুঃখী জনসাধারণ সম্রাটের দর্শন লাভের জন্য জমায়েত হইয়া তাড়াহুড়া ও দৌড় ঝাঁপ শুরু করিত।[৪] সম্রাট প্রতিদিন ভোরবেলা প্রায় দেড় প্রহর অর্থাৎ সাড়ে চারিঘণ্টা ঝরোকা-দর্শন অতিবাহিত করিতেন।[৫] মনসারেট ঝরোকা-দর্শন প্রসঙ্গে আকবরের সময় হস্তীর লড়াইয়ের কথা উল্লেখ করেন।[৬] জাহাঙ্গীরের আমলেও উক্ত ঝরোকা-দর্শন প্রথা বলবৎ ছিল। একবার অসুস্থ অবস্থায়ও তিনি জনসাধারণকে তাঁহার দর্শন লাভ হইতে বঞ্চিত করেন নাই।[৭] দ্যা লিট্ ও হকিন্স্ তাঁহাদের বিবরণীতে জাহাঙ্গীরের ঝরোকা-দর্শনের কথা বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করিয়া বলেন যে, জনসাধারণ সম্রাটকে 'পাদশাহ সালামত'—'সম্রাট দীর্ঘজীবী হউক' বলিয়া অভিনন্দিত করিত।[৮] আবদুল হামিদ খান লাহোরীর মতে, শাহজাহান ঝরোকা-দর্শনের পর জনসাধারণের অভাব অভিযোগ শ্রবণ করিতেন এবং জনসাধারণ ন্যায় বিচার লাভ করিত।[৯] সম্রাট ঝরোকা-ই-দর্শন হইতে সোজা ঝরোকা-ই-দিওয়ানে

১ যদুনাথ সরকার : ডেলি লাইফ্ অফ দি মোগল এমপারারস্—দি মডার্ন রিভিউ, অক্টোবর ১৯০৮, পৃঃ ১৮৬-১৯১।
২ আইন, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ১৫৫ ; লাহোরী : বাদশাহ-নামা, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ১৪৫।
৩ বদায়ুনী : মুন্তাখাব-উত্-তাওয়ারিখ, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ২৩৬।
৪ আকবর-নামা, তৃতীয় খণ্ড, পৃঃ ২৫৭।
৫ পূর্বোক্ত, পৃঃ ২৫৬।
৬ মন্সারেট : কমেন্ট্যারি, পৃঃ ৬১।
৭ তুজুক-ই-জাহাঙ্গিরী, পৃঃ ২৩২।
৮ দ্যা লিট : দি এম্পায়ার অফ দি গ্রেট মোগল; প্রথম, পৃঃ ৯২-৯৩, ৯৭ ; ডাবেলইউ. হকিন্স : ট্রাভেলস্, (১৬০৮-১৬১৩); পৃঃ ১১৫।
৯ লাহোরী : বাদশাহ-নামা, প্রথম, পৃঃ ১৪৩-১৪৪।

প্রবেশ করিতেন এবং রাষ্ট্রের সরকারী কাজ সম্পাদন করিতেন।[১]

ব্যক্তিগতভাবে বিচার-কার্য পরিচালনা করার জন্য উক্ত তিনজন সম্রাটেরই সপ্তাহের একটি দিন নির্ধারিত ছিল, যেমন আকবরের বৃহস্পতিবার,[২] জাহাঙ্গীরের মঙ্গলবার [৩] এবং শাজাহানেরর বুধবার। একটি নির্দিষ্ট নিত্য-কর্ম তালিকা অনুযায়ী রাষ্ট্রের সরকারী কাজ সম্পাদন করিবার রীতি প্রবর্তন করা, নিঃসন্দেহে মোগল রাজতান্ত্রিক প্রশাসনিক-ব্যবস্থায় আকবরের এক বিশেষ অবদান। আকবরের নিয়ম-কানুন অনুসরণ করিয়া জাহাঙ্গীর এবং শাহজাহান রাষ্ট্রের সরকারী কর্তব্য ও দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করেন। যেহেতু সাম্রাজ্যে প্রশাসনিক যন্ত্রকে নিয়ন্ত্রণ ও তদারক করিবার জন্য সংবিধান অনুযায়ী কোন স্থায়ী ক্ষমতাসম্পন্ন সংসদ ছিল না, সেইহেতু সাম্রাজ্যের নিরাপত্তা বিধান, বিপদ-লঙ্ঘন ও রাজ্যের শাসন-ব্যবস্থার সুষ্ঠু পরিচালনা সম্রাটের কর্মতৎপরতা, দক্ষতা, নৈপুণ্য ও সতর্কতার উপর নির্ভর করিত। সম্রাটগণ এই গুরুদায়িত্ব অনুভব করিতেন এবং তদনুযায়ী শাসনকার্য পরিচালনা করিতেন।[৪]

অত্যন্ত ধর্মভীরু ও নিষ্ঠাবান সম্রাট আওরঙ্গজেবের রাষ্ট্রীয় নিত্য-কর্ম তালিকার প্রশংসা টেভারনিয়ার-এর ভ্রমণ কাহিনীতে উল্লেখিত আছে।[৫] যদুনাথ সরকারের মতে, সম্রাট পরবর্তীকালে ঝরোকা-দর্শন হিন্দু প্রথা বলিয়া পরিত্যাগ করেন।[৬]

সম্রাটদের রাষ্ট্রীয় নিত্য-কর্ম তালিকায়, সম্রাটের সহিত বিনা বাধায় জনসাধারণের সাক্ষাৎ লাভের সুযোগ প্রদানের প্রথা ও অন্যান্য রীতি-নীতি দেশের সার্বিক প্রশাসন-ব্যবস্থার উপর গভীর প্রভাব বিস্তার করে। সূর্যোদয়ের সাথে সাথে প্রভাতে সম্রাটের দর্শন দান হিন্দু প্রচলিত প্রথা।[৭] এই রীতি জনসাধারণের মনে আবেদনের সৃষ্টি করে এবং মানুষের মনে দোলা দেয়। দ্বিতীয়তঃ, সম্রাটের

১ ইবনে হাসান : সেন্ট্রাল স্ট্রাকচার, পৃঃ ৭৪।

২ আকবর-নামা, তৃতীয়, পৃঃ ৭১৭।

৩ দ্যা লিট : গ্রেট মোগল, পৃঃ ৯৩ ; হকিন্স : ট্রাভলস. পৃঃ১৯৬; ডাবেল্ইউ. ফিঞ্চ : ট্রাভলস্ (১৬০৮-১৬১১), পৃঃ ১৮৪।

৪ ইবনে হাসান : সেন্ট্রাল স্ট্রাকচার, পৃঃ ৮৫।

৫ টেভার্নিয়ার : আর্লি ট্রাভাল্স্ ইন্ ইণ্ডিয়া (১৬৪১-১৬৬৭) ; স্টেন্লি লেন-পুল : মেডিয়ীভ্যাল ইণ্ডিয়া আণ্ডার্ মুহামেডান্ রুল্, পৃঃ ৩৬০।

৬ যদুনাথ সরকার : স্টাডিজ ইন্ মোগল ইণ্ডিয়া, পৃঃ ৬৪ ; হুসাইনি : এম. অ্যাড্মিনিস্ট্রেশন, পৃঃ ৩৪ পাদটীকা।

৭ ইবনে হাসান : সেন্ট্রাল স্ট্রাকচার, পৃঃ ৮৭।

প্রকাশ্যে দরবার অনুষ্ঠিত হইবার রীতি শাসক ও শাসিতের মধ্যে অত্যন্ত নিবিড়, ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ও সুযোগ স্থাপনের পথ সুগম করে। পূর্বে দিল্লীর সুলতানগণ অবশ্য এই বিষয়টির গুরুত্ব উপলব্ধি করেন নাই। তৃতীয়তঃ, পূর্ণ দরবারে রাষ্ট্রীয় নিত্য-কর্ম পরিচালনার রীতি সম্রাটকে সাম্রাজ্যের সার্বিক অবস্থা উপলব্ধি করিবার সুযোগ প্রদান করে এবং ইহাতে ওয়াজির ও অন্যান্য উচ্চপদস্থ রাজকর্মকর্তাদের প্রভাব ও ক্ষমতা অনেকটা হ্রাস পায়। চতুর্থতঃ, সম্রাট গোসল-খানায় অর্থাৎ ব্যক্তিগত গোপন প্রকোষ্ঠে উপস্থিত হইলে, মন্ত্রিগণ ও দপ্তর প্রধানগণ তাঁহাকে রাষ্ট্রের জরুরী বিষয়ে পরামর্শ দিবার সুযোগ পাইতেন।

পূর্বে বলা হইয়াছে যে, রাজতন্ত্রে শাসনের সফলতা নির্ভর করে রাজার নিত্য-কর্ম পরিচালনার তৎপরতার উপর। মোগল সম্রাটগণ উক্ত তথ্যের গুরুত্ব মর্মে মর্মে অনুভব করিয়া, অত্যন্ত নিষ্ঠার সহিত রাষ্ট্রীয় শাসনকার্য পরিচালনা করিতেন। জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালের শেষ ছয় বৎসর ব্যক্তিগত ও রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা এবং নিজের ভগ্ন স্বাস্থের দরুন, তিনি রাষ্ট্র পরিচালনার কর্মদক্ষতা, উৎসাহ ও বিচারের ভারসাম্য হারাইয়া ফেলেন বলিয়া মনে হয়। পেলসারট্ মন্তব্য করেন যে, 'জাহাঙ্গীর শুধু নামেমাত্র রাজা ছিলেন'[১]; এই মন্তব্য সম্রাটের রাজত্বের কেবল শেষ কয়েক বৎসরের জন্য সম্ভবতঃ প্রযোজ্য ছিল। কিন্তু নিঃসন্দেহে শাজাহান তাঁহার পিতার অপেক্ষা রাষ্ট্রের শাসন পরিচালনায় অধিক সতর্ক ও যত্নবান ছিলেন।[২]

দিল্লীর সুলতানদের মত, মোগল সম্রাটদের শাসনকালে রাজ পরিবারের ব্যবস্থাপনা খুব বিস্তৃত ছিল না। খান সামান সম্রাটের গৃহস্থালী দপ্তরের প্রধান রূপে, এই বিভাগের সর্বকর্মের সুষ্ঠু পরিচালনায় জড়িত ছিলেন।[৩] সম্রাটদের আস্তাবল ও রাজকীয় শিকার অভিযান বিশেষ উল্লেখযোগ্য। রাজকীয় বিশিষ্ট পরিচয়-চিহ্ন ছিল 'খুৎবা', 'তিরাজ' ও 'সিক্কাহ্'। সম্রাটগণ জাঁকজমকপ্রিয় ছিলেন বলিয়া তাঁহাদের রাজদরবার, দিল্লীর সুলতানদের অপেক্ষা বেশী আড়ম্বর-পূর্ণ ছিল। তাঁহারা তাঁহাদের রাজদরবারের শিষ্টাচার ও আদব-কায়দা আরও বেশী চিত্তাকর্ষক করিয়া তোলেন। মুহম্মদ হুসাইন আজাদের রচিত দরবার-ই-আকবরীতে রাজদরবার ও 'জিশান'-এর বিস্তারিত বর্ণনা আছে। রাজদরবারের

১ পেল্সারট্: জাহাঙ্গীরস্ ইণ্ডিয়া—উদ্ধৃত হইয়াছে ইবনে হাসান: সেণ্ট্রাল স্ট্রাক্চার, পৃঃ ৯০।
২ সরকার: স্টাডিজ্, পৃঃ ১৫।
৩ মানুচী: স্তোরিয়া দো মোগোর, দ্বিতীয়, পৃঃ ৪১৯।

আদব-কায়দার মধ্যে 'কুরনিশ',[১] 'তাস্‌লিম'[২] ও 'জামিন্ বোস্'[৩] বিশেষ উল্লেখযোগ্য।[৪]

পৃথিবীর সর্বোৎকৃষ্ট অশ্ব খানসামানের তত্ত্বাবধানে মোগল রাজ-আস্তাবলে রক্ষিত থাকিত।[৫]

মোগল আমলে সম্রাটদের শিকার অভিযান বাস্তবিকই আড়ম্বরপূর্ণ অনুষ্ঠান ছিল। আকবরের আমলে রাজকীয় শিকার অভিযানের বিস্তারিত বর্ণনা স্যার ডাবেল্‌ইউ. হেগ্‌-এর আলোচনায় লক্ষ্য করা যায়।[৬]

পূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, 'খুৎবা', 'তিরাজ' ও 'সিক্কাহ্' ছিল রাজকীয় বিশিষ্ট সম্মান-পরিচয়-চিহ্ন। মুসলিম রাষ্ট্রে উক্ত তিনটি বিষয়কে স্বাধীন রাজাদের বিশেষ অধিকার বলিয়া বিবেচনা করা হইত।[৭]

খুৎবা হইতেছে 'খাতিব' প্রদত্ত ধর্মোপদেশ। দিল্লীর সুলতানগণ আব্বাসীয় খলিফাদিগকে স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন বলিয়া খুৎবাতে প্রথম খলিফার নাম এবং পরে তাঁহাদের নাম উল্লেখ করা হইত। কিন্তু মোগল শাসনের শুরু হইতেই সম্রাটগণ ওসমানী খলিফাদিগকে স্বীকার করেন নাই ; সুতরাং সমগ্র মোগল শাসনকাল ব্যাপী সম্রাটগণ কিংবা খাতিবগণ কর্তৃক সম্রাটদের নিজেদেব নাম খুৎবাতে উচ্চারিত হইত।[৮]

তিরাজ একটি ফার্সী শব্দ ; ইহার অর্থ হইতেছে সুন্দর সূচি কর্ম।[৯] রাজার লম্বা ঢিলা বহির্বাস স্বর্ণ রৌপ্য কারুকার্যখচিত ও সুন্দর সূচিকর্ম সজ্জিত থাকিত। দিল্লীর সুলতানদের মত, মোগল সম্রাটগণও তিরাজের অধিকারসম্পন্ন ছিলেন। শতাধিক রাষ্ট্রীয় কারখানায় সম্রাটদের সহস্র তিরাজ-খচিত অতি

১ 'কুরনিশ' একটি অভিবাদনের ধরন, অর্থাৎ ডান হস্তের তালু ললাটে স্পর্শ করিয়া মস্তক অবনত অবস্থায় অভিবাদন জ্ঞাপনের ভঙ্গি।—জে. এ. এস্. বি. ১৯৩৫, প্রথম খণ্ড, পৃ· ১৬৫।

২ 'তাসলিম' আরেক ধরনের অভিবাদন, অর্থাৎ ডান হস্ত-পৃষ্ঠ জমির উপর রাখিয়া, ধীরে ধীরে শান্তভাবে সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া, করতল মস্তকে স্পর্শ করিয়া অভিবাদন জ্ঞাপনের ভঙ্গি।—আইন, প্রথম, পৃঃ ১০।

৩ 'জামিন্‌ বোস্' (আক্ষরিক অর্থ ভূমি চুম্বন) একটি ভিন্ন ধরনের অভিবাদন, অর্থাৎ রাজার সম্মুখে ভূমিতে কপাল অবনত করিয়া অভিবাদন জ্ঞাপনের ভঙ্গি।—জে. এ. এস. বি, ১৯৩৫ প্রথম খণ্ড. পৃঃ ১৬৫।

৪ এস. এম. জাফর : দি কাল্‌চার‍্যাল্ অ্যাস্পেক্ট্ অফ মুসলিম রুল্ ইন ইণ্ডিয়া, পৃঃ ২০-২৯।

৫ হুসাইনি : এম. অ্যাড্‌মিনিস্ট্রেশন, পৃ. ৪০।

৬ সি. এইচ. আই. চতুর্থ খণ্ড, পৃঃ ৮৩।

৭ জায়দান : তমাদ্দুন-ই-ইসলামী, পৃঃ ৯৬ ; কোরায়েশী : এস. অ্যাড্‌মিনিস্ট্রেশন, পৃঃ ৭২।

৮ সি. এইচ. আই, চতুর্থ খণ্ড, পৃঃ ১২১-১২২।

৯ এন্‌সাইক্লোপীডিয়া অফ ইসলাম, চতুর্থ খণ্ড, পৃঃ ৭৮৫।

মূল্যবান 'খেলাৎ' তৈয়ারী হইত।[১]

সিক্কাহ্‌র আক্ষরিক অর্থ মুদ্রা। যখন বাবর ভারত জয় করেন, যখন স্বর্ণ রৌপ্যের টংকা এই দেশে প্রচলিত ছিল। বাবরের দরবারে 'শাহ্‌রুখি'[২] নামক একটি রৌপ্য মুদ্রা ব্যবহৃত হইত। আকবরের আমলে টাকশাল হইতে প্রস্তুত নানা ওজন ও মূল্যের স্বর্ণ, রৌপ্য ও তাম্র মুদ্রা লক্ষ্য করা যায়। আবুল ফজল আইন-ই-আকবরীতে ছাব্বিশ শ্রেণীর স্বর্ণ-মুদ্রা, নয় ধরনের রৌপ্য-মুদ্রা ও কতক প্রকারের তাম্র-মুদ্রার বর্ণনা দিয়াছেন।[৩] বৃটিশ ভারতীয় টাকা হইতে অনেক কম পরিমাণ খাদ্‌ মোগল মুদ্রায় মিশান হইত।[৪]

মোগল সম্রাটদের রাজকীয় ফরমান ও সীল-মোহরের বিস্তারিত বর্ণনা আবুল ফজলের আইন-ই-আকবরীতে পাওয়া যায়।[৫]

---

১ হুসাইনি: এম. অ্যাড্‌মিনিস্ট্রেশন্‌, পৃ: ৪৪।

২ কাফি খান: মুনতাখাব-উল্‌-লুবাব, প্রথম, পৃ: ৫৩; আল্‌-খুদারি: তারিখ-ই-ওমামি আল্‌-ইসলামিয়াহ্‌, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ: ৩৬৩।

৩ আইন, পৃ: ২৬-৩১।

৪ এস. এইচ. হোডিভ্যালা: হিস্টরিক্যাল স্টাডিজ্‌ ইন মোগল নিউমিজ্‌ম্যাটিকস্‌, পৃ: ১৩১।

৫ আইন, পৃ: ১৯৩।

তৃতীয় অধ্যায়

কেন্দ্রীয় শাসন-ব্যবস্থা

পবিত্র কোরআনের আইন-কানুন অনুযায়ী সার্বভৌম মুসলিম শাসনকর্তা হইতেছেন সত্যিকারের ধর্মবিশ্বাসীদের অধিনায়ক 'আমীর-উল মুমিনিন' এবং তাঁহার কর্তব্য ও দায়িত্ব সম্পাদনের জন্য তিনি মুসলিম জনসাধারণ (জমায়েত)-এর নিকট দায়ী ছিলেন। কিন্তু মোগল সম্রাটের কর্তব্য ও ক্ষমতার নিয়ন্ত্রণ করিবার জন্য, কোন সংবিধান অনুযায়ী প্রশাসনিক যন্ত্র—গণসংসদ কিংবা জনগণের নির্বাচিত মন্ত্রী-পরিষদের অস্তিত্ব তখন ছিল না। মোগল রাষ্ট্র ছিল মূলতঃ সামরিক রাষ্ট্র এবং ইহার অস্তিত্ব রক্ষার জন্য সামরিক অধিনায়করূপে সম্রাটের সর্বময় ক্ষমতা লাভের প্রয়োজন ছিল।[১]

মোগল সম্রাটদের জন্য সংরক্ষিত বিশেষ অধিকার, ক্ষমতা ও সুযোগ-সুবিধা সম্পর্কে ফার্সী সূত্র-গ্রন্থাদিতে বিস্তারিত আলোচনা রহিয়াছে। জনসাধারণ সম্রাটের উক্ত অধিকার, সুযোগ-সুবিধা অবৈধভাবে আত্মসাৎ করিলে উহা বিধিবহির্ভূত কাজ ও চরম অপরাধ বলিয়া গণ্য করা হইত। আওরঙ্গজেব রাজকীয় পদ-মর্যাদা, অধিকার ও ক্ষমতা সম্পর্কে খুবই সতর্ক ছিলেন এবং নিজের পুত্রদের দ্বারা উহার বরখেলাপ হইলে যথাযথ শাস্তি বিধান করিতে তিনি দ্বিধাবোধ করেন নাই। প্রাদেশিক শাসনকর্তাগণ যাহাতে সম্রাটের বিশেষ পদ-পুর্যাদা, অধিকার ও ক্ষমতায় হস্তক্ষেপ না করেন, সেইজন্য জাহাঙ্গীর প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের জন্য বেশ কিছু সংখ্যক রীতি-নীতি পালন করা নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন।[২]

মোগল সম্রাটদের 'নিয়মিত মন্ত্রীপরিষদ' ছিল না।[৩] ওয়াজির অথবা দিওয়ান ছিলেন সম্রাটের পরেই উচ্চপদস্থ রাজকর্মকর্তা; কিন্তু অন্যান্য কর্মকর্তা তাঁহার

১ সরকার: এম. অ্যাড্‌মিনিস্ট্রেশন্‌, পৃঃ ১৬।

২ তুজুক-ই-জাহাঙ্গীরী, পৃঃ ১০০; মির্জা নাথান (শিতাবখান): বাহারিস্তান-ই-গায়েবী (ডক্টর বোরাহ্‌ কর্তৃক ইংরেজীতে অনূদিত, গৌহাটী, ১৯৩৬), ১০৩; মুতামিদ খান: ইকবাল নামা-ই-জাহাঙ্গীরী, পৃঃ ৫৯।

৩ সরকার: এম, অ্যাড্‌মিনিস্ট্রেশন্‌, পৃঃ ১৭।

সহকর্মী হইলেও নিঃসন্দেহে তুলনামূলকভাবে নিম্নপদস্থ ছিলেন; তাঁহাদেরকে মন্ত্রী অপেক্ষা সচিবরূপেই অধিক গণ্য করা হইত। নিয়ম অনুযায়ী সম্রাট দিওয়ান-ই-খাসে রাষ্ট্রের বিষয়াদি ওয়াজিরের সহিত আলাপ-আলোচনার সময় অন্যান্য মন্ত্রী অংশ গ্রহণ করিতে পারিতেন; তবে জরুরী ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি সম্পর্কে অন্যান্য মন্ত্রীর অজ্ঞাতে শুধু সম্রাট ও ওয়াজিরই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। বলা বাহুল্য, মন্ত্রিগণ এমনকি ওয়াজির পর্যন্ত সম্রাটের ইচ্ছা-অনিচ্ছায় কোন বাধা সৃষ্টি করিতে পারিতেন না, মন্ত্রিগণ সম্রাটকে শুধু পরামর্শ দিতে পারিতেন, কিন্তু কখনও নিজেদের মতামত জোর দিয়া বলিতে পারিতেন না; কারণ তাঁহাদের চাকুরীর নিরাপত্তার অভাব ছিল এবং চাকুরীর মেয়াদ সম্রাটের ইচ্ছার উপর নির্ভর করিত। সুতরাং সম্রাট স্পষ্টভাবে ভ্রান্তপথে অগ্রসর হইতেছেন দেখিয়াও প্রতিবাদ করা বা তাঁহাকে বাধা দেওয়া মন্ত্রীদের পক্ষে অসম্ভব ছিল। যদুনাথ সরকারের মতে, মোগল কেন্দ্রীয় শাসন-ব্যবস্থা ছিল 'এক ব্যক্তির শাসন' এবং আওরঙ্গজেব সমসাময়িক লুই চতুর্দশের মত, প্রকৃতপক্ষে 'নিজেই নিজের প্রধান মন্ত্রী' ছিলেন।[১]

উপরোক্ত আলোচনা হইতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, আধুনিক অর্থে মোগল সম্রাটের কোন মন্ত্রিপরিষদ ছিল না। তাঁহার মন্ত্রিগণ ছিলেন সচিব মাত্র; তাঁহারা সম্রাটের ইচ্ছা ও আদেশ পালন করিতেন এবং উহা কার্যে পরিণত করিতেন। যদুনাথ সরকারের মতে, 'সম্রাটের শুধু ঘুমন্ত অবস্থায় মন্ত্রিগণ শাসনকার্য পরিচালনা করিতেন'।[২]

মোগল সম্রাট ছিলেন একাধারে ধর্ম ও রাষ্ট্রপ্রধান; ইহা হইতে তাঁহার সীমাহীন ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি সম্পর্কে সহজেই আন্দাজ করা যায়। এক কথায় নিঃসন্দেহে তিনি ছিলেন অনিয়ন্ত্রিত সর্বক্ষমতার অধিকারী।

ওয়াজির বা প্রধানমন্ত্রীর পদটি ছিল একটি সম্মানসূচক উপাধি[৩] এবং ওয়াজির শাসন-ব্যবস্থার কোন নির্দিষ্ট দপ্তরের জন্য ভারপ্রাপ্ত ছিলেন না। তবে নিঃসন্দেহে তিনি সর্বদাই কেন্দ্রীয় রাজস্ব-বিভাগের প্রধান ছিলেন; কিন্তু ইহা ছিলেন দিওয়ান পদের অধিকারী রূপে। সকল দিওয়ান ওয়াজির ছিলেন না এবং কোন হিন্দু দিওয়ানকে ওয়াজিরের উচ্চ উপাধি দেওয়া হইত না।

১ সরকার: এম. অ্যাড্‌মিনিস্ট্রেশন, পৃঃ ১৭-১৮।
২ পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৮।
৩ প্রধান মন্ত্রীর কার্যাবলী বিস্তারিত আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য—চন্দ্রভান ব্রাহ্মণ: চাহার-চামন

আকবরের সময় প্রধানমন্ত্রীকে ওয়াকিল উপাধি প্রদান করা হয়।[১]

উৎপত্তির দিক হইতে, ওয়াজির ছিলেন রাজস্ব-বিভাগের সর্বোচ্চ রাজকর্মকর্তা এবং ক্রমশঃ অন্যান্য কেন্দ্রীয় দপ্তর তাঁহার নিয়ন্ত্রণাধীনে আসে। শুধু যখন রাজা অযোগ্য, অক্ষম, বিলাসপ্রিয় কিংবা অপ্রাপ্তবয়স্ক হন, তখন ওয়াজির সামরিক বাহিনীও তত্ত্বাবধান করেন। সুতরাং মূলতঃ ওয়াজিরের পদ ছিল বেসামরিক এবং তাঁহার সামরিক ক্ষমতা গ্রহণ ছিল অস্বাভাবিক এবং রাজার ক্ষমতা হ্রাসের নিদর্শন স্বরূপ।[২] মোগল সরকারের অন্যান্য উচ্চপদস্থ রাজ-কর্মকর্তাদের মত ওয়াজিরকে সামরিক নেতৃত্ব দিতে হইত এবং প্রায়ই তিনি অপেক্ষাকৃত ছোট সামরিক অভিযান পরিচালনা করিতেন। বিভিন্ন রাজকীয় আড়ম্বরপূর্ণ অনুষ্ঠানে সম্রাটের প্রতিনিধিরূপে, তাঁহাকে কাজ করিতে হইত। সম্রাটের নির্দেশে, ওয়াজির নিজের নামে সরকারী চিঠি লিখিতেন, উহাতে 'হাস্‌ব-উল-হুকুম' অর্থাৎ 'হুকুম বলে' উল্লেখ থাকিত।

পূর্বে বলা হইয়াছে যে, দিল্লী সালতানাতের শেষদিকে, বিশেষ করিয়া শেরশাহের শাসন-ব্যবস্থায় অতি কেন্দ্রীয়করণের দরুন, ওয়াজির পদটি অপসারিত হয় এবং শেরশাহ নিজেই সরকার পরিচালনা করেন।[৩] কিন্তু মোগলদের কর্তৃত্ব হিন্দুস্থান অধিকৃত হইবার পর, ওয়াজিরের পদ ও ক্ষমতা পুনরুজ্জীবিত হয়। বাবরের আমলে নিজামউদ্দীন ছিলেন একজন একনিষ্ঠ, উৎস্বর্গীকৃত ও অনুগত ওয়াজির। তিনি ছিলেন সরকারের বেসামরিক, রাজনৈতিক ও আর্থিক বিষয়ের প্রধান। সম্রাটের ব্যক্তিগত উৎসাহের জন্য, তাঁহার ওয়াজিরের সামরিক বিষয়ে বিশেষ তৎপরতা ও কর্মব্যস্ততার প্রয়োজন হইত না।

কিন্তু হুমায়ুনের সময় বিশ্বস্ত, উপযুক্ত ও অনুগত ওয়াজির পরিলক্ষিত হয় না; ঐদিক দিয়া তিনি তাঁহার পিতার ন্যায় সৌভাগ্যবান ছিলেন না। সম্রাটের উৎসাহ ও উদ্দীপনার অভাবহেতু, বলিতে গেলে রাজ্যশাসনের সমস্ত ক্ষমতা তাঁহার ওয়াজির লাভ করেন। তাঁহার ওয়াজির ওয়ায়েজ মুহম্মদ সামরিক ও বেসামরিক সমস্ত বিষয়ের উপর পূর্ণ কর্তৃত্ব ও নিয়ন্ত্রণ প্রদর্শন করেন। বাবর সামরিক বিষয়ের ক্ষমতা তাঁহার ওয়াজিরকে প্রদান করেন নাই, কিন্তু হুমায়ুন

১ আইন, প্রথমখণ্ড, পৃঃ ২৬০।

২ সরকার: এম. অ্যাড্‌মিনিস্ট্রেশন্., পৃঃ ২৩।

৩ কানুন গো তাঁহার মন্তব্যের যৌক্তিকতা প্রদর্শন করিয়া বলেন যে, শেরশাহের মন্ত্রিগণ ছিলেন নেহাৎ সচিব মাত্র—তাহারা নিয়ম মাফিক শুধু নিত্য-কর্ম সম্পাদন করিতেন।—কানুন গো: শেরশাহ, পৃঃ ৩৫৯।

এই বিভাগের দায়িত্বও তাঁহার ওয়াজিরদের অর্থাৎ ওয়ায়েজ মুহম্মদ, হিন্দুবেগ ও কারাচা বেগের উপর অর্পণ করেন।

হিন্দুস্থান পুনর্দখলের পর কয়েক মাসের মধ্যে হুমায়ুন এন্তেকাল করিলে অপ্রাপ্তবয়স্ক আকবরের 'আতালিক' অর্থাৎ গৃহ-শিক্ষক বৈরাম খান মোগল সাম্রাজ্যের প্রধানমন্ত্রী 'ওয়াকিল-ই-সালতানাত' পদে অধিষ্ঠিত হইয়া, নাবালক সম্রাটের নামে সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারীরূপে রাজ্যশাসন করেন। সম্রাট ছিলেন পর্দার পশ্চাতে এবং রাজ্যশাসন ছিল প্রকৃতপক্ষে ওয়াকিলের দায়িত্ব।

মোগল সাম্রাজ্যের ওয়াকিলরূপে, অসীম ক্ষমতাসম্পন্ন প্রধানমন্ত্রীর মত বৈরাম খান কেন্দ্রীয় শাসন-ব্যবস্থা পরিচালনা করেন। কার্যতঃ তিনি ছিলেন, আল্-মাওয়ার্দীর মতানুসারে, প্রথম শ্রেণীর প্রধানমন্ত্রী অর্থাৎ 'ওয়াজির-ই-তাফয়িদ' রাষ্ট্রের অপরিসীম ক্ষমতার অধিকারী বৈরাম খান উচ্চপদস্থ রাজকর্মকর্তাদিগকে, এমনকি মন্ত্রিদেরকেও নিয়োগ ও বরখাস্ত করিতে পারিতেন। অনেক সময় সম্রাটের ব্যক্তিগত বিষয়েও সরাসরিভাবে হস্তক্ষেপ করিতে তিনি দ্বিধা করিতেন না।[১]

উত্তর-ভারতের ইতিহাসে, বৈরাম খানের মত শক্তিশালী, প্রভাবশালী ও অসীম ক্ষমতাসম্পন্ন ওয়াকিলের নজির আর দেখা যায় না। যদিও নব প্রতিষ্ঠিত মোগল সাম্রাজ্যের উন্নতি ও সমৃদ্ধির জন্য তাঁহার অবদান অনস্বীকার্য, কিন্তু তাঁহার বিচক্ষণতা ও দূরদর্শিতার অভাবে তিনি ক্রমশঃ তাঁহার প্রতি সম্রাটের দৃঢ়বিশ্বাসের মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিতে অসমর্থ হন এবং তিনি অভিজাত সম্প্রদায়ের ও জনসাধারণের সমর্থন লাভেও ব্যর্থ হন। ক্রমে ক্রমে তাঁহার আচরণ অসমর্থনীয় হইয়া পড়ে এবং তাঁহাকে প্রধানমন্ত্রীর পদ হইতে অপসারিত করা হয়। বৈরাম খানের অপসারণ প্রধানমন্ত্রীর হস্তে সর্বক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হওয়ার বিরুদ্ধে হুশিয়ারীর নিদর্শনস্বরূপ ছিল।[২] সাম্রাজ্যে ওয়াকিলের অসীম ক্ষমতার অপব্যবহারের দরুন বৈরাম খানের সঙ্গে আকবরের ব্যক্তিগত তিক্ত অভিজ্ঞতা, সম্রাটকে শিক্ষা দিয়াছিল যে একজন প্রধানমন্ত্রীর হস্তে রাজ্যশাসনের সমস্ত ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত রাখা অত্যধিক বিপজ্জনক। সুতরাং সম্রাট তাঁহার স্বীয়

---

১ ইবনে হাসান: সেন্ট্রাল স্ট্রাকচার, পৃঃ ১২৩।
২ পূর্বোক্ত, পৃঃ ১২৩।

ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার প্রয়াসে এই ওয়াকিল পদের বিলুপ্তি ঘটান।

বৈরাম খানের পদচ্যুতি ও পতনের পর, ওয়াকিলের ক্ষমতা কয়েকজন রাজকর্মকর্তাদের মধ্যে বণ্টন করা হয় এবং প্রায়ই ওয়াকিলের পদ খালি রাখা হয়।[১] কেন্দ্রীয় মোগল শাসন-ব্যবস্থায় ১৫৬০ হইতে ১৬৫৭ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত, সাতানব্বই বৎসরের মধ্যে উনচল্লিশ বৎসরের জন্য দশজন ওয়াকিল ছিলেন[২]; অবশিষ্ট বৎসরের জন্য কোন ওয়াকিল ছিলেন না। ওয়াকিলের পদে উপযুক্ত ব্যক্তি না পাওয়ার অজুহাতে আকবর প্রায় দশ বৎসরকাল কোন ওয়াকিল নিয়োগ করেন নাই। ইহাতে উক্ত পদের ক্ষমতা ও মর্যাদা চুড়ান্তভাবে হ্রাস পায়। ওয়াকালাত ও দিওয়ানি দুইটি পৃথক পদ এবং সাধারণতঃ দুই ব্যক্তি উক্ত দুই পদে অধিষ্ঠিত থাকিতেন। সময় সময় দুইটি পদকে একত্রিত করিয়া একজন দক্ষ প্রশাসকের দায়িত্বে ন্যস্ত করা হইত। আকবর মুজাফ্‌ফর খানের অধীনে দুই বৎসরের জন্য এবং জাহাঙ্গীর আসফ খান ও কাজউইনির অধীনে তিন বৎসরের জন্য উক্ত পদ দুইটি একত্রিত করেন।[৩]

মোগল সম্রাটদের অধীনে দশজন ওয়াকিলের মধ্যে, ছয়জন ছিলেন আকবরের শাসন আমলে। তাঁহাদের মধ্যে খান-ই-আজম মির্জা আজিজ কোকা দশ বৎসরকাল ওয়াকিল পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। মুন্‌'ইম খান এই পদে নিযুক্ত ছিলেন পাঁচ বৎসরকাল। আরও চারিজন ওয়াকিল পাঁচ বৎসরের জন্য নিয়োজিত ছিলেন। জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালের প্রথম চারি বৎসর ব্যতীত বস্তুতঃ-পক্ষে তাঁহার শাসন আমলে কোন ওয়াকিল ছিলেন না। শাহ্‌জাহানের রাজত্ব-কালের প্রথম চৌদ্দ বৎসর পর্যন্ত আসফ খান আবু-আল্‌-হাসান ওয়াকিল পদে নিযুক্ত ছিলেন। বলাবাহুল্য, ইহার পর হইতে ওয়াকিল পদটি প্রচলন লোপ পায়। আওরঙ্গজেব নিজেই নিজের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। তাঁহার মন্ত্রিগণ ছিলেন প্রকৃতপক্ষে 'কেরানীর মত'।[৪]

শুধু আওরঙ্গজেবের অধঃপতিত বংশধরগণের শাসন আমলে, ওয়াজিরগণ

---

১ ইবনে হাসান: সেন্ট্রাল স্ট্রাকচার, পৃ: পৃ: ১০৯।
২ পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৪০।
৩ বিস্তারিত আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য—তুজুক-ই-জাহাঙ্গীরী, পৃঃ ৪১২।
৪ সি. এইচ. আই, চতুর্থ খণ্ড, পৃঃ ৮১৮।

মধ্যযুগীয় ফ্রান্সের মেয়রদের মত, কার্যতঃ রাষ্ট্রের শাসনকর্তায় পরিণত হইয়াছিলেন।[১]

বৈরাম খানের পতনের পর, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিষয়াদির দায়িত্বভার দিল্লীর গভর্নর শিহাবউদ্দীন গ্রহণ করেন এবং পরবর্তী পর্যায় মাহাম আন্‌গা তাঁহার সঙ্গে যোগদান করেন।[২] শামসউদ্দীন আত্‌গা খানকে[৩] বৈরাম খানের পতাকা, ঢাক ও তরবারি দেওয়া হয়। মুন্‌'ইম খানকে[৪] খান-খানান উপাধিতে ভূষিত করা হয় এবং তাঁহাকে ওয়াকিলাতের দায়িত্বভার অর্পণ করা হয়। এইভাবে বৈরাম খানের ক্ষমতা, প্রতিপত্তি ও সম্মান-চিহ্ন তিন ব্যক্তির মধ্যে বণ্টন করা হয়।[৫]

মাহাম আন্‌গার মৃত্যুর পর, মুন্‌'ইম খান ও আত্‌গা খান রাজনৈতিক ও আর্থিক বিষয়াদির শাসন-ব্যবস্থায় পূর্ণ ক্ষমতা প্রয়োগ করেন।[৬]

মুজাফ্‌ফর খানের দিওয়ান পদে নিযুক্ত হইবার পর, স্বভাবতঃই রাজস্ব ও অর্থ-সম্বন্ধীয় বিষয়াদি ওয়াকিলের আওতা হইতে পৃথক করা হয় এবং ইহাতে ওয়াকিলের পদ-মর্যাদা ও ক্ষমতা বহুলাংশে হ্রাস পায়।[৭] কেন্দ্রীয় শাসন-ব্যবস্থায় চারি মন্ত্রী ও দপ্তরসমূহ[৮] নিম্নে বিস্তারিতভাবে আলোচিত হইল।

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, বৈরাম খানের অপসারণের পর, আকবর ওয়াকিলের ক্ষমতা ও কর্তব্যাদি কয়েকজন মন্ত্রীর মধ্যে বণ্টন করেন। রাজস্ব ও অর্থ মন্ত্রণালয়ের

---

১ ইবনে হাসান: সেন্ট্রাল স্ট্রাকচার, পৃঃ ২৪।

২ আকবর নামা, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ১৪৩-১৪৪, ১৭৪।

৩ আতগাখান হুমায়ূনের বিশ্বস্ত ব্যক্তি ছিলেন এবং পাঞ্জাব তাঁহার অধীনে ছিল।—আকবর-নামা, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ১৭৪।

৪ মুন্‌'ইম খান আনুগত্য সহকারে কাবুল শাসন করেন এবং তথা হইতে আসিয়া ওয়াকিলের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন।—আকবর-নামা, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ১৭৪।

৫ ইবনে হাসান: সেন্ট্রাল স্ট্রাকচার, পৃঃ ১২৫।

৬ আকবর-নামা, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ২৩০।

৭ ইবনে হাসান: সেন্ট্রাল স্ট্রাকচার, পৃঃ ১২৭; হুসাইনি: এম. অ্যাড্‌মিনিস্ট্রেশন্‌, পৃঃ ৫৯।

৮ কেন্দ্রীয় দপ্তরসমূহ:

ক) অর্থ ও রাজস্ব দপ্তর—প্রধান দিওয়ান
খ) সামরিক বিষয়ক দপ্তর—মীর বখ্‌শী
গ) সরবরাহ দপ্তর—মীর সামান (খান সামান)
ঘ) বিচার বিভাগ—প্রধান কাজী
ঙ) ধর্ম-বিষয়ক বিভাগ—সদর
চ) নৈতিক চরিত্র নিয়ন্ত্রণ—মুহ্‌তাসিব
ছ) গোলন্দাজ বিভাগ—মীর আতিশ বা দারোগা-ই-তোপখানাহ্‌
জ) গোয়েন্দা ও ডাক বিভাগ—দারোগা-ই-ডাকচৌকি।—বিশেষ দ্রষ্টব্য—সরকার: এম. অ্যাড্‌মিনিস্ট্রেশন্‌, পৃঃ ২২।

দায়িত্ব দিওয়ানকে, সামরিক বিষয়ের দায়িত্ব মীরবখ্‌শীকে, সরবরাহ বিভাগের দায়িত্ব মীরসামানকে ও ধর্মীয় বিষয়াদির দায়িত্বভার সদর-উস্‌-সুদুরকে অর্পণ করা হয়। উক্ত চারি মন্ত্রীর ক্ষমতা, কর্তব্য ও দায়িত্বাদি নিম্নে আলোচনা করা হইল।

আকবরের আমলে ওয়াজির শব্দ কদাচিৎ ব্যবহৃত হইত এবং দিওয়ান শব্দটি প্রায়ই ব্যবহৃত হইত। জাহাঙ্গীরের সময় ইহার বিপরীত নিয়ম ছিল; তখন ওয়াজির শব্দই মোটামুটি প্রচলিত ছিল। শাহজাহানের রাজত্বকালে আরও সঠিকভাবে ওয়াজির শব্দটি ব্যবহৃত হয়। ওয়াজিরকে 'দিওয়ান-ই-কুল্' [১] অর্থাৎ প্রধান দিওয়ান এবং তাঁহার দপ্তরের সহকর্মীদিগকে দিওয়ান বলা হইত।[২]

মোগল আমলে দিওয়ান ছিলেন সরকারী রাজস্ব বিভাগের প্রধান অর্থ-মন্ত্রী। সরকারী রাজস্ব দপ্তরের সভাপতিত্ব করিতেন প্রধান অর্থ-মন্ত্রী 'দিওয়ান-ই-আলা'। তাঁহার সৌজন্যমূলক উপাধি ছিল ওয়াজির। তাঁহার দুইজন সহকারীকে 'দিওয়ান-ই-তান' অর্থাৎ বেতন প্রদানের দিওয়ান এবং 'দিওয়ান-ই-খাল্‌সা' অর্থাৎ রাষ্ট্রীয় খাস জমির তদারককারী দিওয়ান বলা হইত।

নিম্নলিখিত বিষয়গুলি আলোচনা করিলে প্রধান দিওয়ানের কর্তব্য ও দায়িত্ব সম্বন্ধে সম্যক ধারণা পাওয়া যায়ঃ

(ক) প্রধান দিওয়ান ছিলেন সম্রাট ও সাম্রাজ্যের অন্যান্য রাজকর্মচারীর মধ্যস্থ ব্যক্তি।

(খ) বস্তুতঃপক্ষে, সরকারী সমস্ত নথি-পত্র তাঁহার পরীক্ষার জন্য এবং তাঁহার নিয়ন্ত্রণাধীনে সংরক্ষণের জন্য তাঁহার দপ্তরে প্রেরিত হইত। তাঁহার কার্যালয় ছিল 'পাবলিক রেকর্ড'স্ অফিস' [৩] অর্থাৎ সরকারী নথি-পত্রের দপ্তর।

(গ) সকল দপ্তরের অর্থ লেন-দেন এবং বেতন প্রদানের হিসাব-নিকাশের

---

১ দিওয়ান শব্দটি ফার্সী হইতে উদ্ভূত। ইহা পারসিকদের একটি পুরাতন প্রতিষ্ঠান ছিল। এই বিভাগে আয়-ব্যয়ের হিসাব রাখা হইত।—ই. জি. ব্রাউন: এ. লিটারারি হিস্টরি অফ পারসিয়া (১৯০১), প্রথম খণ্ড, পৃঃ ২০৮; হজরত প্রথম ওমরের (রাঃ) সময় আরব শাসন-ব্যবস্থায় অবসর বৃত্তির তালিকার বইকে দিওয়ান বলা হইত।—এন্‌সাইক্লোপীডিয়া অফ ইসলাম, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ৯৭৯; ইবনে হাসান: সেন্ট্রাল স্ট্রাকচার পৃঃ ১৪৮; দিল্লী সুলতানী আমলে ওয়াজিরের অধীনে রাজস্ব ও অর্থ দপ্তর দিওয়ান নামে অভিহিত ছিল। মোগল আমলে দিওয়ান শব্দের ব্যবহার আরও নির্দিষ্ট ছিল এবং দিওয়ান শব্দ দ্বারা অর্থ ও রাজস্ব দপ্তরের প্রধানকে স্পষ্টভাবে বুঝাইত।—হুসাইনি: এম. অ্যাড্‌মিনিস্ট্রেশন্, পৃঃ ৬০।

২ ইবনে হাসান: সেন্ট্রাল স্ট্রাক্‌চার্, পৃঃ ১৪৮।

৩ সরকার: এম. অ্যাড্‌মিনিস্ট্রেশন, পৃঃ ৩৩।

সংক্ষিপ্ত বিবরণ তাঁহার পরীক্ষা ও সমালোচনাধীন ছিল।

(ঘ) নিয়োগ, পদোন্নতি কিংবা উচ্চ বেতন প্রদানের কোন হুকুমই তাঁহার অনুমোদন ব্যতীত কার্যকরী হইত না।

(ঙ) প্রাদেশিক দিওয়ানগণ সর্বদা তাঁহার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হইতেন।

(চ) প্রায় সকল সরকারী দলিলপত্রের অনুলিপির সত্যতা প্রতিপাদন বা প্রমাণীকরণের জন্য এবং কাগজপত্রের বৈধতা সিদ্ধকরণের জন্য তাঁহার সীলমোহর ও স্বাক্ষরের প্রয়োজন ছিল।

'সিয়াহা' অর্থাৎ দৈনিক খতিয়ান বই বা অর্থপ্রাপ্তি ও প্রদানের হিসাব-নিকাশের বই এবং 'আওয়ারিজা'[১] অর্থাৎ অর্থপ্রাপ্তি ও প্রদানের একটি সংক্ষিপ্ত মোটামুটি হিসাবের বই সহ বিভিন্ন কেন্দ্রীয় দপ্তরের নানাবিধ সরকারী নথি-পত্রাদি, যেমন (ক) 'ইবতিয়া'—রাজ-অনুচরবর্গের জন্য অশ্ব ক্রয়, (খ) 'আহাদি'—ভদ্রবেশী সেনাবাহিনী, (গ) ইনাম—পুরস্কার, (ঘ) 'বাকায়া—বাকী-বকেয়া, (ঙ) 'খরচ-ই-কুল'—সাধারণ খরচাদি, (চ) সম্রাটকে নজর প্রদান, (ছ) 'আবদার-খানাহ্'—খানসামার বিভাগ, (জ) 'ভাণ্ডা-খানাহ্'[২]—গুদাম, (ঝ) 'সুখ শয্যা'[৩]—আরামদায়ক বিছানা ইত্যাদি প্রধান দিওয়ানের দপ্তরে অবশ্যই পাঠাইতে হইত।[৪]

দিওয়ান-ই-তান বা তংকার নানাবিধ কর্তব্যের মধ্যে নিম্নলিখিত বিষয়-গুলির তত্ত্বাবধান করা অন্যতম ছিল:

(ক) জমিদার-সংক্রান্ত বিষয়াদি, (খ) 'আওয়ারিজা' অর্থাৎ পরগণার অর্থ-প্রাপ্তি ও প্রদানের সংক্ষিপ্ত হিসাব, (গ) বাকী-বকেয়ার নথিপত্র, (ঘ) সুবাদারদের জায়গীর প্রদান, (ঙ) নগদ বেতন প্রদানের হুকুম ইত্যাদি। নগদ বেতন প্রদানের পরোয়ানা অর্থাৎ হুকুমপত্রে দিওয়ান-ই-তানের স্বাক্ষরের প্রয়োজন ছিল। অশ্বকে জলন্ত লৌহ দ্বারা চিহ্নিত করা ও অশ্বারোহীর সনাক্তকরণের কাগজ-পত্রে তাহাকে 'অনুমোদিত' লিখিতে হইত।[৫]

---

১ এইচ. এইচ. উইল্‌সন: গ্লোস্যারি অফ জুডিশ্যাল্ অ্যাণ্ড্ রেভিনিউ টার্মস্ পৃ: ৪৮১, ৪০।

২ পূর্বোক্ত, পৃ: ৭৩।

৩ 'সুখ-শয্যা' একটি সংস্কৃত শব্দ। ইহার অর্থ আরামদায়ক বিছানা। ১৭০১-১৭০২ সালে দরবারের সংক্ষিপ্ত ইশ্‌তাহার অনুযায়ী জানা যায় যে আওরঙ্গজেব 'সুখ-শয্যা' দাক্ষিণাত্যে লইয়া গিয়াছিলেন। বাংলাদেশের ধনী ব্যক্তিদের দ্বারা ভ্রমণে ব্যবহৃত 'সুখ-আসন' অর্থাৎ আরামদায়ক শিবিকার উল্লেখ আবুল ফজলের আইন-ই-আকবরীতে আছে।—আইন, দ্বিতীয়, পৃ: ১২২।

৪ সরকার: এম. অ্যাড্‌মিনিস্ট্রেশন্, পৃ: ৪৩।

৫ দিওয়ান-ই-তানের কর্তব্যাদির বিস্তারিত আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য—সরকার: এম. অ্যাড্‌মিনি-স্ট্রেশন্, পৃ: ৪৬-৪৮।

দিওয়ান-ই-খাল্‌সা অর্থাৎ রাজকীয় খাস জমির তদারককারী দিওয়ানের বহুবিধ কর্তব্য নিম্নে আলোচিত হইল ঃ

দিওয়ান-ই-খাল্‌সাকে সুবাদার, ফৌজদার, আমিন, দিওয়ানি কর্মচারীবৃন্দ, ক্রোরি[১], দারোগা, মুশ্‌রিফ ও তহশিলদারগণের নির্দিষ্ট কর্মস্থলে নিয়োগ করিতে হইত। পরোয়ানাতে অর্থাৎ হুকুমনামাতে প্রধান দিওয়ানকে 'সাদ্‌' অর্থাৎ '*নিভুর্ল*' এবং দিওয়ান-ই-খাল্‌সাকে '*মুলাহিজা শুদ্‌*' অর্থাৎ '*দেখিয়াছি*' লিখিতে হইত। নিম্নপদস্থ কর্মচারীদের জিজ্ঞাসাবাদের উত্তর প্রদান, চাকুরীর 'সনদ' (হুকুম-নামা), সম্রাটের পুত্র ও পৌত্রদের নগদে বেতন প্রদানের পরোয়ানা, আহ্‌ল-ই-খেদমতদের নির্দিষ্ট বেতন দেওয়ার হুকুম প্রদান প্রভৃতি দায়িত্ব দিওয়ান-ই-খাল্‌সাকে পালন করিতে হইত।[২]

নিম্নপদস্থ দিওয়ানি কর্মচারীদের প্রেরিত আয়-ব্যয়ের হিসাবপত্রের প্রয়োজন অনুযায়ী সারাংশ লিখিতভাবে দিওয়ান-ই-খাল্‌সাকে সম্রাটের নিকট পেশ করিতে হইত। জমিদারগণের কার্যাবলী ও রাজকোষাগারের নগদ টাকার পরিমাণ সংক্রান্ত প্রতিবেদন তাহাকে প্রায়ই সম্রাটের নিকট প্রেরণ করিতে হইত। 'বদর নবিসি'[৩] অর্থাৎ আপত্তিকর বা অপরিমিত হিসাবের মধ্যে যে-যে দফা বাদ দেওয়া প্রয়োজন উহাতে এবং সরকারী হিসাব পরীক্ষা-নিরীক্ষার কাগজ পত্রাদিতে, প্রধান দিওয়ানকে 'মনজুর-শুদ' অর্থাৎ 'অনুমোদিত' ও দিওয়ান-ই-খাল্‌সাকে 'মুলাহিজা-শুদ' অর্থাৎ 'দেখিয়াছি' লিখিতে হইত। রাজস্ব দপ্তরের 'নুস্‌খা' কাগজপত্রাদি অনুসন্ধান এবং 'তুমার-ই-জমা' অর্থাৎ সরকারী খাস জমির নথিপত্রাদি সংশোধন করাও দিওয়ান-ই-খাল্‌সার কর্তব্য ছিল। রাজকীয় শিবিরের আয়-ব্যয়ের হিসাব তৈয়ার এবং বেগমদের বরাদ্দ ভাতা প্রদানের কাগজপত্র সংরক্ষণ করাও তাহারই দায়িত্ব ছিল।

ওয়াকালাতের গুরুত্ব হ্রাস পাওয়ার সহিত, মোগলদের শাসন আমলে দিওয়ানের ক্ষমতা বৃদ্ধি লাভ করে। প্রায় দশ বৎসরকাল (১৫৭৯—১৫৮৯) উপযুক্ত

---

১ এক ক্রোর 'দাম্‌' অর্থাৎ আড়াই লক্ষ টাকা রাজস্ব আদায়কারীকে 'ক্রোরি' বলা হয়। এই পদটি আকবর প্রবর্তন করেন। তবে অল্পকাল পর এই পদ ইহার যথার্থ অর্থ আর বহন করিত না।—সরকার : এম. অ্যাড্‌মিনিস্ট্রেশন্‌, পৃ: ৪১-৪২ পাদটীকা।

২ সরকার ; এম. অ্যাড্‌মিনিস্ট্রেশন্‌, পৃ: ৪২-৪৫।

৩ উইল্‌সন্‌ : গ্লোস্যারি, পৃ: ৪৩।

ব্যক্তি না পাইবার অজুহাতে, আকবর কোন ওয়াকিল নিয়োগ করেন নাই। ওয়াকিলের পদ-মর্যাদা ও ক্ষমতার মূলে আকবরের এই পদক্ষেপ একটি বিরাট আঘাত হানিল। তাঁহার রাজত্বকালের শেষদিকে, অর্থ ও রাজস্ব-সংক্রান্ত বিষয়াদির দায়িত্বে ন্যস্ত দিওয়ান পদের গুরুত্ব ও তাৎপর্য ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে থাকে। প্রায় বিশ বৎসরকাল দিওয়ান পদে মুজাফ্‌ফর খান তুর্‌বতি, টোডরমল ও শাহমনসুর পর্যায়ক্রমে অধিষ্ঠিত ছিলেন। অর্থ ও রাজস্ব-শাসন ব্যাপারে অভিজ্ঞ মুজাফ্‌ফর খান ওয়াকিল বৈরাম খানের আমলে দিওয়ান রূপে কাজ করেন। বৈরাম খানের পতনের পর, তিনি পরসুরের আমিলের পদ হইতে গুরুত্বপূর্ণ দিওয়ান-ই-বুয়ুতাত[১] (সরবরাহ বিভাগের দিওয়ান) পদে উন্নীত হন। তাঁহার প্রচুর অভিজ্ঞতা ও কর্মদক্ষতার জন্য, তিনি সাম্রাজ্যের দিওয়ান পদে সম্পূর্ণ উপযুক্ত ছিলেন। বিরাট ধনিক টোডরমল তাহাকে সাহায্য করিতেন। ১৫৮২ খ্রীস্টাব্দে টোডরমল দিওয়ান পদে নিযুক্ত হন এবং রাজস্ব শাসন-ব্যবস্থার উন্নতি সাধনের জন্য একটি সন্তোষজনক পরিকল্পনা প্রণয়ন করিয়া সম্রাটের নিকট পেশ করেন। তিনি সর্তকভাবে পরীক্ষা করিয়া দেখিবার পর, রাজস্ব-সংস্কার-মূলক পরিকল্পনাটি অনুমোদন করেন।

টোডরমলের রাজস্ব-সংস্কারের কয়েকটি প্রধান বৈশিষ্ট্য[২] নিম্নে উল্লেখ করা গেল ঃ

প্রথমতঃ রাজস্ব আদায়কারীর কর্তব্যাদি নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হয় এবং অপরিমিত কর আদায়ের জন্য জরিমানা প্রদানের নিয়ম প্রবর্তিত হয়।

দ্বিতীয় নিয়মানুযায়ী, দুইজনের পরিবর্তে একজন কেরানী 'বিটিক্‌চি' নিয়োগ করা হয়।

তৃতীয় ও চতুর্থ বিধি অনুযায়ী, চাষাবাদ বৃদ্ধি ও কৃষকদের অগ্রিম নগদ ঋণ প্রদান করা হয় এবং রাজস্ব আদায়কারীদিগকে প্রতিবৎসর প্রতিবেদন পেশ করিতে হয়।

পঞ্চম ও ষষ্ঠ নিয়মানুযায়ী, ক্ষতিগ্রস্ত জমির তালিকা প্রণয়ন করিয়া প্রধান কার্যালয়ে প্রেরণ করিতে হয়।

---

১ আকবর-নামা, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ১৯৮ ; শাহনাওয়াজ খান : মা'আছির-উল্‌-ওমারা, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ২২১।

২ টোডরমলের রাজস্ব-সংস্কারের বিস্তারিত আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য—ইবনে হাসান : সেন্ট্রাল স্ট্রাক্‌চার, পৃঃ ১৬০।

সপ্তম বিধিমতে, দাঙ্গাবাজ, হাঙ্গামাকারী কৃষকগণ যাহাতে আইন মানিয়া রাষ্ট্রের অনুগত হয়, উহার ব্যবস্থা করা হয়।

অষ্টম ও নবম ধারা অনুযায়ী, খাজনা আদায়কারী পাটোয়ারী ও কোষাধ্যক্ষকে খাজনা আদায়-সংক্রান্ত উপদেশ প্রদান করা হয়।

দশম নিয়ম মতে, খাল্‌সা কর্মচারী ও জায়গীরদারগণকে দুশ্চরিত্র, অনুগত এবং যাহারা অনুগত নয় তাহাদের সম্পর্কে বিবরণী পেশ করিতে হয়।

একাদশ ধারানুযায়ী, জমির পরিমাপ নির্ধারণ দলের প্রতি বিঘা জমি মাপিবার ফি নির্ধারিত করা হয়।[১] উক্ত সংস্কারাদির ফলে কৃষকদের বোঝা বহুলাংশে লাঘব হয়।

শাহ মনসুর মূলতঃ ধনিক ব্যক্তি ছিলেন। তিনি মুশ্‌রিফ অথবা সুগন্ধ দ্রব্য সামগ্রী বিভাগের ব্যবস্থাপক রূপে সুনাম অর্জন করেন। তিনি আলী কুলি খানের ও মুন'ইম খানের দিওয়ান ছিলেন। তিনি একজন অভিজ্ঞ ও নিপুণ প্রশাসক ছিলেন, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। অর্থসংক্রান্ত বিষয়াদির প্রশাসকরূপে, তাঁহার সামর্থ্য প্রশংসনীয় ও টোডরমলের সমতুল্য। তাঁহার সর্বাপেক্ষা বড় ত্রুটি ছিল যে, তিনি সামরিক বিষয়ের গুরুত্ব ততটা উপলব্ধি করিতে অক্ষম ছিলেন। তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী টোডরমল ও মুজাফফ্‌র খান তাঁহার উক্ত দুর্বলতার সুযোগ গ্রহণ করেন। তিনি তাঁহার বিরোধীদের ষড়যন্ত্রের শিকারে পরিণত হন এবং তাঁহার প্রাণদণ্ড হয়।[২]

আকবরের আমলের পরবর্তী দিওয়ান ছিলেন যথাক্রমে কুলিজ খান, মীর ফাতেউল্লাহ্‌, খাজা শামস্‌উদ্দীন, রাই পাতর দাস, আসফ খান ও মুহম্মদ মুকিম (ওয়াজির খান)। তাঁহার রাজত্বের শেষ কিছুদিন উক্ত দপ্তরটি যুবরাজ সেলিমের দায়িত্বে ছিল।[৩]

মোটের উপর, আকবরের দিওয়ানগণ কর্মনিষ্ঠ, কর্মদক্ষ ও অনুগত ছিলেন।

আকবরের আমলের দিওয়ান মুহম্মদ মুকিম (ওয়াজির খান) জাহাঙ্গীরের আমলে উক্ত পদে কিছুদিন অধিষ্ঠিত ছিলেন। মুকিমকে বাংলাদেশে বদলী করিবার পর, নূরজাহানের পিতা গিয়াস বেগকে দিওয়ান পদে নিয়োগ করা

---

১ আকবর-নামা, তৃতীয় খণ্ড, পৃঃ ৩৮১-৩৮৩ (বেভেরিজ্‌, পৃঃ ৫৬৩-৫৬৬)

২ বদায়ূনী: মুন্‌তাখাব-উত্‌-তাওয়ারিখ, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ৬৪।

৩ আকবরের আমলে তাঁহার দিওয়ানগণের পূর্ণ তালিকার জন্য বিশেষ দ্রষ্টব্য—ইবনে হাসান: সেন্ট্রাল স্ট্রাকচার, পৃঃ ১৬৬-১৬৭।

হয় এবং তাঁহাকে ইতিমাদ্-উদ্-দৌলাহ্ উপাধি দেওয়া হয়।[১] তাঁহার পুত্রের বিদ্রোহে জড়িত থাকিবার সন্দেহে, জাহাঙ্গীর ইতিমাদ্-উদ্-দৌলাহকে ক্ষমতাচ্যুত করিয়া আসফ খানকে দিওয়ান পদে অধিষ্ঠিত করেন। পরবর্তীকালে আসফ খানকে দাক্ষিণাত্যে প্রেরণ করা হইলে আবুল হাসান তাহার স্থলাভিষিক্ত হন। ইতিমাদ্-উদ্-দৌলাহকে ক্ষমতায় পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করা হইলে, তিনি আবুল হাসানের সহিত এক যোগে দিওয়ানের দায়িত্ব পালন করেন। জাহাঙ্গীর তাঁহার রাজত্বকালের ষষ্ঠ বৎসরে নূরজাহানকে বিবাহ করিলে ইতিমাদ্-উদ-দৌলাহকে ওয়াজির ও একমাত্র দিওয়ান পদে নিয়োগ করা হয় এবং ইতিমাদ-উদ-দৌলাহ্ তাঁহার মৃত্যুকাল পর্যন্ত উক্ত পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ইতিমাদ্-উদ্-দৌলার পদোন্নতির কারণ ছিল (ক) তাঁহার ব্যক্তিগত গুণাবলী, (খ) তাঁহার কন্যার প্রভাব এবং (গ) প্রতিদ্বন্দ্বিতার অভাব।[২] জাহাঙ্গীর ইতিমাদ্-উদ্-দৌল্লাহর গুণাবলী, কর্মদক্ষতা ও নৈপুণ্যের ভূয়সী প্রশংসা করেন।[৩] সমসাময়িক লেখক মুতামিদ খান,[৪] স্যার টমাস রো, পেলসারট[৫] ও পরবর্তীকালের গ্রন্থপঞ্জী লেখক আবদুল হামিদ খান লাহোরী[৬] ইতিমাদ্-উদ্ দৌলার কর্মদক্ষতার প্রশংসা সমর্থন করেন এবং জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালের শেষদিকে সাম্রাজ্যের প্রশাসন ব্যবস্থায় নূরজাহান ও তাঁহার ভ্রাতা আসফ খানের অপরিসীম প্রভাবের উল্লেখ করেন।

ইতিমাদ্-উদ্-দৌলাহর মৃত্যুর পর, খাজা আবুল হাসান দিওয়ান পদে নিযুক্ত হন এবং জাহাঙ্গীরের মৃত্যুকাল পর্যন্ত তিনি উক্ত পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

ইহা অনস্বীকার্য যে, আসফ খানের প্রভাব, অদম্য সাহস ও কর্মবিচক্ষণতার দরুন, শাহজাহান দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। শাহজাহান আসফ খানকে ওয়াকিল পদে নিয়োগ করেন এবং তাঁহারই পরামর্শে সম্রাট ইবাদত খানকে দিওয়ান পদে নিযুক্ত করেন। ইবাদত খানকে দাক্ষিণাত্যে বদলী করিয়া,

---

১ ইহা অবশ্য জাহাঙ্গীর নূরজাহানকে বিবাহ করিবার কয়েক বৎসর পূর্বে ঘটিয়াছিল।—তুজুক-ই-জাহাঙ্গীরী (নাওয়াল কিশোর), পৃঃ ৭।

২ ইবনে হাসান: সেন্ট্রাল স্ট্রাক্চার, পৃঃ ১৭২, ১৭৭।

৩ তুজুক-ই-জাহাঙ্গীরী, পৃঃ ৩৩৯।

৪ মুতামিদ খান: ইকবাল-নামা-ই-জাহাঙ্গীরী, পৃঃ ৫৫, ৫৭।

৫ পেলসারট্: জাহাঙ্গীর্স্ ইণ্ডিয়া. পৃঃ ৫০-৫১।

৬ লাহোরী: বাদশাহ-নামা, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ৬৯; দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ৪৭৫।

সম্রাট বিশ্বস্ত পরামর্শদাতা বিদ্বান আল্লামি আফজাল খানকে দিওয়ান পদে অভিষিক্ত করেন। আফজাল খান তাঁহার মৃত্যুকাল পর্যন্ত উক্ত পদে আসীন ছিলেন। তৎপর একদা যুবরাজের সহচর ইসলাম খান আফজাল খানের স্থলাভিষিক্ত হন। ইসলাম খানকে 'দিওয়ান-ই-কুল্' বলা হইত। তাঁহাকে দাক্ষিণাত্যের গভর্নর পদে বদলী করিবার পর, সম্রাট তাঁহার প্রিয়পাত্র তরুণ সা'দউল্লাহ্ খানের ব্যক্তিগত গুণাবলী, আনুগত্য ও কর্মদক্ষতার স্বীকৃতি হিসাবে, তাঁহাকে দিওয়ান পদে নিযুক্ত করেন। তিনি নিঃসন্দেহে শাহজাহানের দিওয়ানদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বিদ্বান, কর্মনিপুণ ও সর্বশ্রেষ্ঠ দিওয়ান ছিলেন।[১] অনেকে বলেন যে, তিনি শুধু শাহজাহানেরই সর্বশ্রেষ্ঠ দিওয়ান ছিলেন না; তিনি সম্ভবতঃ মোগল দিওয়ানদিগের মধ্যেই সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন।[২] তিনি দশ বৎসরকাল উক্ত পদের দায়িত্বভার পালন করেন। তৎপর দিওয়ান পদে অস্থায়িভাবে মীরজুমলা নিয়োজিত হন। তাঁহার দাক্ষিণাত্যে বদলীর পর, রাইরায়ান ও জাফর খান যুগ্ম দিওয়ানরূপে কর্তব্য পালন করেন। জাফর খানের মালোয়াতে বদলীর পর, রাইরায়ানের একার উপরই দিওয়ান পদের দায়িত্ব অর্পিত হয়।

পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে, আওরঙ্গজেব ছিলেন নিজেই নিজের মন্ত্রী। তাঁহার মন্ত্রিগণ ছিলেন বলিতে গেলে মাত্র কেরানী বিশেষ এবং তাহারা শুধু পরোক্ষভাবে রাজাজ্ঞা ও নির্দেশাবলী যথাযথভাবে পালন করিতেন।[৩]

মীরবখশী কেন্দ্রীয় শাসন-ব্যবস্থায় সামরিক বিভাগের প্রধানরূপে, একজন উচ্চপদস্থ রাজকর্মকর্তা ছিলেন এবং সেনাবাহিনীকে তালিকাভুক্ত করা ও তাহাদিগকে বেতন প্রদান করা ছিল তাঁহার দায়িত্বের অন্যতম।[৪] মীরবখশী ভারতে মোগল শাসন-ব্যবস্থায় একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ পদ ছিল। তাঁহার আয়ত্তাধীনের এই সামরিক দপ্তরটি দিল্লী সুলতানী আমলে কেন্দ্রীয় শাসন ব্যবস্থায় দিওয়ান-ই-আরজ নামক একটি পৃথক দপ্তর রূপে পূর্বেই সংগঠিত ও প্রচলিত ছিল।

---

১ ইবনে হাসান: সেন্ট্রাল স্ট্রাকচার, পৃ: ১৯৫।
২ হুসাইনি: এম. অ্যাড্‌মিনিস্ট্রেশন্, পৃ: ৬৬।
৩ সি. এইচ. আই. চতুর্থ খণ্ড, পৃ: ৮১৮।
৪ এনসাইক্লোপীডিয়া অফ ইসলাম, প্রথম খণ্ড, পৃ: ৬০০।

গিয়াসউদ্দীন বলবন ছিলেন প্রথম দিল্লী সুলতান, যিনি সামরিক বিভাগকে পৃথক করিয়া একজন বিশেষ মন্ত্রী আরিজ-ই-মুমালিকের অধীনে ন্যস্ত করেন। নূতন সৈন্য সংগ্রহ করিয়া তালিকাভুক্ত করা, সেনাবাহিনীর রক্ষণাবেক্ষণ, সামরিক প্রশিক্ষণ প্রদান, অশ্ব পরিদর্শন, নিয়মিত সামরিক কুচকাওয়াজ ও রণকৌশল প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা, সামরিক অভিযানের প্রস্তুতি গ্রহণ ইত্যাদির দায়িত্ব তাঁহাকে অর্পণ করা হয়।[১]

মীরবখশী ব্যতীত আরও অধীনস্থ বখশী ছিলেন। আবুল ফজলের আইন-ই-আকবরীতে বখশীগণের উল্লেখ আছে, কিন্তু বখশীদের কোন নির্দিষ্ট সংখ্যা বলা নাই। জাহাঙ্গীরের আমলে একজন মীরবখশী ও দুইজন বখশী (যাহারা পরবর্তী সময় দ্বিতীয় ও তৃতীয় হইয়াছিলেন) ছিলেন। 'বখশী-ই-হুজুর,' 'বখশী-ই-আহাদি' ও 'বখশী-ই-শাগিরদ্ পেশাহ্' এর উল্লেখ করা যায়।[২] আকবর ও জাহাঙ্গীরের অধীনে প্রধান বখশীকে মীরবখশী এবং সাহায্যকারীদিগকে বখশী বলা হইত। শাহজাহানের আমলে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় বখশীর নাম পাওয়া যায়।

মোগল সরকারের প্রত্যেক রাজকর্মকর্তাকে নির্দিষ্ট সংখ্যক অশ্বারোহীর নেতা বলিয়া গণ্য করা হইত। তাহার বেতন ও পদ-মর্যাদা নির্ধারণের সুবিধার্থে, উক্ত উপাধি তাহাকে দেওয়া হইত। সুতরাং নিয়ম অনুযায়ী বেসামরিক কর্মকর্তাগণও সামরিক দপ্তরের অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং সামরিক বিভাগের বেতন প্রদানকারী কর্মকর্তার দ্বারা সকল কর্মকর্তাদের বেতনের বিল অনুমোদিত হইত। সাম্রাজ্য বিস্তার লাভের সহিত ক্রমশঃ বেতন প্রদানকারী বখশীর সংখ্যাও বৃদ্ধি পায় এবং আওরঙ্গজেবের আমলে সাম্রাজ্যের সর্বপ্রধান বেতন প্রদানকারী মীরবখশীর অধীনে দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ বখশী নামে আরও তিনজন সাহায্যকারী ছিলেন।[৩] আকবরের অধীনে লস্কর খান, শাহবাজ খান কম্ভু, আসফ খান কাজওইনি ও শেখ ফরিদ মীরবখশী ছিলেন। জাহাঙ্গীরের আমলে ওয়াজির-উল্-মুলক, খাজা আবু হাসান, সাদিক খান ও ইবাদত খান মীরবখশী ছিলেন। শাহজাহানের সময় ইসলাম খান, মীরজুমলা, মুতামিদ

১ ইবনে হাসান: সেন্ট্রাল স্ট্রাক্চার, পৃ: ২১৩।
২ হুসাইনি: এম. অ্যাড্মিনিস্ট্রেশন, পৃ: ৬৭।
৩ সরকার: এম. অ্যাড্মিনিস্ট্রেশন, পৃ: ২৪-২৫।

খান, সালাবত খান, আসালত খান, জাফর খান ও খলিলউল্লাহ্ খান মীর-বখশী ছিলেন।[১]

মোগল কেন্দ্রীয় সরকারের প্রশাসনিক কাঠামোতে মীরবখ্শী ছিলেন একটি উচ্চপদের অধিকারী। মোগল সাম্রাজ্যে মীরবখশী কেন্দ্রীয় সামরিক দপ্তরের প্রধানরূপে সুলতানী আমলের দিওয়ান-ই-আরজের সমস্ত ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন; কিন্তু তাঁহার প্রভাব-প্রতিপত্তি নিজের দপ্তরের বাহিরেও বিস্তারিত ছিল এবং রাজদরবারে সম্রাটের নৈকট্য লাভের দরুন, তাঁহার পদ-মর্যাদা আরও বৃদ্ধি পায়।

প্রত্যেক স্তরের মনসবের নিয়োগের হুকুমপত্র এবং রাষ্ট্রের বিভিন্ন পদে, যথা ওয়াকিলাত, ওয়াজিরাত ও সাদারাত নিয়োগের হুকুমপত্র মীরবখশীর মাধ্যমে কার্যকরী হইত। সকল ফরমান, পরোয়ানা ও বরাত-এ সাম্রাজ্যের দিওয়ানের সীলমোহরের সহিত, মীরবখশীর সীল মোহরেরও প্রয়োজন ছিল।[২] এইভাবে তাঁহার প্রভাব কেন্দ্রীয় সরকারের সকল দপ্তরের উপর বিস্তৃত ছিল।

সামরিক দপ্তরের প্রধানরূপে, রাজদরবারে মীরবখ্শীর উপস্থিতি অপরিহার্য ছিল। রাজদরবারে সিংহাসনের ডান পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া, তিনি সম্রাটের নিকট তাঁহার দপ্তরের সমস্ত বিষয়ের কাগজপত্র পেশ করিতেন। তিনি সকল চাকুরী-প্রার্থীকে রাজদরবারে বিবেচনার জন্য উপস্থাপিত করিতেন। ইরানী, তুর্কী, হিন্দী ও কাশ্মিরী যাহারা চাকুরী প্রার্থী ছিল, তাহাদের বেতন নিয়মানুযায়ী নির্ধারিত হইবার পর, তাহাদিগকে অন্যান্য বখশী সম্রাটের সম্মুখে উপস্থিত করিতেন।[৩]

নূতন নিয়োগের ক্ষেত্রে 'দাগ' ও 'তাশিমা' অর্থাৎ জ্বলন্ত লৌহ দ্বারা চিহ্নিতকরণ ও সত্য প্রতিপাদনের পর এবং স্থায়ী সরকারী কর্মকর্তাদের ক্ষেত্রে নিয়মিত বিরতির পর, মনসবদারদের সৈন্য ও অশ্ব বখশীগণ সম্রাটের নিকট হাজির করিতেন।[৪]

---

১ মীরবখ্শী ও অন্যান্য বখশীর পূর্ণ তালিকার জন্য দ্রষ্টব্য—ইবনে হাসান: সেন্ট্রাল স্ট্রাকচার পৃ: ২৩০-২৩১।

২ আইন, প্রথম, পৃ: ১৯৩-১৯৫ (ব্লকম্যান, পৃ. ২৬০-২৬৩)

৩ এই কর্তব্যটি অন্যান্য বখশীও পালন করিতে পারিতেন। প্রধান বখশীর উপস্থিতির প্রয়োজন ছিল না। এই ক্ষেত্রে 'বখ্শিয়ান' শব্দটি ব্যবহৃত হইয়াছে।—আইন, পৃ: ১৯১।

৪ আইন, পৃ: ১৫৮।

রাষ্ট্রের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা—যাহারা প্রদেশ হইতে রাজধানীতে আসিয়াছেন কিংবা রাজধানী ছাড়িয়া নিজ নিজ কর্মস্থলে যাইতেছেন—তাহাদিগকে এবং বিভিন্ন দেশের রাজদূত ও বিদেশী সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদিগকে, মীরবখশী সম্রাটের নিকট উপস্থিত করিতেন। এই প্রসঙ্গে, হকিন্স তাঁহাকে 'লেফটেন্যান্ট-জেনারেল'[১] বলিয়া আখ্যায়িত করেন।

রাজপ্রাসাদের প্রহরীদের সহিত মীরবখশী সংশ্লিষ্ট ছিলেন। সুতরাং তিনি প্রহরীদিগকে সম্রাটের নিকট পুরস্কার প্রদানের জন্য হাজির করিতেন। সম্রাট তাহাদিগকে হস্তী, অশ্ব ইত্যাদি পুরস্কার দিতেন। ইহা ব্যতীত, মীরবখশীকে প্রহরী ও মনসবদারদের পূর্ণ তালিকা রাখিতে হইত এবং সম্রাটের নিকট উহা পেশ করিতে হইত।

মীরবখশী গোপনীয় প্রকোষ্ঠে সম্রাটকে সঙ্গ দান করিতেন এবং জরুরী সভা চলাকালীন সময়ে তাহাকে সর্বদা উপস্থিত থাকিতে হইত। ইহা হইতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, সাম্রাজ্যের জরুরী ও গুরুত্বপূর্ণ সর্ববিষয়ের সহিত তিনি নিবিড়ভাবে জড়িত ছিলেন।

মীরব্‌খশী বিভিন্ন প্রদেশ হইতে ওয়াকিয়ানবিশ দ্বারা প্রেরিত সংবাদ-বিবরণী গ্রহণ করিতেন, এবং সম্রাটের নিকট উহা পেশ করিতেন। এইভাবে প্রদেশের সহিতও তাঁহার সম্পর্ক ছিল; ইহাতে রাজধানীতে তাঁহার প্রভাব আরও বৃদ্ধি পাইয়াছিল।

সামরিক দপ্তরের প্রধান এবং সম্রাট ও মনসবদারদিগের মধ্যে প্রধান সংযোগ-সূত্র রূপে, মীরবখশী ভ্রমণ, প্রমোদ-বিহার ও শিকার অভিযানে সম্রাটের সঙ্গী হইতেন।

যুদ্ধক্ষেত্রেও মীরবখশী ও তাঁহার সহকর্মী বখশীদিগের নানা দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করিতে হইত। সেনাবাহিনীর প্রত্যেক বিভাগের সহিত একজন পৃথক পৃথক বখশী নিয়োজিত থাকিতেন। যুদ্ধকালীন অবস্থায় সৈন্যদের মধ্যে ঋণদান, অগ্রিম অর্থপ্রদান ও বেতন প্রদান সংশ্লিষ্ট বখশীর প্রধান কর্তব্য ছিল। প্রধান বখশী ও সহকারী বখশীগণ অন্যান্য সামরিক কর্মকর্তাদের মতে, যুদ্ধে সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করিতেন।[২]

---

১ হকিন্স: ট্রাভল্‌স্, পৃঃ ১১৫।
২ ইবনে হাসান: সেন্ট্রাল স্ট্রাক্‌চার, পৃঃ ২২৪-২২৫।

বিবিধ বিষয়ে তাঁহার সীলমোহর ও স্বাক্ষর-সম্বলিত 'দস্তক' [১] অর্থাৎ প্রমাণপত্র, মীরবখশীকে প্রদান করিতে হইত, যেমন, (ক) মনসব, মঞ্জুরী, যুবরাজ, সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি, আমীর ওমারাহের বেতন-বৃদ্ধি অনুমোদন, (খ) জ্বলন্ত লৌহ দ্বারা অশ্ব-চিহ্নিতকরণ, (গ) রাজপ্রাসাদের প্রহরীদের কর্তব্য বণ্টন, (ঘ) সৈন্য সমাবেশ, (ঙ) বখশী, ওয়াকিয়া-নবিশ, দারোগা, আমিল, মুশরিফদের নিয়োগ ও বদলী ইত্যাদি।

এতদ্ব্যতীত, মীরবখশীকে বিভিন্ন সরকারী কাগজপত্র, নথিপত্র তাঁহার দপ্তরে সংরক্ষণ করিতে হইত, যেমন (ক) সেনাবাহিনীর পৃথক পৃথক বিভাগের তালিকা, (খ) উচ্চপদস্থ রাজকর্মকর্তা ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের তালিকা, (গ) প্রদেশ হইতে ওয়াকিয়া-নবিশ কর্তৃক প্রেরিত বিবরণ, (ঘ) রাজধানী ও বিভিন্ন প্রদেশে নিয়োজিত মনসবদারদের পূর্ণ তালিকা, (ঙ) বেতন-বিল সংক্রান্ত তালিকা [২] ইত্যাদি।

সামরিক দপ্তরের প্রধানরূপে মীরবখশী ছিলেন মনসবদারগণের প্রধান প্রতিনিধি, কিন্তু তিনি সাম্রাজ্যের সামরিক বাহিনীর প্রধান সেনাপতি ছিলেন না, কিংবা পদবলে তিনি কোন সামরিক অভিযানও পরিচালনা করিতে পারিতেন না। গুরুত্বপূর্ণ সামরিক অভিযানে, যুদ্ধক্ষেত্রে সম্রাট কিংবা উচ্চ-পদস্থ আমীরের উপস্থিতির দরুন, সেনাবাহিনীতে মীরবখশীর প্রভাব বহুলাংশে হ্রাস পায়। মীরবখশীকে সাধারণতঃ সামরিক বাহিনীর প্রধান বেতন প্রদান-কারী বলা হইত; কিন্তু বেতন প্রদান করা তাঁহার নিয়মিত ও স্থায়ী কর্তব্যাদির অংশ ছিল না। সেনাবাহিনী যখন কোন যুদ্ধে লিপ্ত থাকিত, তখনই শুধু তিনি এই অর্থসংক্রান্ত ব্যাপারে জড়িত থাকিতেন।

মীরবখশী পদের বৈশিষ্ট্য, কর্তব্যাদির প্রকৃতি ও ধরন বিবেচনা করিলে দেখা যায় যে, মীরবখশী ছিলেন মূলতঃ একজন সামরিক ব্যক্তি; তবে ইহাও সত্য যে, রাজদরবারে তাঁহার সমভাবে জরুরী দায়িত্বাদির বিবেচনা করিলে, তাঁহাকে একজন সংস্কৃতিমনা ও বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তি বলিয়াও মনে হওয়া স্বাভাবিক।

পরিশেষে, বলা যায় যে, ক্ষমতা, পদ-মর্যদা ও প্রভাব-প্রতিপত্তির দিক হইতে, মীরবখশী প্রধান দিওয়ানের সমতুল্য ছিলেন। [৩] মোগল কেন্দ্রীয় শাসন-

১ ইবনে হাসান, পৃঃ ২২৬।
২ পূর্বোক্ত, পৃঃ ২২৭।
৩ ইবনে হাসান: সেন্ট্রাল স্ট্রাকচার, পৃঃ ২৩১।

ব্যবস্থায় প্রশাসনিক কর্তব্যাদি মন্ত্রীদের মধ্যে এমনভাবে বণ্টন করা হইয়াছিল যে, কেহ কাহারও উপর আধিপত্য বিস্তার করিতে পারিতেন না।

মোগল শাসনের প্রারম্ভিক কালে কেন্দ্রীয় সরবরাহ বিভাগ দিওয়ান-ই-বুয়ুতাত[১] নামে অভিহিত ছিল এবং এই দপ্তরটি একজন নিম্নপদস্থ দিওয়ানের-অধীনে ছিল। ক্রমে এই কেন্দ্রীয় দপ্তরটি বৃহৎ আকারে পরিণত হয় এবং ইহার গুরুত্ব দ্রুত বৃদ্ধি পায়। এমতাবস্থায় জাহাঙ্গীরের আমলে, সরবরাহ দপ্তরের প্রধান একজন কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর পদ-মর্যাদা লাভ করেন এবং তিনি মীরসামান নামে অভিহিত হন। মোগল কেন্দ্রীয় প্রশাসনিক কাঠামোতে, ওয়াকিল ছিলেন প্রধান মন্ত্রী, দিওয়ান ছিলেন অর্থ ও রাজস্ব মন্ত্রী এবং মীরবখশী ছিলেন যুদ্ধ ও প্রতিরক্ষা মন্ত্রী—তেমনি জাহাঙ্গীর ও শাহজাহানের আমলে মীরামান ছিলেন সরবরাহ মন্ত্রী এবং আওরঙ্গজেবের সময় তিনি 'খানসামান' নামে পরিচিত ছিলেন।

মীরসামান শব্দটি আকবরের আমলে আদৌ ব্যবহৃত হয় নাই। আবুল ফজলের আইন-ই-আকবরীতে মীরসামানের কর্তব্য ও দায়িত্ব সম্পর্কে কোন উল্লেখ নাই এবং তাঁহার ক্ষমতার কোন ব্যাখ্যা নাই।[২] আকবরনামাতেও ইহার কোন বিশেষ উল্লেখ নাই।

জাহাঙ্গীরের আমলে সরবরাহ মন্ত্রী বুঝাইতে মীরসামান শব্দটি সর্বদাই ব্যবহৃত হইয়াছে এবং মীরজুমলার 'খিদমত-ই-খানসামোনি'[৩] পদে নিয়োগের সময় শুধু একবার খানসামান শব্দটি ব্যবহৃত হইয়াছিল।

শাহজাহানের সময় সরবরাহ মন্ত্রীর নিয়োগ-আদেশে কিংবা তাঁহার বহুবিধ কর্তব্য ও দায়িত্বের উল্লেখ করিতে গিয়া সমসাময়িক লেখক মীরসামান শব্দটি সকল সময় ব্যবহার করিয়াছেন।

আওরঙ্গজেব আলমগীরের রাজত্বকালে দস্তুর-উল্-আমলে সর্বদাই সরবরাহ মন্ত্রীকে খানসামান বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। মুহম্মদ শাহের শাসন আমলে রচিত তারিখ-ই-শাকির খানিতেও খানসামান শব্দটি সর্বত্র ব্যবহৃত

---

১ 'বুয়ূতাত' আরবী 'বয়িত' শব্দ হইতে উদ্ভূত; অর্থ হইতেছে বাড়ী। মোগল ভারতে ইহা একজন কেন্দ্রীয় কর্মকর্তার উপাধি ছিল। তিনি মৃত ব্যক্তির সম্পত্তির বিবরণ লিপিবদ্ধ করিতেন, যাহাতে রাষ্ট্রের প্রাপ্য আদায় করিতে সুবিধা হয় এবং মৃত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীর সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ হয়।—সরকার : এম. অ্যাড্মিনিস্ট্রেশন্, পৃঃ ৫৩।

২ সরকার : এম. অ্যাড্মিনিস্ট্রেশন, পৃঃ ২৫-২৬।

৩ তুজুক-ই-জাহাঙ্গীরী, পৃঃ ৩১৪।

হইয়াছে। তবে ইহা সত্য যে, মোগল আমলের বেশীর ভাগ সময়ই, সমসাময়িক লেখকগণ কেন্দ্রীয় সরবরাহ মন্ত্রীকে মীরসামান নামে উল্লেখ করিয়াছেন।

খানসামান রাজকীয় গৃহস্থালী সংগঠন ও সরবরাহ দপ্তরের প্রধান তত্ত্বাবধায়ক রূপে, মোগল আমলে একজন বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কর্মকর্তা ছিলেন। সম্রাটের ভ্রমণ, প্রমোদ-বিহার ও শিকার অভিযানে খানসামান সম্রাটের সঙ্গী থাকিতেন। মানুচী বলেন যে, খানসামান রাজপরিবারের প্রয়োজনীয় ছোট-বড় সকল সামগ্রী সরবরাহ ও ব্যয়ের দায়িত্বে ন্যস্ত ছিলেন।[১] আওরঙ্গজেবের সময় সম্রাটের ব্যক্তিগত দাস-দাসীরা খানসামান অর্থাৎ প্রধান তত্ত্বাবধায়কের নিয়ন্ত্রণাধীনে ছিল এবং প্রধান তত্ত্বাবধায়ক সম্রাটের দৈনন্দিন খরচ পত্রাদি, খাদ্য, তাঁবু, শিবির, ভাণ্ডার, গুদাম ইত্যাদি তদারক করিতেন। স্বভাবতঃই খানসামান সম্রাটের বিশ্বাসভাজন ছিলেন; স্বাভাবিক কারণেই খানসামানদের মধ্য হইতে ওয়াজির নিয়োগ করিবার উদাহরণও পাওয়া যায়।[২]

কোন কোন ঐতিহাসিক খান সামানকে মোগল কেন্দ্রীয় প্রশাসনিক কাঠামোতে দিওয়ানের পরেই পদ-মর্যাদা দিয়াছেন। বাস্তবিকপক্ষেই, তিনি ছিলেন 'খরচপত্রাদির দিওয়ান'। বিভিন্ন কারখানার বিভিন্ন খাতে বাৎসরিক খরচের একটি বিবরণী তাঁহাকে রাখিতে হইত। তাঁহাকে সরকারের প্রয়োজনীয় জিনিস-পত্র খরিদ করিয়া সরবরাহ করিতে হইত। সরকারী উৎসব অনুষ্ঠানে উপহার, উপঢৌকন প্রদানের উপযোগী মনোরম সামগ্রী তাঁহাকে খরিদ করিতে হইত।

দস্তুরে খানসামানের বহুবিধ কর্তব্য[৩] বর্ণিত আছে, যথা (ক) শ্রমিক, মজুর ও কর্মচারীদের বেতনের বিল সত্যায়ন, (খ) বিভিন্ন কারখানার দারোগা, আমিন, মুশরিফ ও তহশিলদারদের প্রথম নিয়োগ, বদলী ও পদচ্যুতি, (গ) কারখানা ও কোষাগার পরিচালনার জন্য নিয়ম-কানুন প্রণয়ন, (ঘ) নিম-গাশত্ ও পাও-গাশ্ত পরিদর্শন, (ঙ) কারখানার ব্যবস্থাপক ও কর্মচারীদের নিকট হইতে অঙ্গীকারপত্র গ্রহণ, (চ) গবাদি গৃহপালিত পশুর প্রাত্যহিক খোরাক বরাদ্দকরণ, (ছ) কারখানা হইতে জিনিস-পত্র ধার লইবার অনুমতিপত্র প্রদান,

১ মানুচী: স্তোরিয়া দ্যো মোগোর, দ্বিতীয়, পৃঃ ৪১৯; সরকার: আওরঙ্গজেব, তৃতীয় খণ্ড, পৃঃ ৭৯।

২ মীরসামান 'দিওয়ান-ই-বুয়্‌তাত' সহ সাম্রাজ্যের দিওয়ানের অধীনস্থ ছিলেন।—ইবনে-হাসান: সেন্ট্রাল স্ট্রাক্‌চার, পৃঃ ২৩৭ পাদটীকা।

৩ সরকার: এম. অ্যাড্‌মিনিস্ট্রেশন্, পৃঃ ৫২-৫৩।

(জ) যুবরাজদের বিবাহ অনুষ্ঠানাদির বন্দোবস্তকরণ ইত্যাদি।

কেন্দ্রীয় সরবরাহ মন্ত্রণালয়ের সুষ্ঠু পরিচালনার দায়িত্ব নির্ভর করিত দপ্তরের প্রধান প্রশাসনিক কর্মকর্তা মীরসামানের উপর। তাঁহাকে সাহায্য করিবার জন্য এই বিভাগের আরও কর্মকর্তা নিয়োজিত ছিলেন।[১]

"দিওয়ান ই-বুয়ূতাত': উচ্চপদ-মর্যাদাসম্পন্ন কর্মকর্তারূপে, তিনি মুখ্যভাবে এই দপ্তরের আর্থিক দিকের জন্য দায়ী ছিলেন।

নাজির: এই বিভাগের পদ-মর্যাদার দিক হইতে নাজির ছিলেন দিওয়ানের ঠিক পরেই। এই দপ্তরের প্রশাসনিক বিষয় অপেক্ষা আর্থিক বিষয়ের সহিত তিনি অধিক জড়িত ছিলেন।

'মুশ্‌রিফ-ই-কুল ও জুজ': মুশ্‌রিফ-ই কুল্‌ ও জুজ্‌ বলিতে আক্ষরিকভাবে বুঝায় পূর্ণ ও আংশিক হিসাব রক্ষক, অর্থাৎ তিনিই ছিলেন এই দপ্তরের প্রধান হিসাব রক্ষক।

দারোগা: প্রত্যেক কারখানার জন্য একজন দারোগা ছিলেন। তাঁহাকে কারখানার শ্রমিক ও কারিগরদের সহিত সরাসরিভাবে যোগাযোগ রক্ষা করিতে হইত।

তহশিলদার: দারোগার মত, প্রত্যেক কারখানায় একজন তহ্‌শিলদার ছিলেন। কারখানার প্রয়োজনীয় সামগ্রী ও নগদ অর্থ তাহার দায়িত্বাধীনে ছিল।

মুস্‌তাওফি: মুস্‌তাওফি ছিলেন কারখানার আয়-ব্যয় পরীক্ষক-নিরীক্ষক।

'দারোগা ই-কাচেহ্‌রি': দারোগা-ই-কাচেহ্‌রি এই দপ্তরের সাধারণ তদারকের সার্বিক দায়িত্বে ন্যস্ত ছিলেন।

সংক্ষেপে বলিতে গেলে, সরবরাহ মন্ত্রণালয়ের প্রধানরূপে, মীরসামান এই দপ্তরের প্রশাসনিক বিষয় এবং দপ্তরের অধীনে প্রত্যেক শাখার উপর সাধারণ তদারকের দায়িত্বে ন্যস্ত ছিলেন। দিওয়ান এই বিভাগের আর্থিক বিষয় তদারক করিতেন এবং নাজির, মুস্‌তাওফি ও মুস্‌রিফের সহিত যোগাযোগ রক্ষা করিতেন। নাজিরের কোন পৃথক ক্ষমতা ও দায়িত্ব ছিল না। তিনি দিওয়ানের সহিত সমন্বয় সাধন করিয়া কর্তব্য পালন করিতেন। মুশ্‌রিফ যেমন বিভাগের আয়-ব্যয়ের হিসাব-নিকাশ রাখিতেন, তেমনি মুস্‌তাওফি হিসাব-নিকাশের

---

১ ইবনে হাসান: সেণ্ট্রাল্‌ স্ট্রাক্‌চার্‌, পৃঃ ২৩৮-২৪২।

পরীক্ষা-নিরীক্ষা করিতেন। তহশিলদার ও দারোগা শ্রমিক ও কারিগরদের কাজের সহিত প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিলেন।

কারখানাগুলির সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও সরবরাহ দপ্তরের সঠিক পরিচালনায়, মীরসামান ও দিওয়ান-ই-বয়ুতাতের যুগ্ম দায়িত্ব থাকিলেও সার্বিকভাবে মীর-সামানই দায়ী ছিলেন এবং এই কারণেই তিনি দিওয়ানের অপেক্ষা উচ্চ-পদমর্যাদা ও ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন; তবে দিওয়ানকে মীরসামানের তাবেদারও[১] বলা চলে না।

দপ্তরের প্রধানরূপে, মীরসামান রাজধানীতে রাষ্ট্রের সম্পত্তির তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন। অন্যান্য মন্ত্রীদের ন্যায় তিনিও সম্রাটের সহিত সরাসরি যোগাযোগ রক্ষা করিতেন। দপ্তরের আর্থিক বিষয়ে মন্ত্রী দিওয়ানের সহিত এবং সেনা-বাহিনীর প্রয়োজনীয় সামগ্রী সরবরাহ, রাজকীয় ভ্রমণ ও শিকারের ব্যবস্থাপনার জন্য মন্ত্রী মীরবখশীর সহিত তাঁহাকে যোগাযোগ রক্ষা করিতে হইত।

শাহজাহানের শাসন আমলে আল্লামি আফজাল খান, মীরজুমলা, আকিল খান, সা'দ্-উল্লাহ্ খান, মুল্লা আলা-উল্-মুলক এবং পরবর্তীকালে ফজিল খান মীরসামান পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।[২]

শরিয়াত রক্ষা করা, ইসলামের মর্যাদা বৃদ্ধি করা এবং মুসলিম জনগণকে ধর্মের সত্যপথে পরিচালনার চেষ্টা করা প্রত্যেক মুসলিম শাসকের কর্তব্য। সুতরাং ধর্মীয় জরুরী বিষয়ে শাসনকর্তাকে উলামাদের সহিত আলোচনা ও পরামর্শ করিতে হইত। মোগলরা উলামাদেরকে সুদুর এবং তাহাদের প্রতিনিধিকে সদর অর্থাৎ প্রধান বলিয়া আখ্যায়িত করে। সুতরাং সদর-উস-সুদুর যথার্থই সুদুর-প্রধান, শেখ-উল্-ইসলামের সমার্থক ও তুল্যার্থবোধক্।[৩] সদর সম্রাট কর্তৃক মনোনীত ও নিয়োজিত হইতেন।

মুসলিম আইন বিশেষজ্ঞদের মতে, সদর ছিলেন সম্রাট ও জনগণের মধ্যে যোগসূত্র বিশেষ এবং তিনি ছিলেন রাষ্ট্র ও সম্রাটের জন্য অপরিহার্য ও অত্যাবশ্যক। একদিকে তিনি সম্রাটকে সমস্ত ধর্মীয় ব্যাপারে পরামর্শ দিতেন এবং অন্যদিকে তিনি রাষ্ট্রের উলামাদিগের উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখিতেন। ধার্মিক ব্যক্তি, পণ্ডিত ব্যক্তি ও মঠধারী সন্ন্যাসীদের ভরণপোষণের জন্য

১ লাহোরী: বাদশাহ-নামা, প্রথম, পৃঃ ২৪৫; আইন, পৃঃ ২৬৩।
২ ইবনে হাসান: সেণ্ট্রাল স্ট্রাক্চার্, পৃঃ ২৫২।
৩ পূর্বোক্ত, পৃঃ ২৫৬।

সদর ছিলেন সম্রাট কিংবা যুবরাজদের দ্বারা প্রদত্ত ভূ-সম্পত্তির তত্ত্বাবধায়ক। যোগ্য ব্যক্তিগণ যাহাতে সম্রাটের প্রদত্ত জমি ভোগ করিতে পারেন, ইহার প্রতি লক্ষ্য রাখা ছিল তাঁহার অন্যতম কর্তব্য। তিনি সম্রাটের সাহায্যদানের নিমিত্ত সরকারী কর্মকর্তাও ছিলেন।[১] পবিত্র রমজান মাসে ও অন্যান্য ধর্মীয় উৎসবে দান খয়রাতের জন্য, সম্রাট কর্তৃক বরাদ্দ প্রচুর অর্থ বিতরণের কাজ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার দায়িত্বও তাঁহার ছিল।

সাম্রাজ্যের সদরকে সদর-উস্-সুদুর,-সদর-ই-জাহান বা জনপ্রিয়ভাবে সদর-ই-কুল[২] বলা হইত। সদর পদের জন্য আরবী ভাষায় সর্বাধিক ব্যুৎপত্তি-সম্পন্ন ও চরিত্রবান ব্যক্তিকে মনোনীত করা হইত। ধর্ম বিষয়ক দপ্তরের প্রধান বলিয়া সম্রাট তাঁহাকে সম্ভাব্য সকল সম্মান প্রদর্শন করিতেন এবং আইন ও ধর্মের সকল বিষয়ে তাঁহার সহিত পরামর্শ করিতেন। ইহাতে জনগণের চোখে সদরের পদমর্যাদা ও সম্মান বহুলাংশে বৃদ্ধি পায়।

সদর উলামাদের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিয়া শিক্ষক, অনুশীলন প্রদানকারী ও ধর্ম প্রচারকদের অবস্থা ও যোগ্যতার খোঁজখবর রাখিতেন। রাষ্ট্রের সকল ধরনের শিক্ষা-প্রদান তাঁহার পূর্ণ নিয়ন্ত্রণাধীন ছিল।[৩] শিক্ষা পদ্ধতির সমালোচক-রূপে, তিনি সতর্কভাবে লক্ষ্য রাখিতেন যাহাতে মুসলিমদের ধর্মীয় বিশ্বাসে আঘাত হানিতে পারে, এমন কোন শিক্ষা প্রদান করা না হয়। তিনি সৎ ও উপযুক্ত শিক্ষক এবং আশাপ্রদ ছাত্রদিগকে বিদ্যাশিক্ষায় উৎসাহ প্রদান করিতেন এবং তাহাদিগকে সংগত-রূপে পুরস্কৃত করিতেন। তিনি যোগ্য উলামা ও পণ্ডিত ব্যক্তিদিগকে যথোপযুক্ত বৃত্তি ও রাষ্ট্রীয় সাহায্য প্রদানের জন্য, সম্রাটের নিকট সুপারিশ পেশ করিতেন।

মোগল আমলের অন্যান্য কেন্দ্রীয় দপ্তরের মত, সদরের দপ্তর খুব বিস্তৃত ছিল না। আইন-ই-আকবরীতে সদরের দপ্তর সম্পর্কে বিশেষ উল্লেখ নাই। শুধু বলা হইয়াছে যে, সদরের জরুরী কার্যে 'বিটিক্চি' নামে একজন পদস্থ কেরানী তাঁহাকে সক্রিয়ভাবে সাহায্য করিতেন। তিনি দপ্তরের আর্থিক দিকটা দেখাশুনা করিতেন; তাহাকে দিওয়ান-ই-সা'আদাত[৪] বলা হইত।

---

১ সরকার: এম. অ্যাড্মিনিস্ট্রেশন্, পৃ: ২৫।
২ পূর্বোক্ত, পৃ: ২৫-২৬।
৩ ইবনে হাসান: সেন্ট্রাল স্ট্রাক্চার্, পৃ: ২৫৭।
৪ আইন, পৃ: ১৯৫, ১৯৮।

আকবরের প্রথম সদর শেখ গদাই কম্‌বুহ্ খুব বিদ্বান ছিলেন না। বদায়ূনী তাহার বিরুদ্ধে সরকারী তহবিল তছরূপ ও অর্থ আত্মসাৎকরণের অভিযোগ আনিয়াছিলেন।[১] পরবর্তী সদর ছিলেন খাজা মুহম্মদ সালিহ্ হরাভি। বিদ্যোৎসাহী ও বিশিষ্ট পণ্ডিত শেখ আবদ-উন-নবিকে আকবর সদর-উস্‌-সুদুর পদে নিয়োগ করেন। তৎপর সদর পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন যথাক্রমে সুলতান খাজা, মীর ফাতাহ্-উল্লাহ্ সিরাজী ও মীরান সদর জাহান।

জাহাঙ্গীরের আমলে মীরান সদর জাহান ও মুসাভিখান সদর পদের দায়িত্বে ন্যস্ত ছিলেন। শাহ্‌জাহানের রাজত্বকালের ষষ্ঠদশ বৎসরে সদর মুসাভিখান পদচ্যুত হইলে, ক্রমান্বয়ে সাইয়েদ জালাল বোখারি গুজরাটী ও সাইয়েদ হিদায়াত উল্লাহ্ সদরের পদ অলঙ্কৃত করেন।

মোগল কেন্দ্রীয় বিচার বিভাগে সম্রাট 'যুগের খলিফা'রূপে নীতির দিক হইতে প্রধান বিচারপতি ছিলেন এবং তিনি প্রতি বুধবার সর্বোচ্চ বিচারালয়ে নিজে বিশেষ বিশেষ মোকদ্দমার বিচার করিতেন। তাঁহার সভাপতিত্বে পরিচালিত বিচারালয় ছিল সর্বোচ্চ আপীল আদালত। কাজী ছিলেন অপরাধমূলক ফৌজদারী মামলার বিচারক। মুফতি মুসলিম আইনের ব্যাখ্যা দিয়া কাজীকে বিচারে সাহায্য করিতেন এবং কাজী বিচারের রায় দিতেন। যদুনাথ সরকার মোগল কাজীদের দুর্নীতি ও উৎকোচ গ্রহণের অভিযোগ উল্লেখ করিয়া তীব্রভাবে তাঁহাদের সমালোচনা করিয়াছেন।[২] তবে তাঁহার এই সমালোচনা অতিশয়োক্তি ও অতিরঞ্জিত, ইহা নিঃসন্দেহে বলা চলে।

মোগল সাম্রাজ্যের কেন্দ্রীয় বিচার বিভাগের প্রধান কাজী কাজী-উল্‌-কুজ্জাত বা কাজী-ই-মুমালিক নামে অভিহিত ছিলেন। তিনি সম্রাটকে সর্বদা সঙ্গ দান করিতেন; তাই তাঁহাকে 'রাজ শিবিরের কাজী'[৩] বলা হইত। প্রত্যেক নগর, এমনকি বৃহৎ গ্রামেও প্রধান কাজী দ্বারা নিয়োজিত স্থানীয় কাজী ছিলেন।

সংক্ষেপে বলিতে গেলে, মোগল আমলে কেন্দ্রীয় শাসন-ব্যবস্থায় পাঁচ শ্রেণীর মন্ত্রী ছিলেন, যেমন ওয়াকিল, দিওয়ান, মীরবখশী, মীরসামান ও সদর-উস্‌-সুদুর। ওয়াকিল আধুনিক প্রধানমন্ত্রীর মত, মোগল কেন্দ্রীয় শাসনের সকল

---

১ বদায়ূনী: মুন্তাখাব-উত্‌-তাওয়ারিখ, দ্বিতীয়, পৃঃ ২৯।
২ সরকার: আওরঙ্গজেব, তৃতীয় খণ্ড, পৃঃ ৮৪-৮৬।
৩ সরকার: এম. অ্যাড্‌মিনিস্ট্রেশন্‌, পৃঃ ২৫।

দপ্তরের কাজ-কর্ম তত্ত্বাবধান করিতেন এবং তাঁহার নিয়ন্ত্রণের প্রভাব সর্বত্র বিস্তৃত ছিল। তাঁহার সরাসরি আয়ত্তাধীনের দপ্তর ব্যতীতও, আরও চারিজন মন্ত্রীর সভাপতিত্বে আরও চারিটি কেন্দ্রীয় দপ্তর পরিচালিত হইত। ওয়াকিলের পর, দিওয়ান সর্বোচ্চপদ-মর্যাদার অধিকারী ছিলেন। মীরবখশী ও মীরসামানের মধ্যে পদমর্যাদায় কে উর্ধ্বতন ছিলেন, সঠিকভাবে বলা সহজ নহে; কারণ যাহারা ঐ পদদ্বয়ে অধিষ্ঠিত থাকিতেন, তাঁহাদের ব্যক্তিত্বের উপর ঐ পদের গুরুত্ব নির্ভর করিত। তবে নিঃসন্দেহে বলা চলে যে, পদ-মর্যাদার দিক হইতে সদরের স্থান ছিল চতুর্থ।

মোগল ওয়াকিল, যিনি সামরিক, বেসামরিক ও বিচার ক্ষমতা স্বীয় হস্তে কেন্দ্রীভূত করিয়াছিলেন আকবরেব নীতি দ্বারা ওয়াকিলের ক্ষমতা বহুলাংশে হ্রাস পায়। আকবরের আমলে ওয়াকিলের পদটি বিলুপ্ত না হইলেও, ওয়াকিল সর্বক্ষমতায় বঞ্চিত হন।

বেসামরিক ও সামরিক বিষয়ের প্রকৃত ক্ষমতা প্রধান দিওয়ান ও মীরবখশীর মধ্যে বিভক্ত ছিল, কিন্তু দিল্লী সালতানাতের দিওয়ান-ই-ওয়াজিরাত ও দিওয়ান-ই-আরিজের ন্যায়, তাহাদেরকে স্ব স্ব ক্ষেত্রে স্বাধীনতা প্রদান করা হয় নাই। মনসবদারী ব্যবস্থার সুনিয়মিত ও সুষম কাঠামোর ভিতরে ফেলিয়া, রাষ্ট্রের দুইটি প্রধান দপ্তরের কার্য সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য উক্ত উভয় মন্ত্রীকে যুগ্মভাবে দায়ী করা হয়।

প্রধান দিওয়ান শাসন-ব্যবস্থার দৈনন্দিন কাজে তুলনামূলকভাবে সামান্য উচ্চতর পদমর্যাদা-সম্পন্ন মন্ত্রী ছিলেন। পক্ষান্তরে, রাজদরবারে নানাবিধ দায়িত্ব পালনের জন্য, কেন্দ্রীয় সরকারে মীরবখশীর অতিরিক্ত প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। দুইটি বিভাগীয় প্রধানরূপে, মন্ত্রীদয় উভয়ই তাঁহাদের মন্ত্রণালয়ের কার্য সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য কেবলমাত্র সম্রাটের নিকটই দায়ী ছিলেন।

তৃতীয় মন্ত্রী মীরসামান তাঁহার কর্তব্য ও দায়িত্বাদির প্রকৃতির দিক হইতে ইবনে খালদুনের আমীর-ই-হাজিব কিংবা দিল্লী সালতানাতের ওয়াকিল-ই-দার ও বারবেকের স্থান অধিকার করেন। কিন্তু প্রথমতঃ মীরবখশীকে দরবারের দায়িত্ব অর্পণ এবং দ্বিতীয়তঃ দারোগা-ই-গোসলখানা পদের সৃষ্টির দ্বারা, মীর-সামানের প্রভাবের অধিক্ষেত্র কিয়দংশ হ্রাস পায়।[১] তবে সম্রাটের নিকট

১ ইবনে হাসান: সেন্ট্রাল স্ট্রাক্চার, পৃঃ ২৯২।

সান্নিধ্যের দরুন, অন্যান্য মন্ত্রীর ন্যায় তিনি সমপদ-মর্যাদা ও রাজদরবারে সম-প্রভাবের অধিকারী ছিলেন।

চতুর্থ মন্ত্রী ছিলেন সদর। আকবরের নীতি ও নানাবিধ সংস্কার সাধনের দরুন, সদরের প্রভূত ক্ষমতা বহুলাংশে হ্রাস পায়।

এইভাবে মুসলিম আইন বিশেষজ্ঞদের মতে, মহাপরাক্রমশালী ও প্রভূত প্রভাবশালী ওয়াজিরের ক্ষমতা ও আধিপত্য সমপদমর্যাদা-সম্পন্ন চারিজন মন্ত্রীর মধ্যে বণ্টন করিয়া দেওয়া হয়। এতদ্দ্বারা এমন একটি শাসন-পদ্ধতি প্রবর্তিত হয়, যাহাতে চারিজন মন্ত্রীই নিজ নিজ দপ্তরে স্বাধীন হইলেও, প্রশাসনিক নানা বিষয়ে সময় সময় তাঁহাদের পারস্পরিক সহযোগিতার প্রয়োজন ছিল এবং একে অন্যে সরকারীভাবে যোগাযোগ রক্ষা করিতেন। এইরূপ প্রশাসনিক ব্যবস্থাতে তাঁহাদের মধ্যে একজনের হস্তে সমস্ত ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হওয়ার কোন সম্ভাবনা ছিল না; সুতরাং এক মন্ত্রীর অন্য মন্ত্রীর উপর আধিপত্য বিস্তারের প্রশ্নই উঠে না।[1]

কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদের তুলনামূলক স্থান নির্ণয় করিয়া বলা যায় যে, ওয়াকিল কেন্দ্রীয় প্রশাসনিক কাঠামোতে সর্বোচ্চ স্থানের অধিকারী ছিলেন। চারিজন স্থায়ী মন্ত্রীর মধ্যে, দিওয়ান নিঃসন্দেহে প্রথম স্থানের অধিকারী ছিলেন। উচ্চতর পদ-মর্যাদা লাভ করিলেও, সর্বদাই তিনি সর্বাপেক্ষা বেশী বেতন পাইতেন না। প্রত্যেক চাকুরীতে পদ ছিল ব্যক্তিগত এবং কোন পদের জন্যই কোন বেতন নির্দিষ্ট ছিল না। মীরবখশী ছিলেন পদ-মর্যাদায় প্রধান দিওয়ানের পরেই। কর্তব্যের গুরুত্ব বিবেচনা করিয়া বলা যায় যে, সহকর্মীদের মধ্যে মীরবখশী ছিলেন দ্বিতীয় স্থানের অধিকারী। সুতরাং মীরসামান ছিলেন তৃতীয় এবং সদর নিঃসন্দেহে মন্ত্রীদের মধ্যে চতুর্থ ছিলেন। কেন্দ্রীয় মন্ত্রিগণ অসীম ক্ষমতা-সম্পন্ন ছিলেন না; তাঁহাদের ক্ষমতা, প্রভাব-প্রতিপত্তি সীমিত ছিল। নানা নীতি ও সংস্কারের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ করা হয়, যেমন, সম্রাটের কেন্দ্রীয় প্রশাসনিক সংসদ শুধু মন্ত্রীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না—নানা উপদেষ্টা, আমীর ওমারাহ ও রাজকর্মকর্তা উক্ত প্রশাসনিক সংসদের পরিচালনায় জড়িত ছিলেন। সর্বোপরি, সাম্রাজ্যের শাসন-ব্যবস্থার বিভিন্ন দিকে সম্রাটের সজাগ দৃষ্টি ও সতর্কতায়[2] মন্ত্রীদের ক্ষমতা হ্রাসকৃত হয়।

১ ইবনে হাসান: সেন্ট্রাল স্ট্রাক্চার, পৃঃ ২১৪।
২ পূর্বোক্ত, পৃঃ ৩০১।

চতুর্থ অধ্যায়

অর্থ ও ভূমি-রাজস্ব ব্যবস্থা

মধ্যযুগীয় মুসলিম ভারতে মোগল শাসন আমলে অর্থ ও রাজস্ব ব্যবস্থায় রাষ্ট্রের আয়ের এগারটি বৈধ উৎস ছিল ঃ

(ক) আল্-গানিমাহ্—যুদ্ধ-লব্ধ সামগ্রী, লুণ্ঠিত, দ্রব্য

(খ) আজ্-জাকাত ও আস্-সাদ্কাহ্,

(গ) আল্-জিজিয়া,

(ঘ) আল্-ফে,

(ঙ) আল্-ওশুর,

(চ) বাজেয়াপ্ত সম্পত্তি,

(ছ) একচেটিয়া ব্যবসা,

(জ) টাঁকশাল,

(ঝ) খনি, এবং

(ঞ) উপহার, উপঢৌকন

পূর্বরীতি অনুযায়ী গানিমাতের অর্থাৎ যুদ্ধ-লব্ধ সামগ্রী ও লুণ্ঠিত দ্রব্যের এক-পঞ্চমাংশ রাষ্ট্রের জন্য রাখিয়া, বাকী চারি-পঞ্চমাংশ যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সৈন্যদের মধ্যে বণ্টনের প্রথা, মোগল শাসন আমলের প্রথম দিকে প্রচলিত ছিল। নানা কারণবশতঃ ও পরিবর্তিত অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আকবরের শাসনযুগে উক্ত পদ্ধতির ক্রমশঃ বিলুপ্তি ঘটে। ত্রিপাঠির মতে, আকবরের সময় ধর্ম-ভিত্তিক কর আরোপণের গুরুত্ব হ্রাস পায়।[১]

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, কোর-আন শরীফের নির্দেশ অনুযায়ী, মুসলিমগণ বিভিন্ন খাতে যে কর, রাজস্ব প্রদান করে, উহাকে জাকাত বলা হয়। অনেক সময় কেহ কেহ জাকাত ও সাদ্কাহ্ একই অর্থে ব্যবহার করে, কিন্তু উহা ঠিক নহে। স্বেচ্ছায় ভিক্ষা, দান-খয়রাত প্রদানকে সত্যিকার অর্থে আস্-সাদ্-কাহ্ বলা হয়।

---

১ ত্রিপাঠি : এম. অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, পৃ: ৩৩১-৩৩৭।

মোগল আমলে মুসলিমদের উপর ভূমি-রাজস্ব 'ওশর আরোপণের বিস্তারিত বর্ণনা পাওয়া যায় না; কিন্তু আওরঙ্গজেবের একটি ফরমানে 'ওশরি জমি ও খারাজি জমির মধ্যে পার্থক্যের উল্লেখ আছে।[১] মোরল্যাণ্ড্ বলেন যে, তিনি মোগল ভারতে 'ওশরি জমির অস্তিত্ব নির্ণয় করিতে ব্যর্থ হন এবং যদি উহার অস্তিত্ব আদৌ থাকে, তবে উহা অবশ্য পরিমাণে সামান্য ছিল।[২] পূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, যাহারা ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিল, তাহাদের জমি মুহম্মদ-বিন-কাসিম 'ওশরি জমি রূপে গণ্য করেন এবং সাবেক গজনী শাসনকর্তাদের শাসনাধীনে পাঞ্জাবের কিয়দংশ খুব সম্ভবতঃ কুতুবউদ্দীন আইবেকও 'ওশরি অঞ্চল রূপে গণ্য করেন।[৩] ইহা ব্যতীত, খুব সম্ভব আওরঙ্গজেব 'ওশরি অঞ্চল নির্ণয় করিতে মুসলিম আইন-শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তিদের পরামর্শ গ্রহণ করেন। মোটের উপর, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই যে, অন্ততঃপক্ষে আওরঙ্গজেবের শাসন আমলে ভারতের সামান্য অঞ্চল 'ওশরি জমি রূপে গণ্য করা হইয়াছিল।[৪]

পূর্বে বলা হইয়াছে যে, মুহম্মদ-বিন-কাসিম সিন্ধু প্রদেশ জয় করিয়া, মুসলিম বিশ্বে প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী, অমুসলমানের উপর জিজিয়া কর ধার্য করেন।[৫] দিল্লীর সুলতানগণ দশ, বিশ ও চল্লিশ টংকা[৬] হারে জিজিয়া আরোপ করেন। যখন ফিরোজশাহ তুঘলক ব্রাহ্মণদের উপরও জিজিয়া ধার্য করেন, তখন অমুসলমানগণ প্রতিবাদ ও বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন; উক্ত ঘটনা ব্যতীত, প্রাক-মোগল ভারতে জিজিয়া কর আরোপের বিরুদ্ধে অমুসলমানরা কখনও বিদ্বেষভাব পোষণ বা বিরক্তিবোধ করিতেন না।[৭]

ভারতে মোগল শাসনের প্রারম্ভিককালে, জিজিয়া কর অমুসলমানদের উপর আরোপিত থাকিলেও, আকবর হিন্দু প্রজাবৃন্দের প্রতি সুযোগ সুবিধা প্রদানের উদ্দেশ্যে, ১৫৬৪ খ্রীস্টাব্দে সারা ভারতে জিজিয়া উচ্ছেদ করেন।[৮]

---

১ মোরল্যাণ্ড: অ্যাগরেরিয়ান সিস্টেম্, পৃঃ ১৪০।
২ পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৪০।
৩ কোরায়েশী: এস, অ্যাড্মিনিস্ট্রেশন, পৃঃ ৯৯।
৪ হুসাইনি: এম. অ্যাড্মিনিস্ট্রেশন, পৃঃ ৯৬।
৫ কুফি: চাচ-নামাহ্, পৃঃ ২০৮-২০৯।
৬ এক টংকা এক দিরহামের সমান ছিল।—হুসাইনি: এম. অ্যাড্মিনিস্ট্রেশন, পৃঃ ৯৮ পাদটীকা।
৭ কোরায়েশী: এস. অ্যাড্মিনিস্ট্রেশন পৃঃ ৯৫।
৮ আকবর-নামা, দ্বিতীয়, পৃঃ ২০৩; অবশ্য বদায়ূনী ১৫৭৯ খ্রীস্টাব্দে জিজিয়া বিলোপ সাধন করা হইয়াছিল বলিয়া মন্তব্য করেন।—বদায়ূনী: মুন্তাখাব-উত-তাওয়ারিখ, দ্বিতীয়, পৃঃ ২৭৬; সি. এইচ. আই., চতুর্থ খণ্ড, পৃঃ ৮৭।

আবুল ফজল আকবর কর্তৃক জিজিয়া উচ্ছেদ সাধনের মত উদার পদক্ষেপের সমর্থনে যুক্তির অবতারণা করেন। তাঁহার মতে, উক্ত উদারতা প্রদর্শনের দরুন সম্রাট শত সহস্র গর্বিত হিন্দু-রাজপুতদের হৃদয় জয় করেন।[১] পূর্বে অমুসলমান-গণ মুসলিম শাসন আমলে শত্রুভাবাপন্ন ছিল; কিন্তু আকবরের উদারনীতি ও সহিষ্ণু দৃষ্টিভঙ্গির জন্য, জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে ভারতবাসী সম্রাটের অনুগত ও ভক্তে পরিণত হয় এবং তাহারা মোগল শাসনের সুপ্রতিষ্ঠা ও স্থিতিশীলতায় সক্রিয়ভাবে সাহায্য ও সহযোগিতা করে। তদুপরি হিন্দু, রাজপুত ধনী ব্যক্তিগণ বন্ধুত্বের নিদর্শন স্বরূপ স্বেচ্ছায় সম্রাটকে প্রচুর ধনদৌলত উপহার-উপঢৌকন মুক্ত হস্তে প্রদান করেন। ইহার ফলে মোগল রাজকোষাগার অর্থে ও সম্পদে পরিপূর্ণ হইয়া উঠে।

সুতরাং বিনাদ্বিধায় বলা যায় যে, মোগল সাম্রাজ্য ও আকবরের আধিপত্য, প্রভাব-প্রতিপত্তি বিস্তারে, হিন্দুদের স্বতঃস্ফূর্ত সহযোগিতা, সাহায্য, সমর্থনের দরুন এবং তাহাদের স্বেচ্ছায় প্রদত্ত ধন-দৌলত উপহারে পরিপূর্ণ রাজভাণ্ডারে অর্থের প্রাচুর্যের হেতু আকবর জিজিয়া বিলোপ সাধন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

কিন্তু আওরঙ্গজেবের শাসন আমলে নানাবিধ কারণে উপরোক্ত অবস্থা দেশে বিরাজিত ছিল না। হিন্দু-রাজপুতদের সহযোগিতা ও সমর্থনের হস্ত প্রসারিত ছিল না এবং রাজধনাগার ছিল প্রায় শূন্য। এমতাবস্থায় আওরঙ্গজেবকে ১৬৭৯ খ্রীস্টাব্দে অমুসলমানদের উপর জিজিয়া পুনঃ ধার্য করিতে হয়। এক শতাব্দীকাল ব্যতীত, প্রায় দশ শতাব্দীকাল (৭১২—১৬৭৯ খ্রীস্টাব্দ) হিন্দুরা মুসলিম শাসকদিগকে জিজিয়া কর দিয়াছে এবং এই জিজিয়া রাষ্ট্রের রাজস্ব-আয়ের প্রধান উৎসগুলির অন্যতম ছিল।

জিজিয়া পুনঃপ্রবর্তনের সমর্থনে আওরঙ্গজেবের কয়েকটি যুক্তি[২] ছিল, যেমন (ক) আকবরের আমলে স্বেচ্ছায় হিন্দুগণ শাসন-ব্যবস্থায় সহযোগিতা করিত, আওরঙ্গজেবের সময় উহার অভাব পরিলক্ষিত হয়; (খ) কেহ কেহ বলেন যে, আকবরের অতিরিক্ত উদার-সহিষ্ণু নীতির অতিশয় প্রশ্রয়ের দরুন, হিন্দুরা ইসলামের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন হইয়া উঠে; (গ) নানা যুদ্ধ-বিগ্রহে

১ আকবর-নামা, দ্বিতীয়, পৃ: ২০৪।
২ হুসাইনি : এম. অ্যাড্‌মিনিস্ট্রেশন, পৃ: ৯৯।

আওরঙ্গজেব লিপ্ত থাকিবার জন্য, তাঁহার কোষাগার শূন্য হইয়া পড়ে। তবুও তিনি কোন অবৈধ কর ধার্য করেন নাই; কিংবা স্বেচ্ছায় প্রদত্ত ধনদৌলতের কোন উপহারও গ্রহণ করেন নাই; (ঘ) জিজিয়া বিলুপ্তির দরুন, ধনী হিন্দু ব্যবসায়ী ও কারিগর করমুক্ত ছিল; পক্ষান্তরে মুসলিম ব্যবসায়ী ও কারিগরদিগকে স্বর্ণ, রৌপ্য, জীব-জন্তু ও ব্যবসায়ের পণ্য দ্রব্যের উপর জাকাত দিতে হইত। অমুসলমানরা শুধু ভূমি-রাজস্ব দিত, যাহা মুসলিমদিগকেও দিতে হইত। সুতরাং সংখ্যালঘিষ্ঠ মুসলিমদিগকে সংখ্যাগরিষ্ঠ অমুসলমানদের তুলনায় অপেক্ষাকৃত বেশী পরিমাণ কর দিতে হইত; (ঙ) আওরঙ্গজেব সমস্ত অবৈধ উপ-করের বিলোপ সাধন করেন।[১] জিজিয়া পুনঃপ্রবর্তনের ফলে যে ক্ষতি হইয়াছিল বলিয়া মনে করা হয়, তাহা অপেক্ষা অবৈধ করসমূহের বিলুপ্তি সাধন অনেক বেশী ক্ষতি পূরণ করে।[২]

জিজিয়া ধার্য ও আদায়ের জন্য অমুসলমানদিগকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়, দরিদ্র, মধ্যবিত্ত ও ধনী এবং তাহাদের উপর যথাক্রমে বার্ষিক ১২, ২৪, ৪৮ দিরহাম জিজিয়া ধার্য করা হয়।[৩] চাকুরিজীবী, ব্যবসায়ী ও জমির মালিকগণকে ধনী শ্রেণী এবং কারিগরদিগকে দরিদ্র শ্রেণীভুক্ত বলিয়া গণ্য করা হইত। পরিবারবর্গের ভরণ-পোষণের প্রয়োজনীয় অর্থের অপেক্ষা আয় বেশী হইলেই শুধু নিম্নশ্রেণীর লোকদিগকে জিজিয়া দিতে হইত। স্ত্রীলোক, চৌদ্দ বৎসরের নিম্নের ছেলে-মেয়ে, ক্রীতদাস, ভিক্ষুক ও দীন-দুঃখীদিগের জিজিয়া মওকুফ করা হয়; অন্ধ, পঙ্গু, উন্মত্ত ও মঠধারী সন্ন্যাসী-দিগকে[৪] জিজিয়া দিতে হইত না। সরকারী সকল কর্মচারী এই জিজিয়া কর মুক্ত ছিল।[৫] ইহা হইতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, শুধু আর্থিক সংগতি-সম্পন্নদিগকেই জিজিয়া কর দিতে বাধ্য করা হইয়াছিল। জিজিয়া পুনঃপ্রবর্তিত হইলে প্রথমদিকে কিছুদিন হিন্দুগণ প্রতিবাদ করিলেও, সম্রাটের দৃঢ় মনোভাবের জন্য অবশেষে হিন্দুরা প্রতিবাদ করিতে ক্ষান্ত হয়।[৬]

---

১ যদুনাথ সরকার আওরঙ্গজেব কর্তৃক চুয়ান্নটি বিষয়ের অবৈধ উপ-করের উচ্ছেদের একটি দীর্ঘ তালিকা উল্লেখ করেন।—সরকার: এম. অ্যাড্‌মিনিস্ট্রেশন, পৃঃ ১১৯-১২৭।

২ হুসাইনি: এম. অ্যাড্‌মিনিস্ট্রেশন, পৃঃ ১০০।

৩ এক দিরহাম এক টাকার এক-চতুর্থাংশের বেশী ছিল।—জে. এ. এস. বি., ১৯১৭, পৃঃ ৪৫।

৪ শুধু 'ধনী' হইলে অন্ধ, পঙ্গু ও উন্মত্ত ব্যক্তিদিগকে এবং উন্নত ও সমৃদ্ধ মঠের সন্ন্যাসীদিকে অবশ্য জিজিয়া দিতে হইত।—হুসাইনি: এম. অ্যাড্‌মিনিস্ট্রেশন, পৃঃ ১০০।

৫ সি. এইচ. আই. পৃঃ ২৪২; সরকার: আওরঙ্গজেব, পৃঃ ৩০৬।

৬ সরকার: আওরঙ্গজেব, পৃঃ ৩২৫-৩২৯।

ফার্‌রুখ শিয়ার সিংহাসনে আরোহণ করিয়া, ১৭১৩ খ্রীস্টাব্দে জিজিয়া উচ্ছেদ করেন। কিন্তু অতি শীঘ্র তিনি উপলব্ধি করেন যে, সরকারের আয়ের প্রধান উৎসের অন্যতম জিজিয়া কর ব্যতীত, দেশের শাসন-ব্যবস্থা পরিচালনা সম্ভব নহে; তাই অনতিবিলম্বে তিনি জিজিয়া পুনরায় ধার্য করেন। মুহম্মদ শাহের আমলের প্রথমদিকে জিজিয়া প্রচলিত থাকিলেও, অম্বরের জয়সিংহ ও গিরধর বাহাদুরের পরামর্শে, শীঘ্রই তিনি জিজিয়া আদায় বন্ধ করেন। পরবর্তী পর্যায়ে নিজাম-উল্‌-মুলক জিজিয়া আদায় করা যায় বলিয়া পরামর্শ দিলেও, তিনি উহা উপেক্ষা করেন।

মোগল শাসন আমলে আদায়কৃত জিজিয়া করের পরিমাণ জানা নাই। আবুল ফজল বলেন যে, পরিমাণ এত বেশী ছিল যে, গণনা করিয়া হিসাব দেওয়া অসম্ভব।[১]

আওরঙ্গজেবের রাজত্বকালে আদায়কৃত জিজিয়ার মোট পরিমাণের হিসাব নাই, কিন্তু ১৭২০ খ্রীস্টাব্দে যখন মুহম্মদ শাহ এই কর উচ্ছেদ করেন, তখন ইহার বার্ষিক পরিমাণ ছিল প্রায় চারি কোটি টাকা।[২]

সীমিত অর্থে আল্‌-ফে শব্দটি বিজিত রাজ্যের জমিকে বুঝায়, যাহা রাষ্ট্রের সরাসরি মালীকানাধীনে ন্যস্ত থাকে।

মোগল শাসন আমলে জমিকে নিম্নলিখিত শ্রেণীতে[৩] বিভক্ত করা হয়ঃ

(ক) খালিসা জমি—ইহা সরকারের প্রত্যক্ষ ব্যবস্থাপনাধীন এবং ইহা হইতে রাষ্ট্র রাজস্ব লাভ করে।

(খ) 'ইকতা' অথবা জায়গীর জমি—ইহা মুক্‌তা বা জায়গীদারের সরাসরি ব্যবস্থাপনাধীন—সরকারের নহে। জায়গীরের শর্তানুযায়ী জায়গীরদার সরকারকে রাজস্ব প্রদান করেন।

(গ) সুয়ুরগাল জমি—ইহা বিনা রাজস্বে সম্পত্তি ভোগদখলের স্বত্বে প্রদান করা হয় এবং সরকারকে কোন রাজস্ব দিতে হয় না। তবে ইচ্ছা করিলে সরকার এই জমি ফিরিয়া নিতে পারে।

(ঘ) সুল্‌হি জমি—ইহা একটি নির্দিষ্ট রাজস্ব প্রদানের প্রতিশ্রুতিতে সাবেক

---

১ হুসাইনি : এম. অ্যাড্‌মিনিস্ট্রেশন, পৃঃ ১০২।
২ ডাব্‌লিউ. আইর্‌ভিন্‌ : লেটার মোগল্‌স্‌, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ৩৩৮-৩৩৯।
৩ বিস্তারিত আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য—হুসাইনি : এম. অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, পৃঃ ১০৩-১০৪।

মালিককে দেওয়া হয়।

(৬) আল্‌তাম্‌গা জমি—ইহা উপযুক্ত রাজকর্মচারীকে রাজস্ব-মুক্ত রূপে প্রদান করা হয় এবং ইহা তাহার ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে পরিণত হয়। সরকার ইহা পুনরায় ফিরিয়া নিতে পারে না।

ভারতে কোন আল্‌-ফে জমি ছিল না। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকারের নগদ আয়ের জন্য, সাম্রাজ্যের একটি বিরাট অংশ সংরক্ষণ করিয়া রাখা হইত। ইহাই ছিল খালিসা জমি এবং ইহাকে 'মম্‌লাকত্‌' বলা হইত। ইহা কোন ব্যক্তিগত সম্পত্তি ছিল না; ইহা ছিল জনগণের কোষাগারের সম্পত্তি। ইহা সরকারের সরাসরি তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণাধীনে ছিল, এবং সম্ভবতঃ আমিলের মাধ্যমে ব্যবস্থাপনা পরিচালিত হইত। এই শ্রেণীর জমির জন্য রাজস্বের হার কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হইত।[১]

দিল্লীর সুলতানদের মত, বাবর সাম্রাজ্যের বহুলাংশে খালিসা রাখিয়া, ইক্‌তা রূপে জমির রাজস্ব তাঁহার কর্মচারীদিগকে প্রদান করিতেন। শেরশাহের পুত্র ইসলাম শাহের নীতি ছিল খালিসা জমির পরিমাণ বৃদ্ধি করা এবং ক্রমশঃ বেশী ইক্‌তা জমি সরকারী রাজস্ব বিভাগের অধীনে আনা।

১৫৬৩ খ্রীস্টাব্দে আকবর খালিসা জমি সংগঠিত করিবার জন্য, ইতিমাদ্‌ খানকে নিয়োগ করেন।[২] ইতিমাদ্‌ খান অনুসন্ধানের মাধ্যমে অন্যায় রূপে আত্মসাৎকৃত সমস্ত খালিসা জমি পুনরুদ্ধার করেন।[৩] ইহার পর তিনি সমস্ত খালিসা জমি ছোট ছোট খণ্ড জমিতে বিভক্ত করেন এবং প্রত্যেক খণ্ড জমি হইতে এক 'করোর' 'দাম্‌' (এক কোটি দাম্‌) অর্থাৎ ২৫,০০০ টাকা রাজস্ব আদায় হইত। তিনি প্রত্যেক খণ্ড জমিতে 'ক্রোরি'[৪] নামক রাজস্ব কর্মচারী নিযুক্ত করেন। একজন 'বিটিক্‌চি' অর্থাৎ কেরানী ও একজন 'গনজুর' অর্থাৎ কোষাধ্যক্ষ ক্রোরিকে সাহায্য করিত।[৫]

১ ত্রিপাঠি : এম. অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, পৃ: ২৪৬।

২ আকবর-নামা, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ: ২২৭।

৩ পূর্বোক্ত।

৪ যদুনাথ সরকার বলেন যে. 'ক্রোরি' ছিল জিলায় রাজস্ব আদায়কারীয় এক ক্রোর দাম্‌ অর্থাৎ আড়াই লক্ষ টাকা রাজস্ব আদায় হইবে আশায়, এই কর আদায়কারীকে ক্রোরি বলা হয়।—সরকার : এম. অ্যাড্‌মিনিস্ট্রেশন. পৃ: ৮৬ ; উহা আকবরের ব্যবস্থাপনা ছিল।—আইন, প্রথম খণ্ড. পৃ: ১৩।

৫ আইন, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ: ২২৭।

১৫৭৪ খ্রীস্টাব্দে ১৮২ জন ক্রোরি নিয়োগ করা হয়। খাজনা আদায় করা ব্যতীত, ক্রোরিদের অন্যান্য দায়িত্বের মধ্যে অন্যতম ছিল জমির সীমা নির্ধারণ, গ্রাম অঞ্চলের পরিমাপ নির্ধারণ ইত্যাদি।

বুয়াহিদ, মামুলক, সাল্‌জুক, দিল্লীর সুলতান ও মোগল সম্রাটদের শাসন আমলে এই ইক্‌তা প্রথার প্রচলন ছিল। দিল্লী সালতানাতে বলবনের সময় রাজ্যের বেশীর ভাগ অঞ্চল জায়গীরদারের অধীন ছিল।[১] পরবর্তী সুলতানদের শাসন আমলেও ইক্‌তা প্রথা প্রচলিত ছিল। এমনকি ফিরোজশাহ্ তুঘলক কারখানাগুলিকে ইক্‌তা বিবেচনা করিতেন।

মোগল শাসন আমলে জমি ও জমি হইতে প্রাপ্ত রাজস্ব ইক্‌তা রূপে প্রদান করা হইত, কিন্তু সম্রাটগণ ইক্‌তা প্রথাকে বংশগত প্রথায় রূপান্তরকরণে বাধা সৃষ্টি করেন। যদিও আকবর খালিসা জমি বৃদ্ধিকরণ নীতি প্রত্যাহার করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন এবং অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাঁহাকে সামরিক কর্মকর্তাদেরকে জায়গীর প্রদান করিতে হইত, তথাপি তিনি জায়গীরের বিশৃঙ্খলভাবে পরিচালনা অনুমোদন করেন নাই। ক্রোরি নিয়োগ করিবার জন্য তিনি জায়গীরদারদিগকে নির্দেশ দিয়াছিলেন এবং ১৫৮১-৮২ খ্রীস্টাব্দে তিনি এক হুকুম জারি করেন যে, খালিসা জমিতে যে নিয়ম, আইনবিধি প্রচলিত আছে, উহা জায়গীরের ক্ষেত্রেও সমভাবে প্রযোজ্য।[২]

মুসলিমগণ ব্যবসায়ের পণ্যদ্রব্যের উপর আড়াই শতাংশ জাকাত দিয়া থাকে। মুসলিম রাষ্ট্রে অমুসলমানদিগকে পাঁচ শতাংশ এবং বিদেশীকে দশ শতাংশ আল্-'ওশূর দেওয়ার রীতি প্রচলিত ছিল। ইবনে বতুতার মতে, দিল্লীর সুলতানগণ সকল জাতীয় আমদানির উপর এক-চতুর্থাংশ শুল্ক ধার্য করিয়াছিলেন; কিন্তু তিনি ইহাও স্বীকার করিয়াছেন যে, পরবর্তীকালে মুহম্মদ-বিন-তুঘলক উচ্চ শুল্কের হার বৈধহারে রূপান্তরিত করেন।[৩]

মোগল শাসন আমলে ১৬৬৫ খ্রীস্টাব্দে এক জরুরী আদেশজারির দ্বারা, আওরঙ্গজেব হিন্দুদের বিক্রি পণ্যদ্রবাদির উপর পাঁচ শতাংশ শুল্ক এবং মুসলিমদের ক্ষেত্রে আড়াই শতাংশ কর ধার্য করেন। জিম্মিদের উপর পাঁচশতাংশ শুল্ক ধার্য মুসলিম

১ বারনী: ফিরোজশাহী, পৃ. ৬১-৬৩।
২ বদায়ূনী: মুন্তাখাব-উত্-তাওয়ারিখ., দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ: ২৯৬।
৩ ইবনে বতুতা: ট্রাভেল্‌স্, পৃ: ১৪৫।

আইন অনুযায়ী বৈধ ছিল কিন্তু মুসলিমদের ব্যবসায়ের উপর শুল্ক আরোপ বৈধ নহে বলিয়া অনেকে মনে করেন, কারণ তাহাদের মতে, প্রতিবৎসর মুসলিমগণ তাহাদের মূলধনের উপর জাকাত দিতে বাধ্য থাকে। উক্ত ভুল সংশোধন করিয়া, ১৬৬৭ খ্রীস্টাব্দে সম্রাট মুসলিম ব্যবসায়ীদের ক্ষেত্রে আমদানি-রপ্তানি শুল্ক সম্পূর্ণভাবে উচ্ছেদ করেন, কিন্তু হিন্দুদের উপর বৈধভাবে নির্দিষ্ট শুল্ক আরোপিত থাকে।[১] শুল্ক প্রদান হইতে রেহাই পাইবার জন্য, হিন্দু ব্যবসায়ীরা তাহাদের ব্যবসায়ের পণ্যদ্রব্য মুসলিমদের সম্পত্তি বলিয়া প্রতারণার আশ্রয় নেয়; ঐ ধরনের নানা অভিযোগ সম্রাটের কর্ণগোচর হইলে, তিনি হিন্দু ব্যবসায়ীদের এই প্রতারণা ও প্রবঞ্চনা প্রতিরোধ করিবার জন্য, স্থানীয় কর্মচারীদিগকে সতর্ক করিয়া দেন।

দিল্লীর সুলতানী আমলে উইল না করিয়া, উত্তরাধিকারীবিহীন মৃত ব্যক্তির সম্পত্তি পুরাপুরি রাষ্ট্রের সম্পত্তিতে পরিণত হইত।[২] সরকারী কর্মকর্তাদের পরিত্যক্ত সমস্ত সম্পত্তি রাষ্ট্র দাবি করিত এবং ধনী ব্যবসায়ীদের সম্পত্তির উপরও দাবি করা হইত।[৩] তবে মৃত ব্যক্তির পরিবারবর্গ ও আশ্রিতজনদিগের ভরণ-পোষণের জন্য, সরকার সম্পত্তির অনেকাংশ ছাড়িয়া দিত।

মোগল সরকার ব্যবসা-বাণিজ্যে সক্রিয়ভাবে উৎসাহী ছিল এবং প্রায়ই সরকারের বিশেষ বিশেষ পণ্য-দ্রব্য, যথা সীসা, যবক্ষার, শোরা ইত্যাদির এক-চেটিয়া ব্যবসা ছিল। ১৬৩৩ খ্রীস্টাব্দে শাহজাহান নীল-এর সাধারণ একচেটিয়া ব্যবসার সৃষ্টি করেন। বিদেশী ক্রেতারা সম্রাটের এই নূতন একচেটিয়া ব্যবসার প্রতিরোধ করিতে চেষ্টা করে এবং পরে সম্রাট ইহা পরিত্যাগ করেন।

মোগল সরকার টাকশাল হইতে বাটা লাভ করিত।

মোগল আমলে খনির মালিকানা ছিল রাষ্ট্রের। সরকারকে একটি নির্দিষ্ট ফি প্রদান করিলে ব্যবসায়ীদিগকে খনি খননের অনুমতি দেওয়া হইত। গোল-কুণ্ডার হীরক খনির যে-কোন একটি হীরা এক আউন্সের তিন-অষ্টমাংশের বেশী ওজন হইলে, উহা সম্রাটের প্রাপ্য ছিল।[৪]

মোগল সম্রাটগণ তাঁহাদের দুই জন্মদিবসে (সৌর ও চান্দ্র), রাজ্যাভিষেক,

১ আমীর আলী: দি স্যার্যাসেন্স্, পৃ: ২৯৭।
২ সি. এইচ. আই. চতুর্থ খণ্ড, পৃ: ৪৫০।
৩ পূর্বোক্ত,
৪ মানুচী: স্তোরিয়া দ্যো মোগোর, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ: ৪১৭

বার্ষিক উৎসবের দিনে এবং রাজকুমার-রাজকুমারীদের বিবাহের ন্যায় অন্যান্য উৎসব উপলক্ষ্যে প্রাপ্ত উপঢৌকন ও উপহারাদি হইতে প্রচুর আয় করিতেন।

১৬৭৭ খ্রীস্টাব্দে আওরঙ্গজেব সম্রাটকে উপহার প্রদানের রীতি বন্ধ করেন। কিন্তু পরবর্তীকালে তাঁহার অর্থ সংকটের দিনে, তিনি উপহার-উপঢৌকন গ্রহণ করিতেন। ইতিপূর্বে সম্রাটকে প্রদত্ত উপহার সম্রাটের ব্যক্তিগত সম্পত্তিরূপে বিবেচিত হইত, কিন্তু আওরঙ্গজেব নিয়ম করেন যে, সম্রাট-প্রাপ্ত উপহার জনগণের সম্পত্তি (বায়তুল-মাল); সম্রাট শুধু একজন তত্ত্বাবধায়ক মাত্র, ইহার মালিক নহেন।[১]

নানা ছল-ছুতা বা ওজর দ্বারা নিম্নপদস্থ রাজস্ব কর্মচারীরা, মোগল আমলে বৈধ কর ও রাজস্বের অতিরিক্ত অবৈধ উপ-কর আদায় করিত—ইহাই 'আবওয়াব' নামে পরিচিত। যদিও সম্রাটগণ তাঁহাদের সাম্রাজ্যে উক্ত কর সম্পূর্ণরূপে অবৈধ ও নিষিদ্ধ বলিয়া ঘোষণা করেন, তবুও উহা প্রচলিত ছিল। জনসাধারণ অবৈধ উপ-কর আদায়কে চিরাচরিত রীতি বলিয়া মনে করিত। অবৈধ উপ-কর আদায় প্রাচীন-ভারতে মৌর্য শাসন আমলে প্রচলিত ছিল বলিয়া অনেকের ধারণা। চতুর্দশ শতাব্দীতে ফিরোজশাহ তুঘলক ইসলামী আইনের পরিপন্থী বলিয়া অবৈধ উপ-কর আদায় নিষিদ্ধ করেন। আকবর অবশ্য অন্যান্য কারণ বিবেচনা করিয়া উহা নিষিদ্ধ ভাবিতেন।[২]

আকবর ১৫৯০ খ্রীস্টাব্দে যে সমস্ত 'আবওয়াব' বিলোপ করিয়াছিলেন, উহার একটি তালিকা[৩] এড্ওয়ার্ট টমাস ফার্সী সূত্রের উপর নির্ভর করিয়া তাঁহার রচিত 'রেভিনিউ রিসোর্সেস্ অফ দি মোগল এমপায়ার' গ্রন্থে উল্লেখ করেন। আওরঙ্গজেব ১৬৭৩ খ্রীস্টাব্দে এক ফরমানের মাধ্যমে সমস্ত অবৈধ কর আদায় ধর্মীয় কারণে নিষিদ্ধ ঘোষণা করিয়া সম্পূর্ণরূপে উহা বন্ধ করিয়া দেন।[৪] যদুনাথ সরকার চুয়ান্ন দফা অবৈধ কর আদায়ের একটি ভয়ানক তালিকা প্রণয়ন করেন।[৫]

১ আওরঙ্গজেব অ্যাণ্ড্ হিজ্ টাইম্স্, পৃঃ ৪৮০।
২ সি. এইচ. আই, চতুর্থ খণ্ড, পৃঃ ৪৪৯।
৩ সরকার: এম. অ্যাড্মিনিস্ট্রেশন্, পৃঃ ৯০।
৪ বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য—খান: মিরাট-ই-আহমদী, পৃঃ ৩০৩-৩০৪।
৫ সরকার: এম. অ্যাড্মিনিস্ট্রেশন্, পৃঃ ১২১—১২৭।

আওরঙ্গজেব নিম্নলিখিত 'আবওয়াব'—অবৈধ কর বিলোপ করেন, যথা,

(ক) বিভিন্ন দ্রব্য বিক্রয়ের উপর কর, যেমন জেলেদের বিক্রির মাছ, কৃষকদের বাগান হইতে বিক্রির শাক-শব্জী, জ্বালানীরূপে ব্যবহৃত গরুর গোবর, দুধ-দধি, ঘাস-জঙ্গল হইতে আনা জ্বালানী কাঠ, তৈল,[১] গ্রামে নির্মিত বিক্রির মৃত্তিকা পাত্র তামাক[২] ইত্যাদি ;

(খ) সম্পত্তি বিক্রয়ের উপর ফি যথা, জমি বিক্রি বা বন্ধক, বাড়ী বিক্রি করিলে কাননগো ও পেয়াদারা ক্রেতার নিকট হইতে আড়াই শতাংশ অবৈধ উপ-কর আদায় করিত ;[৩]

(গ) ক্রীতদাস বিক্রির উপর কর ;

(ঘ) বাজারের দোকানঘরের উপর ভাড়া উপ-কর 'তা-ই-বাজারিহ্';

(ঙ) গুড় তৈয়ার করিবার বড় লোহার কড়ার উপর কর ;

(চ) শুকাইয়া যাওয়া নদীর (যাহা পায়ে হাঁটিয়া পার হওয়া যায়) খেয়া পার হওয়ার শুল্ক ;

(ছ) বলদ চরাণ কর[৪]

(জ) হিন্দু বিধবাকে নিম্ন-বর্ণ হিন্দু বিবাহ করিলে এবং তাহার দ্বারা সন্তান লাভ করিলে ফি 'ধারিচা' ;

(ঝ) গরু, ছাগল জবাই ফি ;[৫]

(ঞ) হিন্দুদের উপর শুল্ক যথা, গঙ্গা ও অন্যান্য পবিত্র নদীতে স্নানের উপর কর ;[৬] মৃত হিন্দুদের অস্থি বহন করিয়া গঙ্গানদীতে নিক্ষেপ করিবার উপর কর[৭] ।

---

১ গুজরাটে সরসপুরে প্রতি 'কুপাহ' (ড্রাম) তেলের জন্য কর্মচারীরা বার্ষিক ৩০, টাকা আদায় করিত।—খান ; মিরাট-ই-আহমদী, পৃঃ ২৭৫ ।

২ একজন সৈনিক তাহার স্ত্রীকে হত্যা করিয়াছিল, যখন সে শুনিল যে তাহার স্ত্রীর দুই চাকার গাড়ী কর আদায়কারীরা গুপ্ত তামাক বাহির করিতে তল্লাশী করিয়াছিল। উক্ত ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ১৬৬৬ খ্রীস্টাব্দে তামাকের উপর শুল্ক আদায় নিষিদ্ধ করা হয়।—মানুচী : স্তোরিয়া দো মোগোর, দ্বিতীয়, পৃঃ ৭৫ ; সরকার : আওরঙ্গজেব, তৃতীয়, পৃঃ ৯১।
ডুলি, বলদের গাড়ী, উষ্ট্র শিবিকা তল্লাশী করিয়া স্ত্রীলোক ও ছেলেমেয়েদের হয়রানী না করিবার জন্য এবং বাক্স বিছানা তল্লাশী করিয়া তামাকের জন্য অবৈধ কর আদায় না করিবার জন্য. ১৬৭৩ খ্রীস্টাব্দে এক ফরমান জারি করিয়া আওরঙ্গজেব তাঁহার কর্মচারীদিগকে হুশিয়ার করিয়া দেন।—সরকার : এম. অ্যাড্‌মিনিস্ট্রেশন্, পৃঃ ৯৪ ।

৩ খান : মিরাট-ই-আহমদী, পৃঃ ২৭৪ ।

৪ পূর্বোক্ত, পৃঃ ২৭৪ ।

৫ পূর্বোক্ত. পৃঃ ২৭৫ ।

৬ এলাহাবাদে প্রতি তীর্থযাত্রীর নিকট হইতে মোগল সরকার ছয় টাকা চারি আনা করিয়া উপ কর নিত।—মানুচী : স্তোরিয়া দো মোগোর, দ্বিতীয়, পৃঃ ৮২ ।

৭ সরকার : এম. অ্যাড্‌মিনিস্ট্রেশন্, পৃঃ ১০৫ ।

১৬৮২ খ্রীস্টাব্দে আওরঙ্গজেব আরও অন্যান্য 'আবওয়াব' নিষিদ্ধ করিয়া আর একটি ফরমান জারি করেন, যথা 'মালবা', 'বালাদস্তি' [১] ইত্যাদি ইত্যাদি। তবে ইহা সত্য যে, সম্রাট 'আবওয়াব' আদায় বন্ধ করিতে সংকল্পবদ্ধ হইলেও, রাজস্ব আদায়কারী কর্মচারীরা নিজেদের স্বার্থে অবৈধ উপ-কর আদায়ে তৎপর ছিল।

শেরশাহের আমলে সাম্রাজ্যকে রাজস্ব এককে বিভক্তিকরণের যে রীতি ছিল, বস্তুতঃপক্ষে মোগল শাসন আমলেও উহা প্রচলিত ছিল। ১৫৯৫ খ্রীস্টাব্দে আকবরের সাম্রাজ্য ১২টি সুবায় বিভক্ত করা হয় এবং পরবর্তীকালে খান্দেশ, বেরার ও আহমদনগর অধিকার করিবার পর, সুবার সংখ্যা ১৫টিতে উন্নীত হয়। আওরঙ্গজেবের মৃত্যুকালে (১৭০৭ খ্রীস্টাব্দে) মোগল সাম্রাজ্য ২১টি সুবায় বা পৃথক প্রদেশে বিভক্ত ছিল।

জাহাঙ্গীর ও শাহজাহানের শাসন আমলের ভূমি-রাজস্ব ব্যবস্থা সম্পর্কে সমসাময়িক লেখকদের গ্রন্থে প্রচুর তথ্য পাওয়া যায়।

ইহা স্পষ্ট যে, মোগল সাম্রাজ্যকে প্রদেশে (সুবা), প্রদেশকে জিলায় (সরকার) এবং জিলাকে মহকুমায় (পরগণা) বিভক্ত করা হয়। গ্রাম ছিল সর্বনিম্ন অর্থাৎ সর্বাপেক্ষা ছোট রাজস্ব একক। সাম্রাজ্যের বহুলাংশ জায়গীরদারের শাসনাধীনে ছিল; সুতরাং জায়গীরও রাজস্ব শাসনের একক ছিল।

শেরশাহের ভূমি-রাজস্ব ব্যবস্থা অত্যধিক বিস্তারিত, সুসম্পন্ন ও সুপরীক্ষিত পদ্ধতি ছিল।[২]

আকবরের আমলে ওয়াকিল এবং পরবর্তীকালে দিওয়ান ছিলেন সাম্রাজ্যের সর্বোচ্চ রাজস্ব কর্মকর্তা। আমিল বা দিওয়ান ছিলেন সুবার প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা এবং সরকারের প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা ছিলেন আমিল[৩] ও আমলগুজার। আমলগুজার ছিলেন দিল্লী সুলতানী আমলের মুনসিফ-ই-মুন্সিফানের সমকক্ষ। পরগণায় রাজস্ব-ব্যবস্থার প্রধান ছিলেন আমলগুজার[৪] এবং মুনসিফ

১ খান: মিরাট-ই-আহমদী, পৃ: ২৭৫; সি. এইচ. আই. চতুর্থ খণ্ড, পৃ: ২৩১-২৩২।
২ শরণ: প্রভিন্‌শ্‌ল্‌ গভর্নমেন্ট, পৃ: ৭৭।
৩ পূর্বোক্ত, পৃ: ২০৯।
৪ ইসলামিক কাল্‌চার্‌, ষষ্ঠদশ খণ্ড, পৃ: ৮৯-৯০; আমল গুজারের ক্ষমতা ও কর্তব্যের বিস্তারিত আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য—আইন, পঞ্চম অধ্যায়।

বা আমিন,[১] বিটিকচি,[২] কারকুন,[৩] কানুনগো,[৪] পাটোয়ারী[৫] খাজা-নাহ্‌দার বা ফুতাহ্‌দার ছিলেন অন্যান্য রাজস্ব কর্মচারীদের অন্যতম। রাজস্ব কর্মচারীদের কর্তব্য শুধু প্রতি গ্রামের উৎপন্ন শস্যের পরিমাণ নির্ধারণে সীমাবদ্ধ ছিল না, তাহাদিগকে ফসল উৎপাদনের বৃদ্ধিকরণে উৎসাহ প্রদান ও বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে হইত।[৬]

তৈমুর তাঁহার বিস্তৃত সাম্রাজ্যের কোন কোন অঞ্চলে উৎপন্ন ফসলের এক-তৃতীয়াংশ ভূমি-রাজস্ব আদায় করিতেন। বাবর এই প্রচলিত ভূমি-রাজস্ব শতকরা তিরিশভাগ বৃদ্ধি করেন।[৭] শেরশাহ্‌ উত্তম, মধ্যম ও মন্দ জমি বিবেচনা করিয়া, প্রতি-বিঘা জমিতে গড়পরতা উৎপাদিত ফসলের এক-তৃতীয়াংশ রাষ্ট্রের ভূমি-রাজস্ব নির্ধারণ করেন।

আকবর রাজত্বকালের প্রথমদিকে শেরশাহের নির্ধারিত রাজস্বের হার অনুযায়ী, উৎপাদিত শস্যের এক-তৃতীয়াংশ রাজস্ব দাবি করেন। ১৫৭০-৭১ খ্রীস্টাব্দে তিনি একটি নূতন রাজস্ব-নিরূপণ পদ্ধতি প্রবর্তন করেন। প্রতি বৎসর প্রতি অঞ্চলে জমির উৎপাদিত ফসলের মূল্য সম্রাটকে নির্ধারণ করিতে হইত। ইহাতে নানা অসুবিধার উদ্ভব হওয়াতে উক্ত রাজস্ব-নিরূপণ পদ্ধতি বাতিল করিয়া দেওয়া হয়।

আওরঙ্গজেবের শাসন আমলে ভূমি-রাজস্ব এক-তৃতীয়াংশ হইতে অর্ধাংশে উঠা-নামা করে। আকবর ও তাঁহার পূর্বে শেরশাহ্‌ 'দহাস্‌তরি'[৮] ও

১ আমিন শব্দটি সাধারণভাবে মুন্‌সিফ শব্দের অর্থেই ব্যবহৃত হইত।—ব্রি. মি. অ. পাণ্ডুলিপি ৬৫৮৮।

২ বিটিক্‌চির কর্তব্যাদির বিস্তারিত আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য—আইন, ষষ্ঠ অধ্যায়। বিটিক্‌চি একটি তুর্কী শব্দ; ইহা দ্বারা লেখক বা হিসাব-রক্ষক বুঝায়। তিনি ছিলেন সরকারের রাজস্ব বিভাগের সচিব—শরণ: প্রভিন্‌শল্‌ গভর্নমেন্ট, পৃ: ২৮৭।

৩ কারকুন ছিলেন শিবিরের কেরানী ও হিসাব রক্ষক।—শরণ: প্রভিন্‌শ্‌ল্‌ গভর্নমেন্ট, পৃ: ২৯০।

৪ আবুল ফজলের আইন-ই-আকবরীতে কানুনগোকে 'কৃষকদের আশ্রয়' বলা হইয়াছে।—আইন, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ: ৬৬; কানুনগো ছিলেন প্রচলিত রাজস্ব নিয়ম—কানুনের 'চলন্ত অভিধান' বিশেষ।—সরকার: এম. অ্যাড্‌মিনিস্ট্রেশন্‌, পৃ: ৮৯; দি ম্যানিউয়্যাল্‌ অফ দি ডিউটিজ অফ অফিসারস্‌ এ অবশ্য কানুনগোর ভিন্ন কর্তব্য ও দায়িত্বের উল্লেখ আছে।—ম্যানিউয়্যাল্‌ পৃ: ১৪৮-৪৯ এবং উইলসন্‌: গ্লোস্যারি, পৃ: ২৬০।

৫ আবুল ফজল বলেন যে, পাটোয়ারী কৃষকের পক্ষে নিযুক্ত একজন লেখক।—শরণ: প্রভিন্‌শল গভর্নমেন্ট, পৃ: ২৯৫।

৬ সি. এইচ. আই. চতুর্থ খণ্ড, পৃ: ৪৬৯।

৭ তুজুক-ই-বাবুরী, দ্বিতীয়, পৃ: ৩৪৫।

৮ শেরশাহের আমলে, 'দহাস্‌তরি' শুল্ক আদায় করা হইত।—সি. এইচ. আই- চতুর্থ খণ্ড, পৃ: ৪৬০।

'দহ্‌সেরি'[১] শুল্কের অতিরিক্ত, উৎপাদিত শস্যের এক-তৃতীয়াংশ রাজস্ব আদায় করিতেন। ৫৪টিরও বেশী অবৈধ উপ-কর উচ্ছেদ করিবার পর, আওরঙ্গজেব ভূমি-রাজস্ব সামান্য বৃদ্ধি করিলে কৃষকগণ উক্ত বর্ধিত রাজস্বকে অতিরিক্ত বোঝা মনে করিত না। আওরঙ্গজেবের দিওয়ান মুর্শিদকুলী খানের পরিচালিত দাক্ষিণাত্যের প্রশাসন-ব্যবস্থা সম্পর্কে প্রাপ্ত বিস্তারিত তথ্য যে আলোকসম্পাত করে, উহাতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, আওরঙ্গজেবের ভূমি-রাজস্ব ব্যবস্থায় দরিদ্র কৃষককুলের প্রতি সরকারের মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গি ছিল সহানুভূতিপূর্ণ।

প্রতি বৎসর প্রত্যেক অঞ্চলে মূল্য-নির্ধারণ পদ্ধতি সন্তোষজনকভাবে কাজ না করায়, উক্ত অসুবিধা দূরীভূত করিবার জন্য, আকবর তাঁহার রাজত্বের চব্বিশতম বৎসরে 'দহ্‌সালাহ্' অর্থাৎ দশ-বৎসরের ভূমি-রাজস্ব নিরূপণ পদ্ধতি[২] প্রবর্তন করেন। জমির উৎপাদিকা শক্তির উপর ভিত্তি করিয়া রাজস্বের পরিমাণ নির্ধারণ করা ছিল আকবরের রাজস্ব সংস্কারের প্রধান বিজ্ঞানসম্মত নীতি।[৩] সংক্ষেপে বলা যায় যে, তাঁহার রাজস্ব-সংস্কার নীতি তিনটি প্রধান বৈশিষ্ট্যের[৪] উপর নির্ভর করিত, যথা, (ক) জমি জরিপ ও পরিমাণ নির্ধারণ, (খ) জমির শ্রেণী বিভাগ, এবং (গ) রাজস্ব-হার নির্ধারণ। তিনি সমগ্র জমি জরিপ করাইয়া জমির উর্বরতা এবং কতকাল যাবৎ জমিতে চাষ-আবাদ করা হইতেছে, এই সকল ভিত্তিতে সমগ্র চাষের জমিকে চারি ভাগে[৫] বিভক্ত করেন, যথা, (১) 'পোলাজ' অর্থাৎ যে-সমস্ত জমি প্রতিবৎসর চাষ-আবাদ করা চলিত, (২) 'পরাউতি' অর্থাৎ যে-সমস্ত জমি কিছুকাল চাষের পর উর্বরতা সঞ্চয় ও উৎপাদন-শক্তি বৃদ্ধির জন্য কিছুকাল পতিত রাখিতে হইত, (৩) 'চাচর' অর্থাৎ যে-সকল জমি তিন বা চারি বৎসর যাবৎ পতিত পড়িয়া আছে, এবং (৪) 'বঞ্জর' অর্থাৎ যে-সমস্ত জমি পাঁচ বৎসরের অধিককাল অনাবাদী আছে। 'পোলাজ' ও 'পরাউতি' জমিকে রাজস্ব-বিভাগের কৃতবিদ্য, সুযোগ্য দেওয়ান টোডরমল উৎপন্ন ফসলের পরিমাণের ভিত্তিতে পুনরায় উত্তম, মধ্যম ও অধম

---

১ আকবরের সময় 'দহসেরি' শুল্ক আদায় করা হইত।—আইন, পৃঃ ২৬-২৭।

২ মোগল আমলের ভূমি-রাজস্ব নিরূপণ ও আদায় পদ্ধতির বিস্তারিত আলোচনার জন্য বিশেষ দ্রষ্টব্য—মুন্সী হরকরণ : ইনশা-ই-হরকরণ।

৩ আলীম : ভারতে মুসলিম রাজত্বের ইতিহাস, পৃঃ ২৫১-২৫২।

৪ এস. এম. এডওয়ার্ড ও এইচ. ও. গ্যারেট্ : মোগল্ রুল ইন্ ইণ্ডিয়া, পৃঃ ১৩৯।

৫ রায় চৌধুরী, মজুমদার ও দত্ত : অ্যান্ অ্যাডভান্স্‌ড্ হিস্টরি অব ইণ্ডিয়া, পৃঃ ৫৬১।

এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছিলেন।[১] প্রত্যেক কৃষকের অধীনে এই তিন পর্যায়ের জমিই থাকিত। প্রতি বিঘার উৎপাদিত শস্যের দ্বারা এই তিন শ্রেণীর ভূমির গড় নির্ণয় করা হইত এবং এই হিসাবেই কর ধার্য করা হইত। টোডরমল এই তিন প্রকার জমির মোট উৎপন্ন ফসলের এক-তৃতীয়াংশ রাজস্ব হিসাবে ধার্য করেন। আর 'চাচর' ও 'বঞ্জর' এই দুই প্রকার জমির রাজস্ব অতি সামান্য পরিমাণে ধার্য করা হইয়াছিল, কিন্তু জমির উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে রাজস্ব ক্রমবর্ধিত হইবে, এইরূপ ব্যবস্থাও করা হইয়াছিল। 'পরাউতি' জমি যখন চাষ করা হইত, তখন 'পোলাজ' জমির ফসলের হারে ঐ জমির রাজস্ব নেওয়া হইত; যখন 'চাচর' ও 'বঞ্জর' জমি চাষ করা হইত, তখন ক্রমশঃ সেই জমিগুলির রাজস্ব আদায় করা হইত।[২] রায়তগণ ইচ্ছানুযায়ী উৎপন্ন ফসলে অথবা নগদ অর্থের দ্বারা জমির রাজস্ব দিতে পারিত। উপরোক্ত রাজস্ব-ব্যবস্থা সমগ্র উত্তর-ভারত ও গুজরাটে প্রবর্তন করা হইয়াছিল, কিন্তু সামান্য পরিবর্তন সাধিত করিয়া দক্ষিণ-ভারতেও প্রচলন করা হয়। ইহা মোগলদের রাজস্ব-নীতির ইতিহাসে টোডরমলের 'রায়তোয়ারী প্রথা' নামে পরিচিত। ইহাতে টোডরমলের 'যবতি' রাজস্বনীতিও বলা হয়। এই 'যবতি প্রথা' বিহার, এলাহাবাদ, অযোধ্যা, আগ্রা, মালব, আজমীর, দিল্লী, লাহোর-মুলতান, গুজরাট প্রভৃতি সুবায় সর্বাপেক্ষা অধিক প্রচলিত ছিল।[৩]

অন্যান্য রাজস্বনীতির মধ্যে 'গাল্লাহ্‌বখশ' ও 'নাসাখ' বিশেষ উল্লেখযোগ্য। 'গাল্লাহ্‌বখশ' পদ্ধতি খুবই সহজ ছিল। 'গাল্লাহ্‌বখশ' পদ্ধতিতে 'বতা'ই' 'খাতি বতা'ই' ও 'লঙ্গবতা'ই' নামক তিনটি প্রথা প্রচলিত ছিল।[৪] 'নাসাখ' প্রথা জমিদারী প্রথা নহে, ইহা ছিল রায়তোয়ারী রাজস্বনীতি, কারণ এই নীতিতে রায়ত ও রাষ্ট্রের মধ্যে কোন মধ্যবর্তী প্রতিনিধি ছিল না। সরাসরিভাবে সরকারের সহিত কৃষকদের সম্বন্ধ ছিল।

আকবরের রাজস্ব-সংস্কার সম্পর্কে স্মীথ বলেন যে, সম্রাটের রাজস্বনীতি ছিল নিখুঁত এবং রাজস্ব-ব্যবস্থা ছিল প্রশংসনীয়।[৫]

---

১ ঈশ্বরীপ্রসাদ : এ শর্ট' হিস্টরি অফ মুসলিম রুল্ ইন্ ইণ্ডিয়া, পৃ: ২২৮-২২৯।
২ বিস্তারিত আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য—মোর‍্ল্যাণ্ড : ইণ্ডিয়া অ্যাট দি ডেথ অফ আকবর.
৩ ঈশ্বরী প্রসাদ : শর্ট' হিস্টরি, পৃ: ৩৩০ পাদটীকা।
৪ হুসাইনি : এম. অ্যাড্‌মিনিস্ট্রেশন, পৃ: ১৩২।
৫ ঈশ্বরী প্রসাদ : শর্ট' হিস্টরি, পৃ: ৩৩১।

জাহাঙ্গীর ও শাহজাহানের শাসন আমলের রাজস্ব-প্রশাসনিক ব্যবস্থা সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যায় না। খুব সম্ভব তাঁহারা আকবরের রাজস্ব-প্রথার পরিবর্তন করিয়াছিলেন।[১]

অনেকের মতে, আওরঙ্গজেবের আমলে গ্রামকে রাজস্ব-একক হিসাবে বার্ষিক রাজস্ব নগদে নির্ধারিত করা হইত।

প্রত্যেক মোগল সম্রাটের আমলে সাম্রাজ্যের মোট ভূমি-রাজস্বের পরিমাণ নির্ধারণ করিবার জন্য প্রচুর তথ্য পাওয়া যায় না। ১৬০৫ খ্রীস্টাব্দে জাহাঙ্গীরের সিংহাসনে আরোহণের সময় ভূমি-রাজস্ব হইতে সাম্রাজ্যের মোট আয় ছিল ১৭ কোটি ৪৫ লক্ষ টাকা।[২] ১৬৪৭ খ্রীস্টাব্দে শাহজাহানের আমলে বার্ষিক আয় ছিল ২২০,০০০,০০০ টাকা।[৩] যদুনাথ সরকারের মতে, ১৬৯০ খ্রীস্টাব্দে আওরঙ্গজেবের সময় আফগানিস্তানকে বাদ দিয়া, মোগল সাম্রাজ্যের রাজস্বের পরিমাণ সরকারীভাবে ৩৩৪,৫০০,০০০ টাকা দেখান হইয়াছিল, কিন্তু সত্যিকারের আদায়কৃত রাজস্ব পরিমাণ ছিল অপেক্ষাকৃত কম। উক্ত সংখ্যক টাকা শুধু ভূমি-রাজস্ব ছিল এবং ইহাতে জাকাত ও জিজিয়া অন্তর্ভুক্ত ছিল না।[৪]

সাম্রাজ্যের সর্বত্র কৃষকদের নিকট হইতে সরাসরিভাবে রাজস্ব, কর আদায় করিবার জন্য মোগল আমলে অত্যন্ত বিস্তারিত প্রশাসনিক যন্ত্র নিয়োজিত ছিল। সাম্রাজ্যের মোট জমির[৫] এক ক্ষুদ্র অংশ খালিসাহ্ জমিতে সম্রাটের রাজস্ব কর্মচারীদিগের দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে শাসন-ব্যবস্থা পরিচালিত হইত। সাম্রাজ্যের বহুলাংশ জমিই ছিল সমর্পিত বা হস্তান্তরিত অর্থাৎ জায়গীর (ইক্তা) প্রদত্ত। জায়গীরদারগণ স্বীয় জায়গীরে রাজস্ব আদায় করিতেন এবং আদায়কৃত রাজস্ব হইতে তাহাদের প্রাপ্য অংশ কাটিয়া রাখিয়া, বাকী অংশ কেন্দ্রীয় সরকারকে প্রদান করিতেন। এই পদ্ধতিটি মুসলিম ভূ-সম্পত্তি বিষয়ক প্রথার একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল।[৬]

রাজস্ব আদায়ের ভারপ্রাপ্ত রাজস্ব কর্মচারী দেওয়ান আদায়কৃত রাজস্ব হইতে, শাসনকার্যের প্রয়োজনীয় ব্যয় সংকুলানের জন্য অর্থ সুবাদারকে দিতেন এবং উদ্ধৃত্ত অর্থ কেন্দ্রীয় রাজকোষে প্রেরণ করিতেন। কেন্দ্রীয় সরকারের প্রধান

---

১ সি. এইচ. আই., চতুর্থ খণ্ড, পৃঃ ৪৬৬।

২ ভ্যান্‌ডেন ব্রুক্, উদ্ধৃত হইয়াছে ভি. স্মিথ্ : আকবর দি গ্রেট্ মোগল, পৃঃ ৩৭৯।

৩ লাহোরী : বাদশাহ-নামা, দ্বিতীয়, পৃঃ ৭১৩।

৪ সি. এইচ. আই., চতুর্থ খণ্ড, পৃঃ ৩১৬।

৫ রাজস্ব আদায়ের ব্যবস্থার বিস্তারিত আলোচনার জন্য বিশেষ দ্রষ্টব্য—রুকাত্-ই-আলমগীরী।

৬ মোরল্যাণ্ড্ : অ্যাগ্রেরিয়্যান্ সিস্টেম্, পৃঃ ৯-১০।

দিওয়ানের নিকট আমিন রাজস্ব প্রেরণ করিতেন এবং তাহাকে বিটিক্চি, পোত্-দার, কাননগো, পাটোয়ারী, মুকাদ্দম প্রভৃতি রাজস্ব কর্মচারী সাহায্য করিতেন। বন্যা, দুর্ভিক্ষ ও অভাব-অনটনের দিনে রাজস্ব আদায় করিতে রায়তদিগের প্রতি নির্দয় ব্যবহার না করিবার জন্য কড়া নির্দেশ ছিল। রাজস্ব কর্মচারীদের দুর্নীতি কঠোর হস্তে দমন করা হইত।

যদুনাথ সরকার মোগল আমলে ভূমি-রাজস্ব আদায়ের ব্যবস্থা সমালোচনা করিয়া মন্তব্য করেন যে, রাজস্ব আদায়কারী কর্মচারীদের প্রতি ভারতীয় কৃষক 'চরম বিরুদ্ধাচরণ করিত' এবং 'সরকারের অনিশ্চিয়তা'-হেতু ও রাজস্ব প্রদানের পরিবর্তে কৃষকদের কোন সুযোগ-সুবিধা লাভের সম্ভাবনার অভাবের দরুন, কৃষকরা প্রায়ই অনিচ্ছা ও অনিয়মিতভাবে সরকারকে রাজস্ব দিত।[১] তবে ইহা অনস্বীকার্য যে, রাজস্ব আদায় করিবার সময় কৃষকদের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শনের জন্য, অহেতুক নির্দয় ব্যবহার না করিবার জন্য এবং অবৈধ কর আদায় না করিবার জন্য, সম্রাট প্রায়ই কড়া হুকুম জারি করিতেন। রাজস্ব আদায়কালে রায়তদিগকে অত্যাচার ও উৎপীড়ন না করিবার জন্য রাজস্ব আদায়কারীদের প্রতি সুস্পষ্ট নির্দেশ মোগল সরকারের প্রশাসনিক নীতিতে পরিলক্ষিত হয় এবং সমসাময়িক ঐতিহাসিক ও লেখকদের পুস্তকাদিতে ইহার উল্লেখ রহিয়াছে। শাহজাহান ও আওরঙ্গজেবের রাজত্বকালে কৃষকদের প্রতি রাজস্ব আদায়কারী কর্মচারীদের অত্যাচার ও নির্দয় ব্যবহারের অভিযোগ সম্রাটের নিকট পৌঁছিলে, উক্ত কর্মচারীদিগকে, এমনকি প্রাদেশিক ভাইসরয়কেও চাকুরী হইতে বরখাস্ত করিবার অনেক দৃষ্টান্ত রহিয়াছে।[২]

কেহ কেহ মন্তব্য করিয়াছে, মোগল ভারতে নিম্নপদস্থ রাজস্ব কর্মচারিগণ নির্দয়, অত্যাচারী, দুর্নীতিপরায়ণ ও অসাধু, কিন্তু উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাগণ সৎ ও উদার ছিলেন।[৩] সম্রাট, প্রধান দিওয়ান ও এমনকি সুবাদার কৃষকদের প্রতি সদয় ও ন্যায়পরায়ণ ছিলেন এবং সদ্ব্যবহার করিতেন বটে, কিন্তু সপ্তদশ শতাব্দীতে নিম্নপদস্থ রাজস্ব বিভাগের কর্মচারীদের লোভ-লালসা ও নির্দয়তায় কৃষককুল অত্যাচারিত ও উৎপীড়িত হইয়াছিল সন্দেহ নাই, কারণ তাহারা জনসাধারণের সহিত কর আদায়ের সময় দুর্ব্যবহার করিত[৪] উহার প্রমাণ পাওয়া যায়।

---

১ সরকার : এম. অ্যাড্‌মিনিস্ট্রেশন, পৃ: ৭৬।

২ পূর্বোক্ত, পৃ: ৮১ ; আই. ও. ফার্সী পাণ্ডুলিপি নং ৩৭০।

৩ সরকার : স্টাডিজ্, পৃ: ২২৩-২২৪।

৪ সরকার : এম. অ্যাড্‌মিনিস্ট্রেশন্, পৃ: ৮২-৮৩।

পঞ্চম অধ্যায়

সামরিক শাসন-ব্যবস্থা

ভারতে মোগল সামরিক শাসন-ব্যবস্থায় খুব কম সংখ্যক সৈন্য সরাসরি সম্রাট কর্তৃক পোষণ করা হইত ; বেশীর ভাগ সময়ই সৈন্যরা সামরিক নেতা অথবা সামরিক প্রধানদের অধীনে চাকুরীতে যোগদান করিত। যত সংখ্যক সৈন্য সামরিক নেতারা তাহাদের অধীনে পোষণ করিতেন বা আশা করা হইত তাহারা পোষণ করিবেন, উক্ত সৈন্য-সংখ্যানুযায়ী তাহাদের পদ-মর্যাদা নির্ধারণ করা হইত। এইভাবে মনসবদারী প্রথার গোড়াপত্তন হয়। ১৫৭১ খ্রীস্টাব্দে মোগল সামরিক সংস্কার সাধন করিবার উদ্দেশ্যে শাহবাজ খানকে মীরবখশী পদে নিযুক্ত করিয়া সম্রাট আকবর স্বয়ং একটি পরিকল্পনা প্রস্তুত করেন। ইতিহাসে ইহা আকবরের বিখ্যাত 'মনসবদারী প্রথা'[১] নামে পরিচিত। তাঁহার আমলে মনসবদারী প্রথা সর্বাত্মকভাবে প্রথম প্রবর্তিত হয়।[২] মনসবদারী প্রথা ছিল মোগল সামরিক শাসন-ব্যবস্থার অন্যতম উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। আকবরের সামরিক নীতির মূল কথা ছিল যে, প্রয়োজনবোধে সাম্রাজ্যের সমস্ত সুস্থ ও সবল ব্যক্তিকে দেশরক্ষার জন্য অস্ত্রধারণ করিতে প্রস্তুত থাকিতে হইবে। প্রকৃতপক্ষে, তাঁহার মনসবদারগণই সামরিক দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করিতেন। তাঁহারাই ছিলেন সাম্রাজ্যের শক্তির কেন্দ্র। এই মনসবদারী প্রথার ভিত্তির উপর আকবরের সমগ্র সামরিক সংগঠন প্রতিষ্ঠিত ছিল।[৩]

মনসব[৪] শব্দের অর্থ পদ, মর্যাদা বা অফিস এবং যিনি এই পদের অধিকারী ছিলেন, তাঁহাকে বলা হইত মনসবদার। আইরভিন তাঁহার পুস্তকে মোঘল সেনাবাহিনী সম্পর্কে বিশদভাবে আলোচনা করিয়া বলেন যে, আকবরের এই

---

১ বিশেষ আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য—আলীম : ভারতে মুসলিম রাজত্বের ইতিহাস, পৃঃ ২৫৫-২৫৮ ; আবদুল আজিজ : দি মন্‌সবদারি সিস্‌টেম অ্যাণ্ড্ দি মোগল আর্মি।

২ আইন, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ২৩৭; আইরভিন্ : আর্মি, পৃঃ ৩৮।

৩ ঈশ্বরী প্রসাদ : শর্ট' হিস্টরি, পৃঃ ৩৩২।

৪ 'মনসব' শব্দের আক্ষরিক অর্থ স্থান যাহার উপর কিছু রাখা হয় 'নসবকরদান'—দস্‌তুর-উল-ইনশা, পৃঃ ২৩৩; ঐতিহাসিক রজ্ 'মনসব' শব্দটিকে অস্পষ্টভাবে বিশেষ অধিকাররূপে অনুবাদ করিয়াছেন।—ই. ডি. রজ্ : তারিখ-ই-রাশিদী, পৃঃ ১০৩।

সামরিক প্রথার উদ্দেশ্য ছিল মনসবদারের মধ্যে পদ-মর্যাদার ধাপ ও বেতনের ক্রমোন্নতি নির্ধারণ করা।[১]

মোগলদের হিন্দুস্তানে আগমনের পূর্বে, মধ্য-এশিয়ায় খুব সম্ভবতঃ এই প্রথা প্রচলিত ছিল। মোঙ্গল নেতা ও বিজয়ী চেংগিজ খান এবং তৈমুর লঙ্গের শাসন আমলে মনসবদারী প্রথার প্রাথমিক পর্যায়, পদ-মর্যাদা ও নির্দিষ্ট সংখ্যক সৈন্য পোষণ করিবার মধ্যে সত্যিকারের সমঝোতা ছিল। এক 'তুমান' ১০,০০০ মনসবের অধিকারী একজন সামরিক কর্মকর্তা যথার্থই ১০,০০০ সৈন্য পোষণ করিতেন।

মনসবদারী প্রথার ক্রমবিকাশের দ্বিতীয় পর্যায়, অর্থাৎ তৈমুর ও তাঁহার বংশধর আকবরের সময়কালের মধ্যে, পদ-মর্যাদা ও নির্দিষ্ট সংখ্যক সৈন্য রাখিবার মধ্যে বিচ্যুতি পরিলক্ষিত হয়। প্রত্যেক মনসবদার তাঁহার পদ অনুযায়ী নির্দিষ্ট সংখ্যক সৈন্য, অশ্ব, হস্তী প্রভৃতি প্রস্তুত রাখিতে বাধ্য থাকিতেন। কিন্তু মনসবদারগণ তাঁহাদের পর্যায় অনুযায়ী নির্দিষ্ট সংখ্যক সৈন্য, অশ্ব ও হস্তী পোষণ করিতেন কিনা, ইহা একটি বিতর্কের বিষয়। প্রথমদিকে আকবর দৃঢ়-হস্তে এই নিয়ম কার্যকরী করিয়াছিলেন, কিন্তু শেষদিকে এই ব্যবস্থাপনায় শিথিলতা দেখা দেয়। ইহার ফলে মনসবদারগণ তাঁহাদের নির্দিষ্ট সংখ্যা হইতে অনেক কম সংখ্যক সৈন্য, অশ্ব ও হস্তী পোষণ করিতেন।[২]

তৃতীয় পর্যায়, আকবর তাঁহার সামরিক কর্মকর্তাদিগের প্রত্যেককে দুইটি পদ প্রদান করেন, যথা, 'জাট' (ব্যক্তিগত পদ) ও 'সাওয়ার' (অতিরিক্ত সৈন্য পোষণের জন্য পদ)। বেসামরিক কর্মচারিগণ জাট পদ লাভ করিত এবং তাহাদের বেতন ঐ পদের ধাপের উপর নির্ভরশীল ছিল। সামরিক ও বেসামরিক কর্ম-কর্তাদিগকে প্রদত্ত ব্যক্তিগত পদ মনসব-ই-জাটের সঙ্গে, উক্ত কর্মকর্তাগণ সত্যি-কারে কত সংখ্যক সৈন্য পোষণ করিতেছেন, উহার কোন সম্পর্ক ছিল না। প্রত্যেক সামরিক মনসবদারকে জাট পদের অতিরিক্ত সাওয়ার পদ দেওয়া হইত।

---

১ আইরভিন্ : আর্মি, পৃঃ ৩-৪।

২ সাত হাজার পর্যায়ের মনসবদার লুৎফুল্লাহ খান এমনকি সাতটি গর্দভ, ইহারও কম সংখ্যক অশ্ব অথবা অশ্বারোহী কখনও পোষণ করিতেন না, যদিও তিনি রাজকোষ হইতে তাহার পদ-মর্যাদানুযায়ী নির্দিষ্ট সংখ্যক সৈন্য ও অশ্ব রাখিবার জন্য বেতন ভোগ করিতেন।—ঈশ্বরী প্রসাদ : শর্ট' হিস্টরি, পৃঃ ৩৩৩ পাদটীকা।

সুতরাং একজন ৫,০০০ পদ-মর্যাদার অধিনায়ককে ৫,০০০, ৪,০০০ অশ্বারোহী সৈন্যের অধিনায়করূপে গণ্য করা হইত ; অর্থাৎ ৫,০০০ পদ-মর্যাদার সেনানায়ক ৪,০০০ অশ্বারোহী সৈন্য রাখিবে বলিয়া মনে করা হইত।[১]

মনসবদারদের জাট ও সাওয়ার পদের পার্থক্য সম্পর্কে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতভেদ রহিয়াছে। ব্লকম্যান বলেন যে, একজন মনসবদারকে যে নির্দিষ্ট সংখ্যক সৈন্য পোষণ করিবার কথা, জাটপদ ঐ সংখ্যাকে নির্দেশ করে এবং ঐ মনসবদার প্রকৃতপক্ষে যে সংখ্যক সৈন্য পোষণ করেন, সাওয়ার পদ ঐ সংখ্যাকে নির্দেশ করে। কিন্তু ব্লকম্যান-এর এই অভিমত নির্ভুল বলিয়া মনে হয় না। জাট ও সাওয়ারের পার্থক্য সম্বন্ধে ঈশ্বরীপ্রসাদ বলেন যে, জাট ছিল মনসবদারগণের ব্যক্তিগত পদ। কিন্তু ইহার সঙ্গে সংযুক্ত কতকগুলি অতিরিক্ত অশ্বারোহী সৈন্য পোষণের জন্য একজন মনসবদার অতিরিক্ত ভাতা পাইতেন এবং ইহা ছিল তাঁহার সাওয়ার পদ।[২] আইন-ই-আকবরীতে বলা হইয়াছে যে, সর্বোচ্চ পর্যায়ের মনসবদার মোট দশ হাজার সৈন্য এবং সর্বনিম্ন মনসবদার মোট দশজন সৈন্য রাখিবার নিয়ম এবং সেই অনুযায়ী সর্বমোট ছেষট্টি পর্যায়ের মনসবদার ছিল।[৩] প্রকৃতপক্ষে, তেত্রিশ ধরনের মনসবদারী কার্যকর ছিল।[৪] কিন্তু আইরভিন্‌এর মতে, সর্বোচ্চ পর্যায়ের মনসবদার মোট দশ হাজার সৈন্য এবং সর্বনিম্ন মনসবদার মোট বিশজন সৈন্য রাখিবার দায়িত্বে, সাতাইশ পর্যায়ের মনসবদারের বেশী ছিল না।[৫]

আকবরের রাজত্বের প্রথমদিকে, সাধারণ মনসবদার ১০ হইতে ৫,০০০ অশ্বারোহী সৈন্য রাখিত। তাঁহার রাজত্বের শেষদিকে দুই, তিনজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির ৬,০০০ ও ৭,০০০ সৈন্যের মনসবে পদোন্নতি হইয়াছিল। ৭,০০০ হইতে ৫০,০০০ এমনকি তদূর্ধ্বে সৈন্যের মনসবদার শুধুমাত্র রাজকুমারগণ হইতে পারিতেন।[৬] ৭,০০০ হইতে ১০,০০০ সৈন্যের মনসবদার রাজপরিবারের লোক ভিন্ন অন্য কেহ সাধারণতঃ হইতে পারিতেন না। কিন্তু ৭,০০০ পর্যায়ের মনসবদার

১ এন্‌সাইক্লোপীডিয়া অফ ইসলাম, তৃতীয় খণ্ড, পৃঃ ৬২৬।
২ ঈশ্বরী প্রসাদ : শর্ট হিস্টরি, পৃঃ ৩৩৪।
৩ আইন (ব্লকম্যান), পৃঃ ২৫৮-২৪৯।
৪ ঈশ্বরী প্রসাদ : শর্ট হিস্টরি, পৃঃ ৩৩৩।
৫ আইরভিন্ : আর্মি, পৃঃ ৪।
৬ আনন্দ রাম : মিরাট-ই-ইস্তিলাহ্ (ব্রি. মি. পাণ্ডুলিপি ১৮১৩); আইরভিন : আর্মি, পৃঃ ৪।

মানসিংহ, টোডরমল, কবুলিচ খান উল্লিখিত নিয়মের ব্যতিক্রম ছিলেন। মনসবদারদের নিয়োগ, পদোন্নতি ও পদচ্যুতি সম্পূর্ণভাবে সম্রাটের বিবেচনার উপর নির্ভর করিত। এই পদ বংশগত নহে, ব্যক্তিগত ছিল ; ব্যক্তিগত সামরিক গুণ ও ক্ষমতার উপর ইহা নির্ভরশীল ছিল। যুদ্ধ-বিগ্রহের কালে মনসবদারগণ নির্দিষ্ট সৈন্যসহ উপস্থিত হইতে বাধ্য ছিলেন। সংক্ষেপে বলা চলে যে, মনসবদারী প্রথা ছিল ইউরোপের সামন্ত প্রথারই অনুরূপ।

মনসবদারী প্রথার ইতিহাসের চতুর্থ পর্যায়ে, এমনকি মনসব-ই-সাওয়ারে পর্যন্ত ব্যতিক্রম ও বিচ্যুতির সৃষ্টি হয়। মনসবদারদের সাওয়ার পদে পর্যন্ত সত্যিকার ঘটনা পরিলক্ষিত হইত না ; তাঁহারা নানা কারচুপির আশ্রয় নিতেন। অনেকের ধারণা, সাওয়ার পদ ও সত্যিকারের নির্দিষ্ট সংখ্যক সৈন্য পোষণের মধ্যে বিচ্যুতি জাহাঙ্গীরের শাসন আমলে সংঘটিত হয়।[১] কিন্তু উক্ত অভিযোগের সমর্থনে স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় না। তবে নিশ্চিতভাবে ইহা বলা চলে যে, শাহজাহানের রাজত্বকালে উক্ত বিচ্যুতি, ব্যতিক্রম ও কারচুপি স্পষ্টতঃ পরিলক্ষিত হয়।

মনসবদারী প্রথার পঞ্চম পর্যায়ে অর্থাৎ শেষ পর্যায়ে শাহজাহান সামরিক বাহিনীর পুনর্গঠনে আত্মনিয়োগ করেন। পূর্ববর্তী সম্রাটের আমলে মনসবদারদের মুক্তহস্তে প্রচুর পদোন্নতির ফলে, বিরাট সামরিক বাহিনীর নজির পাওয়া গেলেও, যথার্থভাবে সেনাবাহিনীর শক্তি দুর্বল ছিল, কারণ মনসবদারগণের যে নির্দিষ্ট সংখ্যক সৈন্য, অশ্ব ও হস্তী পোষণ করিবার কথা—তাহারা উহা আদৌ রাখিত না ; রাজকোষ হইতে অহেতুক সামরিক বাহিনীর বেতন ও ভাতা বাবদ প্রচুর অর্থের অপচয় ও অপব্যবহার হইত। মোরল্যাণ্ড-এর মতে, উক্ত জটিল-সমস্যার সমাধানকল্পে সেনাবাহিনীতে সৈন্যসংখ্যা কমাইয়া এবং সামরিক কর্মকর্তাদের বেতন ও সুযোগ-সুবিধা হ্রাস করিয়া শাহজাহান উক্ত সমস্যার আপোষ নিষ্পত্তিতে পৌঁছান।[২]

সামরিক বাহিনীতে পুনর্গঠন পরিকল্পনায় নিম্নলিখিত পরিবর্তন সাধিত হয় :

(ক) নির্বাচিত সৈন্যদের সংখ্যা এক তৃতীয়াংশে পরিণত করা হয় ;

(খ) সামরিক কর্মকর্তাদের বেতন গড়পড়তা এক-তৃতীয়াংশের বেশী হ্রাস করা হয় ;

১ জে. আর. এ. এস., ১৯৩৬, পৃঃ ৬৫৩।

২ পূর্বোক্ত, ৬৫৪।

(গ) সেনাবাহিনীর ভাতা অন্ততঃপক্ষে এক-ষষ্ঠাংশ কমাইয়া দেওয়া হয়।[১]

মোরল্যাণ্ডএর মতে, শাহজাহানের আমলে মনসবদারী প্রথায় ত্রিপদ ছিল মনে হয়, যেমন 'সিহ্-আস্পা দু-আস্পা' অর্থাৎ দুই কিংবা তিন অশ্বের সৈনিক এবং সামরিক কর্মকর্তাকে 'হাজার-ই-জাট হফত্ সাদ সাওয়ার সিহ্সাদ সাওয়ার সিহ্-আপসা দু-আস্পা[২] অর্থাৎ একহাজার জাট (ব্যক্তিগত) সাতশত (অশ্বারোহী সৈন্য) দুই কিংবা তিন অশ্বসহ সৈন্য বলা হইত।

আকবরের আমলে জাট ও সাওয়ার-এর বন্দোবস্ত অনুযায়ী, তিন শ্রেণীর মনসবদার ছিল, যেমন ;

(ক) যে মনসবদারের জাট ও সাওয়ার পদ সমান সমান, তিনি ছিলেন প্রথম শ্রেণীর মনসবদার অর্থাৎ জাট ছিল তাঁহার প্রকৃত পদ-মর্যাদা অনুসারে অশ্বরোহীর সংখ্যা এবং সাওয়ার ছিল অতিরিক্ত অশ্বারোহীর সংখ্যা ; সেই অশ্বারোহীর সংখ্যা যদি প্রথমোক্ত অশ্বারোহীর সংখ্যার সমান হইত, তাহা হইলে সেই মনসবদার প্রথম শ্রেণীভুক্ত হইতেন।

(খ) যে মনসবদারের সাওয়ার ছিল জাট-এর অর্ধেক, তিনি ছিলেন দ্বিতীয় শ্রেণীর মনসবদার।

(গ) যে মনসবদারের সাওয়ার ছিল জাট-এর অর্ধেকেরও কম বা আদৌ সাওয়ার ছিল না, তিনি ছিলেন তৃতীয় শ্রেণীর মনসবদার।[৩]

সুতরাং ৫,০০০ অশ্বরোহী সৈন্যসহ, ৫,০০০ এর সেনানায়ক ছিলেন প্রথম শ্রেণীর মনসবদার, ৩,০০০ অশ্বারোহী সৈন্যসহ ৫,০০০ এর সেনানায়ক ছিলেন দ্বিতীয় শ্রেণীর মনসবদার, এবং ২,০০০ অশ্বারোহী সৈন্যসহ ৫,০০০-এর সেনানায়ক ছিলেন তৃতীয় শ্রেণীর মনসবদার। সম্পূর্ণভাবে একজন বেসামরিক কর্মকর্তার কোন সাওয়ার পদ থাকিত না।[৪] পর-পৃষ্ঠায় বিষয়টি স্পষ্টভাবে দেখান হইল ঃ

---

১ জে. আর. এ. এস., ১৯৩৬, পৃঃ ৬৫৩-৬৫৪।

২ পূর্বোক্ত, পৃঃ ৬৪২।

৩ দস্তুর-উল্-ইনশাহ্, পৃঃ ২২২ ; আইরভিন্ : আর্মি, পৃঃ ৬ ; হুসাইনি : এম. অ্যাডমিনিস্ট্রেশন্, পৃঃ ১৪৫।

৪ লাহোরী : বাদশাহ-নামা, পৃঃ ৬২৬-৬২৭।

শ্রেণী	জাট	সাওয়ার
প্রথম শ্রেণীর মনসবদার	৫,০০০	৫,০০০
দ্বিতীয় শ্রেণীর মনসবদার	৫,০ ০	২,৫০০ অথবা অধিক
তৃতীয় শ্রেণীর মনসবদার	৫,০০০	২,০০০ অথবা আদৌ যদি না থাকে

মনসবদারগণ ব্যতীত 'দাখিলী' ও 'আহ্দী' নামে আরও দুই শ্রেণীর সৈন্যবাহিনী ছিল। দাখিলী রাষ্ট্রের ব্যয়ে নির্দিষ্ট সংখ্যক সৈন্যদ্বারা গঠিত হইত।[১] আহ্দী নিজেরাই একটি বিশিষ্ট শ্রেণী গঠন করিত। সম্ভ্রান্ত বংশীয় যুবক-দের দ্বারা গঠিত এই আহ্দী সেনাবাহিনী সম্রাটের দেহরক্ষী হিসাবে কাজ করিবার জন্য গঠিত হয়। সম্রাট স্বয়ং তাহাদিগকে নিযুক্ত করিতেন।[২] তাঁহারা মনসবদারের পদ লাভ করিতেন না, কিন্তু সাধারণ সৈন্য অপেক্ষা তাঁহাদের বেতন অধিক ছিল।[৩]

মোগল সেনাবাহিনীতে বিভিন্ন দেশের ও জাতির লোক গ্রহণ করা হইত বলিয়া, উহাকে সম্পূর্ণভাবে জাতীয় সেনাবাহিনী বলা চলে না।[৪] আরব পারসিক, তুর্কী, আফগান, বিভিন্ন দেশের ইউরোপীয় এবং বিভিন্ন জাতির ভারতীয়দের সমন্বয়ে মোগল সেনাবাহিনী গড়িয়া উঠে। কেন্দ্রীয় সরকারের দুর্বলতার সুযোগ পাইলে, বিভিন্ন জাতি দ্বারা সংগঠিত এই মনসবদারী প্রথায় শক্তিশালী মনসবদারগণ তাঁহাদের সৈন্যবাহিনীসহ সিংহাসনের প্রতিদ্বন্দ্বী দাবিদার গণের পক্ষ অবলম্বন করিতেন।

মোগল আমলে ৭,০০০ অশ্বারোহী সৈন্যের মনসবদারের বার্ষিক বেতন[৫] ৩৫০,০০০ টাকা হইতে, ২০ অশ্বারোহী সৈন্যের মনসবদারের বেতন ৭৫০ টাকা পর্যন্ত ছিল। তাঁহাদের ব্যক্তিগত পদের সহিত উক্ত বেতন সংযোজিত ছিল। দরবারে অথবা প্রদেশে তাঁহাদের পদ-মর্যাদা রক্ষা, তাঁহাদের ভরণ পোষণ,

---

১ আইন, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ২৫৪।

২ পূর্বোক্ত. পৃঃ ২৪৯-২৫০।

৩ সময় সময় আহ্দী সৈন্যগণ প্রতি মাসে পাঁচশত টাকা বেতন পাইত। আহ্দী শব্দের অর্থ একাকী। ইহা স্পষ্ট নহে যে, এই শব্দটি এই জাতীয় সৈন্যদের জন্য ব্যবহৃত হইত কেন?—দ্রষ্টব্য ঈশ্বরী প্রসাদ: শর্ট' হিস্টরি, পৃঃ ৩৩৪ পাদটীকা।

৪ রায় চৌধুরী, মজুমদার ও দত্ত: অ্যাডভান্সড্ হিস্টরি, পৃঃ ৫৬৪।

৫ বিভিন্ন শ্রেণীর মনসবদারগণের বেতন ও ভাতা বিস্তারিত আলোচনার জন্য বিশেষ দ্রষ্টব্য—আনন্দ রাম: মিরাট-উল্-ইস্তিলাহ; নজফ আলী খানের দ্বারা প্রস্তুত মনসবদারদের বেতনের তালিকা—নজফ আলী খান: শারাহ্-ই-মন্সিব (ব্রি. এম. পাণ্ডুলিপি, ১৯০৬)

তাঁহাদের যান-বাহন ও অশ্ব পোষণের জন্য উক্ত বেতন প্রদান করা হইত।[১] সত্যিকারে যত সৈন্য ও অশ্ব পোষণ করিত, উহার জন্য তাহাদিগকে ভিন্ন ভাতা দেওয়া হইত।

টাকার অংকে বাৎসরিক বেতনসহ মনসব-ই-জাটএর তালিকা[২] :

ক্রমিক সংখ্যা	পদ মনসব-ই-জাট	টাকার অংকে বাৎসরিক বেতন		
		প্রথম শ্রেণী	দ্বিতীয় শ্রেণী	তৃতীয় শ্রেণী
১	৭০০০	৩৫০,০০০	—	—
২	৬০০০	৩০০,০০০	—	—
৩	৫০০০	২৫০,০০০	২৪২,৫০০	২৩৫,০০০
৪	৪৫০০	২২৫,০০০	২১৭,৫০০	২১০,০০০
৫	৪০০০	২০০,০০	১৯২,৫০০	১৮৫,০০০
৬	৩৫০০	১৭৫,০০০	১৬৭,৫০০	১৬০,০০০
৭	৩০০০	১৫০,০০০	১৪২,৫০০	১৩৫,০০০
৮	২৫০০	১২৫,০০০	১১৭,৫০০	১১০,০০০
৯	২০০০	১০০,০০০	৯২,৫০০	৮৫,০০০
১০	১৫০০	৭৫,০০০	৬৭,৫০০	৬০,০০০
১১	১০০০	৫০,০০০	৪৭,৫০০	৪৫,০০০
১২	৯০০	৩৭,৫০০	৩৬,২৫০	৩৫, ০০
১৩	৮০০	৩১,২৫০	৩০,০০০	২৮,৭৫০
১৪	৭০০	২৭,৫০০	২৬,২৫০	২৫,০০০
১৫	৬০০	২৩,৭৫০	২২,৫০০	২১,২৫০
১৬	৫০০	২০,০০০	১৮,৭৫০	১৭,৫০০
১৭	৪০০	১২,৫০০	১২,০০০	১১,৫০০
১৮	৩০০	১০,০০০	৯,৫০০	৯,০০০
১৯	২০০	৭'৫০০	৭'০০০	৬'৫০০
২০	১৫০	৬,২৫০	৫,৭৫০	৫,২৫০
২১	১০০	৫,০০০	৪,৫০০	৪,০০০
২২	৮০	৩,৫০০	৩,২৫০	৩,০০০
২৩	৬০	২,৫০০	২,৩৭৫	২,১৫০

১ এন্‌সাইক্লোপীডিয়া অফ ইসলাম, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ৬২৭।

২ আইরভিন : আর্মি, পৃঃ ৮ ; দস্‌তুর-উল্‌-আমল (ব্রি. মি. পাণ্ডুলিপি নং ১৬৪১) ; দস্‌তুর-উল্‌-ইন্‌শা, পৃঃ ২৩৪।

২৪	৫০	২,১২৫	২,০০০	১,৮৭৫
২৫	৪০	১,৭৫০	১,৬২৫	১,৫০০
২৬	৩০	১,৩৭৫	১,২৫০	১,১২৫
২৭	২০	১,০০০	৮৭৫	৭৫০

আবুল ফজলের আইন-ই-আকবরীতে বর্ণিত তালিকাতে[১] আকবরের রাজত্ব-কালে মনসবদারদের বেতনের হারের যে উল্লেখ আছে, উহা আলমগীরের সময়ের তালিকাতে প্রদত্ত বেতনের হারের অপেক্ষা অনেক বেশী বলিয়া মনে হয়। প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর মধ্যে বেতনের পার্থক্য নিম্নে দেখান হইল[২]ঃ

২০ হইতে ৬০	৫,০০০ 'দাম' অথবা	১২৫ টাকা	বাৎসরিক
৮০ জন্য	১০,০০০ " ,,	২৫০ ,,	,,
১০০ হইতে ৪০০	২০,০০০ ,, ,,	৫০০ ,,	,,
১০০০ জন্য	১০০,০০০ ,, ,,	২৫০০ ,,	,,
১৫০০ হইতে ৫০০০	৩০০,০০০ ,, ,,	৭৫০০ ,,	,,

মোগল অশ্বারোহী সৈন্যকে 'তাবিনান্' বলা হইত এবং তাহাদের মধ্যে বেশীর ভাগই তাহাদের নিজেদের অশ্ব ও অস্ত্র রাখিত। তিন-অশ্বারোহী ও দুই-অশ্বারোহী সৈন্যদের প্রত্যেকে মাসে ১৬½ টাকার সামান্য বেশী পাইত।[৩] বার্নিয়ারএর মতে, এক-অশ্বারোহী সৈন্য মাসে পঁচিশ টাকার কম পাইত না।[৪] বেতন 'দাম'এ হিসাব করা হইত। সকল কর্মকর্তা পুরা বার মাসের বেতন পাইতেন না; বৎসরে অনুমোদিত বেতনের মাসের সংখ্যা চারি হইতে বার-এর মধ্যে ছিল।[৫] বেতন (তন্‌খা) নগদ কিংবা জায়গীর প্রদানের মাধ্যমে দেওয়া হইত। প্রধানতঃ পদাতিক ও গোলন্দাজ বাহিনীর কিছু সংখ্যক কর্মকর্তা ও সৈনিক, যাহারা নিয়মানুযায়ী স্বয়ং সম্রাটের বেতন তালিকার অন্তরভূর্ক্ত ছিল, তাহাদিগকে নগদে বেতন প্রদান করা হইত। কিন্তু জায়গীর প্রদানের মাধ্যমে বেতন প্রদানের পদ্ধতি ছিল বহুল প্রচলিত। এই ব্যবস্থা সংশ্লিষ্ট

১ আইন, প্রথম, পৃঃ ২৪৮।
২ আইরভিন : আর্মি, পৃঃ ৮।
৩ এন্‌সাইক্লোপীডিয়া অফ ইসলাম, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ৬২৭।
৪ এফ. বার্নিয়ার : ট্রাভেল্‌স্ ইন দি মোগল এম্‌পায়ার (১৬৫৬—৬৮), পৃঃ ২১০।
৫ আইরভিন্ : আর্মি, পৃঃ ৭।

উভয় পক্ষেরই উপযোগী ছিল।[১] গোলন্দাজ সৈনিক বিশেষ করিয়া খৃষ্টান, পর্তুগীজ, ইংরেজ, ওলন্দাজ, জার্মান, ফরাসী বেশী বেতন পাইত। বার্নিয়ার বলেন যে, পদাতিক সৈন্য সর্বানিম্ন বেতন পাইত। কেহ কেহ মাসে বিশ, কেহ বা পনর, কেহ বা দশ টাকা বেতন পাইত।[২]

মোগল সম্রাটদের শাসন আমলে বেতন, ভাতা ব্যতীত অতিরিক্ত প্রলোভন প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে সেনাবাহিনীর উপযুক্ত ব্যক্তিদিগকে নানা ধরনের পুরস্কার, উপাধি ও সম্মান-চিহ্ন প্রদান করা ইহত।

(ক) উপাধিঃ উপাধি প্রদানের প্রথা অত্যন্ত বিস্তারিত ছিল, যেমন 'ইখলাস্‌খান', 'রাজ-আন্দাজখান', 'ইয়াকাহ্ তাজখান'[৩] ইত্যাদি।

(খ) সম্মান-সূচক লম্বা ঢিলা বহির্বাস—'খিলাত'ঃ সামরিক দপ্তরের জন্যই শুধু 'খিলাত' দেওয়া সীমাবদ্ধ ছিল না; রাজদরবারে উপস্থিত বিশিষ্ট ব্যক্তিদিগের প্রত্যেককে সম্মান-সূচক লম্বা ঢিলা বহির্বাস দেওয়ার রীতি প্রচলিত ছিল। তবে সম্মান-চিহ্ন প্রদান সম্মান-প্রাপকের ব্যক্তিগত গুরুত্বের উপর নির্ভরশীল ছিল।

(গ) দান, উপহারঃ স্বাভাবিকভাবেই দান, উপহার বিভিন্ন ধরনের ছিল, যেমন মণি-মুক্তা খচিত অলঙ্কার, তরবারি, ছোরা, পাল্কী, হস্তী, অশ্ব[৪] ইত্যাদি।

(ঘ) দামামা, ভেরীঃ অনুগ্রহ প্রদর্শনের নিদর্শনস্বরূপ, ২০০০ সাওয়ার কিংবা তদূর্ধ্বের সম্মানীয় ব্যক্তিদিগকে 'নক্কারাহ্' অর্থাৎ দামামা, ভেরী এবং উহা ব্যবহারের অধিকার ('নওবত') প্রদানের রীতি প্রচলিত ছিল।[৫]

(ঙ) পতাকা ও নিদর্শন-চিহ্নঃ মিরাট-উল্-ইস্‌তিলায়ে ভারতে মোগল সম্রাটদের দ্বারা প্রদর্শিত বিভিন্ন নিদর্শন-চিহ্নের উৎপত্তি ও অর্থ বর্ণিত আছে। আইন-ই-আকবরীতে আট ধরনের রাজকীয় নিদর্শন-চিহ্নের পরিচয় পাওয়া

---

১ আইরভিন: আর্মি', পৃ: ১৪।

২ বার্নিয়ার ট্রাভেল্‌স্, পৃ: ২১৭ বেতনের হার আপাতত: দৃষ্টিতে খুব অল্প মনে হইছে, ইহা ঠিক। কিন্তু ষষ্ঠাদশ শতাব্দীর শেষ দিকে বাজারের দর অনুযায়ী ৩'৫০ টাকায় ৯ মণ গম ক্রয় করা যাইত।—আইন, প্রথম পৃ: ৬৩; যদুনাথ সরকারের হিসাব অনুযায়ী ৩'৫০ টাকায় আওরঙ্গজেবের আমলে এক বৎসরের রেশীকাল এক ব্যক্তির খাওয়া দাওয়া চলিত।—সরকার: আওরঙ্গজেব, তৃতীয় খণ্ড, পৃ: ৩০৭।

৩ আইরভিন্: আর্মি, পৃ: ২৮।

৪ দানিশমন্দ খানের রচিত বাহাদুর শাহের রাজত্বের ইতিহাসে দান, উপহারের বিস্তারিত তালিকা পাওয়া যায়।— আইরভিন: দি আর্মি, পৃ: ২৯।

৫ আইরভিন: দি আর্মি, পৃ: ৩০।

যায়, তন্মধ্যে চারিটি সম্রাটের জন্য বিশেষভাবে সুরক্ষিত ছিল।[১] আটটি নিদর্শন-চিহ্ন ছিল, যেমন (ক) 'আওরঙ্গ'—সিংহাসন, (খ) 'ছতর'—রাষ্ট্রছত্র, (গ) 'ছায়াবান' বা 'আফতাবগির'—সূর্যছায়া, (ঘ) 'আলম'—পতাকা, (ঙ) 'ছতর-তোক্'—চমরী গাইয়ের লেজ, (চ) 'তুমান-তোক্'—চমরী গাইয়ের লেজের অন্য আকৃতি, (ছ) 'ঝাণ্ডা'—ভারতীয় পতাকা, (জ) 'মাহি-ও-মরাতিব'—মৎস্য ও চিহ্ন।[২]

উপাধি বা অর্থ পুরস্কার বা সাধারণ দান, উপহার ব্যতীত একজন সম্মানীয় ব্যক্তিকে নিম্নলিখিত সম্মান-চিহ্ন প্রদান করিবার রীতি ছিল।

(ক) পতাকা বা সাধারণ ধ্বজা বহনের অধিকার ;

(খ) চমুরী গাইয়ের লেজের পতাকা প্রদর্শনের অধিকার ('তুমান-তোক');

(গ) দামামা, ভেরী ব্যবহার ও নওবতের অধিকার ;

(ঘ) মৎস্য ও সংশ্লিষ্ট প্রতীক প্রদর্শনের অধিকার ;

(ঙ) স্বর্ণ ও মুক্তা খচিত পাল্কী ব্যবহারের অধিকার।[৩]

একই অশ্বকে যাহাতে দুইবার উপস্থিত না করিতে পারে কিংবা ভাল অশ্বের পরিবর্তে কৃশ অশ্ব[৪] উপস্থিত না করিতে পারে—উক্ত ধরনের প্রতারণা[৫] বন্ধ করিবার উদ্দেশ্যে পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, ভারতে আলাউদ্দীন খল্জী সর্বপ্রথম ১৩১২-১৩১৩ খ্রীস্টাব্দে অশ্বকে জ্বলন্ত-লৌহ দ্বারা চিহ্নিতকরণ প্রথা প্রবর্তন করেন। তিনি-ই এই কৃতিত্বের দাবিদার। কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর পর উক্ত প্রথার প্রচলন বিলুপ্ত হয়।[৬] ফিরোজশাহ্ তুঘলক সম্ভবতঃ অশ্বকে জ্বলন্ত-লৌহ দ্বারা চিহ্নিতকরণ পদ্ধতি বিলোপ সাধন করেন। শেরশাহ্ উক্ত প্রথা ১৫৪০-৪১ খ্রীস্টাব্দে পুনঃপ্রবর্তন করেন,[৭] কারণ মোগল ক্ষমতা পুনরুদ্ধারের ভয়ে তাঁহাকে সামরিক বাহিনীকে সর্বদা সতর্ক রাখিতে হইত। কেহ কেহ বলেন যে, অবশেষে উক্ত প্রথা অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝিকালে চূড়ান্তভাবে বিলুপ্ত

১ যদুনাথ সরকার: দি প্রিয়গ্যাটিভ্স্ অফ দি মোগল এম্পারারস্—দি মর্ডান রিভিউ, আগষ্ট, ১৯২২, পৃঃ ১৭৬—১৮২।

২ আইন, প্রথম, পৃঃ ৫০।

৩ আইরভিন: আর্মি, পৃ: ৩৫ ; হুসাইনি: এম. অ্যাড্মিনিস্ট্রেশন্., পৃঃ ১৫৩।

৪ বারনী: তারিখ-ই-ফিরোজশাহী, পৃঃ ৩৬০।

৫ গোলাম হুসেন সলিম: সিয়ার-উল্-মুতাখ্খিরিন (হাজী মুস্তফা কর্তৃক অনূদিত), প্রথম, পৃঃ ৬০৯ পাদটীকা।

৬ দস্তুর-উল্-ইনশা, পৃ; ২৩৩-২৩৪।

৭ আইন, প্রথম, পৃঃ ২৩৩।

হয়। মোগল শাসন আমলে আকবর 'দাগ'[১] প্রথা চালু রাখিতে চেষ্টা করেন কিন্তু অসমর্থ হন।[২] পরবর্তী মোগল সম্রাটদের আমলে উক্ত প্রথার সম্পূর্ণরূপে বিলোপ ঘটে।[৩]

পূর্বে বলা হইয়াছে যে দিল্লী সুলতানী শাসন আমলে, দিওয়ান-ই-আরজ সামরিক বাহিনীতে যোগদানকারী প্রত্যেক সৈনিকের 'হুলিয়াহ্,' অর্থাৎ বর্ণনামূলক ফর্দ রাখিবার নিয়ম ছিল। সিকান্দর লোদীর সময় আরবী 'হুলিয়াহ্'র পরিবর্তে ফার্সী শব্দ চেহ্‌রাহ্'[৪] ব্যবহৃত হয়।

মোগল আমলে সামরিক বাহিনীতে যোগদানকারী নূতন মনসবদারের নিজের নাম, পিতার নাম, গোত্র-বংশ, আদি জন্মস্থান ও 'চেহ্‌রাহ্,' অর্থাৎ তাহার ব্যক্তিগত চেহারার বর্ণনামূলক তালিকা[৫] প্রণয়ন করা হইত। বর্ণনামূলক তালিকা দুই প্রকারের ছিল, যথা 'চেহ্‌রাহ্-ই-তাবিনান' অর্থাৎ সৈন্যদের বর্ণনামূলক তালিকা এবং চেহ্‌রাহ্-ই-আস্‌পান্' অর্থাৎ অশ্বের চেহরার বর্ণনামূলক তালিকা। প্রত্যেক অশ্বের চেহরার বর্ণনা তালিকাভুক্ত করা হইত।

আইন-ই-আকবরীতে আকবরের সময় সাত শ্রেণীর অশ্ব ছিল—আরবীয়, ইরানী, 'মুজান্নাস' ইরানী অশ্বের অনুরূপ, তুর্কী, ইয়াবু (কাবুলী), তাজী (ভারতীয়), জংলাহ্। আলমগীরের রাজত্বকালে আরব অশ্ব আমদানি সম্ভবতঃ খুব দুর্লভ ছিল।[৬] উক্ত শাসন আমলে অশ্বের শ্রেণীবিভাগে পার্থক্য ছিল, যেমন ইরাকী, 'মুজান্‌নাস্', তুর্কী, ইয়াবু, তাজী ও জংলী। আলমগীরের শাসন-ব্যবস্থায় জ্বলন্ত-লৌহ দ্বারা চিহ্নিতকরণের জন্য, সামরিক বাহিনীর বিভিন্ন

---

১ ট্রানসোক্সিয়ানাতে সম্ভবতঃ দ্বাদশ শতাব্দীতে 'দাগ' প্রথার উৎপত্তি লক্ষ্য করা যায়।—আইরভিন: আর্মি, পৃঃ ৪৬-৪৭।

২ বদায়ূনী: মুন্তাখাব-উত্-তাওয়ারিখ, দ্বিতীয়, পৃঃ ১৭৩, ৩১৫; আকবর-নামা, তৃতীয়, পৃঃ ৬৮-৬৯,১৪৭-১৪৮; অশ্বের উরুদেশে জ্বলন্ত-লৌহ দ্বারা চিহ্নিত করা হইত।—সিয়ার-উল্-মুতাখ্খিরিন, প্রথম, পৃঃ ৪৮১, পাদটীকা ২৭; আকবরের আমলে ব্যবহৃত চিহ্ন আইন-ই-আকবরীতে বর্ণিত আছে।—আইন, প্রথম, পৃঃ ১৩৯; ২৫৫—২১৬।

৩ হুসাইনি: এম. অ্যাড্‌মিনিস্ট্রেশন, পৃঃ ১৫৪।

৪ কোরায়েশী: এস. অ্যাড্‌মিনিস্ট্রেশন, পৃঃ ১৩২।

৫ 'চেহরাহ' আক্ষরিকভাবে 'মুখমণ্ডল', 'আকৃতি' বুঝায়। ইহা অবশ্যই 'চিরাহ' নহে, কারণ 'চিরাহ' বুঝায় এক ধরনের পাগড়ি।—আইরভিন: আর্মি, পৃঃ ৪৭ পাদটীকা।

৬ আইরভিন: আর্মি, পৃঃ ৫১।

পদ-মর্যাদার কর্মকর্তাদিগকে বিভিন্ন জাতির কত সংখ্যক অশ্ব উপস্থিত করিতে হইত, উহা নিম্ন সারণীতে[১] স্পষ্ট বুঝা যাইবে ঃ

সামরিক কর্মকর্তাদের পদ-মর্যাদা	অশ্বের শ্রেণী বিভাগ				মোট
	ইরাকী	মুজান্নাস	তুর্কী	ইয়াব	
৪০০	৩	১	১	০	৫
৩০০ — ৫০০	২	১	১	০	৪
১০০ — ১৫০	০	০	৩	০	৩
৮০ — ৯০	০	০	২	০	২
৫০ — ৭০	০	০	১	১	২
৪০	০	০	১	০	১

জ্বলন্ত-লৌহ দ্বারা চিহ্নিত অশ্বের সনাক্তকরণ পদ্ধতিকে 'তশিহাহ্' বলা হয়। জ্বলন্ত-লৌহ দ্বারা চিহ্নিত অশ্বের সত্য-প্রতিপাদন কখন কখন করিতে হইবে, উহা নির্ভর করিত সামরিক কর্মকর্তার বেতনের প্রকৃতির উপর। যদি তিনি জায়গীরের মাধ্যমে বেতন পাইতেন, তবে তাঁহাকে বৎসরে একবার তাঁহার সৈন্য ও অশ্ব সমাবেশ করিতে হইত, তবে তাঁহাকে ছয় মাসের অনুগ্রহ সময় দেওয়া হইত। যদি তিনি নগদ অর্থের মাধ্যমে বেতন পাইতেন, ও দরবারে উপস্থিত থাকিতেন,'হাজিব-ই-রিকাব', তবে তাঁহাকে সনাক্তকরণের প্রমাণ-পত্র ছয়মাস অন্তর সংগ্রহ করিতে হইত; আর যদি তিনি অন্যত্র থাকিতেন ('ত'ইনাত্') তবে তাঁহাকে দরবারে হাজির হইবার পনর দিনের মধ্যে সনাক্তকরণের প্রমাণ-পত্র সংগ্রহ করিবার অনুমতি দেওয়া হইত। একজন আহাদীকে উক্ত অবস্থায় সাত দিনের বেশী সময় দেওয়া হইত না।[২]

সনাক্তকরণের প্রমাণ-পত্র সংগ্রহের নির্দিষ্ট সময় ও অনুগ্রহ সময় অতিবাহিত হইয়া গেলে, কর্মকর্তাকে 'তাওয়াক্কুফ্-ই-তশিহাহ্' অর্থাৎ সত্য প্রতিপাদনের কাগজ-পত্র, সনাক্তকরণের প্রমাণ-পত্র সংগ্রহের বিলম্ব ঘটিবার কারণ দর্শাইতে হইত। সন্তোষজনক কারণ দর্শাইতে না পারিলে উক্ত মনসবদার উক্ত বিলম্বিত সময়ের জন্য তাঁহার পুরা বেতন পাইতেন না। তবে বিশেষ বিবরণীর ভিত্তিতে শুধু সরকারী হুকুমের দ্বারা, তাঁহাকে অর্থদণ্ড হইতে নিষ্কৃতি দেওয়া হইত।[৩]

১ উক্ত তালিকায় প্রদত্ত হিসাব আবুল ফজলের আইন-ই-আকবরীতে বর্ণিত হিসাবের সঙ্গে সামান্য পার্থক্য আছে।—আইন, প্রথম, পৃঃ ২৪৮-২৪৯ ; তবে অবশ্য আলী মুহম্মদ খানের মিরাট-ই-আহমদীতে বর্ণিত তালিকার সহিত উক্ত তালিকার সাদৃশ্য আছে।—মিরাট-ই-আহমদী, দ্বিতীয় পৃঃ। ১১৮

২ আইরভিন : আর্মি, পৃঃ ৫৪।

৩ পূর্বোক্ত, পৃঃ ৫৪।

ঐতিহাসিক হর্ন বলেন যে, মোগল সেনাবাহিনী অশ্বারোহী, পদাতিক, হস্তিবাহিনী ও গোলন্দাজ দ্বারা সংগঠিত ছিল।

অশ্বারোহী : অশ্বারোহী বাহিনী পল্টনে বিভক্ত ছিল না। কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে, সর্বোচ্চ হইতে নিম্নতম পদ পর্যন্ত সামরিক কর্মকর্তা বা সৈনিক তাহার ঠিক উপরস্থ নেতাকে অনুসরণ করিত এবং সেনাবাহিনীর সার্বিক স্বার্থ রক্ষার অপেক্ষা নিজেদের ব্যক্তিগত স্বার্থ রক্ষা ও ভাগ্যের উন্নতির দিকে, তাহারা অধিক মনোযোগী ছিল।[১]

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, প্রত্যেক অশ্বারোহী সৈন্যকে নিজের অশ্ব সংগ্রহ করিতে হইত। যাহারা নিজেদের অশ্ব সংগ্রহ করিতে পারিত না, তাহাদিগকে 'বর্গীর' বলা হইত এবং যাহারা তাহাদিগকে অশ্ব সরবরাহ করিত, বর্গীরগণ তাহাদের ভৃত্যসম বা অনুগামী ছিল।[২]

রাজকুমারদিগের ও মনসবদারদের সৈন্যদল ছাড়াও, সম্রাটের ব্যক্তিগত সৈন্যদল ছিল। তাঁহার দেহরক্ষী দলকে 'ওয়ালাশাহী' বলা হইত। মানুচী তাঁহাদিগকে সম্রাটের ক্রীতদাস মনে করিতেন এবং তিনি আরও বলেন যে, আওরঙ্গজেবের আমলে তাহারা সংখ্যায় ৪,০০০ ছিল।[৩] আকবর আহদীদল সংগঠন করেন। তাহারা সম্রাটের ব্যক্তিগত চাকুরীতে নিয়োজিত ছিল এবং কোন মনসবদার তাহাদিগকে দলভুক্ত করিয়া চাকুরীতে নিযুক্ত করিতে পারিত না। তাহারা পদমর্যাদায় নিম্ন মনসবদার ও 'তাবিনান' এর মধ্যস্থলে ছিল এবং তাহারা সাধারণ অশ্বারোহী সৈনিকের বেতনের দ্বিগুণ বেতন পাইত। তাহাদিগকে 'ভদ্র-দেহরক্ষীর' সহিত তুলনা করা চলে।

পদাতিক : 'আহ্শাম' মনসবদার 'তাবিনান' কিংবা আহ্দী কোনটাই ছিল না। অস্পষ্ট শব্দ আহ্শাম অভিধানে ভৃত্য, অনুসরণকারী, অনুগামী, পরিচর্যায় নিযুক্ত ব্যক্তি, সশস্ত্র পুলিশ ইত্যাদি বুঝায়। কিন্তু সরকারী সংক্ষিপ্ত সারগ্রন্থে (অফিশিয়েল্ ম্যানিউয়্যাল্স্) দস্তুর-উল-আমলে, আহ্শামকে পদাতিক বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে।[৪] সেনাবাহিনীতে পদাতিক ছিল খুব নিম্ন-

১ উক্ত মন্তব্যের জন্য দ্রষ্টব্য—ডাবলুইউ, আইরস্কিন্ : হিস্টরী অফ ইণ্ডিয়া আণ্ডার বাবর অ্যাণ্ড্ হুমায়ুন।

২ হুসাইনি : এম. অ্যাড্মিনিস্ট্রেশন্, পৃঃ ১৫৭।

৩ ওরমি : হিস্টরিক্যাল ফ্র্যাগমেণ্ট্স্, পৃঃ ৪১৭।

৪ আইরভিন : আর্মি, পৃঃ ১৬১-১৬২।

স্তরের ও নগণ্য।[১] সাধারণতঃ ইহারা ছিল দ্বার-রক্ষক, প্রহরী, গুপ্তচর, মল্লযোদ্ধা, কুস্তিগীর, পাল্কীবাহক ইত্যাদি। যুদ্ধরত পদাতিক বাহিনী হাত-বন্দুকধারী সৈনিক, পলিতা দিয়া বারুদে আগুন লাগান অপ্রচলিত বন্দুকধারী,[২] ধনুকধারী, বর্শাধারী, বল্লমধারী দ্বারা গঠিত ছিল। পদাতিক বাহিনীর নেতৃত্বে ছিলেন যে সামরিক কর্মকর্তা তাহাকে দারোগা বলা হইত। এই পদাতিক বাহিনীর উপর খুব কম বিশ্বাস ও প্রত্যয় ছিল। সংক্ষেপে বলা যায় যে, পদাতিক বাহিনী ছিল বলিতে গেলে 'অর্ধ সশস্ত্র নিম্ন শ্রেণীর লোকের ভিড়'।[৩] আইন-ই-আকবরীর দ্বিতীয় খণ্ডে প্রত্যেক জিলা ও প্রদেশে নিয়োজিত পদাতিক বাহিনীর যে উচ্চ সংখ্যা দেখান হইয়াছে, উহা খুবই সতর্কতার সহিত গ্রহণযোগ্য। দীর্ঘ বল্লম, তরবারি, ঢাল, বর্ম, এমনকি বাঁশের লাঠিধারী গ্রামবাসী দ্বারা গঠিত ছিল ঐ পদাতিক দল। বার্নিয়ার বলেন যে, পদাতিক সৈন্য সর্বাপেক্ষা কম বেতন পাইত।[৪] তথাকথিত হিন্দু ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি 'নাগাস', 'আলিগোহল্',[৫] 'সিলাহ্-পোশ',[৬] 'নাজিব',[৭] 'পাথাবাজ',[৮] 'ধলায়িত',[৯]

---

১ বার্নিয়ার : ট্রাভেল্স্, পৃঃ ২১৯।

২ ওরমি : হিস্টরিক্যাল ফ্র্যাগ্মেন্ট্স্, পৃঃ ৪১৭।

৩ আইরভিন, আর্মি, পৃঃ ১৬১-১৬২।

৪ পদাতিক সৈন্যের বেতন ছিল মাসিক ২০, ১৫ ও ১০ টাকা।—বার্নিয়ার : ট্রাভেল্স্, পৃঃ ২১ ; বেতন ব্যতীত নির্দিষ্ট পরিমাণ বরাদ্দ রসদও তাহারা পাইত।—আইরভিন : আর্মি, পৃঃ ১৭৩।

৫ রোহিলা পাতানদের বাছাইকৃত পদাতিক বাহিনীর সহিত জেমস্ফ্রেজার 'আলিগোহল' কে তুলনা করিয়াছেন।—জেমস্. ফ্রেজার : হিস্টরি অফ নাদির শাহ ; আইরভিন : আর্মি, পৃঃ ১৬৪।

৬ ষোলশত লোকদ্বারা গঠিত সশস্ত্র এক দেহ-রক্ষী বাহিনীকে ফ্র্যাংলিন 'সিলাহ্-পোশ' নামে আখ্যায়িত করিয়াছেন।—ডাবলইউ. ফ্রাংলিন : মিলিটারি মেমোয়ার অফ মিস্টার জর্জ টমাস্, পৃঃ ১৬৫।

৭ 'নাজিব' ছিল চমৎকার অসি পরিচালক।—ডাবেলইউ. এইচ. টন্, এ লেটার অন দি মারাঠা পীপ্ল, পৃঃ ৫০ ; 'নাজিব'এর আক্ষরিক অর্থ 'সম্ভ্রান্ত'—আইরভিন : আর্মি, পৃঃ ১৬৪।

৮ 'পাথাবাজ' দ্বারা সাহসী ও পটু তরবারিধারী ব্যক্তিদিগকে বুঝায়।--ইমাম উদ্দীন চিশ্তি : হুসেনশাহী (ব্রি. মি. পাণ্ডুলিপি, ১৬৬২)।

৯ 'ধলায়িত' একটি হিন্দী শব্দ। আক্ষরিক অর্থ ঢাল, বর্মবাহক।--জন টি. প্লাট্স্ : এ ডিক্শন্যারি অফ উর্দু' ; তারিখ-ই-আলমগীর সানি (ব্রি. মি. পাণ্ডুলিপি) ও মিস্কিনের 'তাহমাস্-নামা'তে 'ধলায়িত' শব্দটির উল্লেখ আছে।

'আমাজান্',[১] 'সিহ্‌বন্‌দি',[২] 'বরকন্দাজ',[৩] ইত্যাদি পদাতিক সৈন্যদলের অংশবিশেষ ছিল।

ঐতিহাসিক হর্ন তাঁহার সামরিক বাহিনীর বিবরণীতে হস্তীকে অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন।[৪] কিন্তু মোগল সাম্রাজ্য পতনের অনেক পূর্ব হইতে, হস্তী প্রধানতঃ ভার বহনের পশু রূপে কিংবা প্রদর্শনের মাধ্যম হিসাবে ব্যবহৃত হইত এবং যুদ্ধে হস্তীর ভূমিকা তুলনামূলকভাবে নগণ্য ছিল।

আকবর যুদ্ধক্ষেত্রে অসংখ্য হস্তী ব্যবহার করিতেন।[৫] তাঁহার সময় হস্তী উহার পৃষ্ঠে হাতবন্দুকধারী সৈনিক ও তীরন্দাজদিগকে বহন করিত। কিন্তু সামরিক শক্তি হিসাবে হস্তীর ব্যবহার শীঘ্র পরিত্যাগ করা হয়, কারণ ইহারা শত্রুর অপেক্ষা মালিক পক্ষের জন্য অধিক বিপজ্জনক হইয়া পড়ে। তবে অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমদিক পর্যন্ত ছোট ছোট কামান বহন করিবার জন্য হস্তীর ব্যবহারের প্রচলন ছিল বলিয়া শোনা যায়।

অবশেষে 'পখার'[৬] অর্থাৎ আত্মরক্ষার্থ বর্মদ্বারা সজ্জিত কতক হস্তী যুদ্ধক্ষেত্রে আনা হইত। সেনাপতি অথবা সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদিগকে 'হাওদাহ'তে[৭] বহন করিয়া আনা এবং তাহাদের পতাকা প্রদর্শনের জন্যই শুধু হস্তীর ব্যবহার তখন প্রায় সীমাবদ্ধ রাখা হইয়াছিল।[৮]

আকবরের আমলে সম্রাটের ব্যবহৃত হস্তীকে 'খসাহ্' অর্থাৎ 'বিশেষ জাতীয়

---

১ অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষদিকে হায়দরাবাদের নিজামের অধীনে স্ত্রী সিপাইয়ের দুইটি বাহিনী ছিল।--আইরভিন: আর্মি, পৃ: ১৬৫।

২ ভূমি-রাজস্ব আদায় করিবার সময় স্থানীয় সামরিক কর্মকর্তাদের দ্বারা নিযুক্ত সশস্ত্র লোক-দিগকে 'সিহ্‌বন্‌দি' বলা হইত।- দস্তুর উল্ আমল (ব্রি. মি. পাণ্ডুলিপি); দানিশমন্দ খানের বাহাদুর শাহ নামাতেও সিহ্‌বন্‌দির উল্লেখ আছে।

৩ পদাতিক সৈন্যের জন্য 'বরকন্দাজ' একটি সাধারণ নাম। পলিতা দিয়া বারুদে আগুন লাগান অপ্রচলিত বন্দুকধারীদের জন্য প্রথম 'বরকন্দাজ' শব্দটি ব্যবহৃত হইত।--মুহম্মদ কাসিম আওরঙ্গাবাদী: আহ্‌ওয়াল-ই-খাওয়াকিন (ব্রি. মি. পাণ্ডুলিপি); আইরভিন: আর্মি, পৃ: ১৬৬।

৪ হর্ন: আর্মি, পৃ: ৫১-৫৬।

৫ পূর্বোক্ত, পৃ: ৫১--৫৩।

৬ আইন, প্রথম, পৃ: ১২৯।

৭ 'হাওদাহ্' অথবা 'হাওদাজ' আর 'ইমারি'তে পার্থক্য আছে। 'হাওদাহ' হইতেছে হস্তি-পৃষ্ঠে আচ্ছাদন ছাড়া চন্দ্রাতপ যুদ্ধে ব্যবহৃত হইত কিন্তু 'ইমারি' হইতেছে চাঁদোয়া ভ্রমণের জন্য ব্যবহৃত হইত।--সিয়ার-ই-মুতাখ্‌খিরিন, দ্বিতীয়, পৃ: ৩০১; আইরভিন: আর্মি পৃ: ১৭৬।

৮ আইরভিন: আর্মি পৃ: ১৭৫।

হস্তী' বলা হইত এবং অন্যান্য হস্তীকে দশ, বিশ অথবা তিরিশ দলে সন্নিবেশ করা হইত ; ইহাকে 'হাল্‌কাহ্‌' অর্থাৎ চক্র বলা হইত।[১]

মোগল আমলে সকল হস্তীরই বিভিন্ন নাম দেওয়া হইয়াছিল, যেমন আকবরের নিজস্ব হস্তী 'আসমন্‌শুকোহ্‌'[২] অর্থাৎ 'স্বর্গীয় মর্যাদা', 'দলসিন্‌গার' অর্থাৎ 'সামরিকবাহিনীর অলংকার', 'আওরঙ্গগজ' অর্থাৎ 'সিংহাসন-হস্তী', 'ফাতেগজ', অর্থাৎ 'বিজয়-হস্তী' ও 'মহাসুন্দর'[৩] অর্থাৎ 'সৌন্দর্যের রাণী'।

মোগল শাসনকালের শেষদিকে, হস্তী প্রধানতঃ ভার বহন করিবার জন্য কিংবা ভারী বন্দুক ও কামান বহন করিবার জন্য ব্যবহৃত হইত।

গোলন্দাজ বাহিনীর সাধারণ নাম হইতেছে 'তোপখানাহ্‌'।[৪] গোলন্দাজের সহিত সংশ্লিষ্ট প্রত্যেক শাখা উক্ত একনামে পরিচিত ছিল। কামান-বন্দুক দুই শ্রেণীর ছিল, যেমন, ভারী ও হাল্কা, বড় ও ছোট—'তোপ-ই-কালান' ও 'তোপ-ই খুর্দ্‌'।[৫]

বাবরের অধীনে একটি পটু ও দক্ষ গোলন্দাজ বাহিনী ছিল এবং ইহা তাঁহার সামরিক বাহিনীর একটি বিশেষ সক্রিয় অংশ ছিল। কিন্তু মোগলরা খুব নিপুণ গোলন্দাজ সৈনিক ছিল না। তবে হর্ন বলেন যে, আকবরের আমলে গোলন্দাজ বাহিনী দক্ষতার শীর্ষ বিন্দুতে পেঁছাইয়াছিল এবং মোগল সাম্রাজ্যের অস্তিত্বের আর কোন সময়ে গোলন্দাজ বাহিনীর ঐরূপ দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায় না।[৬] কিন্তু আইন-ই-আকবরীতে আকবরের সময়ে গোলন্দাজ বাহিনীর চরম দক্ষতার উল্লেখ নাই। আইরভিন-এর মতে, আকবরের আমল অপেক্ষা আওরঙ্গজেব আলমগীরের রাজত্বকালে, গোলন্দাজ বাহিনী সংখ্যায় অধিক, দক্ষতায় সম্পূর্ণরূপে নিপুণ ও পূর্ণাঙ্গ ছিল।[৭] অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইউরোপীয় পর্যবেক্ষকগণ মোগলদের গোলন্দাজের বিশেষ প্রশংসা করেন নাই। মোগলদের ভারী কামান-গোলা বাহিনী ওসমানী তুর্কী এবং কখনও কখনও ইউরোপীয় সামরিক কর্মকর্তা দ্বারা পরিচালিত হইত।

---

১ আইরভিন : আর্মি, পৃঃ ১৭৮।

২ আকবর নামা, প্রথম, পৃঃ ১৭১।

৩ 'মহাসুন্দর' অর্থাৎ 'সৌন্দর্যের রানী' হস্তী নাদিরশাহ ব্যবহার করিতেন --ইলিয়ট ও ডাওসন : হিস্টরি অফ ইণ্ডিয়া, অষ্টম খণ্ড পৃঃ ৯১।

৪ 'তোপ' অর্থ কামান ; 'খানাহ্‌' অর্থ ঘর।--আইরভিন : আর্মি, পৃঃ ১১৩।

৫ পূর্বোক্ত, পৃঃ ১১৪।

৬ হর্ন : আর্মি, পৃঃ ২৯।

৭ আইরভিন : আর্মি, পৃঃ ১১৬।

ভারী ভারী বৃহৎ আকারের সকল রকম যুদ্ধের অস্ত্রশস্ত্র, কামান-বন্দুক মোগলদের প্রিয় ছিল। ভারী কামান-বন্দুক যুদ্ধে ব্যবহারের অপেক্ষা প্রদর্শনের জন্য রক্ষিত ছিল বেশী। মোগল আমলে বড় বড় কামান-বন্দুকের বিভিন্ন নাম দেওয়া হইয়াছিল, যেমন 'গাজীখান' অর্থাৎ বিজয়ী প্রভু, 'শেরদহন' অর্থাৎ ব্যাঘ্র-মুখ, 'ধুমধাম' অর্থাৎ কোলাহলময়, 'কিশ্‌ওয়ার কুশা' অর্থাৎ বিশ্ব উন্মোচনকারী, 'গরহ্-ভঞ্জন' অর্থাৎ দুর্গ ধ্বংসকারী, 'ফাতে-ই-লস্কর'[১] অর্থাৎ সৈন্য-বিজয়ী, 'আওরঙ্গবব' অর্থাৎ সিংহাসনের শক্তি, 'বুরজ শিকার', অর্থাৎ দুর্গপ্রাচীর ভঙ্গকারী, 'জাহান কুশা'[২] অর্থাৎ বিশ্ববিজয়ী।

বার্নিয়ার বলেন যে, মোগল আমলের দুই ধরনের ভারী ও হাল্কা কামান-গোলার মধ্যে, হাল্কা গোলা-বারুদকে বলা হয় 'তোপখানাহ্‌-ই-রেজাহ্'[৩] অর্থাৎ ছোট কামান-বন্দুক, কিংবা 'তোপখানাহ্‌-ই-জামবিশি'[৪] অর্থাৎ চলনশীল কামান-বন্দুক ; তবে 'তোপখানাহ্‌-ই-জিন্‌সি'[৫] অর্থাৎ বিবিধ গোলা-বারুদ নামেই সমধিক পরিচিত।

হাল্কা গোলা-বারুদ বলদের গাড়ীতে ও পশু পৃষ্ঠে এবং 'জামবুরাকস্' অর্থাৎ অপেক্ষাকৃত আরও হাল্কা বন্দুক উষ্ট্রপৃষ্ঠে বহন করা হইত। ভারী কামান-বন্দুক তন্ত্রীযুক্ত ষাঁড় কিংবা মধ্যে মধ্যে হস্তিপৃষ্ঠে বহন করা হইত।

বাবরের ভারতে আগমনের পূর্বে, মোগলদের কামান-বন্দুক ও গোলা-বারুদ ব্যবহার জানা সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ আছে। তাহারা যাহা জানিত, তাহারা উহা সম্ভবতঃ তুর্কীদের নিকট হইতে এবং কন্সটান্টিনোপল হইতে শিক্ষালাভ করে। ষোড়শ শতাব্দীতে ভারতেও কামান বন্দুক ব্যবহারের শিক্ষা প্রসার লাভ করে নাই। সুতরাং ভারতে আগমনের পর, মোগলরা গোলা-বারুদ ব্যবহারের জন্য কন্সটান্টিনোপলের মুসলিম, স্বরাট হইতে পলায়মান নাবিক, পর্তুগীজ ও ইউরোপীয়দের উপর প্রধানতঃ নির্ভরশীল ছিল।

বার্নিয়ার বলেন যে গোলন্দাজ সৈনিকগণ বিশেষ করিয়া ফিরিঙ্গী, খ্রীস্টান,

---

১ ইলিয়ট ও ডাওসন্ : হিস্টরি অফ ইণ্ডিয়া, সপ্তম খণ্ড, পৃঃ ১০০।

২ হর্ন : আর্মি, পৃঃ ৩৭।

৩ আওরঙ্গবাদী : আহ্‌ওয়াল-উল্-খাওয়াকিন (ব্রি. মি. পাণ্ডুলিপি)

৪ খুশহাল চান্দ : নাদির-ই-জামানী (বার্লিন পাণ্ডুলিপি, ৪১৮) ; মির্জা মাহদি 'জাহান কুশাযে নাদিরী'তে চলনশীল কামান-বন্দুককে 'তোপখানাহ্-ই-জিলাও' নামে আখ্যায়িত করিয়াছেন বলিয়া কর্নেল এফ. কলমবারি লে জামবুরেক্স্,-এ (পৃঃ ৩৬) উল্লেখ করিয়াছেন।

৫ কাফি খান : মুন্‌তাখাব-উল্-লুবাব, দ্বিতীয়, পৃঃ ৯৫৩।

পর্তুগীজ, ইংরেজ, ওলন্দাজ জার্মান, ফরাসী তুলনামূলকভাবে বেশী বেতন পাইত।[১]

গোলন্দাজ বিভাগের প্রধান ছিলেন রাষ্ট্রের একজন কর্মকর্তা মীর আতশ অর্থাৎ গোলা-বারুদের অধিকর্তা। তিনি 'দারোগাহ্-ই তোপখানাহ্' অর্থাৎ কামান-বন্দুক বিভাগের তত্ত্বাবধায়ক নামেও পরিচিত ছিলেন। খুশহালচান্দের মন্তব্য অনুযায়ী মীর আতশ শীঘ্রই একজন গুরুত্বপূর্ণ কর্মকর্তায় রূপান্তরিত হন।[২] মীর বখশীর ন্যায়, মীর আতিশ তাহার অধীনস্থ সামরিক কর্মকর্তা ও সৈনিকদের নেতৃত্ব প্রদান এবং নানাবিধ কর্তব্য ও দায়িত্ব পালন করিতেন। তাঁহার বিভাগ সম্পর্কীয় সমস্ত দাবি তিনি স্বয়ং সম্রাটের নিকট পেশ করিতেন। তিনি বেতনের দাবিপত্রের হিসাব পরীক্ষা করিয়া দেখিতেন এবং খানসামানের নিকট প্রেরণের পূর্বে, অস্ত্রাগারের দৈনন্দিন ঘটনা-লিপিবদ্ধ বই তিনি বিবেচনা করিতেন। গোলন্দাজ সৈন্যদের নিয়োগ ও বদলীর তিনি সুপারিশ করিতেন। গোলন্দাজ বিভাগের বেতন-প্রদান কার্যালয়ের প্রধান তাঁহার দ্বারা মনোনীত হইত। এই বিভাগের নব-নিযুক্ত সৈনিকদের বর্ণনামূলক তালিকা প্রণয়ন, নূতন সৈনিক নিয়োগ ও পদোন্নতি তাঁহার দায়িত্বাধীন ছিল।[৩] মীর আতশের অধীনে গোলন্দাজ বিভাগে 'হাজারী'[৪] বা 'মিন্‌ক-বশী' নামে আরও কর্মকর্তা নিয়োজিত ছিলেন।

পর-পৃষ্ঠায় মোগল সামরিক বাহিনীর সৈন্য সংখ্যার একটি সারণি[৫] দেওয়া হইল ঃ

---

১ বার্নিয়ার : ট্রাভলস্, পৃ: ২১৭ ; হর্ন : আর্মি, পৃ· ৩২।

২ খুশ্‌হালচান্দ : নাদির-উল্‌-জামানী

৩ দস্তুর-উল্‌-আমল, ২৩-২৭ ; আইরভিন : আর্মি, পৃ: ১৫৬।

৪ কোন কোন লেখক যেমন মির্জা মুহম্মদ তাঁহার তারিখ-ই-মুহম্মদীতে গোলন্দাজ কর্মকর্তার জন্য 'মিনক্‌-বশী' শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন ; অন্যান্যরা 'হাজারী' শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। গোলাম আলী খান তাঁহার মুকাদ্দমাহ্-ই-শাহ আলম-নামাহ্‌তে (ব্রি, মি. পাণ্ডুলিপি) 'মিনক্‌-বশী' ও 'হাজারী' উভয় শব্দ ব্যবহার করেন। শব্দ দুইটি অর্থ বুঝায়। তুর্কীশব্দ (মিনক্‌-১০০০, বশ্‌-প্রধান) অর্থ ১০০০ সৈন্যের প্রধান।—বিশেষ দ্রষ্টব্য, হর্ন : আর্মি, পৃ: ১৪ ১৩৬ ; আইরভিন্ : আর্মি, পৃ: ১৫৭।

৫ আইরভিন : আর্মি, পৃ: ৬১।

সময়কাল	অশ্বারোহী	পদাতিক	গোলন্দাজ	তথ্যের উৎস
আকবর	১২,০০০	১২,০০০	১০০০	ব্লকম্যান, প্রথম খণ্ড, ২৪৬
,,	৩৮৪,৭৫৮	৩,৮৭৭,৫৫৭	—	আইন-ই-আকবরী
শাহজাহান	২০০,০০০	৪০,০০০	—	বাদশাহ্-নামা, দ্বিতীয়, ৭১৫ আইন, প্রথম, ২৪৪
আওরঙ্গজেব	২৪০,০০০	১৫,০০০	—	বার্নিয়ার
,,	৩০০,০০০	৬০০,০০০	—	ক্যাট্রো
মুহম্মদশাহ	২০০,০০০	৮০০,০০০	—	রুস্তম আলী ঃ তারিখ-ই-হিন্দি

মোগল আমলে অশ্বারোহী বাহিনীর প্রধান আক্রমণাত্মক অস্ত্রশস্ত্র ছিল তরবারি, ঢাল, আসাসোঁটা অর্থাৎ প্রভুত্বের চিহ্ন-স্বরূপ দণ্ড, যুদ্ধে ব্যবহৃত কুঠার, বর্শা, ছোরা, তীর-ধনুক, পিস্তল ইত্যাদি। সকল অশ্বারোহী সৈনিক যুদ্ধ-সজ্জা বিশেষ আত্মরক্ষার্থ বর্ম ব্যবহার করিত। সময় সময় পরিদর্শন ও পরীক্ষার জন্য তাহাদিগকে উহা উপস্থাপিত করিতে হইত।

তরবারি বিভিন্ন ধরনের ছিল, যেমন বক্র আকারের খড়্গ, ভোজালি ('শামশের'[১]), সামান্য বক্র তরবারি ('সিরোহি'[২]), সোজা ও প্রশস্ত তরবারি ('ধুপ' কিংবা 'খন্দহ'[৩]), দুই দিক ধারাল সোজা সরু তরবারি (পাট্টা'[৪]), খাপ, কোষ লাগান সোজা তরবারি ('গুপ্তি[৫]')। তরবারির সহিত থাকিত ঢাল; ঢাল ইস্পাত কিংবা সম্ভরের হরিণ, মহিষ, হস্তী কিংবা গণ্ডারের পুরু-মোটা চামড়া দ্বারা তৈয়ারী হইত।[৬] অদ্ভুত সর্প-চর্ম-নির্মিত ('নাগফানি'[৭]) বর্ম কোন মোগলদের অস্ত্র ছিল না। 'গুরজ'[৮] আসাসোঁটা অর্থাৎ প্রভুত্বের চিহ্ন-স্বরূপ দণ্ড মোগল পদ-মর্যাদা সম্পন্ন যোদ্ধাদের অস্ত্রশস্ত্রের অন্যতম ছিল।

'তবর'[৯] অর্থাৎ যুদ্ধে ব্যবহৃত কুঠার নানা ধরনের ছিল, যেমন

১ আইরভিন: আর্মি', পৃঃ ৭৫।
২ শাহনাওয়াজ খান: মা'আছির-উল্-উমারা, তৃতীয় খণ্ড, পৃঃ ১৫২।
৩ আইন, প্রথম, পৃঃ ১১২।
৪ এগারটন্, : ক্যাটালগ্, পৃঃ ১০৪ নমুনা নং ৪০৩, ৪০৪।
৫ আইন, প্রথম, পৃঃ ১১০ ; এগারটন্, : ক্যাটালগ্, পৃঃ ১১৭, ১৩১ নমুনা নং ৫১৬, ৫১৭, ৫১৮, ৫১৯, ৬৪১, ৬৪২।
৬ এগারটন্ : ক্যাটালগ্. পৃঃ ১১১ নমুনা নং ৪৩৪ এবং ৪৭—৪৯ পৃষ্ঠায় উহার অসংখ্য নমুনা রহিয়াছে।
৭ এগারটন্ : ক্যাটালগ্, পৃঃ ১০৩ নমুনা নং ৩৬৫।
৮ আইন-ই-আকবরীতে 'গুরজ্'এর নমুনা রহিয়াছে।
৯ আইরভিন: আর্মি', পৃঃ ৮০।

'তারানগালাহ্'[১] অর্থাৎ দীর্ঘ হাতলবিশিষ্ট কুঠার, একদিক ধারাল কুঠার, উভয় দিক ধারাল কুঠার ইত্যাদি। দরবার কক্ষে সরকারী কার্যে নিযুক্ত সহগামী ও অনুগামিগণ প্রদর্শনের জন্য অতীত অলঙ্কৃত রৌপ্য-নির্মিত কুঠার[২] ব্যবহার করিত। সহগামী ও অনুগামিগণ ছিলেন 'ইয়াসাওয়াল' এবং আনন্দরাম উক্ত কুঠারকে 'চামচাক্'[৩] নামে অভিহিত করেন।

আইন-ই-আকবরীতে পাঁচ ধরনের[৪] বর্শার কথা উল্লেখ আছে, 'ন্যাজাহ্', 'বরছাহ্', 'সানক্', 'সেইন্থি', ও 'সেলারাহ্'। 'ন্যাজাহ' অর্থাৎ একটি লম্বা বাঁশের হাতলের মাথায় ধারাল ইস্পাত দ্বারা বাঁধান বর্শা[৫] অশ্বারোহী সৈনিক ব্যবহার করিত। বল্লমের অন্যান্য ধরনের মধ্যে চারিটি নাম[৬], বল্লম, পন্দি-বল্লম', 'পান্জ-মুখ' ও 'ল্যান্জ' উল্লেখযোগ্য।

ছোরা ও ছুরি বিভিন্ন প্রকার ও আকৃতির ছিল এবং ঐগুলি বিভিন্ন নামে পরিচিত ছিল, যেমন কতর', 'কাতারাহ্', 'কাতারি',[৭] 'জামধার',[৮] 'খান্জর',[৯] 'পেশকাবজ্'[১০], 'কারদ্'[১১], 'সইলাবাহ্-ই কাল্মকি'[১২] ইত্যাদি।

মোগল তীরন্দাজ অর্থাৎ ধনুকধারীরা তাহাদের অস্ত্র তীর-ধনুক ব্যবহারে

---

১ এগারটন্: ক্যাটালগ, পৃ: ১০৮, নমুনা নং ২৭।

২ পূর্বোক্ত, পৃ: ১০৮, নমুনা নং ৩৭১।

৩ আনন্দরাম: মিরাট-উল্-ইস্তিলাহ্; আইরভিন: আর্মি', পৃ: ৮১; এফ. স্টেন্গাস্ এর পারশিয়ান্-ইংলিশ ডিক্শ্যান্যারিতে (পৃ: ৩৮৮-৩৮৯) 'চামখাক্', 'চাখ্মক্', 'চাখমগ্' শব্দ পাওয়া যায়।

৪ আইন, প্রথম, পৃ: ১১২।

৫ আইরভিন: আর্মি', পৃ: ৮২।

৬ চারি ধরনের বল্লমের নাম এগারটন্এর ক্যাট্যালগ্ এ পাওয়া যায়; তবে ইহা আইন ই-আকবরীতে বাদ পড়িয়াছে।—আইরভিন: আর্মি', পৃ: ৮৪।

৭ সিয়ার-উল্-মুতাখ্খিরিন, প্রথম, পৃ: ৫৪৯।

৮ আইন, প্রথম, পৃ: ১১২ নমুনা নং ৪।

৯ এগারটন্: ক্যাট্যালগ্, পৃ: ১১৬ নমুনা নং ৫০২—৫০৬।

১০ আইরভিন: আর্মি', পৃ: ৮৮।

১১ এগারটন্: ক্যাট্যালগ, পৃ: ১৪৪, নমুনা নং ৭৫০ 'কারদ' ছিল কসাইয়ের ছুরির অনুরূপ। বিশেষভাবে ইহা আফগানদের অস্ত্র ছিল।—আইরভিন: আর্মি', পৃ: ৮৮।

১২ কাশগারের সৈনিকরা সইলাবাহ্-ই-কাল্মকি নামক ছুরি ব্যবহার করিত। ইহা তরবারির মত লম্বা ছিল এবং ইহার হাতল 'শের-মাহি' অর্থাৎ মৎস্য-হাড়ের দ্বারা তৈয়ারী ছিল।—আইরভিন্: আর্মি', পৃ: ৮৯।

বিশেষ দক্ষ ছিল। ধনুক প্রায় চারি ফুট লম্বা ছিল এবং সাধারণতঃ বক্রাকারের ছিল। ইহা শিং, কাষ্ঠ, বাঁশ ও সময় সময় ইস্পাত-নির্মিত ছিল। 'চিল্লাহ্' বা 'রোদা'[১] অর্থাৎ ধনুকের দড়ি সাদা রেশমি মজবুত সুতার দ্বারা তৈয়ারী ছিল।[২] নানা ধরনের ধনুক ব্যবহৃত হইত, যেমন 'তাখাশ্‌কামান,'[৩] 'কামান-ই-গুরুহাহ্'[৪], 'কাম্‌গাহ্'[৫], 'নাওয়াক্', 'তুফাক্-ই-দাহান্' ইত্যাদি বিভিন্নজাতীয় তীরও ব্যবহৃত হইত, যেমন 'তুকাহ্', 'তুক্কাহ্', 'লেয়িস', 'কালানদারা', 'কোহার-তারাশ', 'ঘেরা', 'আনক্‌রি-দার'[৬] ইত্যাদি।

তামান্‌চাহ্'[৭] অর্থাৎ পিস্তল ভারতে মোগল আমলের শেষদিকে ব্যবহৃত হইত।[৮]

বর্ম ছিল দুই ধরনের[৯], যথা মাথা, পিঠ, বুক ও বাহু রক্ষার্থে ইস্পাত-নির্মিত শিরস্ত্রাণ ও পাত কিংবা মাথা, গণ্ডদেশ ও মুখমণ্ডল রক্ষার্থে ইস্পাত-নির্মিত আবরণী।

পদাতিক বাহিনী তরবারি, ঢাল, বল্লম, বর্শা, ছোরা, তীর ধনুক, পলিতা দিয়া বারুদে আগুন লাগান অপ্রচলিত বন্দুক ইত্যাদি অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত ছিল। পদাতিক সৈন্যগণ বিভিন্ন ধরনের বর্শা ও বল্লম ব্যবহার করিত। লোহার হাতলবিশিষ্ট ভারী বর্শা ও বল্লম তাহাদের জন্য নির্ধারিত ছিল। পদাতিক সৈনিকের প্রধান অস্ত্র ছিল বন্দুক। আকবরের আমলের বন্দুকের

---

১ 'রোদা' একটি হিন্দী শব্দ। ইহা ধনুকের দড়ি বুঝায়।—স্টেন্‌গাস্: পারশিয়ান-ইংলিশ ডিক্‌শন্যারি, পৃঃ ৫৯২।

২ আইরভিন: আর্মি', পৃ ৯৩।

৩ 'তাখাশ কামান' ছিল ছোট ধরনের ধনুক।—আইন, প্রথম, পৃঃ ১১০; স্টেন্‌গাস্ ইহাকে আড়াআড়িযুক্ত ধনুক বলিয়াছেন।—স্টেন্‌গাস: পারশিয়ান-ইংলিশ ডিক্‌শন্যারি, পৃঃ ২৮৮।

৪ 'কামান-ই-গুরুহাহ্' ছিল গুটলে ধনুক।—আইরভিন: আর্মি', পৃঃ ৯৫।

৫ 'কাম্‌থাহ্'—ভিল্‌দের লম্বা ধনুক।—আইন, প্রথম,

৬ 'তুকাহ্', তুক্কাহ্ ছিল মাথা ছাড়া তীরের নাম; 'লেইস' ছিল পল্লব আচ্ছাদিত তীর; 'ঘেরা' ছিল প্রশস্ত মাথাবিশিষ্ট তীর; 'আনকরি-দার' ছিল বাঁকান মাথাবিশিষ্ট তীর।—আইরভিন: আর্মি', পৃঃ ৯৭-৯৮।

৭ স্টেন্‌গাস্: ডিকশেন্যারি, পৃঃ ৮১৯। পিস্তল ব্যবহারের কথা আবুল ফজলের ষষ্টদশ শতাব্দীর রচিত আইন-ই-আকবরীতে উল্লেখ নাই, কারণ পিস্তল অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে ভারতে সামান্য ব্যবহৃত হইত, ইহার পূর্বে নহে।—আইরভিন: আর্মি', পৃঃ ১১১।

৮ ইলিয়ট্ ও ডাওসন্: হিস্টরি অফ ইণ্ডিয়া, সপ্তম খণ্ড, পৃঃ ৫৭৩।

৯ আইরভিন: আর্মি', পৃঃ ৬২।

নল ৬৬ কিংবা ৪১ ইঞ্চি লম্বা ছিল। মোগল আমলের শেষ অবধি সাধারণ ব্যবহারের আগ্নেয়াস্ত্র ছিল উক্ত বন্দুক।[১]

যুদ্ধক্ষেত্রে ব্যবহৃত হওয়ার সময়, হস্তীকে বর্মদ্বারা সজ্জিত করা হইত। ইহাকে 'পাখার'[২] বলা হইত এবং ইহা ইস্পাত-নির্মিত ছিল। দুর্গের ফটক পুনঃ পুনঃ সজোরে আঘাত করিবার জন্যও হস্তী ব্যবহৃত হইত।

রোমান সৈন্যবাহিনী দশমিক ভিত্তিতে সংগঠিত ছিল। মুসলিমগণ রোমানদের নিকট হইতে দশমিক ভিত্তিতে সামরিক বাহিনী সংগঠনের[৩] প্রদ্ধতি শিক্ষালাভ করে। আবদুল আজিজের মতে, মধ্য-এশিয়ার মোঙ্গল নেতা চেংগিজ খানের সেনাবাহিনী দশমিক ভিত্তিতে সংগঠিত ছিল।[৪] এই পদ্ধতি গজনী সুলতানদের সেনাবাহিনীতে প্রচলিত ছিল এবং তাহাদের অনুকরণে ভারতে দিল্লীর সুলতানদের আমলেও উক্ত পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়।

ভারতীয় মোগল সম্রাটদের শাসন আমলে, তাঁহাদের সেনাবাহিনী কোন সৈন্যদল বা 'পল্টনভিত্তিক সংগঠন' ছিল না বলিয়া মনে হয়।[৫] সামরিক সংগঠন সংশ্লিষ্ট শব্দ 'তুমান' ও 'তুমানদার'-এর কোন নির্দিষ্ট অর্থ নাই; 'জামাহ্‌দার' ও একটি অস্পষ্ট শব্দবিশেষ।[৬]

মোগল আমলের সৈনিকদের উর্দি অর্থাৎ সমরূপ পোশাকের একমাত্র চিহ্ন ছিল লাল পাগড়ি এবং উহা সকল সৈন্য ব্যবহার করিত। মোগলদের বিরাট সেনাবাহিনীতে সচরাচর পোশাকে কোন সমতা ছিল না। কিন্তু সাধারণভাবে সেনাদলের প্রত্যেক শ্রেণী একই ধরনের পোশাকে সজ্জিত হইত; তবে পারস্যদেশীয় এক ধরনের, মোগল অন্য ধরনের এবং হিন্দুস্থানী মুসলিমদিগকে রাজপুতদের হইতে পৃথক করা যাইত।[৭]

ইউরোপীয়দের ধারণা যে মোগল সেনাবাহিনীতে আদৌ শৃঙ্খলা ছিল

---

১ এইচ. উইল্‌কন্‌সন্‌: এন্‌জিন্‌ অফ ওয়ার, পৃঃ ৬৭।

২ আইন, প্রথম, পৃঃ ১২৯।

৩ মোগল সামরিক বাহিনীর সংগঠন সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার জন্য বিশেষ দ্রষ্টব্য—আচার্য যদুনাথ সরকার: 'আর্মি' অফ দি মোগল এমপারারস্‌'—হিন্দুস্তান স্ট্যাণ্ডার্ড', কলিকাতা, ১৯৫৫, ২০শে মার্চ।

৪ আজিজ: দি মনসবদারি সিস্টেম, পৃঃ ১৭৫-১৭৮।

৫ আইরভিন্‌: আর্মি', পৃঃ ১৮৩।

৬ পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৮৩।

৭ হর্ন: আর্মি', পৃঃ ২৫; আইরভিন্‌: আর্মি', পৃঃ ১৮৩।

না।[১] বার্নিয়ার বলেন যে, বিভ্রান্তি ও বিশৃঙ্খল অবস্থা দেখা দিলে, মোগল সেনাবাহিনীতে শৃঙ্খলা পুনঃস্থাপিত করা প্রায় অসম্ভব ছিল।[২]

মোগল সৈন্যদের কোন নিয়মিত সামরিক কুচকাওয়াজের বন্দোবস্ত ছিল না বলিয়া মনে হয়। এমতাবস্থায় বোধ হয় কোন সম্মিলিত প্রশিক্ষণের সুযোগও তাহাদের ছিল না। পক্ষান্তরে, ব্যক্তিগতভাবে নিজের দেহ সুস্থ-সবল রাখিবার জন্য প্রতিটি সৈন্য নিয়মিত প্রশিক্ষণে বেশ মনোযোগী ছিল এবং নিজের অস্ত্রশস্ত্র লইয়া কুচকাওয়াজ করিত। ঘোড়ায় চড়া শিখিবার বিদ্যালয়ে যেমন অশ্বচালন কৌশল শিক্ষা দেওয়া হয়, ঐ ধরনের প্রশিক্ষণ অশ্বারোহী সৈন্যদের অশ্বকে দেওয়া হইত।[৩] তরবারি পরিচালনায় মোগল সৈন্য খুব পটু ছিল।

যদিও মোগল সেনাবাহিনীতে নিয়মিত সামরিক কুচকাওয়াজের রীতি ছিল না, তবুও মধ্যে মধ্যে বিশেষ উপলক্ষ্যে আড়ম্বরপূর্ণ সামরিক কুচকাওয়াজ, ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, অস্ত্রশস্ত্র প্রদর্শন ও সামরিক শক্তি প্রদর্শনের ব্যবস্থা ছিল। কেহ কেহ মন্তব্য করিয়াছেন যে, রাজকীয় শিকারের অনুষ্ঠানের মাধ্যমে মোগল সৈন্যদিগকে সুস্থ, সবল ও কর্মঠ রাখিবার নিয়ম ছিল।[৪]

সুরক্ষিত দুর্গ ও সামরিক ঘাঁটি স্থাপন ভারতের প্রাচীন ইতিহাসেও লক্ষ্য করা যায়।[৫] ষষ্ঠদশ শতাব্দীতে মোগলরা ভারতে আসিয়া উক্ত প্রথা পরিত্যাগ করেন নাই। মোগল সম্রাটদের তৈয়ারী আগ্রায় দুর্গ ও দিল্লীতে লালকেল্লা তাঁহাদের সুরক্ষিত দুর্গের পরিচয় বহন করে।

দুর্গ অবরোধ কৌশল মুসলিমদের প্রথম হইতেই জানা ছিল। ভারতে মোগলরা দুর্গ অবরোধ কৌশলের আরও বিভিন্ন পদ্ধতি[৬] উদ্ভাবন করেন।

---

১ আর. ও. কেমব্রিজ: অ্যাকাউন্ট অফ দি ওয়ার ইন ইণ্ডিয়া, ১৭৫০-৬০, সূচনা অষ্টম; আইরভিন: আর্মি, পৃঃ ১৮২।

২ বার্নিয়ার: ট্রাভেলস্, পৃঃ ৫৫।

৩ এন্‌সাইক্লোপীডিয়া অফ ইসলাম, তৃতীয় খণ্ড, পৃঃ ৬২৯।

৪ হুসাইনি: এম. অ্যাড্‌মিনিস্ট্রেশন, পৃঃ ১৬৯।

৫ এমনকি যখন আলেকজাণ্ডার ভারত আক্রমণ করিয়াছিলেন তখনও ভারতীয় রাজা মহারাজাদের দুর্গ দ্বারা সুরক্ষিত শহর ছিল।—ম্যাক্‌ক্রিন্‌ডল্: ইনভেশন্ অফ ইণ্ডিয়া বাই আলেকজাণ্ডার, পৃঃ ১১৯।

৬ দুর্গ অবরোধ কৌশলের বিভিন্ন পদ্ধতির বিস্তারিত আলোচনার জন্য বিশেষ দ্রষ্টব্য—ফিজ্-ক্ল্যারেনস্: জার্ন্যাল অফ রুট অ্যাক্রস ইণ্ডিয়া, পৃঃ ২৪২-২৪৫।

মোগল আমলের প্রথমদিকে মোগল সৈন্যদের নিয়মিত অগ্রগমনের গতি ছিল দ্রুত এবং আয়োজন ছিল সংক্ষিপ্ত। কিন্তু ক্রমশঃ সাম্রাজ্যের বিস্তার লাভ ঘটিলে, সৈন্যদের চলনে ধীর গতি পরিলক্ষিত হয়। সৈন্যদের বহন করিয়া লইবার সকল পোশাক, তাঁবু ইত্যাদি ভারী হইয়া পড়ে এবং আয়োজনও অত্যধিক বিস্তারিত হয়।[১]

মোগল আমলে সামরিক বাহিনীর পরিবহনের অন্যতম ছিল উষ্ট্র, বলদ, ষাড়, হস্তী, টাট্টু ঘোড়া, বলদের গাড়ী ও মুটে।

মোগল আমলে মীর-মঞ্জিল শিবির স্থাপনের জন্য উপযুক্ত স্থান নির্বাচন করিতেন।[২] বিস্তৃত শিবিরের মধ্যস্থলে সম্রাটের জন্য চারিকোণা বিশিষ্ট[৩] চৌকা ক্যাম্বিস পর্দা[৪] দ্বারা চারিদিকে ঘেরা জায়গা থাকিত। সম্রাটের শিবিরের একদিকের মধ্যখানে প্রবেশপথ ছিল। প্রবেশপথের দুই পার্শ্বে দুইটি সুসজ্জিত তাঁবু থাকিত, উহাতে বেশ কয়েকটি অশ্ব জিন লাগান ও সজ্জিত অবস্থায় সর্বদা প্রস্তুত রাখা হইত।[৫] সম্রাটের শিবিরের সম্মুখ ভাগে খোলা জায়গার শেষ প্রান্তে ছিল 'নাক্কার খানাহ্'। ইহা ছিল ঢাক, করতাল ও রণভেরী রাখিবার স্থান। ইহার সংলগ্ন ছিল 'চৌকি-খানাহ্'। ইহা ছিল পাহারা-রত কর্মকর্তার তাঁবু।[৬] শিবিরে মেয়েদের তাঁবু চারিদিকে প্রহরী দ্বারা বেষ্টিত ছিল। সম্রাটের তাঁবু এবং এই সমস্তকে একত্রে 'দৌলত-খানাহ্' বলা হইত।[৭] রাত্রিবেলা শিবির রক্ষার্থে কতক সৈন্য শিবিরের চারিদিকে পাহারা দিত। কোন অতর্কিত আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা হিসাবে, কোতোয়াল তাঁহার অধীনস্থ সশস্ত্র সৈন্য ও রণভেরীসহ চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেন।

---

১ এফ. কারটো আওরঙ্গজেবের আমলে মোগল সৈন্যদের অগ্রগমনের আয়োজনের একটি বিস্তারিত বর্ণনা দিয়াছেন।--হিস্টরি জেনারাল দ্যা ল' এম্পায়ার দ্যা মোগল, পৃঃ ১২৬ ; আইরভিন : আর্মি', পৃঃ ২০৩-২০৫।

২ বার্নিয়ার : ট্রাভেলস্, পৃঃ ৩৬০।

৩ সম্রাটের শিবিরের বিস্তারিত বর্ণনার জন্য দ্রষ্টব্য—আইন, প্রথম, পৃঃ ৪৭ ; বার্নিয়ার : ট্রাভেলস্ পৃঃ ৩৬০-৩৬১ ; ক্যট্রো : ল' এম্পায়ার দ্যা মোগল, চতুর্থ, পৃঃ ৪০, ৫৭।

৪ সম্রাটের শিবিরের চারিদিক ঘেরা পর্দাকে 'গুলাল্বার' বলা হয়।—আইন, প্রথম, পৃঃ ৪৭, ৫৪।

৫ বার্নিয়ার : ট্রাভেলস্, পৃঃ ২৬৩।

৬ আইরভিন : আর্মি', পৃঃ ১৯৬।

৭ আনন্দরাম : মিরাট-উল্-ইস্তিলাহ., ২০৩।

মোগল আমলে সকল সামরিক অভিযানে রাজপরিবারের মহিলাগণ তাহাদের সহচরী ও দাসদাসীসহ, সম্রাট ও সামরিক প্রধান ব্যক্তিদিগকে সঙ্গ দান করিতেন।[১]

যখন মুসলিমরা ভারতে আসিয়াছিল, দেশে অসংখ্য 'বাঞ্জরা' অর্থাৎ ভ্রাম্যমাণ ব্যবসায়ী ছিল, যাহাদের ব্যবসা ছিল বলদ, ষাঁড়ের পৃষ্ঠে করিয়া একস্থান হইতে অন্য স্থানে খাদ্যশস্য সরবরাহ বা পরিবহন করা। চলন্ত সেনা-বাহিনীর জন্য খাদ্যশস্য নিয়মিত সরবরাহ করিবার উদ্দেশ্যে, অধিক দ্রব্যমূল্য প্রদান করিয়া উক্ত ভ্রাম্যমাণ ব্যবসায়ীদিগকে উৎসাহিত ও প্রলুব্ধ করা হইত।[২]

যখন মোগল শাসন ভারতে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন যুদ্ধরত রাজ-সেনাবাহিনীর প্রয়োজনীয় খাদ্যদ্রব্য সরবরাহ যুদ্ধক্ষেত্রের নিকটবর্তী প্রাদেশিক সরকারের দায়িত্ব ছিল।

শান্তি অথবা যুদ্ধ চলাকালীন সর্ব অবস্থায়ই মোগল আমলে গোয়েন্দা বিভাগ সদা সতর্ক এবং অত্যন্ত কর্মঠ ছিল। দানিশমন্দ খানের মতে, মোগল আমলে সাম্রাজ্যের সর্বত্র মোট চারি সহস্র 'হরকরাহ্' অর্থাৎ গুপ্তচর সামরিক অভিপ্রায়ে গোপনে সংবাদ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে রাজকার্যে নিযুক্ত ছিল।[৩] গুপ্তচর বাহিনীর প্রধান ছিলেন 'দারোগা-ই-হরকরাহ্'। তিনি অত্যন্ত প্রভাবশালী ব্যক্তি ছিলেন; সবাই তাঁহাকে সমীহ করিয়া চলিত। যখন সেনাবাহিনী যুদ্ধক্ষেত্রে লিপ্ত থাকিত, তখন শত সহস্র গুপ্তচর ও গোয়েন্দাকে সামরিক বাহিনীর প্রয়োজনীয় সংবাদ গোপনে সংগ্রহের জন্য সাম্রাজ্যের সর্বদিকে সন্ধানী অভিযানে প্রেরণ করা হইত।

শত্রুদের অপেক্ষা সর্বদিকে মুসলিম সৈন্যগণের মনোবল ও সাহস অনেক বেশী ছিল। হিন্দুদের বিরুদ্ধে মুসলিম সেনাবাহিনীর বিজয়ের কারণগুলির মধ্যে মুসলিম সৈন্যদের শৃঙ্খলা ও সময়নিষ্ঠার গুণ অন্যতম ছিল। কিন্তু ইহা অনস্বীকার্য যে, ভারতে মোগল শাসনের পতনের যুগে, মোগল সেনাবাহিনীতে শৃঙ্খলার চরম অভাব ছিল।[৪]

---

১ হর্ণ: আর্মি, পৃঃ ৫৭; আইরভিন: আর্মি, পৃঃ ২০০।

২ খাদ্যশস্য সরবরাহকারীদিগকে 'কারওয়ানিয়ান্' বলা হইত, অর্থাৎ উহারা ছিল যাযাবর, বেদে।—বারনী: ফিরোজশাহী, পৃঃ ৩০৪; মোগল আমলে 'কারওয়ানিয়ান'কে 'বাঞ্জরা' বা 'ব্রিনজারা' বলা হইত।—হুসাইনি: এম. অ্যাড্মিনিস্ট্রেশন্, পৃঃ ১৮০।

৩ 'হরকরাহ্' আক্ষরিকভাবে বুঝায় 'প্রত্যেক কাজের জন্য'। এই নাম দাক্ষিণাত্যে ব্যবহৃত হইত। পরে মোগলদের মধ্যেও ইহা প্রচলিত হয়।—বিস্তারিত আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য—দানিশমন্দ খান: বাহাদুর-নামা; আইরভিন: আর্মি, পৃঃ ২১৩-২১৪।

৪ বার্নিয়ার: ট্রাভলস্, পৃঃ ৫৫।

ষষ্ঠ অধ্যায়

বিচার-ব্যবস্থা

মুসলিম রাষ্ট্র জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে সকলের জান-মালের নিরাপত্তা ও শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখিবার নিশ্চয়তা প্রদান করে। বিচার-ব্যবস্থায় আইনের চোখে মুসলমান ও অমুসলমান সকলই সমান ছিল।[১] অত্যাচার-উৎপীড়নে নিবৃত থাকিতে এবং অবিচারের উধের্ব থাকিতে মুসলিম শাসকগণ সদা সতর্ক ও জাগ্রত থাকিতেন।

পৈতৃক বিষয়, বিবাহ-বন্ধন, বিবাহ বিচ্ছেদ ও এই জাতীয় সামাজিক অন্যান্য সংশ্লিষ্ট বিষয়ে, মুসলিম ও হিন্দু তাহাদের নিজ নিজ আইন অনুসরণ করিত ; মুসলিম অপরাধমূলক আইন, সাক্ষ্য-প্রমাণের আইন ও চুক্তি উভয় সম্প্রদায়ের জন্য প্রযোজ্য ছিল। কিন্তু অনেক অপরাধমূলক ফৌজদারী মোকদ্দমায় প্রমাণ আছে যে, ঐ সকল ক্ষেত্রে ইসলামী আইন আনুযায়ী শাস্তি দেওয়া হয় নাই।

গ্রামাঞ্চলে বিচার-ব্যবস্থা সম্পূর্ণরূপে গ্রাম্য প্রধানদের হস্তে ন্যস্ত ছিল। গ্রামের পঞ্চায়েৎ আদালতে গ্রামবাসী হিন্দুদের ব্যক্তিগত আইন সংক্রান্ত বেসামরিক সকল মামলা-মোকদ্দমাব বিচার সম্পাদিত হইত।

মোগল ভারতে মুসলিম বিচার-ব্যবস্থা সম্পর্কে নানা ভুল ধারণা রহিয়াছে ; উহার নিরপেক্ষ বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজন।

হিন্দু মুসলিম উভয়ের দ্বারা সমর্থিত প্রাচীন আদর্শ ও নীতি অনুযায়ী, শাসক হইতেছেন নিরপেক্ষ বিচারের উৎস এবং প্রকাশ্য বিচারালয়ে নানা ঘটনা, বিবিধ বিষয় তদন্তের মাধ্যমে সুষ্ঠুভাবে বিচার করা তাঁহার কর্তব্য। ভারতে মোগল শাসকগণ উক্ত আদর্শে অনুপ্রাণিত ও নীতিতে উদ্বুদ্ধ হইয়া, নিরপেক্ষ বিচার পরিচালনা করিতেন। মোগল দরবারের ঐতিহাসিকদের ও বিদেশী পর্যটকদের রচিত সমসাময়িক বিবরণীতে, সম্রাটগণ কি পদ্ধতি ও কি উপায়ে সুষ্ঠুভাবে নিরপেক্ষ বিচার-ব্যবস্থা পরিচালনা করিতেন উহার সম্যক ধারণা লাভ করা যায়।

---

১ দ্রষ্টব্য—মুহম্মদ আকবর : দি অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অফ জাস্টিস্ বাই দি মোগলস্

শাহ্‌জাহান ও আওরঙ্গজেব উভয় সম্রাট বুধবারে রাজদরবারে অন্য কোন প্রশাসনিক কার্যে লিপ্ত না হইয়া, ঐ দিন শুধু বিচার পরিচালনায় ব্যস্ত থাকিতেন।[১] ঐ দিন সম্রাট সকাল ৮ ঘটিকায় সোজা 'ঝরোকা দর্শন' হইতে দিওয়ান-ই-খাসে আগমন করিতেন এবং ন্যায়বিচারের সিংহাসনে দ্বি-প্রহর পর্যন্ত উপবিষ্ট থাকিতেন। আইনের কর্মকর্তাগণ, কাজীগণ, আদিলগণ, মুফ্‌তিগণ, উলামাগণ, আইন বিশারদ্‌গণ, 'ফত্‌ওয়া' প্রদানে বিশেষজ্ঞগণ, দারোগা-ই-আদালত ও কোতোয়াল কিংবা নগর পুলিশ-প্রধান সকলেই দরবারকক্ষে উপস্থিত থাকিতেন। বিচারের কর্মকর্তাগণ একের পর এক বাদীদিগকে সম্রাটের সম্মুখে হাজির করিতেন, তাহাদের অভিযোগ পেশ করা হইলে, সম্রাট জিজ্ঞাসাবাদ ও অনুসন্ধানের মাধ্যমে সত্য ঘটনা উদ্ধার করিয়া ন্যায় নির্ণয় করিতে সক্ষম হইতেন, প্রয়োজনবোধে উলামাদের নিকট হইতে আইনের ব্যাখ্যা গ্রহণ করিতেন এবং তদানুযায়ী বিচারের রায় প্রদান করিতেন।[২]

সম্রাট ছিলেন আপীলের সর্বোচ্চ বিচারালয় এবং কখনও কখনও বাদীর অভিযোগ পেশ করিবার প্রথম আদালত হিসাবেও তিনি কাজ করিতেন; কিন্তু খুব কম সংখ্যক বাদীই সরাসরি সম্রাটের নিকট তাহাদের অভিযোগ পেশ করিবার সুযোগ লাভ করিত। সমস্ত আপীলের বিচার-নিষ্পত্তি করিয়া রায় প্রদানের জন্য, সম্রাটের পক্ষে প্রচুর সময় দেওয়া সম্ভব ছিল না। জাহাঙ্গীর অবশ্য জনসাধারণের অভিযোগ শ্রবণ করিয়া, ন্যায়বিচার সম্পাদনের জন্য উদগ্রীব ছিলেন; তাই তিনি তাঁহার রাজপ্রাসাদের খোলা-বারান্দা হইতে আগ্রা দুর্গের বাহিরে একটি সোনার শিকল ঝুলাইয়া রাখিয়াছিলেন, যাহাতে রাস্তার জনসাধারণ সম্রাটের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে এবং তাঁহার ন্যায়বিচার লাভের আশায় তাহাদের অভিযোগের আবেদন-পত্র শিকলে বাঁধিয়া দিতে পারিত।[৩]

যদুনাথ সরকার তীব্র মন্তব্য করেন যে, মোগল আইন ও বিচার বিভাগের প্রধান ত্রুটি ছিল যে বিচার-ব্যবস্থায় কোন পদ্ধতি, নিয়মবদ্ধ রীতি ছিল না, নিয়মিত পর্যায়ক্রমে ধাপে ধাপে সর্বোচ্চ হইতে সর্বনিম্ন আদালতের শ্রেণী-বিন্যাসের অভাব ছিল এবং বিভিন্ন অঞ্চলের আয়তনের অনুপাত অনুযায়ী

---

১ সরকার: এম. অ্যাড্‌মিনিস্ট্রেশন., পৃ: ১০৬-১০৭।
২ সরকার: স্টাডিজ., পৃ: ১৪, ৭০।
৩ সরকার: এম. অ্যাড্‌মিনিস্ট্রেশন., পৃ: ১০৭।

আদালতের অধিক্ষেত্রের যথার্থ বণ্টনেরও অভাব পরিলক্ষিত হয়।[১] দেশের বেশীর ভাগ মামলা-মোকদ্দমা স্বাভাবিকভাবেই কাজী ও সদরের আদালতে উপস্থাপিত হইত। তিনি বলিয়াছেন যে, মোগল আমলের বিচার-ব্যবস্থার স্থূলতা, অপরিপক্কতা, কৌশলহীনতা ও অপর্যাপ্ততার মূল কারণ ছিল সম্রাট ও কাজীদের কোর-আনের আইন, যাহা ভারতের বাহিরে উৎপত্তি লাভ করিয়া পরিপক্ক হইয়াছে, উহাকে একমাত্র আইন-রূপে স্বীকৃতি প্রদান করা। তিনি আরও বলিয়াছেন যে, উক্ত কারণে ভারতে মুসলিম আইন ইহার ক্রমবিকাশ, ক্রমবিবর্তন ও পরিবর্তন সাধনে অসমর্থ ছিল।[২] যদুনাথ সরকারের উল্লিখিত তীব্র মন্তব্যগুলি বিনা বিচারে গ্রহণযোগ্য নহে। তাঁহার মন্তব্যগুলির কিয়দংশে সত্যের অপলাপ ঘটিয়াছে নিরপেক্ষ আলোচনায় উহা প্রতীয়মান হয়।

আর একজন আধুনিক লেখকও মন্তব্য করিয়াছেন যে, হিন্দু-মুসলিমদের মধ্যে দেওয়ানী মোকদ্দমার বিচারে মুসলিম আইন ব্যবহৃত হইত ; সুতরাং হিন্দুগণ প্রচুর অসুবিধার সম্মুখীন হইত।[৩] তিনি আরও বলিয়াছেন যে, শুধুমাত্র আকবরের রাজত্বকাল ব্যতীত যখন রাজ্য শাসন কেন্দ্রীভূত করা হইয়াছিল, মোগল বিচার-ব্যবস্থা ছিল শিথিল এবং বিচারকগণ ব্যক্তিগত সমীকরণের দ্বারা পরিচালিত হইতেন।[৪]

কিন্তু আধুনিক ঐতিহাসিক শ্রীরাম শর্মা মোগল বিচার-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে উপরোক্ত সকল অভিযোগ খণ্ডন করিয়া স্পষ্টভাবে বলিয়াছেন যে, মোগল সম্রাটগণের নিরপেক্ষ, ন্যায়বিচার সম্পাদনের বোধশক্তির কোন অভাব ছিল না। জাতি-ধর্ম, উচ্চ-নীচ নির্বিশেষে নাগরিকবৃন্দের প্রত্যেকের প্রতি বিচারে কোন পক্ষপাতিত্ব বা অন্যায় না করা হয়, উহার প্রতি সম্রাটগণ সদাজাগ্রত ও সতর্ক ছিলেন। যাহাতে দরিদ্র প্রজাবৃন্দ ধনীদের অত্যাচার-উৎপীড়নের শিকারে পরিণত না হয়, ইহার প্রতি তাঁহারা তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিতেন। সরকারী কর্মকর্তাদের নির্যাতন হইতে সম্রাটগণ জনসাধারণকে রক্ষা করিতেন। জনগণের প্রতি অসদ্ব্যবহারে অভিযুক্ত সরকারী কর্মকর্তাগণকে তাঁহারা সমুচিত শাস্তি প্রদানে দ্বিধা করিতেন না।[৫]

---

১ সরকার : এম. অ্যাড্‌মিনিস্ট্রেশন, পৃঃ ১০৭।
২ পূর্বোক্ত, পৃঃ ১০৯-১১০।
৩ ইণ্ডিয়ান হিস্টরিক্যাল কোয়ার্টার্লি', ১৯০৭, পৃঃ ৩৭০।
৪ পূর্বোক্ত, পৃঃ ৩৭০।
৫ শর্মা : এম. গভর্নমেণ্ট, পৃঃ ২০৯।

আর একজন আধুনিক ইতিহাসবিদ, ইবনে হাসান মোগল বিচার-ব্যবস্থার ভূয়সী প্রশংসা করিয়া বলিয়াছেন যে, মোগলদের আইন ও বিচার পদ্ধতির প্রধান বৈশিষ্ট্যের অন্যতম ছিল প্রকট ন্যায়পরায়ণতা, কঠোর নিরপেক্ষতা ও আইনের চোখে সকলের সমতা।[১] বাবর হইতে শুরু করিয়া আওরঙ্গজেবের রাজত্বকালের শেষ অবধি, এমনকি ইহার আরও পরবর্তীকাল পর্যন্ত, নিরপেক্ষ ও ন্যায়বিচার সম্পাদনের জন্য এবং তাঁহাদের নির্মল মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য, মোগলরা খুবই হুশিয়ার ছিলেন। এমনকি একজন সাধারণ নাগরিকেরও সামান্যতম অভিযোগ সম্রাটের দৃষ্টি ও পূর্ণ মনোযোগ আকর্ষণ করিত। কাহারও অভিযোগের প্রতি কখনও অবহেলা প্রদর্শন করা হইত না। এই প্রসঙ্গে, মোগল সরকারী কর্মকর্তাগণের মধ্যে প্রায় সকলেই তাঁহাদের দায়িত্ব পালনে সজাগ থাকিতেন। অনেকের ধারণা, ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে ভারতে মোগল বিচার-ব্যবস্থা সম্ভবতঃ পৃথিবীতে সর্বোত্তম ছিল।[২]

মোগল বিচার-ব্যবস্থা মুসলিম আইন বিশেষজ্ঞদের দ্বারা বিশ্লেষিত এবং উত্তর-ভারতে দিল্লীর সুলতানদের দ্বারা প্রবর্তিত বিচার-ব্যবস্থারই অনুরূপ ছিল। আদালতের সংগঠন সম্পর্কে পূর্বে আলোচিত যদুনাথ সরকারের মন্তব্য ঘটনাবলীর দ্বারা প্রমাণিত হয় না। তিনি একদিকে বলিয়াছেন যে, নিয়মিত পর্যায়ক্রমে ধাপে ধাপে সর্বোচ্চ হইতে সর্বনিম্ন আদালত-সংগঠনের অভাব মোগল বিচার-ব্যবস্থার কাঠামোতে দেখা যায়।[৩] আবার তিনি পূর্বোক্ত মন্তব্যের বিপরীত মন্তব্য নিজেই করিয়াছেন যে, প্রত্যেক প্রাদেশিক রাজধানীতে প্রাদেশিক কাজী সাম্রাজ্যের কাজী-উল্-কুজ্জাত দ্বারা নিয়োজিত ছিলেন। তিনি আরও বলিয়াছেন যে, প্রত্যেক শহর ও এমনকি বড় বড় গ্রামেও স্থানীয় কাজী প্রধান কাজী দ্বারা নিয়োজিত থাকিতেন।[৪]

নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, নিয়মিত পর্যায়ক্রমে ধাপে ধাপে মোগল বিচার-ব্যবস্থার কাঠামোতে কাজীগণ নিযুক্ত ছিলেন। কেন্দ্রে ছিল রাজ-বিচারালয়, ইহার নিম্নে ছিল কাজী-উল্-কুজ্জাতের আদালত এবং ইহারও নিম্নে ছিল কাজীর আদালত। সুতরাং রাজধানীতে ছিল অভিযোগ পেশ করিবার জন্য

---

১ ইবনে হাসান : সেন্ট্রাল স্ট্রাক্চার, পৃঃ ৩২৩।
২ হুসাইনি : এম. অ্যাড্‌মিনিস্ট্রেশন., পৃঃ ১৯৯।
৩ সরকার : এম. অ্যাড্‌মিনিস্ট্রেশন., পৃঃ ১৯।
৪ পূর্বোক্ত, পৃঃ ২৭।

কাজীর সভাপতিত্বে একটি প্রাথমিক আদালত, কাজী উল্ কুজ্জাতের সভাপতিত্বে একটি আপীল আদালত অর্থাৎ পুনর্বিচারের মামলা শুনিবার ক্ষমতা-সম্পন্ন আদালত এবং সর্বোচ্চ রাজ-বিচারালয়।[১] প্রত্যেক প্রাদেশিক রাজধানীতে ছিল প্রাদেশিক কাজীর নেতৃত্বে একটি প্রাদেশিক আদালত (সুবা আদালত) এবং প্রত্যেক জিলা সদরে ছিল কাজীর সভাপতিত্বে একটি জিলা আদালত (সরকার আদালত)। মোগল শাসনের শেষদিকে, মহকুমাগুলির বেশীর ভাগ মহকুমাতে ছিল না'ইব-ই-কাজীর[২] সভাপতিত্বে অধীনস্থ আদালত (পরগণা আদালত)। মোগল সাম্রাজ্যে ভারতীয় গ্রামবাসিগণ সরকারী আদালতে তাহাদের দেওয়ানী মোকদ্দমা করিবার সুযোগ হইতে বঞ্চিত ছিল বলিয়া যদুনাথ সরকারের অভিযোগের[৩] পশ্চাতে কোন যুক্তি নাই, কারণ বস্তুতঃ-পক্ষে একজন গ্রামবাসী ইচ্ছা করিলে না'ইব-ই-কাজীর আদালতে মোকদ্দমা শুরু করিতে পারিত এবং ধাপে ধাপে ক্রমশঃ উচ্চ হইতে উচ্চতর বিচারালয়ে অর্থাৎ কাজীর আদালত ও কাজী-উল্-কুজ্জাতের আদালতের মাধ্যমে সর্বোচ্চ রাজ-বিচারালয়েও তাহার মোকদ্দমা পেশ করিতে পারিত।[৪]

মোগল আমলে বিচাব শাসন-ব্যবস্থাপনা বিস্তৃত ছিল। প্রত্যেক সুবায় বেশ কিছু সংখ্যক আদালত ছিল, যেমন প্রাথমিক ও আপীল, দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালত। আধুনিককালের মহকুমা হাকিম, ডেপুটি-ম্যাজিস্ট্রেট ও মুন্সেফের আদালতের অনুরূপ, মোগল আমলে প্রত্যেক মহকুমায় কাজী, সদর ও 'আদলের আদালত ছিল। আপীলের আদালত সাধারণতঃ সরকার-এ এবং প্রত্যেক সুবার রাজধানীর শহরে অবস্থিত ছিল।[৫]

মুসলিম আইন বিশেষজ্ঞগণ একমত যে, সম্রাট নিজে তাঁহার নিয়োজিত কাজীদের মাধ্যম ব্যতীত ব্যক্তিগতভাবে বিচার-ব্যবস্থা পরিচালনা করিতে পারিতেন।[৬] সম্রাট দেওয়ানী ও ফৌজদারী উভয় জাতীয় মামলা বিচার করিতেন এবং তাঁহার বিচারালয় অভিযোগ পেশ করিবার প্রাথমিক

১ ওয়াহিদ হুসেইন: অ্যাড্‌মিনিস্ট্রেশন্ অফ জাস্টিস্ ডিউরিং দি মুসলিম রুল ইন ইণ্ডিয়া, পৃ: ৩৮।

২ পূর্বোক্ত, পৃ: ৭০।

৩ সরকার: এম. অ্যাড্‌মিনিস্ট্রেশন্, পৃ: ১০৭-১১০।

৪ হুসাইনি: এম. অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, পৃ: ২০১।

৫ হুসেইন: অ্যাড্‌মিনিস্ট্রেশন্ অফ জাস্টিস্, পৃ: ৪৫-৪৬।

৬ ইবনে হাসান: সেণ্ট্রাল স্ট্রাক্চার, পৃ: ৩১৯।

আদালত ও আপীল আদালত দুইটাই ছিল। অবশ্য সম্রাট দেওয়ানীর তুলনায় ফৌজদারী বিচারই বেশী করিতেন। শুধু অত্যন্ত জটিল দেওয়ানী মোকদ্দমার বিচার তাঁহার নিকট পেশ করা হইত।

মোগল সম্রাটদের বিচারে ন্যায়পরায়ণতা, সততা, নিষ্ঠা ও নিরপেক্ষতার প্রশংসা করিয়া, মনসারেট্ বলিয়াছেন যে, সরকারের শাসন-ব্যবস্থায় সম্রাটের ছিল সততার প্রতি প্রবল অনুরাগ, ন্যায়বিচারের প্রতি অতীব নিষ্ঠা। প্রকৃতিগতভাবে সম্রাট ছিলেন দয়ালু, সদয় ও জনহিতৈষী। বিদ্বেষপরায়ণ না হইয়া কিংবা অনুচিত অনুকম্পা প্রদর্শন না করিয়া কাজীগণ যাহাতে অপরাধীকে যথার্থ শাস্তি প্রদান করে সেইদিকে সম্রাট তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিতেন।[১]

প্রধান কাজী ছিলেন সাম্রাজ্যের বিচার-ব্যবস্থার প্রধান কর্মকর্তা এবং তাঁহার আদালত কেন্দ্রে, রাজধানীতে, অবস্থিত ছিল। সম্রাট ব্যক্তিগতভাবে পরিচিত, জ্ঞানী-গুণী ও আইনে ব্যুৎপত্তি-সম্পন্ন ব্যক্তিকে প্রধান কাজীর পদে নিযুক্ত করিতেন। প্রধান কাজী তাঁহার পদ-মর্যাদা বলে সাম্রাজ্যের বিভিন্ন নিম্ন আদালতের কাজী নিয়োগ করিবার অধিকার লাভ করেন। সম্রাট প্রধান কাজীর বিচারের ক্ষমতায় হস্তক্ষেপ করিতে পারিতেন না।

সাম্রাজ্যের সদর বিভিন্ন নামে পরিচিত ছিলেন, যেমন সদর-উস্-সুদুর, সদর-ই-জাহান কিংবা সদর-ই-কুল।[২] বস্তুতঃপক্ষে, সদর ছিলেন একজন দেওয়ানী মোকদ্দমার বিচারক। তিনি ধর্ম-সংক্রান্ত বিষয়াদি তদারক করিতেন।

প্রাদেশিক সদরে নিযুক্ত সুবার কাজীর এখ্তিয়ার সমগ্র সুবার কাজীদের উপর বিস্তৃত ছিল। তিনি প্রদেশের সদরও ছিলেন এবং সুবার ধর্ম-সংক্রান্ত বিষয়াদি তদারক করিতেন।

সরকার কাজী অর্থাৎ জিলার কাজী জিলা আদালতে বিচার পরিচালনা ব্যতীত অধীনস্থ সহকারী নিয়োগ করিবার ক্ষমতাপ্রাপ্ত ছিলেন।

পরগণা আদালতে সভাপতিত্ব করিতেন পরগণা কাজী। স্বাভাবিকভাবেই তিনি দেওয়ানী ও ধর্ম-বিষয়ক ঘটনা তদন্ত ও মীমাংসা করিতেন। কিন্তু এখানে শিকদার কোতোয়ালের শাসন-সংক্রান্ত কাজ এবং ফৌজদারের পুলিশের কর্তব্য সম্পাদন করিতেন।[৩]

---

১ মান্সারেট : কমেন্ট্যারি, পৃ: ২০৮।

২ সদর-এর দপ্তরের বিস্তারিত কার্যাবলীর জন্য দ্রষ্টব্য—বদায়ূনী : মুন্তাখাব-উত-তাওয়ারিখ; সরকার : এম. অ্যাড্মিনিস্ট্রেশন্, পৃ: ২৫।

৩ শরণ : প্রভিনশিয়েল গভর্ণমেন্ট, পৃ: ৩৫৬।

উপরোক্ত বিভিন্ন পর্যায়ের সকল কাজীকে নিয়োজিত হইবার পর, আদালতের সরকারী কাগজ-পত্র ও বিচারের রায়ের রেজিস্ট্রারী বই ইত্যাদির দায়িত্ব-ভার গ্রহণ করিতে হইত।[১] কাজী বিচারক ব্যতীত, তিনি তাঁহার স্বীয় অধিক্ষেত্রে সকল ওয়াকফ্ সম্পত্তির তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন।[২]

আদালতে বিচার ব্যবস্থায় মুফ্তির অস্তিত্ব বাধ্যতামূলক ছিল বলিয়া মনে হয় না।[৩] মুফ্তি বিচার-ব্যবস্থার একজন নিয়মিত কর্মকর্তা ছিলেন না।[৪] যদি কাজীর 'ফতোয়াহ্' (আইনের প্রকৃত ব্যাখ্যা) দিবার সামর্থ্য থাকিত, তবে তিনি নিজেই বিচারে মীমাংসা করিতে পারিতেন; অন্যথায় তাঁহাকে মুফ্তির নিকট আইনের বিশ্লেষণের জন্য ঘটনাটি প্রেরণ করিতে হইত এবং মুফ্তির প্রদত্ত 'ফতোয়াহ্' গ্রহণ করিতে হইত।

ভারতে মুসলিম বিচার-ব্যবস্থায় মীর'আদল পদটি নূতনত্ব বহন করে। মুসলিম সাম্রাজ্যের কোথায়ও উক্ত পদে অধিষ্ঠিত কর্মকর্তা পরিচিত ছিল না। মীর'আদল পদ ও তাঁহার কর্তব্যাদি নির্ণয় সম্পূর্ণরূপে মোগলদের সৃষ্টি।[৫] আবদুল্লাহ্র রচিত তারিখ-ই-দাউদীতে জানা যায় যে, কাজী বা মীর'আদলের সভাপতিত্বে শেরশাহের আমলে আদালত ছিল।

মোগল আমলে আকবরের শাসনকালেও, কাজীকে বিচার পরিচালনায় সাহায্য করিবার জন্য মীর'আদল নিযুক্ত করা হইত। কাজী সমস্ত বিচার-ব্যবস্থাপনায় অসমর্থ হইলে, মীর'আদল কাজীর কর্তব্য ও দায়িত্ব পালন করিতেন।[৬]

সামরিক বাহিনীর জন্য কাজী-ই- 'আস্কার[৭] নামে পৃথক কাজী ছিলেন। মুসলিম শাসন-ব্যবস্থায় সৈন্যবাহিনীর সহিত কাজীকে প্রেরণ করিবার রীতি

---

১ কাজীদের কর্তব্য ও দায়িত্বের বিস্তারিত বিবরণের জন্য বিশেষ দ্রষ্টব্য--আইন, দ্বিতীয় খণ্ড, দ্বিতীয় অধ্যায়, পৃ: ৪১।

২ ইবনে হাসান: সেণ্ট্রাল স্ট্রাক্চার, পৃ. ৩১২।

৩ পূর্বোক্ত, পৃ: ৩১৪।

৪ মুসলিম খেলাফতেও মুফ্তি বৈধ স্বীকৃতি লাভ করে নাই।--দ্রষ্টব্য—ভন্‌ক্রিমার, পৃ: ২৮৪।

৫ শরণ: প্রভিনশিয়েল গভর্নমেণ্ট, পৃ: ৩৪৭।

৬ পূর্বোক্ত, পৃ: ৩৫৬।

৭ ওসমানী সাম্রাজ্যেও কাজী-ই-আসকার ছিল।—এন্‌সাইক্লোপীডিয়া অফ ইসলাম, দ্বিতীয়, পৃ: ৮৩৮।

পুরাতন। সামরিক কাজীর এখ্‌তিয়ার শুধু সামরিক শিবিরে সীমাবদ্ধ ছিল।[১] সম্রাট কাজী-ই-'আস্‌কারকে নিযুক্ত করিতেন। আকবরের শাসন আমলে কাজী তাওয়াইস (১৫৬৭), কাজী ইয়াকুব (১৫৬৭—৭৭) ও কাজী জালাল (১৫৭৭) তিনজন কাজী-ই-আসকারের দায়িত্ব পালন করেন।[২]

দীর্ঘ অভিজ্ঞতা অর্জনের মাধ্যমে মুসলিমরা আদালতে দেওয়ানী ও ফৌজদারী মোকদ্দমা বিচারের বিস্তারিত কার্য প্রণালী উদ্ভব করিতে সক্ষম হয়। মোগল সাম্রাজ্যের বিচারকগণ মুসলিমদের প্রচলিত বিচারের নিয়ম-পদ্ধতি ও কার্য-প্রণালী অনুসরণ করেন।

মুসলিমবিশ্বে প্রাথমিক যুগে খোলা স্থান আদালতরূপে ব্যবহার করা হইত এবং মস্‌জিদে বিচার সম্পাদন করা অধিক বাঞ্ছনীয় বিবেচিত হইত। বারনীর মতে, দিল্লী সুলতানী আমলে আলাউদ্দীন খল্‌জীর রাজত্বকালে কাজীর বিচার মস্‌জিদে অনুষ্ঠিত হইত। কিন্তু মোগল শাসনকালে কাজীগণ সরকারী ভবনে বিচারালয়ের কাজ সমাধান করিতেন এবং কাজীদের বাসস্থানে বিচার করা নিষিদ্ধ ছিল।[৩]

রাজদরবারে মোগল সম্রাটগণ কিভাবে কি প্রণালীতে বিচার সম্পাদন করিতেন, উহার বিস্তারিত বর্ণনা ইউরোপীয় পর্যটক উইলিয়াম ফিঞ্চ, টেরী, বার্নিয়ার ও মানুচীর ভ্রমণকাহিনীতে পাওয়া যায়।[৪] রাজ-বিচারালয়ে সাক্ষ্য-প্রমাণ লিপিবদ্ধ করিবার জন্য 'কাতিব' অর্থাৎ লেখক এবং সম্রাট যদি বাদী-বিবাদীর কোন পক্ষের কিংবা সাক্ষীর ভাষা না জানিতেন, তাহা হইলে উহার অনুবাদ ও বিশদ ব্যাখ্যা করিবার জন্য অনুবাদকারী ও ব্যাখ্যাকারী নিযুক্ত ছিল।[৫]

বাদীর অভিযোগ আদালতে পেশ হইলে কাতিবগণ নির্ধারিত ফরমে বাদীর অভিযোগের সবিশেষ বর্ণনা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে লিপিবদ্ধ করিতেন। নিরপেক্ষনীতি অবলম্বন করিয়া, উচ্চ-নীচ, ধনী-দরিদ্র বিবেচনা না করিয়া, আইনের

---

১ ইবনে হাসান : সেন্ট্রাল স্ট্রাকচার পৃঃ ৩৩১-৩১২ : হুসাইনি : এম. অ্যাডমি নিস্ট্রেশন, পৃঃ ২০৩।
২ শরণ : প্রভিনশিয়েল গভর্নমেন্ট, পৃঃ ৩৫০।
৩ ইবনে হাসান : সেন্ট্রাল স্ট্রাক্চার, পৃঃ ৩১২ পাদটীকা।
৪ সরকার : এম. অ্যাড্‌মিনিস্ট্রেশন্‌, পৃঃ ১১২-১১৩।
৫ ইবনে হাসান : সেন্ট্রাল স্ট্রাক্চার, : পৃঃ ৩১২-৩১৩

চোখে সকলেই সমান[1] ভাবিয়া, বাদী-বিবাদী উভয় পক্ষকে আদালতে হাজির হইবার 'সমন' (আদেশপত্র) জারি করা হইত। উভয় পক্ষ কিংবা তাহাদের নিযুক্ত উকিলদের উপস্থিতিতে বিচার-বিষয় নির্ধারিত হইত এবং বিবাদকারী উভয় পক্ষকেই সাক্ষ্য-প্রমাণাদি পেশ করিতে হইত। শুনানীর সমাপ্তি হইলে, বিচারক অন্যান্য সূত্রের মাধ্যমে বিষয়টি অনুসন্ধান করিতে আরও কিছু সময় নিতেন এবং ইহার পর সিদ্ধান্তে উপনীত হইতেন।

বাদীকে তাহার ঘটনা প্রমাণ করিবার জন্য অন্ততঃপক্ষে দুইজন বিশ্বাস-যোগ্য সাক্ষীকে আদালতে হাজির করিতে হইত। কয়েক ধরনের লোককে সাক্ষী হিসাবে নির্ভরযোগ্য নহে বলিয়া, তাহাদের সাক্ষ্য প্রদান আদালতে গৃহীত হইত না। সাক্ষীদের শুনানী ও দলিল-পত্র, প্রমাণাদির পরীক্ষা-নিরীক্ষার অতিরিক্ত, নির্ভুল সত্য নির্ধারণের জন্য বিচারক বেসরকারী অনুসন্ধান ও তদন্ত করিতেন। সত্য ঘটনা উদ্‌ঘাটনের উপর বিচারের সিদ্ধান্ত নির্ভর করিত। কাজীর বেসরকারী তদন্ত মামলার বিচারের রায় প্রদানে এক বিশেষ ভূমিকা পালন করিত।

অপরাধ সম্পর্কে[2] মুসলিমদের ধারণা ও অপরাধের শ্রেণী বিন্যাস ঃ মুসলিমদের ধারণা যাহা মোগলরাও পোষণ করিত, সেই অনুযায়ী সকল অপরাধকে তিন পর্যায়ে[3] বিভক্ত করা যায় ঃ

(ক) সৃষ্টিকর্তার বিরুদ্ধে অপরাধ, (খ) রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অপরাধ, (গ) মানুষের বিরুদ্ধে অপরাধ।

(ক) সৃষ্টিকর্তার বিরুদ্ধে অপরাধে শাস্তি দিবার অধিকার ও ক্ষমতা শুধু সৃষ্টিকর্তারই আছে; ইহাকে বলা হয় 'আল্-হাদ্'।[4] সম্রাট কিংবা কাজী

---

১ রাজাও যদি কোন ঘটনায় বাদী বা বিবাদী থাকিতেন, তাঁহাকেও কাজীর বিচারালয়ে কোন পৃথক সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হইত না। তাঁহার জন্যও বিচারে একই ব্যবস্থা ছিল।—সুলুক-উল্-মুলুক (ফার্সী পাণ্ডুলিপি, ৩০)
মোগল আমলে কোন সম্রাট ঘটনায় জড়িত হইয়া কাজীর আদালতে হাজির হইয়াছে এইরকম নিদর্শন পাওয়া যায় না।—ইবনে হাসান: সেন্ট্রাল স্ট্রাক্‌চার, পৃঃ ৩১৩ পাদটীকা।

২ মোগল সাম্রাজ্যে অপরাধ, বিচার ও শাস্তি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য—যদুনাথ সরকার: 'ক্রিমিন্যাল ল অ্যাণ্ড জাস্টিস্ ইন্ দি মোগল এম্পায়ার,—মডান', রিভিউ, ১৯২২, পঞ্চম, ৪ নং, অক্টোবর, পৃঃ ৪২৫—৪৩২।

৩ বিভিন্ন ধরনের অপরাধ ও শাস্তির বিস্তারিত বর্ণনা পাওয়া যায়—ড্যাভী: ইন্‌স্টিটিউট্ অফ টাইমুর, পৃঃ ২৫১-২৫৩।

৪ সরকার: এম. অ্যাড্‌মিনিস্ট্রেশন, পৃঃ ১২৬-১২৭; হুসাইনি: এম. অ্যাড্‌মিনিস্ট্রেশন, পৃঃ ২০৪-২০৫

কোন মানবশক্তিই আল্-হাদের আওতাধীনের অপরাধ ক্ষমা করিতে পারে না। ইচ্ছা করিলে সৃষ্টিকর্তাই শুধু উক্ত অপরাধ ক্ষমা করিতে পারেন। আল-হাদ্ এর অধীনে বিভিন্ন শাস্তির[১] ব্যবস্থা রহিয়াছে, যেমন জিনা অর্থাৎ বিবাহিত ব্যক্তির ব্যভিচার-সম্বন্ধীয় অপরাধে প্রস্তর নিক্ষেপ করিয়া মৃত্যু; অবিবাহিত স্ত্রী-পুরুষের ব্যভিচারের অপরাধে একশত বেত মারা; বিবাহিত স্ত্রী-পুরুষের ব্যভিচারের মিথ্যা অভিযোগে আশিটি বেত্রাঘাত; 'ইরতিদাদ্' অর্থাৎ স্বধর্ম ত্যাগের অপরাধে মৃত্যুদণ্ড।[২]

(খ) রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অপরাধের মধ্যে রাজবিদ্রোহ, জনগণের সম্পদের তহ্বিল তছরূপ, গচ্ছিত ধন অন্যায়ভাবে আত্মসাৎকরণ, 'কাতায়ুত তারিক' অর্থাৎ ডাকাতি[৩], 'সরিকাহ্' অর্থাৎ দস্যুবৃত্তি অন্তর্ভুক্ত ছিল। উক্ত অপরাধ সম্রাট ক্ষমা কবিতে পারিতেন।

(গ) মানুষের বিরুদ্ধে অপবাধে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে ক্ষমা প্রদর্শনের ক্ষমতা কাহারও নাই—ইহা শুধু ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির ক্ষমতার আওতাধীন—ইহাকে বলা হয় 'আল্-কিসাস্'। হত্যা, আঘাত, ক্ষতি, অপমান ইত্যাদি মানুষের বিরুদ্ধে অপরাধেব অন্তর্গত ছিল। শুধু ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষেরই হত্যাকারীকে শাস্তি প্রদানের কিংবা শর্তহীনভাবে মুক্তি প্রদানেব অধিকাব ছিল। এমনকি সম্রাটও হত্যাকারীকে ক্ষমা করিতে পারিতেন না।

অপরাধ করিরার পর দোষীকে শাস্তি প্রদানের অপেক্ষা অপরাধ নিবারণ, প্রতিরোধের উপর মোগলরা অধিক গুরুত্ব আরোপ করে। দোষের জন্য শাস্তি প্রদান করিবার অপেক্ষা, বিচার-পদ্ধতির লক্ষ্য ছিল অধিক প্রতিরোধমূলক।[৪]

---

১ মুসলিম আইনে অনুমোদিত বিভিন্ন শাস্তির বিস্তারিত আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য--এনসাইক্লোপীডিয়া অফ ইসলাম, প্রথম, পৃ: ১২৩; হ্যামিলটন: হিদাযাহ, পৃ: ১৭৫-১৯৬; টি. পি. হুজেস্: ডিকশন্যারি অফ ইসলাম, ১৫৩।

২ সরকার: এম. অ্যাড্মিনিস্ট্রেশন পৃ: ১২৬-১২৭।

৩ বৈধভাবে রাজপথে ডাকাতির অপরাধে শুধুমাত্র কাজী মৃত্যুদণ্ড প্রদান করিতে পারিতেন, রাজা কিংবা তাঁহার অন্য কোন রাজকর্মকর্তা উক্ত শাস্তি দিতে পারিতেন না।—সরকার: এম. অ্যাড্মিনিস্ট্রেশন, পৃ: ১১২; আওরঙ্গজেব সিংহাসনে আরোহণ করিবার পর পরই, সকল আইনভঙ্গকারীদের হুশিয়ারী স্বরূপ, 'পাঁচশত ডাকাতের শিরচ্ছেদ করেন'।—মানুচী: স্তোরিয়া দ্যা মোগোর, দ্বিতীয়, পৃ: ৪৭। কিন্তু এই ঘটনার পর শীঘ্রই সম্রাট তাঁহার ক্ষমতা সম্পর্কে তাঁহার অভিমত পরিবর্তন করেন এবং কোর-আন শরীফের আইনানুযায়ী, তিনি তাঁহার কার্যাবলী নিয়ন্ত্রণ করেন।—হুসাইনি: এম. অ্যাড্মিনিস্ট্রেশন্, পৃ: ২০৪।

৪ হুসাইনি: এম. অ্যাড্মিনিস্ট্রেশন পৃ: ২০৫-২০৬।

মুহ্‌তাসিব ও তাঁহার অধীনস্থ কর্মচারীবৃন্দ স্রষ্টিকর্তার বিরুদ্ধে অপরাধ করিতে সবাইকে বাধা দিতেন এবং কোতোয়াল ও তাঁহার অধীনস্থ কর্মচারিগণ রাষ্ট্র ও মানুষেব বিরুদ্ধে অপরাধ প্রতিরোধ করিতে সচেষ্ট থাকিতেন।

ইসলামী আইন অনুযায়ী চারি ধরনের[১] শাস্তি ছিল, যেমন (ক) 'কেসাস্' অর্থাৎ প্রতিশোধ গ্রহণ মারাত্মক নহে এমন ধরনের আহত, জখম ইত্যাদি ঘটনায় প্রযোজ্য; (খ) 'দিয়াৎ' অথবা 'আকল্' নরহত্যাকারী দ্বারা ক্ষতিপূরণ প্রদান কিংবা হত্যাপণ; (গ) 'হদ্' অর্থাৎ ইসলামী আইন-কানুনু দ্বারা নির্ধারিত শাস্তি প্রদান—ইহা স্রষ্টিকর্তার অধিকাররূপে বিবেচিত হয় এবং কোন মানব শক্তি ইহার রদ-বদল করিতে অক্ষম। উক্ত শাস্তি নারী-পুরুষের ব্যভিচার, অবৈধ মিলনের অপরাধের জন্য প্রযোজ্য। (ঘ) 'তাজির'—ইহা বিবেচনামূলক শাস্তি প্রদান; ইহা সম্পূর্ণরূপে কাজীর বিবেচনাধীন। ইহাতে শাস্তির মাত্রায় তারতম্য ঘটিতে পারে। অপরাধীকে সংশোধিত হইবার সুযোগ দেওয়া হইতেছে এই ধরনের শাস্তির উদ্দেশ্য।

'হিদায়াহ' অনুযায়ী কেবলমাত্র তিন ধরনের[২] অপরাধের জন্য মৃত্যুদণ্ড প্রদানের নিয়ম ছিল, যেমন স্বধর্ম ত্যাগ, বিবাহের পর অসতীত্ব, ব্যভিচার ও হত্যা। বিরাট দেশ ভারতে তুলনামূলকভাবে চূড়ান্ত শাস্তি মৃত্যুদণ্ড প্রদানের দৃষ্টান্ত কম ছিল, কারণ সাধারণতঃ ভারতীয় জনগণের অভিমত ছিল মৃত্যুদণ্ড প্রদানের বিরুদ্ধে।

প্রাণদণ্ডের পদ্ধতিতে সর্বদা ইসলামী আইন পালন করা হয় নাই বলিয়া মনে হয়। একজন নিষ্ঠাবান পর্যবেক্ষক ও প্রকৃত লেখকরূপে মনসারেট বলিয়াছেন যে, যাহারা চূড়ান্ত অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হইত, তাহাদিগকে হাতীর পায়ে পিষিয়া, শূলে দিয়া কিংবা ফাঁসি দিয়া হত্যা করা হইত। যাহারা স্ত্রীলোকের সতীত্ব বিসর্জন দিতে প্ররোচিত করে কিংবা পাপের পথে প্রলুব্ধ করে, উক্ত অপরাধীদিগকে এবং পরস্ত্রীগামী-ব্যভিচারীদিগকে গলা

---

১ ইবনে হাসান: সেন্ট্রাল স্ট্রাক্‌চার, পৃ: ৩২৮-৩২৯; শরণ: প্রভিনশিয়েল গভর্নমেণ্ট, পৃ: ৩৮০; সরকার: এম, অ্যাড্‌মিনিস্ট্রেশন, পৃ: ১২৬-১২৭।

২ মুহম্মদ-বিন-তুঘলকের প্রশ্নের জবাবে বারনী সাত ধরনের মারাত্মক অপরাধের উল্লেখ করেন। উপরোক্ত তিন ধরনের অপরাধ ব্যতীতও, আরও চারিটি অপরাধ যথা, রাজদ্রোহ, প্রকাশ্য বিদ্রোহ, রাজার শত্রুকে জনশক্তি, অস্ত্রশক্তি ও সংবাদ সরবরাহ করিয়া সহযোগিতা ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত।—বারনী: ফিরোজশাহী, পৃ: ৫১০-৫১১; হিদায়াহ, পৃ; ১৭৮; ইবনে হাসান: সেন্ট্রাল স্ট্রাক্‌চার, পৃ: ৩৩১-৩৩২।

টিপিয়া শ্বাসরোধ করিয়া কিংবা ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলাইয়া হত্যা করা হইত।[১] আকবরের আদেশে দুশ্চরিত্র, লম্পট ব্যবসা-সংক্রান্ত প্রধান কর্মকর্তাকে একটি ব্রাহ্মণ কন্যার প্রতি ব্যভিচারের চূড়ান্ত অপরাধের জন্য, অনুশোচনাশূন্য নিষ্ঠুর ভাবে গলা টিপিয়া শ্বাসরোধ করিয়া হত্যা করা হইয়াছিল।[২]

মোগল আমলে সম্রাটগণ কর্তৃক পঁচিশটি মৃত্যুদণ্ড প্রদানের দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা যায়। তন্মধ্যে আকবরের সময় তেরটি, জাহাঙ্গীরের সময় এগারটি এবং শাহজাহানের সময় একটি প্রাণদণ্ডের আদেশ দেওয়া হইয়াছিল। বিভিন্ন খাতে মারাত্মক অপরাধ ও প্রাণদণ্ডের তালিকা[৩] নিম্নে প্রদত্ত হইল:

হত্যা—	১১
প্রকাশ্য বিদ্রোহ—	৭
রাজ কোষাগারে চুরি—	১
রাজপথে ডাকাতি—	১
হুকুম ব্যতিরেক সৈন্যগণ কর্তৃক শত্রু ছাউনী লুণ্ঠন—	১
বিবাহিত ব্যক্তির দ্বারা ব্যভিচার—	১
শিক্‌দার দ্বারা রায়তগণকে অত্যাচার, উৎপীড়ন—	১
রাজ শিকারে একজন 'জিলাওদার' কর্তৃক প্রতিবন্ধক সৃষ্টি—	১
(শাহজাহানের রাজত্বকালের চতুর্থ বৎসরে) দুর্ভিক্ষের সময় ছাগলের মাংস বলিয়া কুকুরের মাংস বিক্রি—	১
মোট	২৫

উল্লিখিত অপরাধে দোষী সাব্যস্ত পঁচিশ জনের প্রাণদণ্ডের মধ্যে পাঁচ-জনকে হাতীর পায়ে পিষিয়া,[৪] একজনকে গলা টিপিয়া শ্বাসরোধ করিয়া এবং বাকী উনিশ জনকে শিরচ্ছেদন করিয়া, কিংবা ফাঁসি দিয়া হত্যা করা হয়।[৫]

---

১ মন্‌সারেট্‌: কমেন্‌ট্যারি, পৃ: ২১০।

২ বদায়ূনী: মুন্‌তাখাব-উত্‌-তাওয়ারিখ্‌, দ্বিতীয়, পৃ: ১২৪।

৩ ইবনে হাসান: সেণ্ট্রাল স্ট্রাক্‌চার্‌, পৃ: ৩৩১-৩৩২।

৪ মনসারেট: কমেনটারী, পৃ: ৮৫-৮৭।

মারাত্মক অপরাধীদিগকে পায়ের তলায় পিষিয়া মারিবার জন্য হস্তীর প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা ছিল।—ইবনে হাসান: সেণ্ট্রাল স্ট্রাক্‌চার, পৃ: ৩৩২ পাদটীকা।

৫ এডওয়ার্ড টেরী বলিয়াছেন যে, চূড়ান্ত অপরাধীকে হত্যা করিবার জন্য কুকুর ও সাপ পোষার ব্যবস্থা ছিল।—এডওয়ার্ড টেরী: আর্লী ট্রাভেলস্‌ ইন ইণ্ডিয়া (১৬১৫-১৬২৮) (স্যার ডাবলুইউ ফোস্‌টার কর্তৃক সম্পাদিত, অক্সফোর্ড, ১৯২১), পৃ: ২৮৮।

কিন্তু ইবনে হাসান বলেন যে কুকুর কিংবা সাপ ব্যবহার করিয়া মৃত্যুদণ্ড প্রদানের কোন ঘটনা তাহার জানা নাই। তিনি অবশ্য আরও বলেন যে, রাজকীয় শিকারের উদ্দেশ্যে কুকুর পোষার ব্যবস্থা ছিল।—ইবনে হাসান: সেণ্ট্রাল স্ট্রাক্‌চার্‌, ৩৩২ পাদটীকা।

অন্যান্য ধরনের শাস্তি প্রদানের অন্যতম ছিল জরিমানা, সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত-করণ, পদ-মর্যাদা, উপাধি বঞ্চিতকরণ, কারাবাস, নির্বাসন, চাবুক মারা, বেত্রাঘাত অঙ্গছেদন, অন্ধকরণ ইত্যাদি। কারাবাস দণ্ডের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল যে, কারাবাসের কোন সময় নির্দিষ্ট ছিল না। কারাবাস দণ্ড প্রদানের উদ্দেশ্য ছিল অপরাধীকে আটক রাখা ও সংশোধনের সুযোগ দেওয়া।[১] মনসারেট অঙ্গছেদন দণ্ডের কোন উল্লেখ করেন নাই। তিনি বলিয়াছেন যে, অঙ্গ-ছেদন করিবার যন্ত্র সত্যিকারে ব্যবহার করার অপেক্ষা, অপরাধীর মনে উহা দ্বারা ভয়-ভীতি, আতঙ্ক সৃষ্টি করাই ছিল ইহার উদ্দেশ্য।[২] জাহাঙ্গীর সিংহাসনে আরোহণ করিয়া, একটি ফরমান জারির মাধ্যমে, কোন ব্যক্তির নাক বা কান কাটিয়া ফেলা অর্থাৎ অঙ্গছেদনের দ্বারা শাস্তি প্রদান নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। তাঁহার রাজত্বকালের ষষ্ঠ বৎসরে আর একটি ফরমান জারি করিয়া প্রদেশের গভর্নর কর্তৃক কাহাকেও অন্ধকরণের দ্বারা শাস্তি প্রদান নিষিদ্ধ করেন।[৩]

আপীল অর্থাৎ পুনর্বিচার প্রার্থনা করিবার জন্য কোন নির্দিষ্ট আইন-ছিল না কিংবা আপীলের সনির্বন্ধ অনুরোধ করিবার জন্য বিভিন্ন পর্যায়েরও কোন আদালত ছিল না।[৪] কিন্তু প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী, আপীলের আবেদন করিবার ব্যবস্থা ছিল। যেখানে প্রথম বিচার অনুষ্ঠিত হইয়াছিল সেই নিম্ন আদালত হইতে ক্রমশঃ উচ্চ আদালতে এবং অবশেষে স্বয়ং সম্রাটের নিকটও আপীল পেশ করিবার রীতি প্রচলিত ছিল। প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট উভয় পক্ষেরই সম্রাটের নিকট সরাসরি দেওয়ানী মোকদ্দমা পেশ করিবার অধিকার ছিল কিংবা তাহারা কাজীর বিচারের রায়ের বিরুদ্ধে, সম্রাটের নিকট আপীলও করিতে পারিত। একইভাবে, ফৌজদারী মোকদ্দমায়ও অভিযুক্ত ব্যক্তির আপীল করিবার অধিকার ছিল এবং বিচারকও বিচারের যে-কোন স্তরে ইচ্ছা করিলে, সম্রাটের নিকট মোকদ্দমার চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের জন্য উহা প্রেরণ করিতে পারিতেন।[৫]

---

১ ইবনে হাসান: সেন্ট্রাল্ স্ট্রাক্চার্, পৃ: ৩৩৬-৩৩৭।
২ মনসারেট্: কমেন্ট্যারি, পৃ: ২১১; ইবনে হাসান: সেন্ট্রাল্ স্ট্রাক্চার্, পৃ: ৩৩৩-৩৩৪।
৩ তুজুক-ই-জাহাঙ্গীরী, পৃ: ২০৫।
৪ হুসাইনি: এম. অ্যাড্মিনিস্ট্রেশন্, পৃ: ২০৭।
৫ ইবনে হাসান: সেন্ট্রাল্ স্ট্রাক্চার্, পৃ: ৩২০।

বিচারকার্য দ্রুত সম্পাদন করা মোগল শাসন-ব্যবস্থার একটি প্রধান সুস্পষ্ট বৈশিষ্ট্য ছিল। বিচারের বিশেষ কার্য-প্রণালীর দ্বারাই মোকদ্দমার দ্রুত নিষ্পত্তি সম্ভবপর ছিল। দেওয়ানী ও ফৌজদারী ছোট ছোট মোকদ্দমার অধিকাংশই গ্রাম্য পঞ্চায়েতে প্রথম মীমাংসিত হইত এবং কিছু মামলা-মোকদ্দমা জিলা বিচারকগণ নিষ্পত্তি করিতেন। ইহার ফলে, প্রাদেশিক আদালত ও রাজবিদারালয়ে প্রেরিত মোকদ্দমার সংখ্যা কম ছিল। বিচার-সম্পাদন ত্বরান্বিতকরণে সাহায্য করিতে উহা ছিল একটি অন্যতম কারণ। আদালতে মামলা দায়ের করিবার পদ্ধতিতে এবং বিচারের কার্য-প্রণালীতে কোন জটিলতা ছিল না কিংবা আইন কৌশলীগণ বৃথা তর্কবিতর্ক করিয়া বিচার-সম্পাদন অহেতুক বিলম্বিত করিতে পারিতেন না। কোন কোন লেখকের ধারণা যে, মোগল বিচার-পদ্ধতি ছিল খুবই হঠকারী এবং তাহারা উক্ত পদ্ধতিকে একটি 'স্থূল ও অপরিণামদর্শী ধরনের' ব্যবস্থাপনা বলিয়া আখ্যায়িত করেন।[১] কিন্তু নিরপেক্ষভাবে বলা যাইতে পারে যে, আদালতের স্বাভাবিক কার্য-প্রণালীতে কোন অহেতুক হঠকারিতা ছিল না।[২]

কঠিন মোকদ্দমা সম্রাটের নিকট উপস্থিত হইলে, তিনি সত্য অনুসন্ধান ও তদন্তের জন্য বিচার-কমিশন নিয়োগ করিতেন। দুই প্রকারের বিচার-কমিটি ছিল, যথা, স্থায়ী কমিটি ও বিশেষ কমিটি। বিচার ত্বরান্বিত করিবার উদ্দেশ্যে, বিলম্বিত বিচার সম্পাদনের দুর্দশা হইতে জনসাধারণকে রক্ষা করিবার জন্য এবং বিচার-ব্যবস্থায় সাধারণ অগ্রগতি আনিবার প্রচেষ্টায়, আকবর ১৫৮৫ খ্রীস্টাব্দে একটি স্থায়ী বিচার-কমিটি গঠন করেন।[৩] বিশেষ বিশেষ মোকদ্দমার অনুসন্ধান করিবার জন্য সকল মোগল শাসকই বিশেষ কমিশন নিয়োগ করেন।

মোগল সম্রাটগণ নিরপেক্ষ ও ন্যায়বিচার করিতেন এবং আবুল ফজল যথার্থভাবে দাবি করিয়াছেন যে, আকবরের বিচারে আত্মীয়-স্বজন, পরিচিত-অপরিচিত ও ধনী-দরিদ্রের মধ্যে কোন পার্থক্য ছিল না।[৪] জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলই আইন ও বিচারকের চোখে সমান ছিল।

---

১ শরণ: প্রভিনশিয়েল গভর্নমেণ্ট, পৃঃ ৩৭৫।
২ পূর্বোক্ত, পৃঃ ৩৭৫।
৩ পূর্বোক্ত, পৃঃ ৩৭৭; হুসাইনী: এম. অ্যাড্‌মিনিস্ট্রেশন্‌. পৃঃ ২০৮।
৪ আকবর-নামা, পৃঃ ৬৯ (বেভেরিজ., পৃঃ ৩৮৭)।

সম্রাটগণ ন্যায়বিচারের আদর্শ অনুযায়ী বিচার-কার্য পরিচালনা করিতে চেষ্টা করিতেন এবং তাঁহাদের প্রচেষ্টায় পরিণামদর্শিতা, বিচক্ষণতা ও অন্তর্দৃষ্টির ছাপ স্পষ্ট পরিলক্ষিত হয়।

সম্রাট কর্তৃক অপরাধীকে কঠিনতম শাস্তি প্রদানের পথে উচ্চ পদ-মর্যাদার বিবেচনা, এমনকি রাজ-আত্মীয়তার সম্পর্কও কোন প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করিতে পারিত না। কোন মিথ্যা মর্যাদার ধারণা, অহমিকা ন্যায়বিচার ব্যর্থ করিতে এবং শাসকের সুনাম কলঙ্কিত করিতে পারিত না। জনগণের মনে দৃঢ় বিশ্বাস ও আস্থা সৃষ্টির মাধ্যমে মোগলদের মর্যাদা নিহিত ছিল—কোন ভীতি-সন্ত্রাস সৃষ্টির মধ্যে নহে। বস্তুতঃ পক্ষে, যদি কোন একজন দায়িত্বশীল কর্মকর্তা জনগণের সহিত আচার-ব্যবহারে অত্যাচার, উৎপীড়ন কিংবা অন্যায়ের অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত হইতেন, সম্রাট নিয়ত একরূপেই অপরাধীকে দৃষ্টান্ত মূলক ও নিবর্তক শাস্তি প্রদান করিতেন।[১]

মুসলিম আইন অনুযায়ী, মুহ্‌তাসিব অর্থাৎ নৈতিক উপদেশদানকারী, সামাজিক ও নৈতিক আচার-পদ্ধতির সমালোচক, পরিদর্শক নিযুক্ত করা সম্রাটেরই অন্যতম কর্তব্য ছিল। মুহ্‌তাসিব জনসাধারণের জীবন-যাত্রা 'ধর্মশাস্ত্র-সম্বন্ধীয় আইন' দ্বারা নিয়ন্ত্রণ করিতেন।[২] আল্‌-মাওয়ার্দীর গ্রন্থে মুহ্‌তাসিবের বিবিধ কর্তব্য ও দায়িত্বের বিস্তারিত আলোচনা পাওয়া যায়।[৩] মুহ্‌তাসিবের প্রধান দায়িত্ব ছিল নবীর আদেশ-নির্দেশ বলবৎ করা। সুরাসার, মদ্যপান, ভাং-গাঁজা খাওয়া ও অন্যান্য মাদক-দ্রব্য গ্রহণ, জুয়া খেলা, নানাবিধ ব্যভিচার, নবী কর্তৃক ঘোষিত নিষিদ্ধ কাজ-কর্মে জনগণ যাহাতে লিপ্ত না হয়, সেইদিকে সজাগ দৃষ্টি রাখা এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা ছিল মুহ্‌তাসিবের প্রধান কর্তব্যাদির অন্যতম। কেহ নবীর বিরুদ্ধে কোন অকথ্য নিন্দা না করে এবং মুসলিমগণ যাহাতে নামাজ পড়িতে ও পবিত্র রমজান মাসে রোজা রাখিতে অবহেলা প্রদর্শন না করে, সেইদিকে মুহ্‌তাসিবকে কড়া নজর রাখিতে হইত।

---

১ শরণ : প্রভিনশিয়েল গভর্নমেন্ট, পৃঃ ৩৬৭-৩৬৮।

২ সরকার : এম. অ্যাড্‌মিনিস্ট্রেশন্‌, পৃঃ ২৯। যদুনাথ সরকার মন্তব্য করিয়াছেন যে 'নব-নির্মিত মন্দির ভাঙ্গিয়া ফেলা মুহ্‌তাসিবের কর্তব্যের অন্যতম ছিল'।—সরকার : আওরঙ্গজেব, তৃতীয় খণ্ড, পৃঃ ৯৩-৯৪, ৩২৩। তবে উক্ত মন্তব্য অন্য কোন সমসাময়িক লেখক দ্বারা সমর্থিত হয় নাই।

৩ বিশেষ আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য—আল্‌-মাওয়ার্দী : আহ্‌কাম-উস্‌-সুলতানিয়াহ্‌, বিংশতম অধ্যায় ; ভনক্রিমার, পৃঃ ২৯২-২৯৬।

মোগল আমলে কেন্দ্রীয় শাসন-ব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় রাজধানীতে এবং প্রাদেশিক শাসন-ব্যবস্থায় প্রত্যেক প্রাদেশিক রাজধানীতে মুহ্‌তাসিব নিযুক্ত ছিলেন।[১] আওরঙ্গজেবের রাজত্বকালে মুহ্‌তাসিব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কর্মকর্তা ছিলেন। তাঁহার নিয়মিত স্বাভাবিক কর্তব্য পালনের অতিরিক্ত, তাঁহাকে হিন্দুদের আচার-আচরণের বিরুদ্ধে সম্রাট কর্তৃক ঘোষিত নূতন রাজাজ্ঞা ও নির্দেশ পালিত হইতেছে কিনা তাহা লক্ষ্য রাখিতে হইত। ইহা ব্যতীত, স্বধর্ম ত্যাগ, নবীর বিরুদ্ধে নিন্দা, প্রচলিত ধর্মমতের বিরুদ্ধমত ইত্যাদি ঘটনা সম্পর্কে তাঁহাকে বিবরণী পেশ করিতে হইত এবং সরেজমিনে উহা তদন্তের পর, দোষীকে উপযুক্ত শাস্তি বিধানের ব্যবস্থা করিতে হইত।[২] গান-বাদ্য নিষিদ্ধ করা, মুসলিমদের কবর-স্থানে বাতি জ্বালান বন্ধ করা এবং মুসলিমরা যাহাতে শরিয়াত অনুযায়ী যথাযথভাবে দাড়ি রাখে ও পোশাক-পরিচ্ছদ পরিধান করে, উহার প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখাও মুহ্‌তাসিবের কর্তব্যের অংশবিশেষ ছিল। তাজ-নির্মাতা শাহজাহানের পুত্র আওরঙ্গজেব সমাধি-সৌধ নির্মাণ নিষিদ্ধ করেন এবং তাঁহার মুহ্‌তাসিবরা উক্ত রাজ-আদেশ যাহাতে সকলেই মানিয়া চলে, উহার প্রতি লক্ষ্য রাখিতেন।

শেরশাহ স্থানীয় দায়িত্ববোধের নীতির উপর ভিত্তি করিয়া, তাঁহার পুলিশ বাহিনী[৩] সংগঠিত করেন।[৪] মোগলরা শেরশাহের পুলিশ-ব্যবস্থাপনায় অনু-প্রাণিত হইয়া, উক্ত নীতি অনুযায়ী তাঁহাদের পুলিশ প্রথা প্রবর্তন করেন।

মোগল আমলে কোতোয়াল ও ফৌজদার নামে দুইজন গুরুত্বপূর্ণ পুলিশ কর্মকর্তা শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার কাজে নিয়োজিত ছিলেন। শহর-নগর ও শহরতলীর পুলিশ-ব্যবস্থার দায়িত্বে ছিলেন কোতোয়াল এবং গ্রাম-অঞ্চলের দায়িত্বে ছিলেন ফৌজদার।[৫] চোর-ডাকাতের উপদ্রুত ভয়ঙ্কর স্থানগুলি বিশেষ ফৌজদারের অধীনে রাখা হইত। তাঁহার অধীনে প্রয়োজনীয় সৈন্য মোতায়েন করা হইত।

---

১ খান : মিরাট-ই-আহমদী, ৪২৫ ; ইবনে হাসান : সেন্ট্রাল্ স্ট্রাক্‌চার্, পৃঃ ৩১৫।

২ হুসাইনি : এম. অ্যাড্‌মিনিস্ট্রেশন্, পৃঃ ২১২।

৩ মোগল আমলের পুলিশ বাহিনী সম্পর্কে বিশদ আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য—যদুনাথ সরকার : 'দি পুলিশ ইন দি মোগল এমপায়ার', ক্যালকাটা পুলিশ জার্ন্যাল, প্রথম খণ্ড, ১৯৫৩ পৃঃ ৫-৮।

৪ শরণ : প্রভিনশিয়েল গভর্নমেন্ট, পৃঃ ৩৯৫ : থেভেনট, তৃতীয় খণ্ড, পৃ: ১৯-২০ ; হুসাইনি : এম. অ্যাড্‌মিনিস্ট্রেশন্, পৃঃ ২১৪।

৫ কোতোয়াল ও ফৌজদারের কর্তব্যের বিস্তারিত আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য—শরণ : প্রভিনশিয়েল গভর্নমেন্ট, সপ্তম অধ্যায়।

দেশকে বিভিন্ন অঞ্চলে বিভক্ত করিয়া, প্রত্যেক অঞ্চলের শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য একজন করিয়া ফৌজদার নিযুক্ত করা হইত। ফৌজদারের নির্দেশে ও অনুপ্রেরণায়, প্রত্যেক অঞ্চলের বসবাসকারী স্থানীয় লোকজন, নিজেদের এলাকার নিরাপত্তা বিধান করা এবং শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার কাজে নিয়োজিত থাকিত। ফৌজদারগণ জনসাধারণের মধ্যে স্থানীয় দায়িত্ববোধ জাগ্রত করেন। প্রত্যেক গ্রামে রাত্রিতে পাহারার জন্য চৌকিদার নিযুক্ত ছিল। চৌকিদাররা পুলিশের কাজ করিত। গ্রামবাসীই চৌকিদারদের বেতন দিত। রাষ্ট্রের কোন দায়িত্ব ছিল না।

রাস্তা ঘাটে চলাচলকারী ও ভ্রমণকারীদের নিরাপত্তা বিধানের দায়িত্ব গ্রামবাসীদের ছিল। গ্রামবাসী দ্বারা গ্রামের শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা করিবার মোগলদের নীতি ও প্রথা সন্তোষজনকভাবে সাফল্য লাভ করিয়াছিল এবং মোগল শাসন আমলের অধিকাংশ সময়ই সাম্রাজ্যের সর্বত্র নিরাপত্তার অভাব ছিল না।

মোগল শাসন আমলে কারাগারের প্রশাসনিক সুবিধার্থে, শাস্তিপ্রাপ্ত অপরাধীদিগকে সামাজিক পদ-মর্যাদা অনুযায়ী দুই শ্রেণীতে অর্থাৎ 'ক' উচ্চ শ্রেণী ও 'খ' নিম্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া, তাহাদিগকে কারাবাস দিবার পদ্ধতি প্রচলিত ছিল। সরকারী উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাগণ, সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গ ও রাজ পরিবারের সদস্যগণের জন্য 'ক' উচ্চ শ্রেণীর কারাবাস নির্ধারিত ছিল। সাধারণ অপরাধীরা 'খ' নিম্ন শ্রেণীর কারাবন্দী থাকিত। রাজপরিবারের সদস্যগণ ও অভিজাত সম্প্রদায়ের ব্যক্তিদিগের জন্য সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে কয়েকটি দুর্গ সংরক্ষণ করা হইত। গোয়ালিওর, রণথম্ভর, রোহ্‌টাস প্রভৃতি দুর্গগুলি বন্দীশালা রূপে ব্যবহৃত হইত।[১]

পরিশেষে মোগলদের বিচার-ব্যবস্থা সম্পর্কে বলিলে অতিরঞ্জিত হইবে না যে, মোগল সরকার তদানীন্তন সমাজের কাঠামোর প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলির কোন পরিবর্তন না করিয়া, উহার অস্তিত্বের স্বীকৃতি দিয়া উহাকে চালু রাখিবার জন্য সম্ভাব্য সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করে। সমাজের ও সরকারের নীতির লক্ষ্য ছিল মামলা-মোকদ্দমার সংখ্যা হ্রাস করা এবং জনসাধারণকে মামলা-মোকদ্দমায়

---

১ মা'আছির-উল্-উমারা, (অনুবাদ), প্রথম খণ্ড, পৃঃ ১৩৪ ; শরণ : প্রভিনশিয়েল গভর্নমেণ্ট, পৃঃ ৩৯০ ; হুসাইনি : এম. অ্যাড্‌মিনিস্ট্রেশন্‌, পৃঃ ২১৭।

লিপ্ত হইতে নিরুৎসাহিত করা ও বিরত রাখা। শহর-নগর-পরগণায় অবস্থিত আদালত সীমিত সংখ্যক মামলা-মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করিতে যথেষ্ট ছিল, তখন আদালতের সংখ্যা বৃদ্ধির কোন প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয় নাই। টেরী মন্তব্য করিয়াছেন যে, মোগল আমলে কোন লিখিত আইন ছিল না এবং বার্নিয়ার সমালোচনা করিয়া বলেন যে, 'গভর্নরের বেত' কিংবা 'সম্রাটের খামখেয়ালী মনোভাব' জনগণকে শাসন করিত।[১] তবে উক্ত দায়িত্বহীন মন্তব্য সার্বিকভাবে গ্রহণযোগ্য নহে, কারণ আইনের চোখে সম্রাট, বিচারক ও কাজী সকলই সমান ছিলেন। সম্রাটের তথাকথিত খামখেয়ালের সুযোগ শুধু শাস্তি প্রদানের প্রণালী ও পদ্ধতিতে সম্ভবতঃ সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু আদালতে লিখিত অভিযোগ ও প্রমাণিক দলিল-পত্র যথারীতি পেশ করা, সাক্ষীদিগকে হাজির করা, নিয়মিত শুনানীর ব্যবস্থা ইত্যাদি বিচার সংশ্লিষ্ট নিয়ম সর্বদাই প্রচলিত ও কার্যকরী ছিল, ইহাতে কোন সন্দেহের অবকাশ নাই।

ইউরোপীয় পরিব্রাজকগণ মোগলদের বিচার-ব্যবস্থার দুর্বলতা ও ত্রুটি সম্পর্কে মন্তব্য করিতে গিয়া, কাজীদের দুর্নীতির কথা জোরের সঙ্গে উল্লেখ করিয়াছেন।[২] কিন্তু ইহা অনস্বীকার্য যে পেলসারেট[৩] ও বার্নিয়ার[৪]-এর দুর্নীতি সম্পর্কে বিবরণী অতিরঞ্জিত। কাজীরা যাহাতে দুর্নীতিপরায়ণ না হইতে পারেন সম্রাটগণ সেইদিকে সদাসতর্ক থাকিতেন।

সকলের জন্য আইনে সমতা প্রতিষ্ঠা এবং ন্যায় ও নিরপেক্ষ বিচার প্রবর্তন ছিল মোগল বিচার-ব্যবস্থার প্রধান বৈশিষ্ট্যের অন্যতম। শুধু আইন নহে, শাস্তি প্রদানও উচ্চ-নীচ, ধনী-দরিদ্রের জন্য সমান ছিল। আদালতের সংখ্যা ছিল কম, কার্য-প্রণালী ছিল সহজ এবং বিচার-সম্পাদন ছিল ত্বরিত।[৫] তদোপরি আদালতের ফি উচ্চহারের ছিল না।[৬] উক্ত ব্যবস্থাদি ভাল ছিল কি মন্দ ছিল, ইহা বিতর্কের বিষয়; আধুনিক আইন বিশেষজ্ঞদের পক্ষেও কোন অভ্রান্ত সিদ্ধান্তে পেঁছান কঠিন। কিন্তু ইহা নিশ্চিত যে, মোগল বিচার-পদ্ধতি যুগের ও সমাজের উপযোগী ছিল।[৭]

---

১ টেরী: ট্রাভেলস্, পৃ: ৩২৬; বার্নিয়ার ট্রাভেলস্, পৃ: ২৩৬।
২ ইবনে হাসান: সেন্ট্রাল স্ট্রাক্চার, পৃ: ৩৪২।
৩ পেলসারেট: দি রিমনস্ট্রান্টই, পৃ: ৫৭।
৪ বার্নিয়ার: ট্রাভেলস্, পৃ: ২৩৬।
৫ টেরী: ট্রাভেলস্, পৃ: ৩২৬; ইবনে হাসান: সেন্ট্রাল্ স্ট্রাক্চার্, পৃ. ৩৪৩।
৬ বার্নিয়ার: ট্রাভেলস্, পৃ: ২৩৬; ইবনে হাসান: সেন্ট্রাল্ স্ট্রাক্চার্, পৃ: ৩৪৩-৩৪৪।
৭ ইবনে হাসান: সেন্ট্রাল্ স্ট্রাক্চার্, পৃ: ৩৪৪।

সপ্তম অধ্যায়

প্রাদেশিক ও স্থানীয় শাসন-ব্যবস্থা

প্রশাসনের সুবিধার্থে মোগল সম্রাট আকবর সাম্রাজ্যকে বারটি প্রদেশে বিভক্ত করিয়া, প্রত্যেক প্রদেশকে সুবা নামে অভিহিত করেন। এই সুবাগুলি ছিল এলাহাবাদ, আগ্রা, অযোধ্যা, আজমীর, আহমদাবাদ, বিহার, বাংলাদেশ, দিল্লী, কাবুল, লাহোর, মুলতান ও মালোয়া। বেরার, খান্দেশ ও আহমদনগর জয় করিবার পর, সুবার সংখ্যা পনেরতে[১] নির্দিষ্ট করা হয়।

যদুনাথ সরকারের মতে, মোগল প্রাদেশিক সরকারের প্রশাসনিক কাঠামো[২] মোগল কেন্দ্রীয় সরকারের অবিকল ক্ষুদ্র চিত্র ছিল।[৩] কেন্দ্রীয় সরকারের দপ্তরগুলির অনুরূপ প্রাদেশিক সরকারের সার্বিক কাজ-কর্ম কয়েকটি দপ্তরে বিভক্ত ছিল। যদিও পূর্তকার্য, শিক্ষা, ত্রাণ প্রভৃতি বিষয়ের জন্য পৃথক বিভাগ ছিল না, কিন্তু জনগণের সহায়তায় উক্ত বিষয়গুলি মোগল শাসনাধীনে সম্পাদিত হওয়ার ব্যবস্থা ছিল।'

সুবার কর্মকর্তাগণের নাম নিম্নে প্রদত্ত হইল ঃ

(ক) গভর্নর (সুবাদার)
(খ) দিওয়ান
(গ) বখ্শী
(ঘ) সদর
(ঙ) কাজী
(চ) ফৌজদার
(ছ) মীরবহর
(জ) ওয়াকেয়া-নবিস

কিন্তু কোন খান-ই-সামান ছিল না।[৪]

---

১ আইন, পৃঃ ৩৮৬ (অনুবাদ-জ্যারেট্, পৃঃ ১১৫)।

২ মোগল প্রাদেশিক শাসন-ব্যবস্থার বিস্তারিত আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য—চন্দ্রভানের পাণ্ডুলিপি 'নিগার নামা-ই-মুন্সী' এবং মুন্সী ঠাকুর লালের পাণ্ডুলিপি দস্তুর-উল্-আমল-ই-শাহান শাহী।

৩ সরকার : এম্. অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, পৃঃ ৫৫।

৪ পূর্বোক্ত, পৃঃ ৫৫।

দিল্লী সুলতানী আমলের গোড়ার দিকে, প্রাদেশিক গভর্ণরকে 'ওয়ালি'[১] বলা হইত এবং লোদী ও সুরী শাসনকালে তিনি 'হাকিম'[২] নামে পরিচিত ছিলেন। মোগল সম্রাট আকবরের রাজত্বকালে প্রাদেশিক শাসন-ব্যবস্থার অধিকর্তাকে সরকারীভাবে 'সিপাহ্‌সালার' উপাধিতে অভিহিত করা হয় এবং তিনি 'সুবাদার'[৩] নামে অধিক পরিচিত ছিলেন—পরে শুধু তাঁহাকে সুবাহ' বলা হইত।[৪] আকবরের মৃত্যুর পর গভর্ণরের নামের শেষ পরিবর্তন ঘটে এবং তখন হইতে তিনি 'নাজিম' নাম গ্রহণ করেন।[৫]

সাধারণতঃ নিয়ম অনুযায়ী অত্যন্ত জ্ঞানী-গুণী, অভিজ্ঞ ও দায়িত্বশীল ব্যক্তিদিগকে প্রদেশের শাসন-ব্যবস্থায় সর্বোচ্চ গভর্ণর পদে নিযুক্ত করা হইত। কিন্তু সময় সময় রাজপরিবারের যুবরাজ ও উচ্চপদস্থ সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির পুত্রকেও অত্যধিক গুরুত্বপূর্ণ প্রদেশের গভর্ণর পদে নিয়োগ করা হইত। ইহাতে প্রচলিত নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটিত, সন্দেহ নাই। ঐ সকল ক্ষেত্রে একজন কর্মঠ ও অভিজ্ঞ ব্যক্তিকে তরুণ গভর্ণরের 'আতালিক' অর্থাৎ পথ প্রদর্শক ও শিক্ষকরূপে দায়িত্বভার গ্রহণ করা অবশ্যম্ভাবী ছিল। তিনিই ছিলেন উপ-গভর্ণর। সময় সময় গভর্ণরের চরম তারুণ্যের উচ্ছলতা ও যৌবনের চঞ্চলতার দরুন, আতালিককে বস্তুতঃপক্ষে-গভর্ণরের কাজ করিতে হইত। তরুণ গভর্ণরকে সাহায্য করিবার জন্য উচ্চ-পদস্থ কর্মকর্তা দ্বারা একটি শক্তিশালী কমিটি গঠন করা হইত।[৬] আতালিক উপ-গভর্ণর রূপে, স্বীয় প্রদেশের সুষ্ঠু শাসন-ব্যবস্থা

---

১ বারনী : ফিরোজশাহী, পৃঃ ৮২, ৯৫।

২ শরণ : প্রভিন্‌শিয়েল্ গভর্ণমেন্ট, পৃঃ ১৭০ পাদটীকা।

৩ 'সুবাহ্‌দার' আরবী শব্দ—ইহার অর্থ তত্ত্বাবধান বা দিকনির্দেশক। মোগল আমলে যেমন প্রাদেশিক ভাইস্‌রয়কে সুবাদার বলা হইত, তেমনি বাহমনি রাজ্যে প্রাদেশিক গভর্ণরকে 'তরফদার' বলা হইত। তরফ্‌ এর অর্থ গতি, দিক। —সরকার : এম. অ্যাডমিনিস্ট্রেশন্, পৃঃ ৫৬—৫৭।

৪ শরণ : প্রভিনশিয়েল গভর্ণমেন্ট, পৃঃ ১৭০।

৫ গোলাম হুসেইন সলিম : রিয়াজ-উস্-সালাতিন (মৌলভী আবদুল হক কর্তৃক সম্পাদিত ও আবদুস সালাম কর্তৃক ইংরেজীতে অনূদিত), ১৭০।

৬ (ক) ১৫৭৫ খ্রীস্টাব্দে মির্জা আবদুল রহিম খান খানাকে গুজরাটের ভাইস্‌রয় নিয়োগ করা হইলে, তাঁহাকে সাহায্য করিবার জন্য চারিজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি দ্বারা একটি কমিটি গঠন করা হয়। তন্মধ্যে একজন ছিলেন আতালিক। —মিরাট-ই-আহমদী, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ১৩৩।
(খ) ১৫৯৮ খ্রীস্টাব্দে যুবরাজ দানিয়ালকে এলাহাবাদের ভাইসরয় নিযুক্ত করা হইলে, কালিজ খানকে আতালিক রূপে তাঁহার সঙ্গে প্রেরণ করা হয়। —আকবর-নামা, তৃতীয়, পৃঃ ৭২২।
(গ) ১৬০০ খ্রীস্টাব্দে রাজকুমার দানিয়ালকে দাক্ষিণাত্যের ভাইস্‌রয় নিয়োগ করা হইলে, আবুল ফজলকে তাঁহার আতালিক নিযুক্ত করা হয়। —আকবর-নামা, তৃতীয়, পৃঃ ৫৭৭।

পরিচালনার জন্য দায়ী ছিলেন। যে মুহূর্তে আতালিকের অসামর্থ্যের কিংবা ইচ্ছাকৃত কর্তব্যের অবহেলার অভিযোগ কেন্দ্রীয় সরকারের কর্ণগোচর হইত, ঐ মুহূর্তে তাঁহাকে বরখাস্ত করা হইত।[১]

মোগল আমলের প্রাদেশিক শাসন-ব্যবস্থায় কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ করা যায়, যেমন, রাজকুমারগণ প্রদেশের গভর্নর নিযুক্ত হইবার পর, প্রাদেশিক রাজধানীতে অবস্থান করিয়া প্রত্যক্ষভাবে প্রদেশের শাসন পরিচালনায় লিপ্ত না থাকিয়া, স্বীয় স্বার্থ রক্ষার্থে কেন্দ্রীয় রাজধানীতে রাজদরবারে উপস্থিত থাকিতে অধিক পছন্দ করিতেন। শাহজাহান তাঁহার রাজত্বের প্রথম বৎসর মহব্বত খানকে দাক্ষিণাত্যের ভাইস্‌রয় নিয়োগ করেন। কিন্তু মহব্বত খান রাজদরবারে উপস্থিত থাকিতে বেশী পছন্দ করেন এবং তাঁহার পুত্র খান-ই-জামানকে তাঁহার না'ইব রূপে দাক্ষিণাত্য শাসন করিবার জন্য প্রেরণ করেন।[২] বাকির খান গুজরাটের ভাইস্‌রয় নিযুক্ত হইলে, তিনি তাঁহার পুত্রকে ঐ প্রদেশের ভারপ্রাপ্ত ভাইস্‌রয় রূপে দায়িত্বভার গ্রহণের জন্য প্রেরণ করেন।[৩]

মোগল আমলে সময় সময় কোন কোন প্রদেশে যুগ্মগভর্নর নিয়োগেরও দৃষ্টান্ত রহিয়াছে। প্রদেশের শাসন ব্যবস্থার সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য, আকবর একত্রিশতম রাজত্বকালে প্রদেশের প্রধান কর্মকর্তারূপে দুই ব্যক্তিকে যুগ্মগভর্নর পদে নিযুক্ত করিবার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন এবং কয়েকটি প্রদেশে যুগ্ম-গভর্নর নিযুক্ত করেন। প্রধান গভর্নরের সাময়িক অনুপস্থিতিতে, যুগ্মগভর্নর প্রধান গভর্নরের কর্তব্য সম্পাদন করিতেন। আকবর কর্তৃক নবপদে নিযুক্ত যুগ্মগভর্নরদের একটি বিস্তারিত তালিকা আবুল ফজল প্রণয়ন করেন।[৪]

প্রদেশে সুবাদার নিয়োগ করিবার পর, সম্রাট তাঁহাকে পদ মর্যাদার চিহ্নতে[৫] ভূষিত করিতেন এবং দায়িত্বভার গ্রহণের সময় তাঁহাকে তাঁহার দায়িত্ব ও

১ শরণ : প্রভিন্‌শিয়েল্ গভর্নমেণ্ট, পৃ: ১৭৩।

২ পূর্বোক্ত, পৃ: ১৭৪ পাদটীকা।

৩ পিটার মুন্‌ডি : আর্লি ট্রাভল্‌স্ ইন ইণ্ডিয়া (১৬৩৩—১৬৬৭) (আর. সি, টেম্পল্ কর্তৃক সম্পাদিত), দ্বিতীয়, পৃ: ২৩৫।

৪ আকবর-নামা, তৃতীয়, পৃ: ৫১১।

৫ ১৬০৮ খ্রীস্টাব্দে ইসলাম খান বাংলার সুবাদার নিযুক্ত হইয়াছিলেন এবং তিনি পদ-মর্যাদার চিহ্ন গ্রহণের জন্য আগ্রায় আসিয়াছিলেন।—শাহনাওয়াজ খান : মা'আছির-উল্-উমারা, প্রথম খণ্ড, পৃ: ১১৮।

কর্তব্য সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভের জন্য সরকারী আদেশ ও নির্দেশমালা[১] প্রদান করিতেন। অবশ্য সুবাদারের ক্ষমতাও আদেশমালায় স্পষ্টভাবে উল্লেখ থাকিত। ন্যায়বিচার, শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা, আইন প্রয়োগ, জনসাধারণের মঙ্গলার্থে নানাবিধ পূর্তকার্যে আত্মনিয়োগ, শিক্ষা-দীক্ষার প্রসার, সেনাবাহিনী পরিদর্শন, সুবার গুরুত্বপূর্ণ কর্মকর্তাদের সম্পর্কে রাজদরবারকে ওয়াকিফহাল করা ইত্যাদি সুবাদারের প্রধান কর্তব্যাদি সরকারী উপদেশ-তালিকায় লিপিবদ্ধ থাকিত। ইহা ব্যতীত, সরকারী উপদেশমালায় সুবাদারকে হুঁশিয়ার[২] করিয়া দেওয়া হইত যে তিনি যেন অবাঞ্ছনীয় সঙ্গ হইতে দূরে থাকেন, অমিতব্যয়ী না হন, হীন কর্মে লিপ্ত না থাকেন এবং সুবার সার্বিক শাসন-পরিচালনায় তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখেন। সুবাদারকে মান্য করিবার জন্য এবং সুবার শাসন পরিচালনায় সক্রিয়ভাবে তাঁহাকে সহযোগিতা করিবার জন্য, সরকারী নির্দেশমালায় অভিজাত ব্যক্তি ও জায়গীরদারদের প্রতি স্পষ্ট আদেশ দেওয়া হইত। সুবাদারকেও স্পষ্ট ভাষায় জানাইয়া দেওয়া হইত যে, সুবার জনসাধারণ ও সেনাবাহিনী তাঁহার দায়িত্বাধীন, সেনাবাহিনীতে শৃঙ্খলা রক্ষা এবং জনসাধারণের সুখ, শান্তি, সমৃদ্ধি বিধান করা তাঁহার অন্যতম প্রধান কর্তব্য।

সুবার শাসন-ব্যবস্থার গুরুত্বপূর্ণ উচ্চপদগুলিতে যেমন উপ-গভর্নর পদে, সুবাদারের সুপারিশক্রমে উপযুক্ত ব্যক্তিদিগকে নিয়োগ করা হইত[৩] এবং অন্যান্য নিম্নপদগুলি সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় প্রধানদের সুপারিশে পূর্ণ করা হইত। সুবাদারের অধীনস্থ মনসবদারদের সম্পর্কে তাঁহার সুপারিশ সম্রাট যথাযথ মর্যাদা দিতেন। সুতরাং সুবাদার শুধু জ্ঞানী-গুণী, অভিজ্ঞ, উপযুক্ত কর্মকর্তাদের পদোন্নতির[৪] জন্য সম্রাটের নিকট সুপারিশ করিতেন।

---

১ সুবাদারের কি করা উচিত আর কি করা উচিত নহে, এই প্রসঙ্গে সকল উপদেশ, নির্দেশের (সংখ্যায় ৪০ টা) একটি বিস্তারিত তালিকা আকবরের ফরমানে সংযোজিত আছে।—মিরাট-ই-আহমদী, পৃ: ৩৮৯-৪০০; পাটনা হইতে যদুনাথ সরকারের আবিষ্কৃত ফার্সী পাণ্ডুলিপি যাহা 'ম্যানিউয়্যাল অফ অফিসারস্ ডিউটিজ্' নামে পরিচিত, পৃঃ ২৭-৩২; আইন, দ্বিতীয়, পৃ: ৩৭-৪১।

২ শরণ: প্রভিনশিয়েল্ গভর্নমেন্ট, পৃঃ ১৮৫।

৩ সরকার: এম. অ্যাড্মিনিস্ট্রেশন, পৃ: ৫৭-৫৮; বাংলার ভাইস্রয় ইসলাম খানের সুপারিশ-ক্রমে, জাহাঙ্গীর ইহতিমাম খানকে মীর আতশ নিয়োগ করেন।—জার্ন্যাল অফ ইণ্ডিয়ান হিস্টরি, একাদশ খণ্ড, পৃ: ৩৪০-৩৪১।

৪ বাংলার গভর্নরের সুপারিশক্রমে, ইফ্তিখার খানের মনসব ১৫০০ হইতে ২০০০ মনসবে পদোন্নতি করা হয়।—শরণ: প্রভিনশিয়েল্ গভর্নমেন্ট, পৃঃ ১৮৭ পাদটিকা; তুজুক-ই-জাহাঙ্গীরী, প্রথম খণ্ড, পৃ: ১৭৭-১৭৮।

সুবাদারকে বিদ্রোহী জমিদার ও আইন-শৃঙ্খলা অমান্যকারীদিগকে যথোপযুক্ত শাস্তি দিতে হইত। সুবার গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলীর বিবরণী ডাক-চৌকির মাধ্যমে, প্রতিমাসে দুইবার তাঁহাকে রাজদরবারে প্রেরণ করিতে হইত। জলসেচনের মাধ্যমে কৃষিকার্যের সম্প্রসারণ ও চরম উন্নতির জন্য, তাঁহাকে রায়তদিগকে উৎসাহিত করিতে হইত। খাল্‌সা মহলের আয়ের প্রতি সুবাদার লোলুপ দৃষ্টি দিলে, দিওয়ান-ই-খাল্‌সার সহিত তাঁহার সংঘর্ষ বাধিতে পারে এবং দিওঁয়ান-ই-খাল্‌সা সম্রাটের নিকট তাঁহার বিরুদ্ধে অভিযোগ করিতে পারেন—এই মর্মে সুবাদারকে পূর্বেই সর্তক করিয়া দেওয়া হইত। শেখ ও কাজীদের প্রতি সহৃদয় ব্যবহার করা এবং ফকির, দরবেশদিগকে সাহায্য দান করা সুবাদারের কর্তব্য ছিল। বলবান ধনী যাহাতে দুর্বল গরীবের প্রতি অত্যাচার, অনাচার ও উৎপীড়ন না করিতে পারে—ঐদিকে সুবাদারকে সজাগ দৃষ্টি রাখিতে হইত। সুবার এখ্‌তিয়ারাধীন সামন্ত ব্যক্তিদিগের নিকট হইতে বার্ষিক কর আদায় করিয়া, কেন্দ্রে রাজদরবারে উক্ত রাজস্ব নিরাপদে পাঠাইবার বন্দোবস্ত করা সুবাদারের অন্যতম প্রধান কর্তব্য ছিল।[১]

সুবার পুলিশ বিভাগে সুবাদার বিশ্বস্ত ও কর্তব্যপরায়ণ ব্যক্তিদিগকে নিয়োগ করিতেন।[২] তাঁহাকে কোতোয়ালের কাজ-কর্ম তদারক করিতে হইত। তিনি জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে সকলের ধর্মীয় স্বাধীনতার নিশ্চয়তা বিধান করিতেন এবং শিক্ষা-দীক্ষা প্রসারের পৃষ্ঠপোষকতা করিতেন।

সুবাদারের পর, প্রাদেশিক দিওয়ান সুবায় সর্বোচ্চ গুরুত্বপূর্ণ কর্মকর্তা ছিলেন। কেন্দ্রীয় দিওয়ান তাঁহাকে নিয়োগ করিতেন[৩] এবং কোনক্রমেই তিনি সুবাদারের নিম্নপদস্থ ছিলেন না। তিনি কেন্দ্রীয় দিওয়ান কর্তৃক সযত্নে মনোনীত ছিলেন, তাঁহার নিকট হইতে সরাসরি সরকারী হুকুম পাইতেন এবং তাঁহার নিকটই সরাসরিভাবে নিজের কর্তব্য পালনের জন্য দায়ী থাকিতেন।[৪] তিনি তাঁহার সহিত সর্বদা যোগাযোগ রক্ষা করিতেন।

---

১ সরকার : স্টাডিজ, পৃঃ ২১৫।

২ জিলায় ফৌজদার পুলিশের কাজ সম্পাদন করিত।—খান : মিরাট-ই-আহমদী, তৃতীয়, ৭১৯।

৩ প্রাদেশিক দিওয়ান সম্রাটের 'হাসব্‌-উল্‌-হুকম্‌' (ওয়াজিরের দ্বারা লিখিত) অনুযায়ী এবং ওয়াজিরের সীল-মোহর যুক্ত সনদের মাধ্যমে নিযুক্ত হইতেন।—খান : মিরাট-ই-আহমদী, দ্বিতীয়, পৃঃ ১১৫ ; সরকার : এম. অ্যাড্‌মিনিস্ট্রেশন, পৃঃ ৬২ পাদটীকা।

৪ শরণ : প্রভিন্‌শিয়েল্‌ গভর্নমেণ্ট, পৃঃ ১৮৯।

পূর্বে বলা হইয়াছে যে, প্রাদেশিক দিওয়ানের নিয়োগ, পদোন্নতি ও পদচ্যুতি কেন্দ্রীয় সরকার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ছিল এবং তিনি তাঁহার সর্বকর্মের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট প্রত্যক্ষভাবে দায়ী ছিলেন। অর্থ ও রাজস্ব সংক্রান্ত বিষয়ে, তিনি গভর্নরের সম পদ-মর্যাদা ও ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। এইভাবে প্রদেশে দুইটি সমান্তরাল ও পারস্পরিক স্বাধীন প্রশাসনিক সংগঠনের অস্তিত্ব পরিলক্ষিত হয়।[১] প্রাদেশিক প্রশাসনিক-ব্যবস্থায় সুবাদারের যেমন ফৌজদার হইতে নিম্নপদস্থ গ্রাম্য চৌকিদার পর্যন্ত কর্মচারীদের উপর কর্তৃত্ব ছিল, তেমনি প্রদেশের রাজস্ব শাসন-ব্যবস্থায় আমলগুজার হইতে নিম্নপদস্থ পাটোয়ারী পর্যন্ত কর্মচারীদের উপর দিওয়ানের কর্তৃত্ব বিস্তৃত ছিল। এই পদ্ধতি প্রকৃতিগত দিক হইতে দ্বৈত প্রশাসন-ব্যবস্থা ছিল[২]; বৃটিশ ভারতের প্রদেশের তথাকথিত দ্বৈত-শাসনের সহিত ইহার সাদৃশ্য আছে। প্রদেশের সর্বোচ্চ পদস্থ কর্মকর্তাদের ক্ষমতার উপর বাধা সৃষ্টি এবং তাহাদিগকে কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীনে রাখিবার উদ্দেশ্যে, উক্ত দ্বৈত-শাসন প্রণালীর উদ্ভব ঘটিয়াছিল। পদ-মর্যাদায় প্রাদেশিক দিওয়ান ছিলেন প্রদেশের প্রশাসনিক কাঠামোতে দ্বিতীয় কর্মকর্তা এবং তিনি ছিলেন সুবাদারের প্রতিদ্বন্দ্বী। আরব শাসন-ব্যবস্থার আমীর ও আমিলের অনুরূপ, সুবাদার ও দিওয়ান পরস্পরের উপর তীক্ষ্ণ ও ঈর্ষান্বিত দৃষ্টি রাখিতেন[৩] এবং একে অন্যের কাজকর্ম সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট বিবরণী পাঠাইতেন।[৪]

বাস্তবিকই যখনই কেন্দ্রীয় সরকারের কর্ণগোচর হইত যে, কোন প্রদেশের দিওয়ান ও গভর্নর পরস্পর ঝগড়া-বিবাদে লিপ্ত হইয়া পড়িয়াছেন, তখনই তাঁহাদের একজনকে কিংবা সময় সময় উভয়কে প্রত্যাহ্বান করা হইত।[৫]

কেন্দ্রীয় দিওয়ান যেমন সমগ্র সাম্রাজ্যের অর্থ ও রাজস্ব বিভাগের প্রধান ছিলেন, তেমনি প্রাদেশিক দিওয়ান ছিলেন প্রদেশের অর্থ ও রাজস্ব বিভাগের

---

১ শরণ : প্রভিনশিয়েল্ গভর্নমেন্ট, পৃ: ১৯৪।

২ পূর্বোক্ত, পৃ: ১৯৪।

৩ সি. এইচ. বেকার অফ হামবরজ্ : মোগল প্রভিন্শিয়েল্ অ্যাড্মিনিস্ট্রেশন, (এন্সাইক্লোপীডিয়া অফ ইসলাম, দ্বিতীয় খণ্ড, ১৩ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত) ; সরকার : এম. অ্যাড্মিনিস্ট্রেশন্, পৃ: ৬২।

৪ একে অন্যের উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখিবার একটি জ্বলন্ত উদাহরণ হইতেছে—উড়িষ্যার দিওয়ান মুহম্মদ হাশিম (১৬৬১-৬৩) ও গভর্নর খান-ই-দওরান পারস্পরিক সম্পর্ক।—সরকার : স্টাডিজ্, পৃ: ২২১-২২৪ ; শরণ : প্রভিন্শিয়েল্ গভর্নমেন্ট, পৃ: ১২৫ পাদটীকা।

৫ জাহাঙ্গীর বাংলার দিওয়ান ওয়াজির খানকে প্রত্যাহবান করিয়াছিলেন, কারণ বাংলার গভর্নর ইসলাম খান ওয়াজির খানকে পছন্দ করিতেন না।—শরণ : প্রভিন্শিয়েল্ গভর্নমেন্ট, পৃ: ১২৫। পাদটীকা।

প্রধান। বাজেট অর্থাৎ আয়-ব্যয়ের বার্ষিক আগাম হিসাব প্রস্তুত করিবার জন্য এবং রাজস্ব নির্ধারণ, আরোপ ও আদায়করণের উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় দিওয়ানের ন্যায় প্রাদেশিক দিওয়ানের অধীনেও অনেক কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিযুক্ত ছিল। মিরাট-ই-আহমদীতে দিওয়ানের কর্তব্য ও দায়িত্বের একটি পূর্ণ বর্ণনা পাওয়া যায়। ঐ বর্ণনানুযায়ী[১] উপসংহারে বলা যায় যে, কেন্দ্রীয় ওয়াজিরাত দপ্তরের ছয়টি[২] গুরুত্বপূর্ণ বিভাগের কাজ-কর্ম প্রদেশে প্রাদেশিক দিওয়ান সম্পাদন করিতেন। মা'আছির-উল্-উমারাতে প্রাদেশিক দিওয়ানের ক্ষমতা ও প্রভাবের বিস্তারিত আলোচনা আছে।

প্রাদেশিক দিওয়ানকে কৃষিকার্যের উন্নতির জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিতে হইত। তাঁহাকে কোষাগারের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিতে হইত, যাহাতে কেহ আজ্ঞাপত্র ব্যতীত কোষাগার হইতে কোন অর্থ গ্রহণ করিতে না পারে। নিষিদ্ধ শুল্ক বা কর কেহ যেন আদায় না করে, ঐদিকে তিনি সতর্কতা অবলম্বন করিতেন। আমিলদের হিসাব-নিকাশ তিনি কঠোরভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করিতেন এবং দুর্নীতিপরায়ণ আমিলদের পদচ্যুতির জন্য কেন্দ্রে অভিযোগ পেশ করিতেন। আমিলের অবহেলার দরুন যদি কোন অঞ্চলের রাজস্ব রীতিমত আদায় না হইত, তাহা হইলে অনাদায়কৃত বকেয়া দেয় রাজস্বের পাঁচ-শতাংশ হিসাবে সহজ কিস্তিতে প্রতিবৎসর আদায় করিবার বন্দোবস্ত দিওয়ানকেই করিতে হইত। তাঁহাকে তাকাভি ঋণ আদায় করিতে হইত।[৩]

দিওয়ানকে সময় সময় আয়-ব্যয় পরীক্ষা-নিরীক্ষা বিভাগেও দায়িত্বভার গ্রহণ করিতে হইত। বিভিন্ন বিভাগের জন্য বরাদ্দ অর্থের খরচের উপর, তিনি পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখিতেন।

প্রদেশের যাবতীয় সরকারী কাগজপত্র, দলিল দস্তাবেজ সংরক্ষণও দিওয়ানের দায়িত্বাধীনে ছিল। প্রশাসনিক বিভাগের সংশ্লিষ্ট প্রামাণ্য কাগজ-পত্র, সুবার সদর দপ্তরের কাগজ-পত্র, সকল সরকারী কর্মচারীর ব্যক্তিগত নথি-পত্র, জায়গীর প্রদান সংক্রান্ত দলিল-পত্র, রাজস্ব আদায় ও আয়-ব্যয়ের বিবরণী, প্রত্যেক

---

১ খান : মিরাট-ই-আহমদী, পৃঃ ১৭২।
২ হুসাইনি : এম. অ্যাড্মিনিস্ট্রেশন, পৃঃ ৭৫।
৩ শরণ : প্রভিনশিয়েল্ গভর্নমেন্ট, পৃঃ ১৯১।

পরগণায় পাতকুয়ার সংখ্যা নির্দেশক কাগজ, খাদ্য সামগ্রীর মূল্যের তালিকা ইত্যাদি দিওয়ানের দপ্তরে সংরক্ষিত থাকিত।[১]

দিওয়ানের সচিবালয়ে নিম্নলিখিত প্রধান কর্মকর্তা নিয়োজিত ছিলেন,[২] যথা :

(ক) পেশকার বা সচিব
(খ) ব্যক্তিগত সহকারী
(গ) একান্ত সহকারী
(ঘ) দারোগা বা সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট
(ঙ) মুশ্‌রিফ বা প্রধান সহকারী বা প্রধান হিসাব রক্ষক
(চ) তহ্‌শিলদার-ই-দপ্তরখানা বা খাজাঞ্চী
(ছ) হুজুর নবিস বা কেন্দ্রীয় সরকারের সহিত পত্র বিনিময়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত কেরানী
(ঝ) সুবা-নবিস বা গভর্নরের দপ্তরের সহিত পত্র বিনিময়ের ভারপ্রাপ্ত কেরানী
(ঞ) শুল্ক হিসাব রক্ষক
(ট) ওজন ও মাপের হিসাব রাখিবার কেরানী
(ঠ) মূল্য-বিবরণী সংরক্ষক
(ড) সংবাদদাতা
(ঢ) দপ্তর বনদ্‌
(ণ) কাছারীর পিয়ন ও প্রহরী।

নূতন সৈন্য সংগ্রহ ও নিয়োগ, সৈন্যবাহিনীকে সুশৃঙ্খল অবস্থায় রাখা, সৈন্য-সমাবেশ, সৈন্যদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা, মনসবদার ও তাহাদের সৈন্যদের বেতনের দাবিপত্র মঞ্জুর করা, সেনাবাহিনীর অশ্ব ও অন্যান্য জন্তু পরিদর্শন, অশ্ব-চিহ্নিতকরণ পদ্ধতি কার্যকরী করা ইত্যাদি প্রাদেশিক বখ্‌শীর প্রধান কর্তব্যাদির অন্যতম ছিল। সংক্ষেপে বলা যায় যে, কেন্দ্রীয় মীরবখ্‌শীর কর্তব্য ও দায়িত্বগুলি প্রাদেশিক বখ্‌শিগণ নিজ নিজ প্রদেশে নিয়মিত ও সুষ্ঠুভাবে পালন করিতেন। মিরাট-ই-আহমদী অনুযায়ী, কেন্দ্রীয় মীরবখ্‌শী

১ ব্রি. মি. অ. পাণ্ডুলিপি নং ৬৫৮৮, ৭২-৭৩ (শরণ : প্রভিন্‌শিয়েল্‌ গভর্নমেণ্ট, পৃঃ ১৯২-৯৩ উদ্ধৃত)।
২ শরণ : প্রভিনশিয়েল্‌ গভর্নমেণ্ট, পৃঃ ১৯৬-১৯৭।

কর্তৃক প্রদেশে চারিজন বখ্‌শী নিয়োজিত হইতেন এবং বখ্‌শীদের নিয়োগপত্র মীরবখ্‌শীর দপ্তরের সীল-মোহরযুক্ত থাকিত।[১]

প্রাদেশিক বখ্‌শীর দপ্তরের সহিত রাজনৈতিক স্মারক ব্যক্তির দপ্তর সাধারণতঃ সংযুক্ত ছিল।[২] কখনও কখনও একজন পৃথক স্মারক ব্যক্তিও নিয়োগ করা হইত।

প্রাদেশিক শাসন-ব্যবস্থায় সদর ধর্ম-বিষয়ক বিভাগের প্রধান ছিলেন। তিনি প্রদেশের ধর্ম সংক্রান্ত বিষয়ের তদারক করিতেন। আর কাজী ছিলেন বিচার বিভাগের প্রধান। তিনি প্রদেশের বিচার-ব্যবস্থা পরিচালনা করিতেন, তবে মোগল শাসন আমলে প্রায়শঃই সদর ও কাজীর বিভাগ দুইটি সংযুক্ত ছিল।

ভারতের হিন্দু আমলের 'স্থানিক' ও পশ্চিম এশিয়ার খেলাফতের প্রাথমিক যুগের মুহ্‌তাসিবের সম্মিলিত কর্তব্যাদি মোগল আমলের কোতোয়াল[৩] পালন করিতেন। মোগল আমলে শহর-নগর ও শহরতলীর শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা এবং নাগরিকদের নিরাপত্তা বিধানের জন্য পুলিশের পাহারার ব্যবস্থা করিবার দায়িত্ব ছিল কোতোয়ালের অর্থাৎ নগর রক্ষকের। প্রাদেশিক সরকারের সদর দপ্তরের কোতোয়াল কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হইতেন। শহরের নিয়মিত-ভাবে পাহারার বন্দোবস্ত, হাট-বাজার নিয়ন্ত্রণ, উত্তরাধিকারীহীন বিষয়-সম্পত্তির তদারক ও নিষ্পত্তিকরণ, অপরাধ, সামাজিক অপব্যবহার ও কু-প্রথা নিরোধকরণ ইত্যাদি কোতোয়ালের প্রধান কর্তব্যাদির অন্যতম ছিল। তিনি শহরের প্রত্যেক অঞ্চলের জনসংখ্যার একটি তালিকা রাখিতেন এবং শহরের নূতন আগমনকারী ও বহির্গমনকারীদের প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখিতেন। শহরের দৈনন্দিন ঘটনাবলী তিনি লক্ষ্য রাখিতেন এবং সরাইখানার উপরও সতর্ক দৃষ্টি রাখিতেন। বেকার বালকদের জন্য চাকুরীর ব্যবস্থা করাও তাহার কর্তব্য ছিল। তাহাকে শিশু হত্যা ও বল-পূর্বক সতীপ্রথা রদ করিতে হইত এবং পতিতালয়ের উপর দৃষ্টি রাখিতে হইত।

---

১ খান: মিরাট-ই-আহমদী, ৭২২ শরণ: প্রভিনশিয়েল্ গভর্নমেন্ট, পৃঃ ১৯৭-১৯৮।

২ শরণ: প্রভিনশিয়েল্ গভর্নমেন্ট, পৃঃ ১৯৭।

৩ 'কোট' ও 'পাল' হিন্দি শব্দদ্বয় হইতে কোতোয়াল শব্দটির উৎপত্তি; ইহার অর্থ 'দুর্গ রক্ষক'। —শরণ: প্রভিন্‌শিয়েল গভর্নমেন্ট, পৃঃ ৩৯৭—৩৯৮।

কোন কোন বৃটিশ ঐতিহাসিকের ধারণা 'কোতোয়াল' একটি ফার্সী শব্দ। কিন্তু কোন কোন ফার্সী অভিধানে যেমন গিয়াস-উল-লুঘাতের অভিধানে 'কোতোয়াল' শব্দটি পাওয়া যায় না। হিন্দি 'শব্‌দ সাগর'-এ দেখা যায় যে কোতোয়াল শব্দটি সংস্কৃত 'কোট-পাল' শব্দ হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। —কে. এন. পি. সাভা, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ৬৪২।

কোতোয়াল প্রকৃতপক্ষে শহরের পুলিশ বাহিনীর প্রধান রূপে একজন পৌর কর্মকর্তা ছিলেন। জনগণের মধ্যে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখা ছিল তাঁহার প্রধান দায়িত্ব।[১] আদর্শ কোতোয়াল হিসাবে তাঁহার দায়িত্ব ও কর্তব্যাদির বিস্তারিত আলোচনা আইন-ই-আকবরীতে পাওয়া যায়।[২] কিন্তু যদুনাথ সরকার সমালোচনা করিয়া বলিয়াছেন যে, কোতোয়ালের কর্তব্য ও দায়িত্বাদি সম্পর্কে আবুল ফজলের অঙ্কিত আদর্শ চিত্রটিতে সত্যিকার ঘটনা প্রতিফলিত হয় নাই।[৩]

মিরাট-ই-আহমদীতে আকবরের ফরমান অনুযায়ী, কোতোয়ালের প্রতি প্রদত্ত নির্দেশাবলীর[৪] উল্লেখ রহিয়াছে, যেমন, (ক) কোতোয়াল সহকারীদের সাহায্যে ঘর বাড়ী, দালান-কোঠার তালিকা প্রণয়ন করিবেন, (খ) বসবাসকারীদের পারস্পরিক সহযোগিতার নিশ্চয়তার বিধান করিবেন, (গ) শহরকে মহল্লায় বিভক্ত করিয়া, প্রত্যেক মহল্লার জন্য একজন মহল্লা-প্রধান ব্যক্তি নিযুক্ত করিবেন এবং তাঁহার পরামর্শ অনুযায়ী শাসন পরিচালনা করিবেন, (ঘ) হাট-বাজারে দ্রব্যাদির মূল্য-নির্ধারণ করিবেন, (ঙ) ধনী ব্যক্তিগণ যাহাতে একচেটিয়াভাবে বেশী দ্রব্য ক্রয় করিয়া কৃত্রিম অভাব সৃষ্টি না করিতে পারে উহা লক্ষ্য রাখিবেন, এবং (চ) তাঁহার নিজ এলাকায় মদ্যপান ও বিক্রয় বন্ধ রাখিবেন।

মানুচী তাঁহার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হইতে কোতোয়ালের কাজ-কর্মের আরও মূল্যবান তথ্য[৫] পরিবেশন করেন, যেমন, (ক) কোতোয়ালকে মদ-সুরা বন্ধ করিতে হইত, (খ) শহরে যেন কোন ব্যভিচার, বেশ্যাবৃত্তি[৬] না ঘটে উহা লক্ষ্য রাখিতে হইত, (গ) তাঁহাকে চোর-দস্যু অপরাধীদিগকে গ্রেফ্‌তার করিতে হইত, (ঘ) কাজীর অধীনস্থ রূপে কাজীর হুকুম পালন করিতে হইত ইত্যাদি।

একজন কোতোয়ালের সনদে অর্থাৎ নিয়োগপত্রে সুস্পষ্টভাবে নির্দেশ থাকিত যে, তাঁহার এখ্‌তিয়ারাধীন শহরে কোন চুরি, ডাকাতি যেন না হয়,

---

১ কোতোয়ালের কর্তব্যাদির বিস্তারিত আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য—সরকার: ম্যানিউয়্যাল অফ দি অফিসারস্‌ ডিউটিজ, পৃ: ৬৭—৭১।
২ আইন, দ্বিতীয়, পৃ: ৪১—৪৩।
৩ সরকার: এম. অ্যাডমিনিস্ট্রেশন্, পৃ: ৬৮—৬৯।
৪ খান: মিরাট-ই-আহমদী, প্রথম, পৃ: ১৭৭—১৭৮।
৫ মানুচী: স্তোরিয়া দ্য মোগোর, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ: ৪২০—৪২১।
৬ বদায়ুনী: মুন্‌তাখাব-উত্‌-তাওয়ারিখ, দ্বিতীয়, পৃ: ৩০২—৩০৩।

শহরবাসী যেন নিরাপদে বসবাস করিতে পারে এবং শান্তিতে ব্যবসা-বাণিজ্য করিতে পারে—ঐদিকে সজাগ দৃষ্টি রাখা কোতোয়ালের প্রধান কর্তব্য।

শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা করিবার জন্য এবং সাধারণভাবে প্রশাসনিক-ব্যবস্থায় সাহায্য করিবার জন্য, সুবাদারের সাহায্যকারী ছিলেন ফৌজদার। ফৌজদারগণ গ্রাম-অঞ্চলে পরগণায় আইন শৃঙ্খলা ও শান্তি রক্ষার্থে নিয়োজিত ছিলেন। নূতন ফৌজদার নিযুক্ত হইবার পর, তাঁহার শাসন-নীতি ও আচার-ব্যবহার সম্পর্কে তাঁহাকে নানাবিধ উপদেশ দেওয়া হইত। স্থানীয় জমিদারগণ যাহাতে নিয়মিত যথারীতি রাজস্ব দেয়, তাঁহাকে উহার নিশ্চয়তা বিধান করিতে হইত। বিদ্রোহী জমিদারকে শায়েস্তা করিয়া আইন মানিতে বাধ্য করা ছিল তাঁহার দায়িত্ব। স্থানীয় কানুনগো, ওয়াকেয়া-নবিস, হরকারাহ, কর্মচারীদিগকে শান্ত করিয়া, স্বপক্ষে আনিবার দায়িত্বও তাঁহারই ছিল।

নিয়োগ-পত্রে ফৌজদারের বিবিধ কর্তব্য ও দায়িত্ব[১] সম্পর্কে সরকারী নির্দেশ বিস্তারিতভাবে বর্ণিত থাকিত। বিদ্রোহী নেতা ও আইন অমান্যকারী লোকদিগকে শাস্তি দিবার উদ্দেশ্যে, ফৌজদারকে তাহাদের শক্তির কেন্দ্র দুর্গ ধ্বংস করিয়া দিতে হইত। ছোট ছোট অঞ্চলের শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্বে, থানাদার পদে ফৌজদারকে উপযুক্ত লোক নিয়োগ করিতে হইত। জায়গীরদারের প্রতিনিধি কিংবা খাল্সা জমির আমিল সামরিক সাহায্যের জন্য লিখিত আবেদন না করিলে, ফৌজদার তাঁহার এলাকার কোন গ্রাম আক্রমণ করিলে উহা অনুচিত বিবেচিত হইত।

সংক্ষেপে বলা যায়, ছোটখাট বিদ্রোহ দমন, চোর-দস্যু, ডাকাত গ্রেফ্তার এবং নানাবিধ অপরাধমূলক কাজ-কর্ম রদ করিবার জন্য, দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ফৌজদারকে একটি সামরিক দলের অধিনায়ক রূপে নিয়োগ করা হইত। তাঁহার বিবিধ কর্তব্য ও দায়িত্ব আইন-ই-আকবরীতে উল্লেখ আছে।[২]

সরকার ও পরগণার ফৌজদারের পদ-মর্যাদা ও গুরুত্ব, সীমান্ত সামরিক ফাঁড়ির ফৌজদারের। পদ-মর্যাদা ও গুরুত্বের সমতুল্য। নিঃসন্দেহে ফৌজদার ছিলেন অত্যধিক দায়িত্বপূর্ণ কর্মকর্তা। যদিও তিনি প্রাদেশিক গভর্নরের অধীনস্থ

---

১ ফৌজদারের কর্তব্য ও দায়িত্বাদির বিস্তারিত আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য—সরকার: এম. অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, পৃঃ ৬৫-৬৬।

২ আইন, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ৪৫০—৪৫১।

ছিলেন, তবুও তিনি কেন্দ্রীয় সরকারের সহিত প্রয়োজনবোধে সরাসরি যোগাযোগ রক্ষা করিতে পারিতেন। সুতরাং উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের নিয়োগ পদ্ধতির মতই, 'ফরমান-ই-সাবাতি'[১] দ্বারা ফৌজদার নিয়োগ করা হইত।

বন্দরে ব্যবস্থা-বাণিজ্য শুল্ক, নৌকা ও ফেরী কর[২] ইত্যাদি আদায়ের দায়িত্বে মীরবহর নিয়োজিত ছিলেন। প্রাদেশিক নৌ-বহর তাঁহার দায়িত্বাধীনে ছিল।

কেন্দ্রীয় সরকার যে-সকল সংবাদ-সংস্থা ও সংবাদ দাতাদের মাধ্যমে দেশের খবরা-খবর পাইত উহা নিম্নে বর্ণিত হইল ঃ

(ক) ওয়াকেয়া-নবিস,

(খ) সাওয়ানিহ্-নবিস বা সাওয়ানিহ্-নিগার,

(গ) কুফিয়াহ্-নবিস।

উপরোক্ত সংবাদদাতাদের সকলই লিখিত বিবরণী কেন্দ্রে প্রেরণ করিত।

(ঘ) হরকরাহ্—আক্ষরিক অর্থ হইতেছে সংবাদ বহনকারী, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে একজন গুপ্তচর ; সে মৌখিক সংবাদ সংগ্রহ করিত এবং কেন্দ্রে সংবাদবাহী পত্র পাঠাইত।[৩]

ওয়াকেয়া-নবিসকে কখনও কখনও ওয়াকেয়া-নিগারও বলা হইত। ওয়াকেয়া-নবিস ও সাওয়ানিহ্ নিগার একই ধরনের, অর্থাৎ লেখক বা ঘটনাবলীর পরিদর্শনকারী বুঝায়। তবে তাহাদের দুইজনের মধ্যে পার্থক্য এই যে, ওয়াকেয়া-নবিস ছিলেন একজন অধিক নিয়মিত গণ-সংবাদদাতা, কিন্তু সাওয়ানিহ্-নিগার ছিলেন শুধু গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলীর একজন গুপ্ত সংবাদদাতা। সাওয়ানিহ্-নিগার গুপ্তচরের ভূমিকা পালন করিত এবং ওয়াকেয়া-নবিসের কাজের উপরও দৃষ্টি রাখিতে হইত।[৪] মিরাট-ই-আহমদীতে বিষয়টি আরও সুস্পষ্টভাবে বলা হইয়াছে যে, মূলতঃ প্রদেশের ঘটনাবলীর বিবরণী পেশ করিবার জন্য, ওয়াকেয়া-

---

১ শরণ : প্রভিন্শিয়েল্ গভর্নমেন্ট, পৃ: ২২৯। মোগল শাসন-ব্যবস্থায় সরকারী চিঠিপত্র বিবিধ শ্রেণীতে ভাগ করা চলে, যথা : (ক) 'ফরমান'—সরাসরি সম্রাট কর্তৃক লিখিত চিঠি, (খ) 'নিশান' —সম্রাট ব্যতীত, অন্য কাহারও নিকট রাজবংশের যুবরাজ কর্তৃক লিখিত চিঠি, (গ) 'হাসূব-উল্-হুকুম'—সম্রাটের নির্দেশে তাঁহার হুকুম সংক্রান্ত মন্ত্রী কর্তৃক লিখিত চিঠি, (ঘ) 'সনদ'—নিয়োগ-পত্র (ঙ) 'দস্তক'—সংক্ষিপ্ত সরকারী পাস বা অনুমতিপত্র। —সরকার : এম. অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, পৃঃ ২৩২।

২ শরণ : প্রভিন্শিয়েল্ গভর্নমেন্ট, ১৭০।

৩ সরকার : এম. অ্যাড্মিনিশস্ট্রেশন, পৃঃ ৭০-৭১।

৪ পূর্বোক্ত, পৃঃ ৭১।

নবিস্‌দিগকে নিযুক্ত করা হইত; কিন্তু স্থানীয় কর্মকর্তাদের যোগসাজশে তাহাদের দ্বারা সত্য ঘটনা চাপিয়া রাখিবার সম্ভাবনা থাকার দরুন, সাওয়ানিহ্‌-নিগারদিগকে (যাহাদিগকে কুফিয়াহ্‌-নবিসও বলা হয়) গোপনে প্রকৃত সংবাদ সংগ্রহ করিবার উদ্দেশ্যে সুবার বিভিন্ন অঞ্চলে গোয়েন্দারূপে নিয়োগ করা হইত। বস্তুতঃপক্ষে, তাহারা ছিল অত্যন্ত গোপনীয় সংবাদদাতাদের শ্রেণীভুক্ত।[১]

জাহাঙ্গীরের সমসাময়িক ইতিহাস বাহারিস্তান-ই-গায়েবি অনুযায়ী,[২] বিভিন্ন সংবাদ-সংস্থা প্রবর্তন ও রাজদরবারে সংবাদদাতাদের প্রেরিত সংবাদ বিবরণী প্রকাশ্যে পঠনের উদ্দেশ্য ছিল, পারস্য দেশীয় রাজদূতের সম্মুখে মোগলদের শৌর্য-বীর্য প্রদর্শন করা।

ছোট ছোট পরগণার ঘটনাবলীর বিবরণ প্রেরণ করিবার জন্য, ওয়াকেয়া-নবিস তাহার অধীনে বিভিন্ন পরগণায় প্রতিনিধি নিয়োগ করিত। প্রাদেশিক ভাইস্‌রয়ের প্রকাশ্য দরবার অনুষ্ঠিত হইলে, ওয়াকেয়া-নবিস দরবারে উপস্থিত থাকিয়া দরবারের কার্যাবলীর ধারাবিবরণী তৎক্ষণাৎ লিপিবদ্ধ করিত। সাওয়াহ্‌-নিগার 'এইরূপ কাজ করিত না'।[৩] যদুনাথ সরকারের 'ম্যানিউয়্যাল্ অফ অফিসার্‌স্ ডিউটিজ্'-এ উল্লেখ আছে যে, ওয়াকেয়া-নবিস প্রতি সপ্তাহে একবার ঘটনাবলীর প্রতিবেদন প্রেরণ করিত, কিন্তু সাওয়াহ্‌-নিগার প্রতিমাসে আটবার গুপ্ত সংবাদ প্রেরণ করিত।[৪]

কোন কোন প্রদেশে একই ব্যক্তিকে বখ্‌শী ও ওয়াকেয়া-নবিস পদে নিযুক্ত করা হইত, ইহাও প্রাদেশিক শাসন-ব্যবস্থায় পরিলক্ষিত হয়।

কুফিয়াহ্‌-নবিস অর্থাৎ 'গুপ্ত লেখক' ছিল একজন অত্যন্ত বিশ্বস্ত গোপনীয় সংবাদদাতা। স্থানীয় প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের অজ্ঞাতে, অগোচরে, তাহাদের সহিত কোন যোগাযোগ রক্ষা না করিয়াই, কুফিয়াহ্‌-নবিস ঘটনাবলী সম্পর্কে গোপন সংবাদ প্রেরণ করিত। স্থানীয় কর্তৃপক্ষ অনেক সময় তাহার নামও জানিতেন না। স্থানীয় জনসাধারণ এই গোপন সংবাদ-প্রেরকদিগকে ভীষণ ভয় করিত।[৫]

---

১ খান: মিরাট-ই-আহমদী, দ্বিতীয়, পৃ: ১১৭।

২ বাহারিস্তান-ই-গায়েবি (প্যারিস পাণ্ডুলিপি ১০১০); সরকার: এম. অ্যাড্‌মিনিস্ট্রেশন, পৃ: ৭২।

৩ সরকার: এম. অ্যাড্‌মিনিস্ট্রেশন, পৃ: ৭৩।

৪ পূর্বোক্ত, পৃ: ৭৩।

৫ মুহম্মদ কাজিম: আলমগীর-নামা, ১০৮০।

ওয়াকেয়া-নবিস প্রাদেশিক সরকারের সদর দপ্তরে, প্রদেশের বিভিন্ন অঞ্চল হইতে তাহার অধীনস্থ সংবাদদাতাদের মাধ্যমে ঘটনাবলীর বিবরণী পাইত এবং শহরের বিবরণীসহ উহা কেন্দ্রে সম্রাটের দরবারে প্রেরণ করিত। 'দারোগা-ই-ডাক' অর্থাৎ ডাক বিভাগের প্রধানের মাধ্যমে বিস্তারিত বিবরণী কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট পাঠান হইত। ডাক বিভাগের প্রধানকে প্রদেশের ডাক প্রেরণের কাজ কর্ম তদারক করা ব্যতীত প্রদেশের গুপ্ত সংবাদ প্রেরণ সংস্থার প্রধান কর্মকর্তা অর্থাৎ গোয়েন্দা প্রধানরূপে কাজ করিতে হইত। তাহার অধীনস্থ কর্মচারী ছিল প্রধানতঃ গুপ্তচর বেশে সংবাদদাতা, যথা সাওয়ানিহ্ বা কুফিয়াহ্-নবিস।

স্থানীয় অবস্থা ও ঘটনাবলী সম্পর্কে প্রতিবেদন কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট প্রেরণের জন্য হরকরাহ্ পদ্ধতিও প্রবর্তিত ছিল।

উল্লিখিত মোগলদের গোপনে সংবাদ প্রেরণ পদ্ধতিতে আখ্‌বার-নবিস[১] শব্দটিও পরিচিত।

আওরঙ্গজেবের রাজত্বকালে সাম্রাজ্য শাসনে গুপ্তচর বিভাগের প্রভূত প্রভাব স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। সম্রাট 'গুপ্তচরদিগকে তাঁহার চক্ষু ও কর্ণ স্বরূপ ভাবিতেন'।[২]

ভারতে মুসলিম শাসকগণ প্রদেশগুলিতে ও করদ রাজ্যগুলিতে বহুলাংশে স্বায়ত্তশাসন প্রদান করেন। অধিকৃত রাজ্যের বৃহৎ অংশ সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদিগকে জায়গীর হিসাবে দেওয়া হইত এবং তাঁহারা নিজ নিজ জায়গীরের শাসন পরিচালনায় প্রায় স্বাধীন ছিলেন।

আকবরকে মোগল সাম্রাজ্যের সর্বত্র তাঁহার প্রভুত্ব ও আধিপত্যের প্রভাব বিস্তার করিতে এবং তাঁহার শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে, নানাবিধ সমস্যার মোকাবিলা করিতে হইয়াছিল। সাম্রাজ্যের বিশালতা, যাতায়াতের অসুবিধা, পরিবহণ ব্যবস্থার ধীরগতি, সাম্রাজ্যের দুর্গম কিয়দংশ, অগম্য অঞ্চল, কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিপত্তির বিরুদ্ধে সম্রাটকে কিছু সংখ্যক অবাধ্য ও অদম্য প্রাদেশিক গভর্নরের মনোভাব, দৃষ্টিভঙ্গি, বিরোধিতা প্রভৃতি নানা ধরনের

১ হুসাইনি : এম. অ্যাড্‌মিনিস্ট্রেশন, পৃঃ ২২৬ পাদটীকা। শরণ : প্রভিন্‌শিয়েল্ গভর্নমেন্ট, পৃঃ ১৯১।

২ সরকার : এম. অ্যাড্‌মিনিস্ট্রেশন, পৃঃ ৭৪। গুপ্তচরদের প্রভাবের উদাহরণ হামিদউদ্দীনের আহকাম-ই-আলমগীরীতে পাওয়া যায়। (ইংরেজী অনুবাদ—সরকার : অ্যানিকডোট্‌স্ অফ আওরঙ্গজেব, পৃঃ ৬১-৬২, ৬৪-৬৫।

ধা, প্রতিবন্ধকতা ও অসুবিধার সম্মুখীন সম্রাটকে হইতে হইয়াছিল।[১] প্রাদেশিক সরকারের উপর কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখা তখন যথার্থ সমস্যা ছিল।

প্রাদেশিক শাসন-ব্যবস্থার সহিত সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের বিশেষ করিয়া গভর্ণর ও তাঁহার মন্ত্রীদের কার্যকলাপ তদারক ও নিয়ন্ত্রণ করিবার জন্য, মোগল সম্রাটদিগকে বহুবিধ উপায় অবলম্বন করিতে হইয়াছিল এবং নানা প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করিতে হইয়াছিল। কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা বৃদ্ধি করা ও প্রাদেশিক গভর্ণরের ক্ষমতা খর্ব করিবার জন্য, আকবরকে যে শাসন-নীতি অবলম্বন করিতে হইয়াছিল, উহাকে এক কথায় মোগলদের শাসন-ব্যবস্থায় 'বাধা-প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির দ্বারা কর্মকর্তাদের ক্ষমতা হ্রাস করিবার ভারসাম্য রক্ষার'[২] নীতি বলা যাইতে পারে। প্রথমতঃ প্রদেশের গভর্ণরকে দীর্ঘদিনের জন্য একই প্রদেশে রাখা হইত। গভর্ণরদিগকে সাধারণতঃ তাঁহাদের মন্ত্রিবর্গসহ প্রায়ই এক প্রদেশ হইতে অন্য প্রদেশে বদলী করা হইত; সুতরাং বারংবার বদলী হওয়ার দরুন, কোন গভর্ণরের পক্ষেই কোন প্রদেশে স্বীয় ক্ষমতা দৃঢ়করণ সম্ভব ছিল না। তদুপরি, গভর্ণরদের বিরুদ্ধে কর্তব্যে অবহেলা কিংবা অত্যাচার-উৎপীড়নের অভিযোগ সম্রাটের কর্ণগোচর হইলে, কালবিলম্ব না করিয়া তাঁহাদিগকে অপসারিত করা হইত।[৩] দ্বিতীয়তঃ, গুপ্তচর বাহিনী, আখ্-বার-নবিস, গোপনে সংবাদ প্রেরণ সংস্থা, গোয়েন্দাবিভাগ ছিল অত্যধিক শক্তিশালী, তাহারা প্রাদেশিক কর্মকর্তা ও সাধারণ কর্মচারীদিগকে সুষ্ঠুভাবে কর্তব্য ও দায়িত্ব পালনে সর্বদা সতর্ক রাখিত। তাহারা ছিল গভর্ণর ও অন্যান্য উচ্চপদস্থ কর্মকর্তার নিকট এক বিরাট ভীতি সঞ্চারের উৎস স্বরূপ। তৃতীয়তঃ, প্রদেশে দ্বৈত শাসন-ব্যবস্থায় স্বাধীন দিওয়ান ছিল সুবাদারের উপর এক মারাত্মক প্রতিবন্ধক স্বরূপ। বখ্‌শী অনেক সময় ওয়াকেয়া-নবিসও ছিলেন; তাঁহার অধীনে ছিল গোপনীয় সংবাদ-দাতারা—সাওয়ানিহ্-নবিস, হরকরাহ্,

১ হুসাইনি: এম. অ্যাড্‌মিনিস্ট্রেশন, পৃঃ ২২৮; শরণ: প্রভিন্‌শিয়েল্ গভর্ণমেণ্ট, পৃঃ ২০২।

২ পূর্বোক্ত, পৃঃ ২২৮।

৩ জনসাধারণের সহিত অন্যায় আচরণের অভিযোগে, মানসিংহের মত প্রভাবশালী কর্মকর্তা কেও কাবুল হইতে প্রত্যাহবান করা হইয়াছিল।—আকবর-নামা, তৃতীয় খণ্ড, পৃঃ ৫১৭-৫১৮।

বাংলাদেশের রাজস্বের অপব্যয়ের অভিযোগে শায়েস্তা খানকে কেন্দ্রে রাজদরবারে উপস্থিত হইয়া সম্রাটের নিকট অভিযোগ খালন করিতে হইয়াছিল। নির্দোষ প্রমাণিত হইবার পর, পুনরায় তিনি সুবাদারের পদে অধিষ্ঠিত হন।—রিয়াজ-উস্-সালাতিন, পৃঃ ২২২—২২৩।

ইত্যাদি। সুতরাং তাহাদের ভয়ে গভর্নর উদ্ধত ও স্বেচ্ছাচারী হইতে সাহস পাইতেন না এবং যাহাতে বখ্‌শীর আস্থা না হারান, সেদিকে তিনি সজাগ থাকিতেন। চতুর্থতঃ, সম্রাটের মধ্যে মধ্যে প্রদেশসমূহ পরিদর্শন এবং কৃষকদের মঙ্গল সাধনের জন্য সম্রাটের আন্তরিক আগ্রহ, অত্যাচার-অনাচারের উপর প্রকট প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করিত।[১] প্রদেশের শাসন-ব্যবস্থা একটি সুষ্ঠু ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য এবং অনাচার-অবিচারের উৎসসমূহ বিনষ্ট করিবার জন্য আরও অন্যান্য সংস্কার সাধনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিয়া আকবর রাজা টোডরমলকে উক্ত মর্মে নির্দেশ দেন। ব্যক্তিগতভাবে সম্রাটের প্রদেশসমূহ পরিদর্শন ব্যতীত রাজদরবারের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাগণকে মধ্যে মধ্যে প্রদেশ পরিদর্শনের জন্য প্রেরণ করা হইত এবং ভ্রমণ হইতে প্রত্যাগমনের পর তাহাদিগকে সম্রাটের নিকট পরিদর্শিত প্রদেশসমূহের অবস্থা সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণী পেশ করিতে হইত।

উল্লিখিত কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির সাফল্যজনক বাস্তবায়নের ফলে, ইহা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না যে, মোগল শাসন আমলে দেশে শান্তি ও নিরাপত্তা বিরাজ করিত; মোট কথা, জনসাধারণ সুখী ও সন্তুষ্ট ছিল।[২]

প্রবলভাবে কেন্দ্রীভূত সরকারের শাসন-ব্যবস্থা অপেক্ষা আর অন্য কোন কিছু এশিয়াবাসীদের মনে বেশী বিতৃষ্ণার ভাব জাগ্রত করে না। মোগল আমলে প্রতিটি ক্ষুদ্র পল্লী-গ্রামে, প্রতিটি শহর-নগরে, প্রকৃতপক্ষে নিজেদের ব্যাপার দেশবাসী নিজেরাই তদারক করিত এবং বিবাদ-বিসম্বাদ নিজেরাই মীমাংসা করিত। স্থানীয় শাসন-ব্যবস্থায় শুধু অবাধ্যতার পরিচয় পাইলে, তদানীন্তন মোগল কেন্দ্রীয়-সরকার হস্তক্ষেপ করিতে বাধ্য হইত।[৩]

প্রতিটি সুবা কয়েকটি সরকার-এ এবং প্রতিটি সরকার কয়েকটি পরগণা বা মহলে বিভক্ত ছিল। পরগণা ছিল নিম্নতম সরকারী প্রশাসনিক একক এবং পরগণার নিম্নে ছিল গ্রাম্য-পঞ্চায়েৎ। পঞ্চায়েৎ ছিল উৎপত্তি হইতেই জনপ্রিয়

---

১ স্মরণ: প্রভিন্‌শিয়েল্ গভর্নমেণ্ট, পৃঃ ২০৪-২০৫।

আকবর দুইবার কাশ্মীর ভ্রমণ করিয়া তথাকার শাসন-ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন করেন।—আকবর-নামা, তৃতীয়, পৃঃ ৫৪৯, ৭২৭।

জাহাঙ্গীর গুজরাট ভ্রমণ করিয়া তথাকার জনগণের উপকারার্থে শাসন-ব্যবস্থায় অনেক পদক্ষেপ গ্রহণ করেন।—তুজুক-ই-জাহাঙ্গীরী, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ৪৪০।

২ স্মরণ: প্রভিন্‌শিয়েল্ গভর্নমেণ্ট, পৃঃ ২০৬।

৩ খুদাবখ্‌শ: দি অরিয়েণ্ট, পৃঃ ২৩৮।

এবং কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক অনুমোদিত ও স্বীকৃত। আইন-ই-আকবরী অনুযায়ী, ১৫৯৬ খ্রীস্টাব্দে ১০৫টি সরকার ও ২৭৩৭টি পরগণা মোগল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। কিন্তু বারংবার প্রশাসনিক পরিবর্তন ও নূতন রাজ্য সংযোজনের দরুন, উল্লিখিত সরকার ও পরগণার সংখ্যা প্রায়ই পরিবর্তিত হইত।[১]

সরকার-এর শাসন-ব্যবস্থায় 'হুজুর' অর্থাৎ প্রশাসনিক প্রধান ও 'মল্' অর্থাৎ রাজস্ব প্রধান ছিলেন যথাক্রমে ফৌজদার ও আমলগুজার।[২] আইন-ই-আকবরীতে আইন-ই-ফৌজদারের উল্লেখ পাওয়া যায়। আইন-ই-ফৌজদার ছিল ফৌজদারের প্রতি কেন্দ্রীয় সরকারের প্রদত্ত নির্দেশমালা। ফৌজদারকে প্রশাসনের তিনটি শাখা—রাজস্ব, পুলিশ ও সামরিক বাহিনীর দায়িত্ব পালন করিতে হইত। রাজস্ব শাসন-ব্যবস্থায় অবশ্য তাঁহার ভূমিকা ছিল পরোক্ষ—প্রত্যক্ষ নহে। কৃষকগণ অবাধ্য হইয়া উঠিলে, রাজস্ব আদায় করিতে আমলগুজারকে তাঁহার সাহায্য করিতে হইত। সরকার-এর অন্তর্গত গ্রাম্য অঞ্চল ও সীমান্ত অঞ্চলের নিরাপত্তা বিধান করা ছিল তাঁহার প্রধান কর্তব্য ও দায়িত্ব। স্থানীয় সেনাবাহিনী সুসজ্জিত রাখা, শৃঙ্খলা বজায় রাখা এবং নিয়মিত পরিদর্শন করাও ছিল তাঁহার দায়িত্বের অন্যতম। যদিও রাজস্ব ও বিচার-ব্যবস্থার হস্তক্ষেপ করিবার তাঁহার কোন ক্ষমতা ছিল না, তথাপি সরকার-এর প্রশাসনিক প্রধানরূপে, ফৌজদার সার্বিক শাসন-ব্যবস্থার প্রতিক্ষেত্রে সাধারণভাবে তদারক করিতে পারিতেন। ফৌজদার বা থানাদারদের বিস্তারিত বর্ণনা মিরাট-ই-আহমদীতে পাওয়া যায়।[৩]

ফৌজদার ও আমলগুজার ব্যতীতও, বিচার ও ধর্ম-বিষয় সংক্রান্ত দপ্তরের দায়িত্বে সরকার শাসন-ব্যবস্থায় আরও দুইজন কর্মকর্তা নিয়োজিত ছিলেন। তাঁহারা ছিলেন কাজী ও কোতোয়াল। ইহা বিশেষ উল্লেখযোগ্য যে, ফৌজদারের বিচার করিবার ক্ষমতা ছিল না; সুতরাং সরকার-এর শাসনে ফৌজদার

---

১ বৃটিশ মিউজিয়াম ও ইণ্ডিয়া অফিস গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত বিবিধ দস্তুর-উল্-আমলে বিভিন্ন সময়ের সুবা ও সরকারের তালিকা দেওয়া আছে, কিন্তু উহাদের মধ্যে একের সহিত অন্যের মিল পাওয়া যায় না।—শরণ: প্রভিন্‌শিয়েল্ গভর্নমেন্ট, পৃঃ ২০৭ পাদটীকা।

২ ইহা নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে, শেরশাহের আমলের শিকদার-ই-শিকদারান ও মুনসিফ-ই-মুনসিফানের পরিবর্তে, আকবর যথাক্রমে ফৌজদার ও আমলগুজার শব্দ ব্যবহার করেন, যদিও শাসন-ব্যবস্থায় তাহাদের ক্ষমতার অধিক্ষেত্র ও দায়িত্বের কোন পরিবর্তন করেন নাই।—শরণ: প্রভিন্‌শিয়েল্ গভর্নমেন্ট, পৃঃ ২১৩-২১৪।

৩ খান: মিরাট-ই-আহমদী, পৃঃ ১৮৮।

গভর্নরের প্রতিনিধিরূপে আইন-শৃংখলা রক্ষার দায়িত্বে নিযুক্ত ছিলেন। এই ভাবে লক্ষ্য করা যায় যে, সরকার-এর শাসন-ব্যবস্থায় চারিজন প্রধান কর্মকর্তা নিয়োজিত ছিলেন, যথা, ফৌজদার, আমলগুজার, কোতোয়াল ও কাজী।

পরগণার শাসন-ব্যবস্থায় ফৌজদার ও কোতোয়ালের দায়িত্বাদি শিকদার পালন করিতেন। তিনি ছিলেন পুলিশ ও ফৌজদারী বিচারের দায়িত্বে নিযুক্ত। অপরদিকে, দেওয়ানী বিচার ও রাজস্ব-শাসন যথাক্রমে কাজী ও আমিল দ্বারা পরিচালিত হইত।

পরগণার প্রশাসনিক প্রধানরূপে, পরগণার আইন-শৃংখলা রক্ষা ও নিরাপত্তা বিধান ছিল শিকদারের প্রধান কর্তব্য ও দায়িত্বের অন্যতম। সরকার-এর আমল-গুজারের অনুরূপ, পরগণার রাজস্ব নির্ধারণ ও আদায়ের দায়িত্ব ছিল আমিলের। তাহাকে সরাসরিভাবে পরগণার কৃষকদের সহিত যোগাযোগ রক্ষা করিয়া, রাজস্ব নির্ধারণ ও আদায়ের কাজ সম্পন্ন করিতে হইত। উক্ত প্রধান দায়িত্ব পালন ব্যতীত, গ্রাম্য-প্রধানদের সহিত একত্রিত হইয়া পরগণার আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা এবং দুরাচার লোকদিগকে শাস্তি প্রদানের কাজে শিকদারকে আমিল সহযোগিতা করিতেন। একইভাবে অবাধ্য কৃষকদের নিকট হইতে রাজস্ব আদায়ের ব্যাপারে, আমিলকে শিকদার সাহায্য করিতেন। সাধারণ-ভাবে পরগণার সুষ্ঠু শাসন পরিচালনার জন্য, শিকদার ছিলেন কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিনিধি,[১] আমিল কিংবা অন্য কোন কর্মচারী নহে। শিকদার, জায়গীরদার ও দারোগা পরগণার অন্তর্গত শহরে, সমাজ-বিরোধী ভয়ঙ্কর চরিত্রের লোকদিগের আগমন ও প্রত্যাবর্তনের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিতেন।[২] সংক্ষেপে বলা যায় যে, পরগণা শাসনের প্রধানরূপে, শিকদার ফৌজদার ও কোতোয়ালের প্রতিনিধিত্ব করিতেন এবং পরগণার সার্বিক শাসন-ব্যবস্থা সাধারণভাবে তদারক করিতেন।[৩]

ভারতে শহরের স্থানীয় শাসন-ব্যবস্থা[৪] ('তদ্‌বির-উল্‌-বালাদ্‌') সম্পর্কে,

---

১ সারওয়ানী : শেরশাহী, ১১৩।
২ ইলিয়ট ও ডাওসন্‌ : হিস্টরি অফ ইণ্ডিয়া, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ৬১।
৩ শরণ : প্রভিন্‌শিয়েল্‌ গভর্নমেন্ট, পৃঃ ২১৩।
৪ মোগল আমলের শহরের শাসন-ব্যবস্থা সম্পর্কে দ্রষ্টব্য—যদুনাথ সরকার : 'সিটি অ্যাডমিনি-স্ট্রেশন আণ্ডার দি মোগল এম্‌পায়ার্স'—ক্যালকাটা মিউনিসিপ্যাল্‌ গেজেট সেভেন্টিন্থ অ্যানিভারসারি নাম্বার ১৯৪১, ৬ই ডিসেম্বর, পৃঃ ১৬-১৮।

সমসাময়িক লেখকগণ আমাদিগকে খুব বিস্তারিত সংবাদ পরিবেশন করেন নাই। শুধু মিরাট-ই-আহমদী আহমদাবাদের পুলিশ-ব্যবস্থা ও পৌর সংগঠন সম্পর্কে প্রচুর আলোকসম্পাত করিয়াছে। ইহা ব্যতীত, মোগল আমলে ইউরোপীয় পরিভ্রমণকারী যাহারা ভারত পর্যটন করিয়াছেন, তাঁহাদের ভ্রমণকাহিনীতে শহরের স্থানীয় শাসন-ব্যবস্থার সামান্য উল্লেখ আছে। আমরা শুধু জানি যে, কোতোয়ালের ক্ষমতা ও কর্তব্য বর্তমান যুগের পুলিশ-প্রধানের ক্ষমতা ও দায়িত্বের সমতুল্য ছিল এবং তিনিই কেবল শহরের শাসন পরিচালনার দায়িত্বে নিযুক্ত ছিলেন। বর্তমানকালের পৌরসভার কর্তব্য ও দায়িত্বের তুলনায় অন্ততঃপক্ষে নীতির দিক হইতে, কোতোয়ালের কর্তব্য ও দায়িত্ব অনেক বেশী বিস্তৃত ছিল।[১]

কোতোয়ালের ক্ষমতা ও কর্তব্যাদি সম্পর্কে, দেশী ও বিদেশী সমসাময়িক সূত্রে প্রচুর তথ্য পাওয়া যায়। আইন-ই-আকবরীতে আইন-ই-কোতোয়াল ও ১৫৯৫ খ্রীস্টাব্দে প্রচারিত আকবরের ফরমানে, কোতোয়ালের ক্ষমতা ও কর্তব্যাদির সুস্পষ্ট নির্দেশ রহিয়াছে।[২] তাঁহার নানাবিধ দায়িত্ব ও কর্তব্য নিম্নলিখিত পর্যায়ভুক্ত ছিল: (ক) শহর-নগরে নিরাপত্তা বিধান,[৩] আইন শৃঙ্খলা রক্ষা ও শান্তি প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে নিয়মিত পুলিশ পাহারার[৪] বন্দোবস্ত করা, (খ) বাজার-হাটে দ্রব্যের ওজন ও মূল্য-নিয়ন্ত্রণ, (গ) উত্তরাধিকারী-বিহীন সম্পত্তির তদারক ও নিষ্পত্তি, (ঘ) সতী প্রথার[৫] মত সামাজিক অনাচার, কুসংস্কার রহিতকরণ, (ঙ) গোরস্তান, কবরস্তান ও কসাইখানা নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি।

মোগল সাম্রাজ্যের কয়েকটি বন্দর খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল, কারণ প্রচুর আমদানী-রপ্তানি, ব্যবসা-বাণিজ্য ঐ সকল বন্দর দিয়া পরিচালিত হইত। ঐ বন্দর-গুলির সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় শাসন-ব্যবস্থা গড়িয়া উঠে। মোগল আমলে সুরাট ছিল একটি প্রথম শ্রেণীর বন্দর। মিরাট-ই-আহমদীতে, সুরাট বন্দরের শাসন-ব্যবস্থার একটি পূর্ণাঙ্গ বিবরণ পাওয়া যায়।

---

১ শরণ: প্রভিন্‌শিয়েল্‌ গভর্নমেন্ট, পৃ: ২৩১-২৩২।

২ ইনশা-ই-হরকরানেও উক্ত একই মর্মে একটি খসড়া ফরমান (নং ৩) আছে।—শরণ: প্রভিন্‌-শিয়েল্‌ গভর্নমেন্ট, পৃ: ২৩৩ পাদটীকা।

৩ এফ. এস. মনরিক: ট্রাভলস্‌ (১৬৪০-১৬৫৩), দ্বিতীয়, পৃ: ১৮৮-১৮৯।

৪ খান: মিরাট-ই-আহমদী, প্রথম খণ্ড, ৯৯; থেভেনট্‌, তৃতীয় খণ্ড, ২০।

৫ পেলসারেট্‌: দি রিমনস্ট্রান্‌তি, পৃ: ৭৯।

বন্দরের প্রধান কর্মকর্তা গভর্নরকে মুতাসাদ্দি বলা হইত। তিনি বন্দরের সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য সম্পূর্ণভাবে দায়ী ছিলেন। বন্দরের গভর্নর মুতাসাদ্দি পদ-মর্যাদায় প্রাদেশিক গভর্নরের সমতুল্য ছিলেন।[১] যদি একজন গভর্নর একাধিক বন্দরের দায়িত্বে নিযুক্ত হইতেন, তাহা হইলে তিনি প্রতিটি বন্দরের জন্য একজন দারোগা নিয়োগ করিতেন।

বন্দরের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাগণ সরাসরি কেন্দ্রীয় সরকারের সদর দপ্তর দ্বারা নিয়োজিত হইতেন। বন্দরের শাসন-ব্যবস্থার সহিত সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কর্মকর্তা-দিগের নাম[২] নিম্নে প্রদত্ত হইল ঃ

(ক) সদর ও কাজী (সচরাচর পদ দুইটি সংযুক্ত ছিল)
(খ) বখ্শী ও ওয়াকেয়া-নিগার
(গ) সাওয়ানিহ্-নবিস
(ঘ) হরকরাহ্
(ঙ) মুহ্তাসিব
(চ) আরব ও ইরাকী অশ্ব ক্রয় করিবার দপ্তরের এবং গোবাদি পশুর ক্রয়-বিক্রয়ের বাজারের দারোগা
(ছ) দপ্তর ও কোষাগারের দারোগা (তদারককারী)
(জ) খরচ-পত্রাদির আমিন (নিয়ন্ত্রণকারী)
(ঝ) আদালত, পূর্ত বিভাগের দারোগা
(ঞ) টাঁকশাল ও লবণ বিভাগের দারোগা
(ত) শুল্ক-কর বিভাগের দারোগা
(থ) দান-দক্ষিণা, রন্ধনশালা ও দরিদ্রের জন্য ত্রাণ বিভাগের তদারককারী
(দ) ভাড়া, কর আদায়ের দারোগা
(ধ) হাসপাতালের তদারককারী
(ন) শস্যের বাজারের দারোগা
(প) লঙ্গরখানার খরচ-পত্রাদির নিয়ন্ত্রণক্যারী
(ফ) মক্কা-মদীনা পবিত্র তীর্থস্থানের জন্য বার্ষিক উপহার প্রেরণের দারোগা।

বন্দরের প্রশাসনিক কর্মকর্তাগণ প্রত্যেক ব্যক্তির মাল-পত্র কঠোরভাবে তল্লাশী করিতেন, কারণ ওলন্দাজ ও ইংরেজ বণিকগণ, ব্যবসায়িগণ প্রচুর পরিমাণে

১ থেভেনট্, তৃতীয় খণ্ড, পৃঃ ১৯-২০ ; শরণ : প্রভিনশিয়েল্ গভর্নমেন্ট, পৃ: ২১৬।
২ শরণ : পূর্বোক্ত, পৃঃ ২১৬—২১৭।

মূল্যবান প্যাথর, মণি-মুক্তা চোরাচালানের জন্য নানাবিধ ছলচাতুরী, কলা-কৌশল ও অসৎ উপায় অবলম্বন করিত।[১]

মোগল আমলে স্থানীয় শাসন ব্যবস্থায়, গ্রাম্য সম্প্রদায় পদ্ধতি একটি বিশেষ স্থান অধিকার করিয়া আছে। মুসলিম শাসকগণ তাঁহাদের দূরদৃষ্টি ও পরিণাম-দর্শিতার জন্য, গ্রাম্য স্থানীয় শাসন-ব্যবস্থায় হস্তক্ষেপ করিতেন না। গ্রামবাসীরা তাহাদের স্বীয় মনোনীত গ্রাম্য প্রধানের মাধ্যমে, স্থানীয় রীতিনীতি, দেশাচার ও প্রথানুযায়ী, তাহাদের নিজেদের বিষয়াদি মীমাংসা করিত। এক কথায় বলা চলে যে, গ্রাম্য শাসন মোটামুটি গ্রামবাসীদের দ্বারাই পরিচালিত হইত।[২] আরব সাম্রাজ্যে খলিফাদের শাসন-ব্যবস্থা অপেক্ষা, ভারতে মোগল শাসন আমলে গ্রামের শাসন-ব্যবস্থায় নির্বাচনের নীতি বহুলাংশে প্রচলিত ছিল।

যদুনাথ সরকার মোগল আমলের গ্রাম্য শাসন-ব্যবস্থা সম্পর্কে সমালোচনা করিয়া তীব্র মন্তব্য করেন যে, ভারতে মোগল সম্রাটগণ, তাঁহাদের সভাসদ ও কর্মকর্তাগণ ছিলেন মূলতঃ নগরবাসী, সুতরাং গ্রাম্য অঞ্চল তাঁহাদের দ্বারা 'অবহেলিত ও উপেক্ষিত' ছিল।[৩] যদিও এই কথা অনস্বীকার্য যে, গ্রাম হইতেই তাঁহাদের খাদ্য সরবরাহ হইত এবং গ্রামই রাষ্ট্রের আয়ের উৎস ছিল, তথাপি মোগল কর্মকর্তাগণ গ্রামের জীবন অপছন্দ করিতেন এবং গ্রামবাসীদের স্বার্থের প্রতি উদাসীন ছিলেন। গ্রাম্য শাসন-ব্যবস্থা ও মোগলদের নীতি সম্পর্কে যদুনাথ সরকারের উল্লিখিত অভিমত ও কটাক্ষপাত অনুচিত, অবাঞ্ছিত ও অসমর্থিত[৪] বলিয়া মনে হয়। আসল প্রশ্ন হইতেছে যে, মোগল শাসকগণ জনসাধারণের সুখ সমৃদ্ধির প্রতি লক্ষ্য রাখিতেন কিনা? যদুনাথ সরকার নিজেই আবার স্পষ্টভাবে স্বীকার করিয়াছেন যে, মুসলিম ভারতের শাসকগণ বুদ্ধিমানের মত, গ্রাম্য শাসনের পুরাতন রীতিনীতিই চালু রাখেন, হিন্দুযুগের রাজস্ব আদায় পদ্ধতি অপরিবর্তিত রাখেন এবং রাজস্ব বিভাগে একচেটিয়াভাবে হিন্দু কর্মচারী নিয়োগ করেন। ইহার ফল হইয়াছিল এই যে, কেন্দ্রে রাজধানীতে শাসকগোষ্ঠীর পরিবর্তন হইলেও, গ্রামবাসী জন-

১ হুসাইনি: এম. অ্যাড্মিনিস্ট্রেশন, পৃঃ ২৩১।
২ আর. সি. মজুমদার: করপোরেট্ লাইফ্ ইন এন্শেন্ট ইণ্ডিয়া, পৃঃ ৫৮।
৩ সরকার: এম. অ্যাড্মিনিস্ট্রেশন, পৃঃ ৫৫; জে. মাথ্হাই: ভিলেজ্ গভর্নমেন্ট ইন ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া, পৃঃ ৯।
৪ শরণ: প্রভিন্ শিয়েল্ গভর্নমেন্ট, পৃঃ ১৬৭-১৬৮ পাদটীকা।

সাধারণের জীবনে প্রশান্তি বিরাজমান ছিল এবং নূতন শাসকের শাসন-ব্যবস্থা প্রচলিত হইলেও, তাহাদের অসন্তুষ্ট হইবার কিংবা শাসকের বিরোধিতা করিবার কোন কারণ ছিল না।[১]

গ্রাম্য পরিষদ ছিল গ্রাম্য শাসন-ব্যবস্থার প্রধান বৈশিষ্ট্য। প্রাচীনকাল হইতে উক্ত গ্রাম্য পরিষদ পঞ্চায়েৎ নামে পরিচিত। ইহা ছিল, এক কথায়, একটি স্থানীয় সরকার।[২] মোগল কেন্দ্রীয় সরকার অহেতুক স্থানীয় শাসন-ব্যবস্থায় হস্তক্ষেপ না করিয়া, ভারতের পুরাতন ঐতিহ্যকে সম্মান প্রদর্শন করিয়াছে।[৩]

আরব দেশের প্রত্যেক গোত্রের বয়োবৃদ্ধদের সংসদের অনুরূপ, ভারতে প্রত্যেক গ্রামে একটি করিয়া পরিষদ ছিল। গ্রাম্য পঞ্চায়েতের গঠন সম্পর্কে বলা যায় যে, কোন কোন গ্রামে পৃথক পৃথক সামাজিক শ্রেণী, বর্ণ অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন পঞ্চায়েৎ ছিল, আবার গ্রামের অধিবাসীদের সকলকে লইয়া সমগ্র গ্রামের জন্যও, একটি গ্রাম্য-পঞ্চায়েৎ গঠিত হইত।

আর্থিক মর্যাদা, বয়স, অভিজ্ঞতা ও অন্যান্য ব্যক্তিগত গুণাবলী গ্রাম্য-পঞ্চায়েতের সদস্য নির্বাচিত হইবার যোগ্যতা হিসাবে বিবেচনা করা হইত। নির্বাচন ব্যাপারে স্ত্রী-পুরুষের কোন পার্থক্য ছিল না। যোগ্য বিবেচিত হইলে, স্ত্রীলোককেও নির্বাচিত করা হইত।[৪] প্রাক-ইসলামী-যুগে আরবদের মধ্যে যে পদ্ধতিতে গোত্রপ্রধান ও সদস্য নির্বাচিত হইত, অনুরূপ পদ্ধতিতে ভারতেও গ্রাম্য-পঞ্চায়েতের প্রধান ও সদস্য মনোনীত হইবার রীতি প্রচলিত ছিল। ইহা ছিল আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সর্বসম্মতিক্রমে মনোনয়নের প্রথা। স্যার হার্বাট রিচলি গ্রাম্য-পঞ্চায়েতের নির্বাচন পদ্ধতির উপর বিশেষ আলোকপাত করিয়াছেন। তাঁহার মতে, পঞ্চায়েৎ নির্বাচন পদ্ধতিকে ইউরোপের রাজনীতির বিশিষ্ট অর্থবোধক শব্দ সমষ্টির তালিকাভুক্ত 'নির্বাচনের' সহিত তুলনা করা উচিত হইবে না।[৫] প্রচলিত নিয়ম ছিল যে, গ্রামবাসী একত্রিত হইয়া নিজেদের মধ্যে আলাপ-আলোচনা করিত এবং অবশেষে সর্বসম্মতিক্রমে একটি সিদ্ধান্তে

---

১ সরকার : এম. অ্যাড্‌মিনিস্ট্রেশন, পৃঃ ২৪৬।
২ লুড্‌লো : ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া—ইটস্ রেসেস্ অ্যাণ্ড ইটস্ হিস্টরি, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ৬৪-৬৫।
৩ স্যার্‌জ ন্‌ ম্যাল্‌কম : মেমোয়ারস্ অফ সেণ্ট্রাল ইণ্ডিয়া, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ৩।
৪ মাথাই : ভিলেজ্ গভর্নমেণ্ট, পৃঃ ২৯।
৫ হুসাইনি : এম. অ্যাড্‌মিনিস্ট্রেশন, পৃঃ ২৩৪।

পেঁীছাইত।[১] এই পদ্ধতিকে প্রস্তাবের পক্ষে উচ্চস্বরে আগ্রহের সহিত সম্মতি দানের মাধ্যমে নির্বাচন রূপে বর্ণনা করা যায়। উক্ত পদ্ধতির মাধ্যমেই, প্রাচীন গ্রীক ও জার্মান জনপ্রিয় সংসদ নির্বাচিত হইত, এবং ইহাই পৃথিবীর অতি প্রাচীন নির্বাচন পদ্ধতি।[২]

গ্রাম্য-পঞ্চায়েতের কর্ম-প্রণালীতে লক্ষ্য করা যায় যে বিশেষ জরুরী বিষয়ের মীমাংসার জন্য সমগ্র সম্প্রদায়ের সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হইত, আর কয়েকটি উপ কমিটির মাধ্যমে নির্বাচিত পরিষদ পঞ্চায়েতের স্বাভাবিক দৈনন্দিন কাজকর্ম সম্পাদন করিত। নিম্নলিখিত উপ-কমিটির[৩] নাম উল্লেখ করা যায়ঃ

(ক) বার্ষিক কমিটি
(খ) বাগান কমিটি,
(ক) পুষ্করিণী কমিটি,
(ঘ) স্বর্ণ কমিটি এবং
(ঙ) বিচার কমিটি।

জে. মাথহাই স্থানীয় শাসন-ব্যবস্থায় পঞ্চায়েতের বিভিন্ন কর্মদারীদের কর্তব্যাদির বিস্তারিত বর্ণনা দিয়াছেন।[৪] গ্রাম্যপ্রধান গ্রামের সর্ববিষয়ের তদারক করিতেন, ঝগড়া-বিবাদ মীমাংসা করিতেন, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা করিতেন এবং তাঁহার অধীনস্থ কর্মচারী গ্রামের রাজস্ব আদায় করিত।

হিসাব রক্ষক চাষবাসের সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি ও আয়-ব্যয়ের হিসাব রাখিত।[৫]

পাহারাদাররা গ্রামের নিরাপত্তা বিধানের জন্য, চোর-ডাকাতের উপদ্রব রহিত করিবার জন্য এবং নানা প্রকার অপরাধজনিত কার্যকলাপ রদ করিবার জন্য সর্বপ্রকার পাহারার ব্যবস্থা করিত।

সীমারক্ষাকারী কর্মচারী গ্রামের সীমা রক্ষা করিত এবং সীমা লইয়া ঝগড়া-বিবাদে সাক্ষ্য-প্রমাণ দিত।

পুরোহিত গ্রামের পূজা-আরাধনা, ধর্ম-কর্ম পরিচালনা করিতেন।

---

১ রুশো 'জেনারাল্ উইল্'-এর অনুরূপ।—হুসাইনি: এম. অ্যাড্মিনিস্ট্রে:শন, পৃঃ ২৩৪ পাদটীকা

২ স্পীচ্ বেঙ্গল লেজিস্লেটিভ্ কাউন্সিল, ২৩শে জুলাই, ১৮৯২।

৩ মাথ্হাই: ভিলেজ্ গভর্নমেন্ট, পৃঃ ২০-২৬।

৪ দিনাজপুরের গ্রাম্য-পঞ্চায়েতের, পুরাতন পদ্ধতি অনুযায়ী, কর্মকর্তাদের কর্তব্যাদির বিস্তারিত আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য—রিপোর্ট অফ ক্রিমিন্যাল্, জাসটিস লোয়ার প্রভিন্সেস্ অফ বেঙ্গল, ১৮৮১, পৃঃ ৪; স্মরণঃ প্রভনশিয়েল্ গভর্নমেন্ট, পৃঃ ২৪৩-২৪৪।

৫ সি. এইচ. আই, চতুর্থ খণ্ড, পৃঃ ৪৫২।

বিদ্যালয় শিক্ষক গ্রামের ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া শিক্ষা দিতেন।

ইহা ব্যতীত, পুকুর তদারককারী, চিকিৎসক, জ্যোতিষী, গণক, ধাতুশিল্পী, ছুতার মিস্ত্রী, নাপিত, ধোপা, কুম্ভকার ইত্যাদি গ্রামের নানা কাজে লিপ্ত থাকিত।

গ্রাম্য-পঞ্চায়েৎ দেওয়ানী, ফৌজদারী, ধর্মীয়, সামাজিক, অর্থনৈতিক সকল প্রকারের বিবাদ-সংঘর্ষ মীমাংসা করিত।[১] ঝগড়া-বিবাদ মীমাংসা, নিরাপত্তা বিধানের জন্য পাহারার বন্দোবস্ত, শিক্ষা-ব্যবস্থা, স্বাস্থ্যকর ব্যবস্থার উৎকর্ষ সাধন, পূর্তকার্য, দরিদ্রদিগের ত্রাণ, চিকিৎসা-ব্যবস্থা, খেলাধূলা, আমোদ-প্রমোদ, উৎসবাদির ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি ছিল পঞ্চায়েতের স্বাভাবিক কাজকর্মের অন্তর্ভুক্ত।

প্রাচীন গ্রাম্য সম্প্রদায়ের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ গ্রাম্য প্রধানের মধ্যস্থতা ও সালিসির মাধ্যমে নিষ্পত্তি হইত। গ্রাম্য প্রধান স্বয়ং ছোট ছোট বিবাদ মীমাংসা করিতেন, কিন্তু অধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদি বয়োবৃদ্ধদের সমন্বয়ে গঠিত সংসদের সাহায্যে, বিবেচনা করিয়া নিষ্পত্তি করিতেন। মোগল সম্রাটদের সদা-সতর্ক দৃষ্টির দরুন, গ্রাম্যপ্রধানগণ তাঁহাদের ক্ষমতার অপব্যবহার করিতে পারিতেন না এবং তাঁহারা সংযমী হইতে বাধ্য হইতেন।[২]

গ্রাম্য পঞ্চায়েতের প্রধান সকল জাতীয় ঝগড়া-বিবাদ মীমাংসা করিলেও, যদি বাদী-বিবাদীর কোন এক পক্ষ পঞ্চায়েতের সিদ্ধান্তে সন্তুষ্ট না হইত, তাহা হইলে ক্ষুব্ধ-পক্ষ সরকারী বিচারালয়ের নিম্ন পর্যায় হইতে সর্বোচ্চ-পর্যায় পর্যন্ত, আপীল অর্থাৎ পুনর্বিচারের জন্য সনির্বন্ধ প্রার্থনা করিতে পারিত।

অভিযোগের সত্যতা উদ্ধার ও বিচারে নির্ভুল রায় প্রদান করা, সরকারী আদালত অপেক্ষা গ্রাম্য পঞ্চায়েতের পক্ষে অধিক সুবিধাজনক ও সহজ ছিল, কারণ গ্রামের একই সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিদিগকে পঞ্চায়েতের পক্ষে যতটা গভীর ও সঠিকভাবে জানা সম্ভব, বিচারালয়ের বিচারকের পক্ষে উহা সম্ভব নহে।[৩] গ্রাম্য পঞ্চায়েতের বিচারের সর্বাপেক্ষা সুযোগ-সুবিধা ছিল এই যে, গ্রাম্যবাসীকে ঝগড়া-বিবাদ মীমাংসার জন্য কোন ফি দিতে হইত না। অধিকন্তু, সরকারী আদালতে মামলা-মোকদ্দমার বিচার করিতে গিয়া গ্রামবাসীদিগকে যে অনর্থক প্রচুর অর্থ ব্যয় করিতে হইত এবং হয়রানিও পোহাইতে হইত, গ্রাম্য পঞ্চায়েত-বিচার-ব্যবস্থায় উহারও অবসান ঘটে।[৪]

---

১ সাইয়েদ আহমদ খান : কাদিম্ নিজাম-ই-দেহ্‌লি, পৃঃ ১৩-১৪।

২ মাথ্‌হাই : ভিলেজ্ গভর্নমেন্ট, পৃঃ ১৬২।

৩ ভি. এ. স্মিথ্ : র‍্যাম্বল্‌স্ অ্যাণ্ড্ রিকালেক্‌শন্‌স্ অব স্যার উইলিয়াম স্লীম্যান, দ্বিতীয়, পৃঃ ৩৪-৩৫।

৪ হুসাইনি : এ্যাড্‌মিনিস্ট্রেশন, পৃঃ ২৩৫।

অষ্টম অধ্যায়

উপসংহার

মধ্যযুগীয় ভারতে মোগল শাসন-ব্যবস্থার কৃতিত্ব, ত্রুটি-বিচ্যুতি ও দোষ-গুণ নিরপেক্ষভাবে বিচার করিলে, ইহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, ইহা ছিল জন-কল্যাণময় ও জনহিতৈষী শাসন-ব্যবস্থা। মহান মোগল সম্রাট আকবরের শাসন ব্যবস্থার উদারনীতি, ধর্ম-নিরপেক্ষতা ও ধর্ম-সহিষ্ণুতা অতীব প্রশংসনীয়। হিন্দু-মুসলিম সকলেরই ধর্মের স্বাধীনতা ছিল। জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে নিজ নিজ ধর্ম পালনে কেহই রাষ্ট্রের তরফ হইতে কোন বাধা-বিঘ্ন বা হস্তক্ষেপের সম্মুখীন হইত না।

আকবরের দ্বারা হিন্দুদের উপর হইতে তীর্থ কর উচ্ছেদ সাধন, অমুসলমানদের উপর হইতে জিজিয়া রদকরণ, হিন্দু-খ্রীস্টানদিগকে নূতন মন্দির-গীর্জা নির্মাণের অনুমতি প্রদান, জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে সকলকে সরকারী চাকুরীতে যোগদানের সুযোগ প্রদান এবং সর্বোপরি, হিন্দু-মুসলিমদিগকে এক জাতীয়তাবাদে উদ্বুদ্ধকরণের প্রচেষ্টা, ভারতে মোগল শাসন নীতির প্রশংসনীয় বৈশিষ্ট্য ছিল।[১]

এমনকি সম্রাট আওরঙ্গজেবের রাজত্বকালের তথাকথিত অসহিষ্ণুযুগেও, সমসাময়িক সরকার হইতে মোগল-শাসন তুলনামূলকভাবে উন্নত ছিল। আওরঙ্গজেব কখনও হিন্দুদিগের ব্যক্তিগত ধর্ম পালন, উপাসনা, আরাধনা নিষিদ্ধ করেন নাই বা উহাতে হস্তক্ষেপ করেন নাই। কিন্তু সমসাময়িক ক্যাভেলিয়ার ইংল্যাণ্ডে ধর্ম পালনে সরকারের হস্তক্ষেপের কথা জানা যায়। ১৮৬৭ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত প্রটেস্ট্যাণ্ট গীর্জার সমর্থনে রোমান ক্যাথলিকদিগকে যে হারে কর দিতে হইত, উহা হইতে হিন্দুরা মোগল আমলে বেশী হারে জিজিয়া দিত না।[২] হিন্দুদিগকে সরকারী পদে নিয়োগের ব্যাপারে, আওরঙ্গজেব (যাকে 'অতি নিন্দিত' মনে করা হয়) আকবরের আদৌ পশ্চাদে ছিলেন না, কারণ আকবর মাত্র ১৪ জন হিন্দুকে[৩] মনসবদার নিযুক্ত করেন, পক্ষান্তরে, আওরঙ্গজেব ১৪৮

---

১ হুসাইনি: এম. অ্যাড্মিনিস্ট্রেশন, পৃ: ২৬০।

২ শর্মা: মোগল গভর্নমেন্ট, পৃ: ১৯৫।

৩ দ্রষ্টব্য—মনসবদারগণের তালিকা।—আইন, প্রথম

জন হিন্দুকে[১] মনসবদার নিয়োগ করিয়াছিলেন।

আকবর ও তাঁহার পরবর্তী সম্রাটগণ জনসাধারণের ধর্মবিশ্বাস ও ধর্ম-কর্ম পালনে কখনও বাধার সৃষ্টি করিতেন না। তাঁহারা বহু প্রচলিত সতীপ্রথা (মৃত স্বামীর চিতায় বিধবা স্ত্রীর জীবন্ত দগ্ধ হইয়া মৃত্যুবরণ) রহিত করেন এবং হিন্দু বিধবাদের পুনর্বিবাহের অনুমতি প্রদান করেন। হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের তীব্র বিরোধিতা সত্ত্বেও, আকবর শিশু-বিবাহ বন্ধ ঘোষণা করেন। তিনি নানাবিধ সামাজিক ব্যভিচারের বিরুদ্ধাচরণ করেন এবং উহা দমন করিতে সচেষ্ট হন।

নীতির দিক হইতে মোগল সম্রাটগণ রাষ্ট্রের শাসন-ব্যবস্থার কাঠামোতে সর্বাধিক কঠোর পরিশ্রমী ছিলেন এবং সাম্রাজ্যের শাসন পরিচালনায় এত ব্যস্ত থাকিতেন যে, তাঁহাদের ব্যক্তিগত অবসর বিনোদনের সময় খুব কম ছিল। রাষ্ট্রের শাসনকার্যে অবহেলা প্রদর্শনের অবকাশ তাঁহাদের ছিল না। রাষ্ট্রের প্রশাসনিক যন্ত্রে তাঁহারা ছিলেন সর্বাধিক কর্মঠ অঙ্গ। তাঁহাদের অবিরত সতর্কতা, সদাজাগ্রত তৎপরতা ও কঠোর পরিশ্রমের দরুন, জনসাধারণ নিরাপত্তা অনুভব করিত।

মোগল সরকার কর্তৃক বংশগত অভিজাত সম্প্রদায় সৃষ্টির পথে বাধা প্রদান ও অনুপস্থিত ভূ-স্বামিত্ব দাবির অস্বীকৃতি মোগল শাসন-নীতির উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য ছিল। মোগল শাসনের সদাসতর্কতার দরুন, বংশগত সম্ভ্রান্ত গোষ্ঠী গড়িয়া উঠিতে পারে নাই এবং অনুপস্থিত ভূ-স্বামিত্বও স্বীকৃতি লাভ করে নাই।

মোগল রাষ্ট্র একটি সামরিক-রাষ্ট্র ছিল না, কিংবা সার্বিকভাবে একটি পুলিশ-রাষ্ট্রও ছিল না। উক্ত দুইটি স্তর অতিক্রম করিয়া, জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্রে পরিণত হওয়ার পথে মোগল রাষ্ট্র অগ্রগতি লাভ করে। মোগল সম্রাটগণ মর্মে মর্মে অনুভব করিয়াছিলেন যে, রাষ্ট্রের মঙ্গল কৃষকদের মঙ্গল সাধনে নিহিত ছিল। জনকল্যাণ ব্যতীত কোন রাষ্ট্রই উন্নত, সমৃদ্ধ ও শক্তিশালী বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। রাজস্ব নিরূপণ, কর নির্ধারণ পদ্ধতিকে নিয়ম ও প্রণালীবদ্ধকরণ ছিল রাজস্ব-ব্যবস্থায় আকবরের প্রধান অবদান। তাঁহার প্রবর্তিত দহ্‌সালাহ্‌ বা জাব্‌তি প্রথা ছিল রাষ্ট্র ও জনগণের স্বার্থের আনুকূল্যে। অনেকের মতে, মোগল শাসন আমলে কৃষককুল বর্তমানকাল হইতে অনেক বেশী আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করিত।

১ শর্মা: মোগল গভর্নমেন্ট, পৃঃ ১১১।

মোগল আমলের মনসবদারী প্রথা ইউরোপ মহাদেশের সামন্ত প্রথার সহিত কয়েক দিকে সাদৃশ্য থাকিলেও, মহাদেশীয় প্রথার মত মনসবদারী প্রথায় একটি স্বাধীন বংশগত অভিজাত সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয় নাই।

মোগল শাসনকালে যুবরাজগণ একটি সমস্যা বিশেষ ছিলেন। সেনাবাহিনীর উর্ধ্বতন পদে ও প্রাদেশিক গভর্নরের পদে, তরুণ, অনভিজ্ঞ ও চঞ্চলমতি যুবরাজদিগকে নিয়োগ করা হইত। ইহাতে প্রশাসনিক কর্মদক্ষতা, নৈপুণ্য ও তৎপরতার প্রকট অভাব প্রায়শঃ পরিলক্ষিত হয় এবং নিয়মিত অভিজ্ঞ সৈন্যাধ্যক্ষদের মধ্যে অসন্তোষের ভাব বিরাজ করিত। ফলে রাজ্যের প্রশাসনিক স্থিতিশীলতা বিঘ্নিত হইত।

মোগল সেনাবাহিনীকে সুসজ্ঞবদ্ধ সংগঠন বলা চলে না, বরঞ্চ ইহাকে 'শিথিল সংগঠন'[১] রূপে বর্ণনা করা যায়। আকবরের সময় মোগল সেনাবাহিনী শক্তিশালী ছিল বটে, কিন্তু নৌবহরের অবহেলা ভারতে মোগল শাসনের সর্বাপেক্ষা মারাত্মক ত্রুটি ছিল। ইহাতে সামরিক দূরদর্শিতার অভাব স্পষ্ট পরিলক্ষিত হয়। আকবরের মত বহুমুখী প্রতিভাশালী সম্রাটের পক্ষে একটি শক্তিশালী নৌবহরের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিতে ব্যর্থ হওয়া বাস্তবিকই অদ্ভুত মনে হয়। পরবর্তীকালে ইউরোপীয় শক্তি মোগলদের নৌশক্তির দুর্বলতার সুযোগ নিঃসন্দেহে গ্রহণ করিয়াছিল।

মোগল বিচার-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সাধারণতঃ দুইটি অভিযোগ লক্ষ্য করা যায়, যথা, মোগলরা হিন্দুদের প্রতি মুসলিম আইন প্রয়োগ করে এবং তাহাদের বিচার-ব্যবস্থা ব্যক্তিগত সমীকরণ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত[২] হইত। প্রথম অভিযোগটি সম্পূর্ণরূপে ভিত্তিহীন বলিয়া মনে হয়। দ্বিতীয় অভিযোগ সম্বর্কে বলা যাইতে পারে যে, তদানীন্তন অন্যান্য দেশের বিচারালয়ের অপেক্ষা মোগলদের বিচারালয় অধিক নিরপেক্ষ ছিল। সততা, ন্যায়পরায়ণতা ও নিরপেক্ষতা ছিল মোগলদের বিচার নীতির মূল কথা।

মোগল সম্রাটদের কেন্দ্রীয় মন্ত্রিপরিষদের সহিত আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে রাষ্ট্র পরিচালনা করিবার নীতি, ভারতে হিন্দুদের ঐতিহ্যগত রীতিরই নামান্তর মাত্র।[৩] মন্ত্রীদের ক্ষমতা প্রয়োগের উপর নানা বাধা থাকা সত্ত্বেও, মন্ত্রীদের পদ-মর্যাদার হানি ঘটিত না। আকবর, জাহাঙ্গীর ও শাহজাহানের

---

১ হুসাইনি : এম. অ্যাড্‌মিনিস্ট্রেশন, পৃঃ ২৬৮।

২ পূর্বোক্ত, পৃঃ ২৭০।

৩ ইবনে হাসান : সেন্ট্রাল স্ট্রাক্‌চার, পৃঃ ৩৫১।

শাসন আমলে মন্ত্রিগণ তাঁহাদের প্রভুদের সম্পূর্ণ বিশ্বাসভাজন ছিলেন ও উচ্চসম্মান লাভ করিতেন। কেন্দ্রীয় চারি মন্ত্রী ছিলেন সাম্রাজ্যের চারি স্তম্ভস্বরূপ। ঠিক যেমন তাজমহলের স্তম্ভগুলি তাজের মর্যাদা ও সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে, তেমনি কেন্দ্রীয় চারি মন্ত্রী সাম্রাজ্যের চারি স্তম্ভরূপে সাম্রাজ্যের শক্তি, গৌরব ও মর্যাদা বৃদ্ধি করিতেন।[১] মন্ত্রীপদে অভিষিক্ত থাকাকালীন, মন্ত্রিগণ সম্পূর্ণ নিরাপত্তা অনুভব করিতেন এবং সম্রাট তাঁহাদের সহিত সদ্ব্যবহার করিতেন। কেন্দ্রীয় প্রশাসনিক যন্ত্র একটি নিয়মিত ধারায় পরিচালিত হইত। কেরানী হইতে শুরু করিয়া মন্ত্রী পর্যন্ত প্রশাসনিক-ব্যবস্থায় সংশ্লিষ্ট সকলেই নিজ নিজ ক্ষমতা, দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সজাগ ছিলেন।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রিপরিষদের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল যে, প্রধানমন্ত্রী সমস্ত ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন না। আকবর সকল ক্ষমতা স্বীয়হস্তে কেন্দ্রীভূত করিয়া, সমক্ষমতাসম্পন্ন মন্ত্রীদের হস্তে প্রশাসনিক যন্ত্রটির পরিচালনার দায়িত্ব অর্পণ করেন।

কেন্দ্রীয় শাসন-নীতির মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল সম্রাট ও জনগণের সহিত সরাসরি সম্পর্ক স্থাপন করা এবং প্রত্যক্ষ যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা করা। দিল্লী সুলতানী আমলের শাসন-নীতির দুইটি সুস্পষ্ট ত্রুটি, (ক) মুসলমান ও অমুসলমান জনগণের মধ্যে মর্যাদার পার্থক্য এবং (খ) সুলতান ও জনগণের মধ্যে সরাসরি যোগাযোগের সুযোগের অভাব দূরীভূত করিবার জন্য আকবর প্রথম হইতে সচেতন ছিলেন এবং উহা দূর করিবার জন্য তিনি নানাবিধ বলিষ্ঠ পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। তাঁহার রাজ্য ছিল সকল ধর্মাবলম্বী এবং সকল শ্রেণীর রাজ্য।[২] হিন্দু-মুসলিম, উচ্চ-নীচ, ধনী-দরিদ্র সকলের জন্য মোগলদের আইন ছিল সমান এবং এই ক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে মোগল সম্রাটগণ আর্যাবর্তের হিন্দুদের সনাতন রীতি ও চিরাচরিত প্রথার উন্নতি সাধন করেন। জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত সহযোগিতা ও সমর্থন লাভের জন্য, আকবর দেশের সকলশ্রেণী লোকের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক এবং প্রত্যক্ষ যোগাযোগ স্থাপনে সক্রিয় উদ্যোগ গ্রহণ করেন।

---

১ ইবনে হাসান : সেন্ট্রাল স্ট্রাকচার, পৃঃ ৩৫১।

২ খ্রীস্টান পুরোহিতদিগকে আকবর নির্দেশ দিয়াছিলেন যে, তাঁহার সাম্রাজ্যে তাহারা স্বাধীনভাবে বসবাস করিতে পারেন এবং তাহারা তাহাদের গীর্জা নির্মাণ করিতে পারেন।--মনসারেট, : কমেন্ট্যারি, পৃঃ ৪৭।

নিঃসন্দেহে বলা চলে যে, অতি-কেন্দ্রীয়করণ ও সম্রাটের উপর অতি নির্ভরশীলতা ছিল মোগল শাসন-ব্যবস্থার প্রধান ত্রুটিগুলির অন্যতম। তবে ঐ যুগে সংবিধানের অভাবে, সম্রাটের সর্বক্ষমতার অধিকারী হওয়া অস্বাভাবিক নহে। দেশে জাতীয় চেতনার অভাব আকবর পুরোপুরি উপলব্ধি করিয়াছিলেন এবং জাতীয় চেতনার উদ্রেক করিবার জন্য, তিনি চেষ্টা করেন কিন্তু সফলকাম হন নাই বলিয়া মনে হয়।

যদুনাথ সরকারের মতে, মোগল-শাসনের রাজনৈতিক ফলাফল ছিল সুদূর-প্রসারী। আকবরের সিংহাসনে আরোহণকাল হইতে মুহম্মদ শাহের মৃত্যুকাল (১৫৫৬-১৭৪৯) পর্যন্ত দুইশত বৎসরকাল, মোগল-শাসন সমগ্র উত্তর-ভারত ও দাক্ষিণাত্যের অনেকাংশে 'এক সরকারী ভাষা, এক শাসন-পদ্ধতি, একই মুদ্রা এবং শুধু হিন্দু পুরোহিত সম্প্রদায় ও গ্রামবাসী ব্যতীত সকল শ্রেণীর লোকের জন্য একটি জনপ্রিয় সাধারণ ভাষা'[১] প্রদান করে। মোগল-সাম্রাজ্যের বিশটি সুবায় একই প্রশাসনিক যন্ত্র, একই পদ্ধতি, একই নিয়মে শাসন-কার্য পরিচালিত হইত। ফার্সী ছিল সরকারী ভাষা—সরকারী সকল দলিল-পত্র, ফরমান, সনদ, ভূমি-মঞ্জুরী, অনুমতি-পত্র নিয়োগ-পত্র ইত্যাদিতে ফার্সী ব্যবহৃত হইত। মোগল-শাসনের অধীনে সম্রাটদের পৃষ্ঠপোষকতায়, ভারতে ঐতিহাসিক সাহিত্যের অভূতপূর্ব উন্নতি সাধিত হয়।

মোগল-শাসন আমলে বহির্জগতের সহিত ভারতের সম্পর্ক স্থাপিত হয়। এই আমলে এশিয়া ও বিশ্বের সহিত ভারত যোগাযোগ পুনঃস্থাপন করে। মোগলরা যাহা শুরু করিয়াছিল, পরবর্তীকালে ইংরেজরা উহাই সম্পূর্ণ করে।

মোগল-শাসনকালে ভারতে সমাজ, স্থাপত্য-শিল্প ও বিবিধ কলাবিদ্যায় মুসলিম প্রভাব সুস্পষ্ট প্রতিফলিত হয়। উত্তর-ভারতে আধুনিক হিন্দু সামাজিক আচার-ব্যবহার, 'অভিজাত সম্প্রদায়ের পোশাক-পরিচ্ছদ, জনপ্রিয় সাহিত্য'[২] কিয়দংশে ইসলামী প্রভাবে পরিবর্তিত হয়।

মুসলিম প্রভাবে ভারতে যুদ্ধ পদ্ধতি, রণ-কৌশল, দুর্গাদি নির্মাণ কৌশলের বহুলাংশে উন্নতি সাধিত হয়।

---

১ সরকার: এম. অ্যাড্‌মিনিস্ট্রেশন., পৃঃ ২৩৮।
২ পূর্বোক্ত, পৃঃ ২৪৩।

হিন্দু-মুসলিম চারুকলার উদ্ভব শিল্প-বিদ্যার জগতে মুসলিমদের সর্বোৎকৃষ্ট অবদান।

মোগল-শাসনকালে সম্রাটদের একান্ত পৃষ্ঠপোষকতায় হিন্দি সাহিত্য ও ফার্সী সাহিত্যের উন্নতি ঘটে।

পরিশেষে, জনহিতৈষী ও শক্তিশালী মোগল-প্রশাসন দুইশত বৎসরেরও বেশী সময় ভারতকে বৈদেশিক আক্রমণ হইতে রক্ষা করে এবং দেশে শান্তি ও সমৃদ্ধি আনয়ন করে।

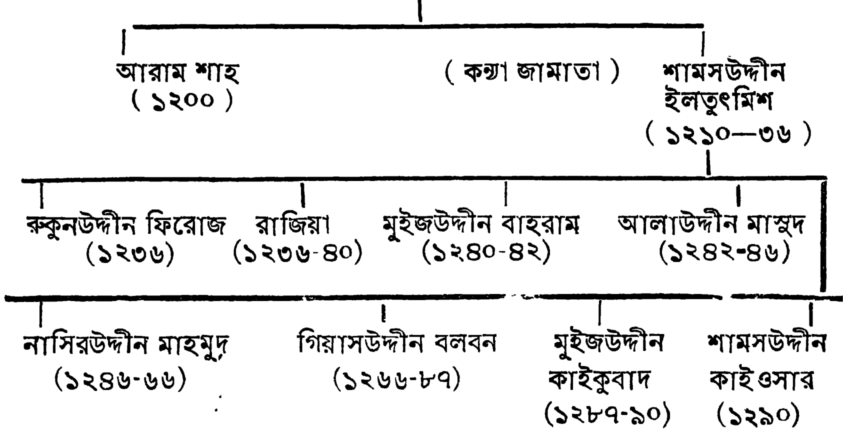
পরিশিষ্ট 'ক'

বংশ-পরিচয়

(১)

মামলুক শাসক গোষ্ঠী

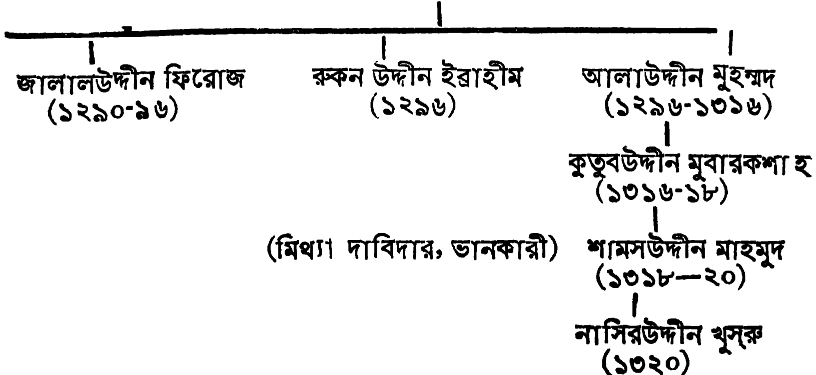
(১২০৬—১২৯০)



(২)

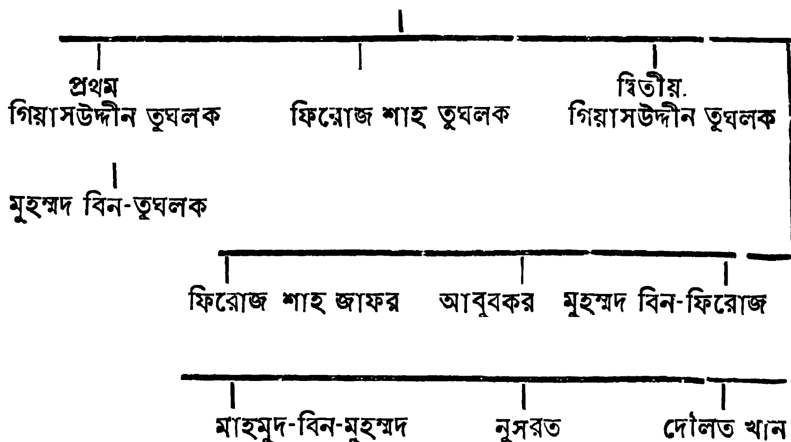
খলজী-বংশ

(১২৯০—১৩২০)



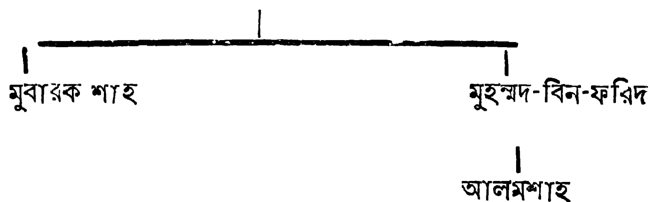
(৩)

তুঘলক-বংশ



(৪)

সাইয়েদ-বংশ



(৫)

লোদী-বংশ

(১৪৫১—১৫২৬)

|

বাহলুল খান লোদী

(১৪৫১—৮৯)

|

সিকান্দর লোদী

(১৪৮৯—১৫১৭)

|

ইব্রাহীম লোদী

(১৫১৭—২৬)

(৬)

সূরী-বংশ

(১৫৪০—১৫৫৫)

শেরশাহ

(১৫৪০—৪৫)

|

ইসলাম শাহ

(১৫৪৫—৫২)

|

মুহম্মদ আদিল শাহ

(১৫৫২—৫৪)

|

ইব্রাহীম শাহ

(১৫৫৪)

|

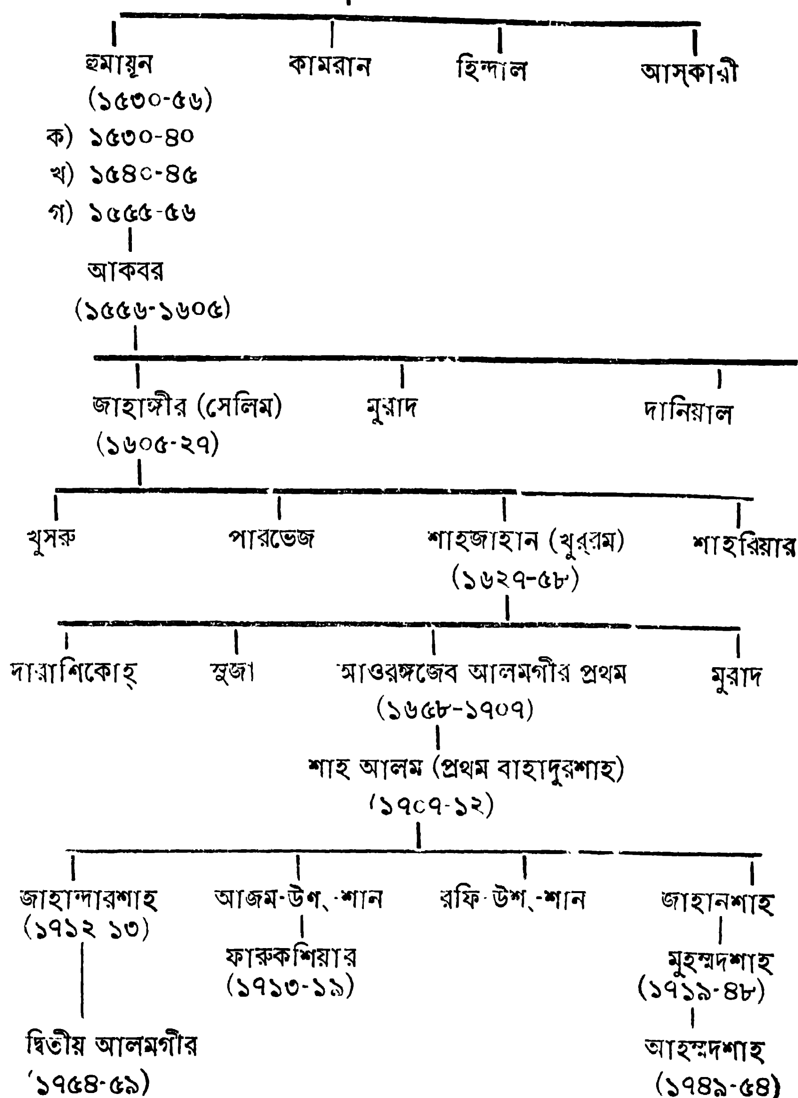
সিকান্দর শাহ

(১৫৫৪—৫৫)

(৭)

মোগল বংশ

(১৫২৬—১৮৫৮)



|
দ্বিতীয় শাহ্‌আলম
(১৭৫৯-১৮০৬)
|
দ্বিতীয় আকবর শাহ্
(১৮০৬-৩৭)
|
দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ
(১৮৩৭—৫৮)*

* আ. ক. ম. আব্দুল আলীমের রচিত ভারতে মুসলিম রাজত্বের ইতিহাস নামক পুস্তকের পৃ: ৪৩১-৪৩৩ হইতে বংশ পরিচয় সংগৃহীত হইয়াছে।

পরিশিষ্ট 'খ'

শব্দ-কোষ

১। আল্‌-তাম্‌ঘা ঃ সীল-মোহরকৃত মঞ্জুরী ; জাহাঙ্গীর কর্তৃক প্রবর্তিত একটি বিশেষ রায়তী স্বত্ব।

২। আবাদী ঃ সাধারণ অর্থে জনঅধ্যুষিত, জনপূর্ণ ও কর্ষিত দেশ বুঝায়।

৩। আমীন ঃ একটি সাধারণ উপাধি ; শেরশাহের আমলে সম্ভবতঃ পরগণায় দুইজন প্রধান কর্মকর্তার মধ্যে একজন ; আকবরের সময় ভাইসরয়ের অধীনস্থ কর্মকর্তাদের একজন ; ১৭ শতাব্দীতে, প্রাদেশিক দিওয়ানের অধীনে একজন রাজস্ব নিরূপণকারী ; ব্যাপক অর্থে একজন কর্মকর্তার 'উপ' বা 'সহকারী' বুঝাইত।

৪। আমীন-উল্‌-মুলক ঃ টোডরমলকে নিয়ন্ত্রণ করিবার জন্য যখন আকবর কর্তৃক নিয়োজিত হন, তখন ফাতেউল্লাহ্‌ শিরাজীর উপাধি ; 'ইম্‌পেরিয়াল্‌ কমিশনার' বুঝায়।

৫। আমীর ঃ ১৩-১৪ শতাব্দীতে, খানের অধস্তন ও মালিকের উর্ধ্বতন একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির পদ-মর্যাদা ; ১৫ শতাব্দীতে, একজন প্রাদেশিক গভর্নর।

৬। আমীল ঃ ১৩-১৫ শতাব্দীতে, সাধারণ অর্থে একজন প্রশাসনিক কর্মকর্তা ; আকবরের সময় হইতে বিশেষ অর্থে সংরক্ষিত রাজস্ব আদায়কারী ; ১৮ শতাব্দীতে, একজন গভর্নর অর্থাৎ সাধারণ প্রশাসনের দায়িত্বপ্রাপ্ত একজন কর্মকর্তা বুঝাইত।

৭। ইক্‌তা ঃ সমর্পিত ভূমি ; জায়গীরের সমার্থ শব্দ।

৮। ইক্‌তাদার ঃ সমর্পিত ভূমির অধিকারী ; জায়গীরদারের প্রতিশব্দ ; মুক্‌তিও বুঝায়।

৯। ইজারা ঃ জোতের জমি ; জোতদার ছিল সাধারণতঃ ইজারাদার, মুস্‌তাজিরও বটে।

১০। ইনাম ঃ পুরস্কার—বিশেষভাবে রাজার প্রদত্ত উপহার বুঝায়।

১১। ওয়াকিল ঃ ১৩-১৪ শতাব্দীতে, ওয়াকিল-ই-দার ছিলেন দিল্লী দরবারে আড়ম্বরপূর্ণ উৎসবাদি পরিচালনে নিযুক্ত উচ্চপদস্থ কর্মচারী। মোগল আমলে, ওয়াকিল ছিলেন প্রধানমন্ত্রী, এবং ওয়াজিরের অপেক্ষা উর্ধ্বতন ; কিন্তু এই পদটি সর্বদা পূর্ণ করা হইত না, এবং যখন ইহা শূন্য থাকিত, ওয়াজির ছিলেন বস্তুতঃপক্ষে প্রধানমন্ত্রী।

১২। ওয়ালায়াত ঃ ১৩-১৪ শতাব্দীতে, সাধারণতঃ ওয়ালির অধীনে একটি প্রদেশবিশেষ ; কিন্তু ইহা রাজ্য, অঞ্চল ইত্যাদিও বুঝায়। মোগল আমলে, প্রদেশ অর্থটি বস্তুতঃপক্ষে তিরোহিত হয়।

১৩। ওয়ালি ঃ সাধারণতঃ একজন প্রাদেশিক গভর্ণর ; সময় সময় একটি বিদেশী দেশের শাসনকর্তা।

১৪। ওশুর ঃ ইসলামী আইন অনুযায়ী, মুসলিমদের উপর আরোপিত ভূমি-রাজস্ব 'দশমাংশ'।

১৫। কবুলিয়াত ঃ রাজস্ব প্রদানের জন্য প্রদত্ত, লিখিত অঙ্গীকার ; পাট্টার প্রতিরূপ বিশেষ।

১৬। কস্‌বা ঃ কস্‌বার প্রচলিত অর্থ 'শহর' গ্রন্থপঞ্জীতে পাওয়া যায় না। প্রাচীন লেখকরা পরগণা বুঝাইতে কসবা ব্যবহার করিতেন ; আফিফ হইতে শুরু করিয়া, পরগণা একটি ফার্সী শব্দরূপে গৃহীত হয়, কিন্তু কস্‌বাকে সময় সময় সমার্থ শব্দ বলিয়া ধরা হইত।

১৭। কাজী ঃ ইসলামী পদ্ধতিতে একজন কর্মকর্তা—প্রধানতঃ তাঁহার কর্তব্যাদি ছিল বিচার-সংক্রান্ত ; ইহার সঠিক ইংরেজী প্রতিশব্দ পাওয়া যায় না, কিন্তু মোগল আমলে, কাজীকে গভর্ণরের একজন বিচার-সংক্রান্ত সহকারীরূপে বর্ণনা করা যায়।

১৮। কানুনগো ঃ পরগণার হিসাব-রক্ষক ও নিবন্ধক।

১৯। কাবিয়াত ঃ একটি গ্রাম, দেহ্-এর প্রতিশব্দ।

২০। কারকুন ঃ আক্ষরিক অর্থে দালাল বা উপ। ১৬ শতাব্দী হইতে, সাধারণতঃ কেরানী, লেখক বুঝায়।

২১। কিসমত্-ই-গাল্লা ঃ খাদ্য-শস্য-ভাগ ; ১৬ শতাব্দীতে, উৎপন্ন ফসলের অংশ গ্রহণের নীতিজনিত রাজস্ব-নির্ধারণ পদ্ধতির একটি নাম বিশেষ।

২২। ক্যারাভ্যানিয়ান ঃ ইতস্ততঃ পরিভ্রমণকারী খাদ্য-শস্য ব্যবসায়ীকে বারনী ক্যারাভ্যানিয়ান বলিয়াছেন ; সাধারণতঃ বঞ্জরা নামে পরিচিত।

২৩। ক্রোর ঃ একশত লক্ষ অর্থাৎ এক কোটি।

২৪। ক্রোরি ঃ ১৬ শতাব্দীতে, সংরক্ষিত রাজস্ব আদায়কারীর জনপ্রিয় উপাধি —সরকারীভাবে আমলগুজার বলা হইত।

২৫। ক্রোহ্ ঃ দূরত্বের পরিমাপ, প্রায় দেড় মাইল।

২৬। খাজা ঃ সাধারণতঃ একটি সম্মানসূচক উপাধি ; ১৩ শতাব্দীতে, প্রদেশে নিযুক্ত একজন কর্মকর্তার উপাধি ছিল।

২৭। খারাজ ঃ ইসলামী আইন অনুযায়ী, অমুসলিমদের উপর আরোপিত ভূমি-রাজস্ব।

২৮। খালিসা ঃ রাষ্ট্রের জন্য সংরক্ষিত জমি।

২৯। খিদ্‌মতি ঃ অধস্তন কর্তৃক ঊর্ধ্বতনকে প্রদত্ত উপহার।

৩০। গুমশ্‌তা ঃ একজন সহকারী বা অধীন, নিম্নপদস্থ।

৩১। গ্র্যাম্‌ ঃ ফরাসী দেশীয় ওজন বিশেষ।

৩২। চাক্‌লা ঃ ১৭ শতাব্দীতে, একজন চাক্‌লাদার কর্মকর্তার দায়িত্বাধীনে সংরক্ষিত জমির অঞ্চল।

৩৩। চৌথ ঃ অধিকৃত কিন্তু শাসিত নহে এমন দেশে মারাঠাদের দাবি, সাধারণতঃ রাজস্বের এক-চতুর্থাংশ।

৩৪। চৌধুরী ঃ পরগণা-প্রধান।

৩৫। জমা (আরবীতে 'জাম্‌, উর্দুতে সাধারণতঃ জমা) ঃ সমষ্টি ; হিসাবে জমা, আকলনের দিক।

৩৬। জমিদার ঃ আক্ষরিক অর্থ 'জমির অধিকারী'। ১৪ শতাব্দী হইতে উত্তর-ভারতের সাহিত্যে উপাধিসহ জমির অধিকারী প্রধান—রাজা, রাওকে বুঝাইত।

৩৭। জরিপ ঃ ভূমির পরিমাপ ; পরিমাপের যন্ত্র, ইহাকে 'পায়মাইশ'ও বলা হয়।

৩৮। জাবত ঃ আকবরের আমলে ভূমি জরিপ ও পরিমাপ পদ্ধতির মাধ্যমে রাজস্ব-নির্ধারণ প্রথা ; জাব্‌তি একটি অঞ্চলকে বুঝায়, যেখানে উক্ত পদ্ধতি প্রবর্তিত ও কার্যকরী হইয়াছে। পরবর্তীকালে জাব্‌তি রাজস্ব-হার নির্দেশ করিত।

৩৯। জায়গীর ঃ সমর্পিত ভূমি ; ইক্‌তার সমার্থ শব্দ।

৪০। জিজিয়া ঃ ইসলামী আইন অনুযায়ী, অমুসলিমদের উপর আরোপিত ব্যক্তিগত মাথা-পিছু কর।

৪১। টংকা ঃ ১৩-১৬ শতাব্দীতে, প্রধান অর্থ-সম্বন্ধীয় একক (ই. টমাস্‌এর 'ক্রনিক্‌ল্‌স্ অফ দি পাঠান কিংস্ অফ দেল্‌হি' পুস্তকে বিস্তারিত ভাবে এককের আলোচনা আছে)।

৪২। তালুক বা 'তাআল্লুক ঃ অধীন রাজ্য ; তালুকদার তালুকের মালিককে বুঝায়।

৪৩। তুয়ুল ঃ ভূমি সমর্পণ—জায়গীর, ইক্‌তা সমার্থক।

৪৪। দফ্‌তর ঃ নথি ; দফ্‌তরখানা—নথিব অফিস।

৪৫। দস্‌তুর ঃ বিভিন্ন অর্থ—'রীতিনীতি', 'হুকুম', মন্ত্রী ও দস্‌তুর-উল্ আমলের সংক্ষিপ্তাকার।

৪৬। 'দাম্' ঃ আকবরের আমলে, এক তাম্র মুদ্রা, টাকার $\frac{1}{80}$ অংশ।

৪৭। দাহ্ ঃ একটি গ্রাম্য (হিন্দি) ; মৌজার সমার্থক।

৪৮। দিওয়ান ঃ ১৩-১৪ শতাব্দীতে দিওয়ানের অর্থ মন্ত্রণালয় ; ১৬ শতাব্দীতে, (ক) রাজস্ব-মন্ত্রী, (খ) সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির নায়েব ; ১৭ শতাব্দীতে (ক) রাজস্ব মন্ত্রাণলয়ের একজন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা, (খ) প্রাদেশিক রাজস্ব কর্মকর্তা। ১৬ শতাব্দীতে, দিওয়ানী রাজস্ব মন্ত্রণালয় বুঝায়; ১৭ শতাব্দী ও পরবর্তীকালে, সার্বিকভাবে রাজস্ব ও প্রশাসন বুঝায় ; ১৯ শতাব্দীতে, দেওয়ানী আদালত বুঝায়।

৪৯। দোয়াব ঃ দুই নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চল, বিশেষ করিয়া গঙ্গা ও যমুনার মধ্যবর্তী অঞ্চল।

৫০। ধর্ ঃ এক মারাঠা শব্দ, ১৮ শতাব্দীতে মুরশিদকুলীর সময়ে রাজস্ব নিরূপণ হার বুঝাইত।

৫১। ধর্ম ঃ হিন্দু পবিত্র আইন।

৫২। না'ইব ঃ উপ, ১৩-১৪ শতাব্দীতে, গভর্নর কেন্দ্রে রাজদরবারে ব্যস্ত থাকিলে, কিংবা অন্য কোন দায়িত্বে নিয়োজিত থাকিলে, গভর্নরের কর্তব্যাদি পালনের জন্য একজন কর্মকর্তাকে প্রদেশে প্রেরণ করা হইত—তাঁহাকে না'ইব অর্থাৎ উপ বলা হইত।

৫৩। নাসাক্‌ঃ সাধারণ অর্থে 'হুকুম' বা 'প্রশাসন'; আকবরের আমলে, একটি বিশেষ ধরনের রাজস্ব শাসন-ব্যবস্থার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ছিল।

৫৪। পরগণাঃ গ্রামের সমষ্টি, ভারতীয় নাম; আংশিকভাবে কস্‌বাকে বাতিল করিয়া ১৪ শতাব্দীতে, পরগণা মুসলিম শাসন-ব্যবস্থায় সরকারীভাবে ব্যবহৃত হইত।

৫৫। পাট্টাঃ ইজারা; রাজস্ব প্রদানকারী কি পরিমাণ রাজস্ব দিবে উহার নির্দেশিত দলিল।

৫৬। পাটোয়ারীঃ গ্রাম্য-হিসাবরক্ষক, মুসলিম শাসন-ব্যবস্থায় বাহির হইতে এই হিন্দী শব্দ গৃহীত হয়।

৫৭। পায়মাইশঃ ভূমির পরিমাপ; জরিপের সমার্থ শব্দ।

৫৮। ফরমানঃ সম্রাট কর্তৃক প্রদত্ত সরকারী হুকুম।

৫৯। ফতোয়াঃ ইসলামী আইনের প্রশ্নে আইন বিশেষজ্ঞের অভিমত।

৬০। ফৌজদারঃ ১৪ শতাব্দীতে; একজন সামরিক কর্মকর্তা; ১৬-১৮ শতাব্দীতে, একটি প্রদেশের এক অংশের সাধারণ প্রশাসন পরিচালনায় ভারপ্রাপ্ত একজন কর্মকর্তা; সাধারণতঃ তিনি রাজস্ব প্রশাসন ব্যবস্থায় জড়িত ছিলেন না, কিন্তু ১৮ শতাব্দীতে, কখনও কখনও একজন কর্মকর্তাই দিওয়ান ও ফৌজদার পদে নিয়োজিত হইতেন।

৬১। বঞ্জরাঃ ইতস্ততঃ পরিভ্রমণকারী খাদ্য-শস্য ব্যবসায়ী 'কেরাভানী'-এর সমার্থক শব্দ।

৬২। বলাহরঃ একটি গ্রাম্য ভৃত্য (হিন্দি শব্দ)।

৬৩। বাটাইঃ ভাগের মাধ্যমে উৎপন্ন শস্যের অংশ গ্রহণ।

৬৪। বিঘাঃ অঞ্চলের সাধারণ পরিমাপের একক; স্থান-কাল ভেদে ইহার পরিমাপের পার্থক্য ঘটে।

৬৫। মদদ-ই-মা'আশঃ ভরণ-পোষণের জন্য ভূমি-মঞ্জুরী।

৬৬। মণঃ ৪০ সের ওজনের একক।

৬৭। মসাহাত্‌ঃ পরিমাপ-নির্ধারণ জরিপ; ১৪ শতাব্দীতে, জমির পরিমাপ-নির্ধারণের মাধ্যমে রাজস্ব নিরূপণ বুঝাইত—যাহাকে পরবর্তীকালে জরিপ বা 'পায়মাইশ' বলা হইত।

৬৮। মহলঃ আকবরের আমলে, একটি রাজস্ব উপ-বিভাগ, সাধারণতঃ (কিন্তু অনিবার্যভাবে নহে) পরগণার অনুরূপ।

৬৯। মালিক ঃ ১৩-১৪ শতাব্দীতে, আমীরের অধস্তন একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির পদ-মর্যাদা ; পরবর্তীকালে, অস্পষ্টভাবে একটি সম্মানসূচক উপাধি-রূপে ব্যবহৃত হইত।

৭০। মাশা ঃ ভারতীয় ওজনবিশেষ—১৫ রতির সমান।

৭১। মুক্‌তি ঃ ১৩-১৪ শতাব্দীতে, একজন প্রাদেশিক গভর্নর।

৭২। মুকাদ্দাম ঃ ১৩-১৪ শতাব্দীতে, সময় সময় একজন বিখ্যাত নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি ; সময় সময় বিশেষভাবে একজন গ্রাম্য-প্রধানকে বুঝাইত। ১৬ শতাব্দী হইতে, গ্রাম্য-প্রধান অর্থেই ইহা সর্বদা ব্যবহৃত হইত।

৭৩। মুকাসামা ঃ ইসলামী আইনে, উৎপাদনের উপর কর নির্ধারণ।

৭৪। মুহাস্‌সিল ঃ শব্দের ব্যুৎপত্তি-অনুযায়ী, একজন (রাজস্ব) আদায়কারী ; ১৪ শতাব্দীতে, রাজা কর্তৃক অনির্দিষ্ট কর্তব্যাদি পালনে নিযুক্ত একজন কর্মকর্তা।

৭৫। মুহাসাবা ঃ একজন সরকারী কর্মকর্তার হিসাবের সরকারীভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা।

৭৬। মৌজা ঃ ১৩ শতাব্দীতে, সাধারণতঃ ব্যাপক অর্থে একটি স্থান বা অঞ্চল বুঝাইত ; পরবর্তীকালে, ভারতীয় অর্থে এক গ্রাম বুঝাইত ; দেহ্-এর প্রতিশব্দ।

৭৭। রবি ঃ ভারতে শীতকালে বপণ করিয়া বসন্তকালে যে শস্য কর্তিত হয় অর্থাৎ রবি শস্য।

৭৮। রাকামি ঃ আকবরের প্রথম মূল্য-নির্ধারণে প্রযোজ্য একটি বর্ণনা।

৭৯। রায়, রাজা, রানা, রাও ঃ হিন্দিশব্দ, ইহা রাজা বা প্রধান বুঝায়, যিনি স্বাধীন কিংবা মুসলিম রাজাকে বার্ষিক কর প্রদানকারী ছিলেন।

৮০। রায়ত (রাইয়ত-এর ইংরেজী প্রতি বর্নিতরূপ) ঃ সার্বিকভাবে কৃষককুল।

৮১। লাখ ঃ একশত সহস্র।

৮২। শিক্ ঃ ভাগ ; বাহ্যত: প্রথমে একটি সামরিক শব্দ ; ১৪ শতাব্দীতে, একটি প্রশাসনিক অঞ্চল, একটি প্রদেশ কিংবা একটি প্রদেশের বিভাগ বিশেষ ; ১৫ শতাব্দীতে, একটি প্রদেশবিশেষ। পরবর্তী যুগে উক্ত অর্থে ব্যবহৃত হইত না।

৮৩। শিক্‌দার ঃ প্রথমত: একটি সামরিক শব্দ ; পরবর্তীকালে একজন রাজস্ব অধস্তন ; শেরশাহের আমলে, পরগণার শাসন পরিচালনায় কর্ম-কর্তাদের অন্যতম ; ১৮ শতাব্দী পর্যন্ত, একজন অধস্তন রাজস্ব কর্মকর্তা রূপে ব্যবহৃত হয়।

৮৪। সদর ঃ মোগল আমলে, একজন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তার উপাধি, মঞ্জুরাদি তদারক যাহার কর্তব্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

৮৫। সরকার ঃ ঘটনাপঞ্জীতে সাধারণতঃ কোষাগার বুঝায়। শেরশাহের আমলে একটি প্রশাসনিক জিলা অর্থাৎ পরগণার সমষ্টি বুঝায় ; আকবরের সময়, একটি রাজস্ব-জিলা বুঝায়। আধুনিক অর্থ 'গভর্ন-মেন্ট' ঘটনাপঞ্জীতে স্পষ্টভাবে পাওয়া যায় না।

৮৬। সালামি ঃ একজন সরকারী কর্মকর্তার সহিত দেখা করিবার উদ্দেশ্যে প্রদত্ত উপহার।

৮৭। সুবা ঃ মোগল আমলে, সাম্রাজ্যের একটি প্রদেশ।

৮৮। সুয়ূরগাল ঃ মোগল আমলে, নগদ কিংবা জমি মঞ্জুরীর মাধ্যমে সম্রাট কর্তৃক প্রদত্ত ভাতা।

৮৯। সের ঃ ওজনের একক, এক মণের এক-চল্লিশাংশ (এক মণের চল্লিশ ভাগের একভাগ)।

৯০। হাকিম ঃ কোন নির্দিষ্ট উপাধি নহে, একজন উচ্চপদস্থ প্রশাসনিক কর্মকর্তা বুঝায়, যেমন প্রদেশের ভাইসরয় বা ছোট অঞ্চলের গভর্নর।

৯১। হাভেলী ঃ শহরতলী বা পাড়া ; কিন্তু ১৩-১৪ শতাব্দীতে, যমুনার পশ্চিমে একটি নির্দিষ্ট প্রশাসনিক অঞ্চল বুঝাইত।

৯২। হাসিল্‌ ঃ সময় সময় মহসুল্‌-এর প্রতিশব্দ ; ১৬ শতাব্দী হইতে সাধারণতঃ আয় বুঝাইত।

মোরল্যাণ্ড রচিত দি অ্যাগরেরিয়ান সিস্টেম অফ মুসলেম ইণ্ডিয়া নামক পুস্তকের অ্যাপেণ্ডিক্স্‌ 'এইচ' হইতে সংকলিত।

পরিশিষ্ট 'গ'

গ্রন্থপঞ্জী

(১) প্রকাশিত আরবী-ফার্সী গ্রন্থ ও ইংরেজী অনুবাদ

আইন-উল্-মুলক মাহরু ঃ ইনশা-ই-মাহরু

আখলাক্-ই-জালালী ঃ ইহিয়া-উল্ উলুম

আব্বাস সারওয়ানী ঃ তুহফাহ্-ই-আকবর শাহী, তারিখ-ই-শেরশাহী (Elliot ও Dowson কর্তৃক অনূদিত, চতুর্থ খণ্ড)

আবু ওমর মিনহাজউদ্দীন ওসমান বিন-সিরাজউদ্দীন আল্ জাওয়াজ্জানি ঃ তবাকাত-ই-নাসিরী (H. G. Raverty কর্তৃক অনূদিত)

আবু আলী হাসান ইবনে আলী তুসি নিজাম-উল-মুলুক ঃ সিয়াসত-নামা অথবা সিয়ার-উল্-মুলুক (Scheffer কর্তৃক সম্পাদিত)

আবু ইউসুফ কিতাব-উল্-খারাজ ঃ (E. Fagnon কর্তৃক অনূদিত, প্যারিস, ১৯২৯)

আবু তালিব আল্ হুসাইনী ঃ মালফুজাত-ই-তিমুরী বা তুজুক ই-তিমুরী (Major Davy কর্তৃক অনূদিত Political and Military Institutes of Timur)

আবু হামিদ মুহম্মদ-বিন-মুহম্মদ আল্-গাজ্জালী ঃ কিমিয়াত-ই-সা'আদাত

" ঃ আত্-তিবর-উল্-মাস্বুক ফি নসিহত্-ইল্-মুলুক

আবুল ফজল বইহাকী ঃ তারিখ-ই-আল্-ই-সবুক্তিগীন ; তারিখ-ই-বইহাকী (W. H. Morby কর্তৃক সম্পাদিত)

আবুল ফজল ঃ আকবর-নামা, ৩ খণ্ড, Henry Beveridge কর্তৃক অনূদিত, কলিকাতা, ১৮২১ (Elliot ও Dowson, ষষ্ঠ খণ্ড)

" আইন-ই-আকবরী, ৩ খণ্ড, H. Blockmann কর্তৃক সম্পাদিত, ; Blockmann কর্তৃক প্রথম খণ্ড ও H. S. Jarrett কর্তৃক দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড অনূদিত, কলিকাতা, ১৮৯৪।

আবদুল কাদির-বিন-মালুকশাহ আল্ বদায়ুনী ঃ মুন্‌তাখাব-উত্‌-তাওয়ারিখ (G. S. A. Ranking, H. Lowe ও W. Haig কর্তৃক অনূদিত, কলিকাতা, ১৯২৫)।

আবদুল হামিদ খান লাহোরী ঃ পাদশাহ্‌-নামা (বাদশাহ্‌-নামা) (Elliot ও Dowson, সপ্তম খণ্ড, লণ্ডন, ১৮৭৭)

আবদুর রাশিদ আল্‌-খাওয়াফি হাফিজ আব্‌রু ঃ তারিখ-ই হাফিজ আব্‌রু।

আল্‌-জাব্বার আল্‌-উৎবী ঃ তারিখ-ই-ইয়ামিনী বা কিতাব-ই-ইয়ামিনী।

আল্‌-কারদিজী ঃ জয়নুল আখ্‌বার

আল্‌-মওয়ার্দী ঃ আল্‌-আহকাম-ই-সুলতানিয়াহ্‌ (খেলাফতের অংশ strorogg কর্তৃক অনূদিত এবং রাজস্ব অংশ Aghnides কর্তৃক ব্যবহৃত)

আল্‌-খুদারি ঃ তারিখ উমামিল্‌ ইসলামিয়াহ্‌

আল্‌-বালাজুরী ঃ ফুতুহ-আল্‌-বুলদান (De Coeje কর্তৃক সম্পাদিত)

আল্‌-বেরুনী ঃ কিতাব-উল্‌-হিন্দ ঃ E. C. Sachan কর্তৃক অনূদিত Al-Beruni's India (ডঃ আবু মহামেদ হবিবুল্লাহ অনূদিত, আলবেরুনীর ভারততত্ত্ব, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৭৫)

আল্‌তাবারী ঃ তারিখ-উল্‌-উম্মি-ওয়া-আল্‌-মুলুক।

আলী মুহম্মদ খান ঃ মিরাট-ই-আহমদী (Major Bird কর্তৃক অনূদিত History of Gujrat এবং যদুনাথ সরকার কর্তৃক সম্পাদিত)

আলী শেরকানী ঃ তুহফাত-উল-কিরাম

আমীর খুসরু ঃ তুঘলক-নামা (সাইয়েদ হাশিমী ফরিদাবাদী কর্তৃক সম্পাদিত, আওরঙ্গাবাদ, ১৯৩৩)

,, ঃ নুহ শিপিহর

,, ঃ ই'জাজ-ই-খুসরুভী

,, ঃ কিরাণ-উস্‌-সা'দায়িন

,, ঃ খাজা-ইল-উল্‌-ফুতাহ্‌

আওরঙ্গজেব আলমগীর (১ম) ঃ রুকাত-ই-আলমগীরী (আবদুর রাজ্জাক অনূদিত, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৭৫)

ইবন-উল্-আছির ঃ তারিখ-উল্-কামিল (Tornberg কর্তৃক সম্পাদিত)
ইবনে খাল্‌দুন ঃ আল্-মুকাদ্‌দমা-ই-তারিখ-ই-ইবনে খাল্‌দুন
ইবনে ফজল উল্লাহ্‌-আল্-উমরি ঃ মাসালিক-উল্‌-আবসার ফি
মুমালিক-ইল্‌-আমসার।
ইসামী ঃ ফুতুহ্-উস্-সালাতিন বা তারিখ-ই-আলা-ই।
ইয়ার মুহম্মদ ঃ দস্‌তুর-উল্‌-ইনশা
ইয়াহিয় -বিন-আহমদ-আস্-সহরিন্দী ঃ তারিখ-ই-মুবারকশাহী
(কে. কে. বসু কর্তৃক অনূদিত, বরোদা, ১৯৩২)
উনসুর-উল্-মা'আলী কাইকাউস ঃ কাবুস-নামা
ওয়েকায়াহ্
কাসা'ইদ-ই-বদর-ই-চাচ।
কুল্লিয়াত-ই-হাসান সাজ্‌দী দেহলভী (মাসুদ 'আলী মাহভী কর্তৃক সম্পাদিত)
খাজা নিজাম-উদ্দীন আহমদ ঃ তবাকাত-ই-আকবরী (বি. দে কর্তৃক অনূদিত,
কলিকাতা, ১৯২৭-৩৫ ; Elliot ও Dowson
কর্তৃক অনূদিত আংশিক পঞ্চম খণ্ড)
খাজা নেয়ামতউল্লাহ হিরাভী ঃ তারিখ-ই-খান জাহান-ই-ওয়া মাখজান-উল্-
আফগানী (Dorn কর্তৃক অনূদিত History
of the Afghans)
গুলবদন বেগম ঃ হুমায়ূন-নামা (Mrs. A. S. Beveridge কর্তৃক অনূদিত,
লণ্ডন, ১৯০২)
গোলাম হুসেন খান তাবাতাবাই ঃ সিয়ার-উল্‌-মুতাখ্‌খিরীন (M. Raymond
হাজী মুস্তফা কর্তৃক অনূদিত- দিল্লী ১৮৮৪)
গোলাম হুসেইন সলিম ঃ রিয়াজ-উস্-সালাতিন (মৌলভী আবদুল হক কর্তৃক
সম্পাদিত ও আবদুস সালাম কর্তৃক অনূদিত,
কলিকাতা, ১৯১০)
চন্দ্রাভন ব্রাহ্মণ ঃ চাহার চামন
চাহার মাকালাহ

চাত্তর মল্ (রায় প্রাণচান্দ মুন্সীর পুত্র) ঃ দিওয়ান-ই-পসন্দ (L. da Costa কর্তৃক অনূদিত)

জাহাঙ্গীর ঃ তুজুক-ই-জাহাঙ্গীরী (Roger ও Beveridge কর্তৃক অনূদিত, লণ্ডন, ১৯২১)

জিয়াউদ্দিন বারনী ঃ তারিখ-ই-ফিরোজশাহী (সাইয়েদ আহমদ খান কর্তৃক সম্পাদিত, Elliot ও Dowson কর্তৃক আংশিক অনূদিত, তৃতীয় খণ্ড)

জুরজী জায়দান ঃ তামাদ্দন-উল-ইসলামী (মৌলভী মুহম্মদ হালিম আনসারী কর্তৃক অনূদিত)

দাউদী ঃ তারিখ-ই দাউদী

দানিশমন্দ খান ঃ বাহাদুরশাহ-নামা

ফখরউদ্দীন ঃ তারিখ-ই-ফখরউদ্দীন মুবারকশাহ (Sir E. Denison Ross কর্তৃক সম্পাদিত)

ফখরউদ্দীন মুবারকশাহ ঃ আদব-উল-মুলুক ওয়া কিফাইয়াত-উল-মামলুক।

ফজলউল্লাহ্ রশিদউদ্দীন ঃ জামি-উত-তাওয়ারিখ (E. Blochet কর্তৃক সম্পাদিত)

ফিক্হ-ই-ফিরোজশাহী (মওলানা মুজাফফর কিরামী সংগৃহীত তথ্যাদি ভিত্তিক)

ফিরোজশাহ ঃ ফুতুহাত-ই-ফিরোজশাহী (শেখ আবদুর রশিদ কর্তৃক অনূদিত, আলীগড়, ১৯৪৩, Elliot ও Dowson ঃ History of India, তৃতীয় খণ্ড)

বাবর ঃ তুজুক-ই-বাবুরী (ওয়াকেয়াত-ই-বাবুরী, বাবুর-নামা Mrs. A. S. Beveridge কর্তৃক অনূদিত, লণ্ডন, ১৯২১)।

মালিক মুহম্মদ জয়ইসি ঃ আখরাওয়াত, আফজাল-উত-তাওয়ারিখ (History of the reign of Shah Tahmsp)

মা'আছির-ই-রহিমী

মির্জা নাথান (শিতাব খান) ঃ বাহারিস্তান-ই-গায়েবি (ডক্টর বোরাহ কর্তৃক অনূদিত, গৌহাটি, ১৯৩৬)

মির্জা মাহদী ঃ জাহান কুশায়ে নাদিরী।

মির্জা মুহম্মদ ঃ তারিখ-ই-মুহম্মদী।

মির্জা হায়দার ঃ তারিখ-ই-রাশিদী (E. D. Ross কর্তৃক অনূদিত ও N. Elliot কর্তৃক সম্পাদিত, লণ্ডন ১৮৯৩)

মুতামিদ খান ঃ ইকবাল-নামা-ই-জাহাঙ্গীরী

মুল্লা আহমদ তাত্তাভী ঃ তারিখ-ই-আল্‌ফী।

মুহম্মদ আলী-বিন-হামিদ-বিন-আবুবকর কুফী ঃ চাচনামা বা ফাতে-নামা বা মিনহাজ-উল-মাসালিক Elliot ও Dowson কর্তৃক অনূদিত, তৃতীয় খণ্ড

মুহম্মদ কাজিম ঃ আলমগীর নামা

মুহম্মদ কাসিম ফিরিশ্‌তা ঃ গুলশান-ই-ইব্রাহিমী (John Briggs কর্তৃক অনূদিত History of the Rise of the Mohammedan Power in India)

,, ঃ তারিখ-ই-ফিরোজশাহী, কলিকাতা, ১৯১০

,, ঃ তারিখ-উল্‌-হিন্দ

মুহম্মদ কাসিম আওরঙ্গবাদী ঃ আহওয়াল-ই-খাওয়াকিন

মুহম্মদ সাকি মুস্তায়িদ খান ঃ মা'আছির-ই-আলমগীরী (যদুনাথ সরকার কর্তৃক অনূদিত ও সম্পাদিত)

মুহমদ হামিদ খান ওরফে কাফি খান ঃ মুনতাখাব-উল্‌-লুবাব (Sir W. Haig কর্তৃক সম্পাদিত, কলিকাতা ১৯২১ আংশিক অনুবাদ Elliot ও Dowson, সপ্তম খণ্ড)

মুহমদ হুসাইন ঃ দরবার-ই-আকবরী

মুন্সি হরকরান ঃ ইনশাহ-ই-হরকরান

রুস্তম আলী ঃ তারিখ-ই-হিন্দি

শামস্‌-ই-সিরাজ আফিফ ঃ তারিখ-ই-ফিরোজশাহী (মৌলভী ওইলিয়াত হুসেইন কর্তৃক সম্পাদিত, কলিকাতা ১৮৯০ ; Elliot ও Dowson কর্তৃক আংশিক অনুবাদ, তৃতীয় খণ্ড)

শাহ্-নাওয়াজ খান সম্‌সম্-উদ্-দৌলা ঃ মা'আছির-উল্-ওমারা (Beveridge কর্তৃক আংশিক অনূদিত)

শেখ আবদুল হক-বিন-সাইফ উদ্দীন দেহ্‌লভি ঃ তারিখ-ই-হক্‌কি।

শেখ শিহাবউদ্দীন আহমদ-বিন-সামস্‌উদ্দীন আবদুল্লাহ্-আল্-হানাদি ঃ আজা'ইব-উল্-মাকদুর ফি আক্‌খারি তিমুর (J. H. Sander কর্তৃক অনূদিত Tamer Lane অথবা Timur, the Great Amir)

শিহাব উদ্দীন আহমদ ঃ নিহা'য়াত-উল্-আরব।

শিহাব উদ্দীন আবুল আব্বাস আহমদ-বিন-আলী-বিন-আবি ঘোদ্‌দা আল্-কালকাশান্দী ঃ সুবাহ্-উল-আ'শা ফি সিনা 'আত-উস-ইনশা

সাদিদ উদ্দীন মুহম্মদ আল্-আওফি ঃ জাওয়ামি-উল্-হিকায়াত

সিরাত-ই-ফিরোজশাহী

হাজী আবদুল হামিদ মুহাররীর গজনভী ঃ দস্‌তুর-উল্-আলবাব ফি ইলম-ইল-হিসাব

হামিদ উদ্দীন ঃ আহ্‌কাম-ই-আলমগীরী (যদুনাথ সরকার কর্তৃক অনূদিত Anecdotes of Aurangzeb)

হাসান'আলা সাজ্‌জি ঃ ফাওয়া 'ইদ-উল্-ফুওযাদ

হাসান নিজামী ঃ তাজ-উল্-মা'আছির।

হিদায়াহ (Charles Hamilton কর্তৃক অনূদিত ও Standish Grove কর্তৃক সম্পাদিত)।

(২) আরবী-ফার্সী পাণ্ডুলিপি

আনন্দরাম ঃ মিরাট-উল্-ইস্‌তিলাহ (ব্রিটিশ মিউজিয়াম প্রাচ্য পাণ্ডুলিপি ১৮১৩)

আলী-বিন-শাহাব হামলানী ঃ জখিরাত-উল্-মুলুক (ব্রিটিশ মিউজিয়াম অতিরিক্ত পাণ্ডুলিপি ৭৬১৮)

আলী মুহমদ খান ঃ মিরাট-ই-আহমদী (ব্রিটিশ মিউজিয়াম অতিরিক্ত পাণ্ডুলিপি ৬৫৮০)

আবু মুহমদ আল্-গাজ্জালী ঃ সুলুক-উল্-সালতানাত (ব্রিটিশ মিউজিয়াম প্রাচ্য পাণ্ডুলিপি ২৫৪)

আমীর খুস্‌রু ঃ নুহ সিপিহর (ব্রিটিশ মিউজিয়াম অতিরিক্ত পাণ্ডুলিপি ২১১০৪)
,, ঃ সিয়ার-উল্‌-আওলিয়া (প্রাচ্য, পাণ্ডুলিপি ১৭২৮)
আবদুল্লাহ ঃ তারিখ-ই-দাউদী (ব্রিটিশ মিউজিয়াম প্রাচ্য পাণ্ডুলিপি ১৯৭)
আবদুর রাজ্জাক-বিন-ইশাক আস্‌-সমরকন্দী ঃ মাত্‌লা-উস্‌-সা'দাইন (ইণ্ডিয়া অফিস পাণ্ডুলিপি ২৭০৪)
আবদুল হামিদ মুহারিরর গজনভী ঃ দস্‌তুর-উল্‌-আলবাব ফি ইলম্‌-ইল্‌-হিসাব-রামপুর রাষ্ট্রীয় গ্রন্থাগার পাণ্ডুলিপি)
আব্বাস আহমদ সারওয়ানী ঃ তুফাহ্‌-ই-আকবরশাহী বা তারিখ-ই শেরশাহী (ইণ্ডিয়া অফিস প্রাচ্য পাণ্ডুলিপি ১৭৮২)
ইমাম উদ্দীন চিশ্‌তি ঃ হুসেন শাহী (ব্রিটিশ মিউজিয়াম পাণ্ডুলিপি ১৬৬২)
কনবু ঃ মদন-ই-আখবর-ই আহমদী
কামরাজ ঃ আজম-উল্‌-হারব (ব্রিটিশ মিউজিয়াম পাণ্ডুলিপি ১৮৯৯)
কেওয়ালরাম ঃ তাজকিরাত-উল্‌-ওমারা (ব্রিটিশ মিউজিয়াম অতিরিক্ত পাণ্ডুলিপি ১৬৭০৩)
খাজা নিয়ামতউল্লাহ্‌ ঃ তারিখ-ই-খানজাহানী ওয়া মাখজানী-ই আফগানী (ব্রিটিশ মিউজিয়াম প্রাচ্য পাণ্ডুলিপি ১৬৩৬)
খুশহাল চান্দ ঃ নাদির-উশ্‌-জামানী (বার্লিন পাণ্ডুলিপি ১১৩৩)
গোলাম আলী খান ঃ মুকাদ্দমাহ্‌-ই-শাহ আলমনামা (ব্রিটিশ মিউজিয়াম অতিরিক্ত পাণ্ডুলিপি ২৪০২৮)
চন্দ্রাভন ব্রাহ্মণ ঃ ইনশা-ই-ব্রাহ্মণ (ইণ্ডিয়া অফিস অতিরিক্ত পাণ্ডুলিপি ২৬১৪১)
,, ঃ চাহার চামন (ব্রিটিশ মিউজিয়াম অতিরিক্ত পাণ্ডুলিপি ১৬৮৬৩)
চাত্তারমল ঃ দিভান পস্‌নদ (ব্রিটিশ মিউজিয়াম অতিরিক্ত পাণ্ডুলিপি ২০১১)
জওহর আফতাব্‌চি ঃ তারিখ-ই-হুমায়ুনশাহী (প্রাচ্য. পাণ্ডুলিপি ১৮৯০)
,, ঃ তাজকিরাত-উল্‌-ওয়াকিয়াত (ইণ্ডিয়া অফিস পাণ্ডুলিপি ২২০) অনুবাদ (বাংলা একাডেমী, ঢাকা)
জালাল উদ্দীন ইস্‌পাহানী ঃ তুহফাত-উল্‌-ওজারা-ওয়া-আস্‌-সালাতিন (ইণ্ডিয়া অফিস পাণ্ডুলিপি ৩৭৮৬)

জালাল-বিন-মুহম্মদ-বিন ওবাইদউল্লাহ আল্‌কায়ানী : নসাইহ্ শাহরুখি
জিয়াউদ্দীন বারনী : ফাতাওয়া-ই-জাহানদারী (ইণ্ডিয়া অফিস পাণ্ডুলিপি ২১৬৯)
দস্‌তুর-উল-আমল-ই-আওরঙ্গজেবী : (ব্রিটিশ মিউজিয়াম অতিরিক্ত পাণ্ডুলিপি ৬৫৯৯)
দস্‌তুর-উল্‌-আমল : ব্রিটিশ মিউজিয়াম পাণ্ডুলিপি ১৬৪১)
দানিশমন্দ খান : বাহাদুরশাহ-নামা (প্রাচ্য পাণ্ডুলিপি ২৪)
নজাফ্ আলী খান : শারাহ্-ই-মনসিব (ব্রিটিশ মিউজিয়াম প্রাচ্য পাণ্ডুলিপি ১৯০৬)
নিজাম-উল্‌-মুলক-তুসি : কিতাব-ই-সিয়াসত (সাইর-উল্ মুলুক) (ব্রিটিশ মিউজিয়াম অতিরিক্ত পাণ্ডুলিপি ২৩৫১৬)
নুর-উল্ হক আল্ মাশরিকি-আদ্-দেহলভি : জুবদাত-উত-তাওয়ারিখ (ব্রিটিশ মিউজিয়াম অতিরিক্ত পাণ্ডুলিপি ১০৫৮০)
ফজল-বিন-রোজেবাহান-ইস্‌পাহানী (ব্রিটিশ মিউজিয়াম প্রাচ্য, পাণ্ডুলিপি ২৫৩)
ফিরোজশাহ : ফুতুহাত-ই-ফিরোজশাহী (প্রাচ্য পাণ্ডুলিপি ২০৩৯)
মির্জা নাথান : বাহারিস্তান-ই-গায়েবি (প্যারিস পাণ্ডুলিপি ১০১০)
মির্জা মুহম্মদ : তারিখ-ই-মুহম্মদী (প্রাচ্য পাণ্ডুলিপি ১৮২৪)
মিস্‌কিন : তাহমাস-নামা (ব্রিটিশ মিউজিয়াম পাণ্ডুলিপি)
মুন্সী ঠাকুর লাল : দস্‌তুর-উল্‌-আমল-ই-শাহানশাহী
মুহম্মদ আলী-বিন-হামিদ-বিন আবুবকর কুফী : চাচনামা বা ফাতেনামা (ইণ্ডিয়া অফিস পাণ্ডুলিপি ৭৩)
মুহম্মদ কবির-বিন-শেখ ইসমাইল : আফসানাহ্-ই-জাহান
মুহম্মদ কাসিম আওরঙ্গবাদী ; আহওয়াল-উল্‌-খাওয়াকিন (ব্রিটিশ মিউজিয়াম অতিরিক্ত পাণ্ডুলিপি ২৬২৪৪)
মুল্লা আহমদ তাত্তাভী : তারিখ-ই-আল্‌ফি (ইণ্ডিয়া অফিস পাণ্ডুলিপি ১১০—১১১)
মুজাফ্‌ফর খান : আরজে দাশত্ (ব্রিটিশ মিউজিয়াম অতিরিক্ত পাণ্ডুলিপি ১৬৮৫৯)

লতিফা-ই-ফৈজী আবদুল সামাদ আফজাল মুহম্মদ : মুকাতাবাত-ই-আল্লামী আবুল ফজল (ব্রিটিশ মিউজিয়াম, অতিরিক্ত পাণ্ডুলিপি ৬৫৪৮)

শারাহ্-ই-মনাসিব (ব্রিটিশ মিউজিয়াম পাণ্ডুলিপি ১৯০৬)

শাকির খান : তারিখ-ই-শাকির খানী (ব্রিটিশ মিউজিয়াম পাণ্ডুলিপি ৬৫৮৫)

সদর উদ্দীন মুহম্মদ : ইরশাদ-উল্-ওয়াজারা (প্রাচ্য পাণ্ডুলিপি ২৩৩)

সাদিক খান : তারিখ-ই-শাহজাহানী (ব্রিটিশ মিউজিয়াম অতিরিক্ত পাণ্ডুলিপি ১৭৪)

সিরাত-ই-ফিরোজশাহী (বাঁকিপুর সাধারণ গ্রন্থাগার)

সুজন রায় মুন্সী : খুলাসাত্-উত্-তাওয়ারিখ্ (ব্রিটিশ মিউজিয়াম প্রাচ্য পাণ্ডুলিপি)

হাসান নিজামী : তাজ-উল্-মা'আছির (ব্রিটিশ মিউজিয়াম অতিরিক্ত পাণ্ডুলিপি ৭৬২৬)

(৩) সাম্প্রতিক কালে প্রকাশিত পুস্তক

(ক)

Arnold, T. W. : The Caliphate

Aghnides, N. P. : Muhammedan Theories of Finance

Browne, E. G. : A Literary History of Persia (১৯০১)

(The) Cambridge History of India, তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ড (কেমব্রিজ ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯২৮)

Cambridge, R. O. : Account of the War in India. 1750-61

C. H. Beckor of Humburj : Mughal Provincial Administration

Crooke, C : Things Indian

,, : N. W. Provinces

Davy : Institute of Timur

Dikshitar, V. R. R. : Hindu Administrative Institutions

Enan : Decisive Moments in the History of Islam

Edward, S. M. ও Garrett, H. O. : Mughal Rule in India

Erskine, E. H. I. : History of India under Babur and Humayun

Elliot and Dowson : The History of India as told by her own historians (লণ্ডন, ১৮৬৭)

Fraser, I : History of Nadir Shah

Francklin, W : Military Memoirs of Mr. George Thomas

Fitzclarence : Journal of Route Across India

Grady : H, Hidaya, A Commentary on the Muhammedan Law

Huarte, Clement : Ancient Persia and Iranian Civilization

Horn : Army

Hodivala, H : Historial Studies in Mughal Numismatics (কলিকাতা, ১৯২৩)

,, : Studies in Indo-Muslim History

Irvine, W. : The Army of the Indian Moghuls (লণ্ডন, ১৯০৩)

,, : Later Mughals (দিল্লী, ১৯৬২)

Keene, H. G. : History of the Turks in India and Mughal Empire

Levy, R. : The Sociology of Islam

Ludlow : British India, Its Races and its History

Matthai, J. : Village Government in British India

Malcolm, Sir John : Memoirs of Central India

Moreland W. H. : The Agrarian System of Moslem India

,, : India at the death of Akbar

Mecrindle : Invasion of India by Alexander

Noer, C. V. : Akbar (Mrs. A. S. Beveridge কর্তৃক The Kaiser -এর ইংরেজী অনুবাদ)

Orme, R. : Historical Fragments of the Mogol Empire

,, : History of the Military Transaction in Indostan

Pant, D. : Commercial Policy of the Mughals

Paul Masson-Ouresel, M. R. Dobie : Ancient India and Indian Civilization

Powell, B. H. B. : The Indian Village Community

Rashbrook Williams, L. F. : An Empire Builder of the Sixteenth Century (লণ্ডন, ১৯১৮)

Sewell, R. : A Forgotten Empire (লণ্ডন, ১৯০০)

Smith, V. A. : The Oxford History of India (অক্সফোর্ড, ১৯১৯)

,, : Akbar the Great Mughal, (অক্সফোর্ড, ১৯২৬)

,, : Rambles and Recollection of Sir William Steeman

Stanley Lane-Poole : The Coinage of the Sultans of Delhi in the British Museum (Regional Stuart Poole কর্তৃক সম্পাদিত, লণ্ডন, ১৮৮৪)

,, : Medieval India under Muhammedan Rule, (লণ্ডন, ১৯১৬)

,, : The Muhammedan Dynasties, (লণ্ডন, ১৮৯৪)

Tone, W. H. : A Letter in tho Maratta people

Tod, J. : Annals and Antiquities of Rajasthan (সম্পাদনা W. Crooke, লণ্ডন, ১৯২০)

Tritton, A. S. : The Caliph and their non-Muslim Subjects

Thomas, E. : Revenue Sources of Mughal Empire

,, : The Chronicles of the Pathan Kings of Delhi (লণ্ডন, ১৮৭১)

,, : Cn the Coins of Ghazna (লণ্ডন, ১৮৪৮)

Wilkinoon, H. : Eugines of War

Wright, N. H. : The Coinage and Metrology of the Sultans of Delhi (দিল্লী, ১৯৩৬)

(খ)

আকবর, মুহম্মদ ঃ The Administration of Justice by the Mughals

আজিজ, আবদুল ঃ The Mansabdari system and Mughal Army (এলাহাবাদ, ১৯৪১)

আলী, সাইয়েদ আমীর ঃ A short History of the Saracens (লণ্ডন, ১৯৫১)

আলীম, আ. ক. ম. আবদুল ঃ ভারতে মুসলিম রাজত্বের ইতিহাস (বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৭৩)

আহমদ, এম, বি ঃ Administration of Ju^stice in Medieval India

আশরাফ, কে. এম ঃ Life and Condition of the People of Hindustan (১২০০-১৫৫০) (J. A. S. B.)

ইবনে হাসান : The Central Structurc of the Mughal Empire (অক্সফোড´ ইউনিভার্সিটি প্রেস, লণ্ডন, ১৯৩৬)

ঈশ্বরী প্রসাদ : A short of History Muslim Rule in India (এলাহাবাদ, ১৯৩৯)

,, : History of Medieval India (এলাহাবাদ, ১৯৩৩)

,, : History of the Qaraunah Turks in India (এলাহাবাদ, ১৯৩৬)

কানুন গো, কালিকারঞ্জন : Shershah (কলিকাতা, ১৯২১)

কোরায়েশী, ইশতিয়াক হুসেইন : The Central Structure of the Mughal Empire (অক্সফোড´ ইউনিভারসিটি প্রেস, লণ্ডন, ১৯৩৬)

খুদাবখ্শ, এস. : Essays, Indian and Islamic

,, : The Orient under Caliph
(Alfred Von Kremer : Culturgs Chiehte des Orients -এর ইংরেজী অনুবাদ)

,, : The Ren issance of Isl m
(Adam Mez : Die Renaissance des Islam-এর ইংরেজী অনুবাদ)

খুদাবখ্শ, এস. : His'ory of the Islamic people
,, Politics in Islam
গোপাল, এম এইচ. : Mauryan Public Finance
ঘোষাল, ইউ. এন. : The Agrarian System in Ancient India
,, : Contributions to the History of the Hindu Revenue System
,, : A History of Hindu Political Theories
জাফর, এস. এম. : The Cultural Aspects of Muslim Rule in India
ত্রিপাঠি, আর. পি. : Some Aspects of Muslim Administration (এলাহাবাদ, ১৯৩৬)
নাজিম, মুহম্মদ : The Life and Times of Sultan Mahmud of Ghazna (কেমব্রিজ, ১৯৩১)
বৈদ্য, সি. ভি. : History of Medieval Hindu India
মজুমদার, আর. সি. ঃ Corporate Life in Ancient India
রায় চৌধুরী, এইচ. সি, আর, সি. মজুমদার ও কে. কে. দত্ত ঃ An Advanced History of India (লণ্ডন, ১৯৬০)
লাল, কে. এস. ঃ History of the Khaljis (এলাহাবাদ, ১৯৫০)
শর্মা, শ্রীরাম ঃ Mughal Government and Administration
শরণ, পরমাত্মা ঃ The Provincial Government of the Mughal (এলাহাবাদ, ১৯৪১)
সরকার, বি. কে. : The Political Institutions and Theories of the Hindus
সরকার, যদুনাথ : Mughal Administration
,, : Studies in Mughal India (কলিকাতা, ১৯১৯)
,, : History of Aurangzeb
,, : The Manuals of Officers' Duties
,, : Anecdotes of Aurangzeb
হবিবুল্লাহ্, এ. বি. এম, : The Foundation of Muslim Rule in India (দ্বিতীয় সংস্করণ. এলাহাবাদ, ১৯৬১)

হাবিব, মুহম্মদ : Life and Works of Hazrat Amir Khusraw

হুসেইন, আগা মাহ্‌দি : The Rise and Fall of Muhammad bin Tughlaq (লণ্ডন, ১৯৩৮)

হুসেইন, ওয়াহিদ : Administration of Justice during the Muslim Rule in India

হুসাইনি, এস. এ. কিউ. ঃ Administration under the Mughals (ঢাকা, ১৯৫২)

,, : Arab Administration

(৪) সমসাময়িক বিদেশী পর্যটকদের ভ্রমণ-কাহিনী ঃ

ইবনে বতুতা : তুহফাত্‌-উল-নুজ্জার ফি গরাইব-ই-আল্‌-আমসার Voyages d' Ibn Batoutah ভ্রমণকাহিনী H. A R. Gibb কর্তৃক ইংরেজী অনুবাদ Travels in Asia and Africa রিহলাত ইবনে বতুতা

Barbosa : Book of Duarte Barbosa (M. L. Dames কর্তৃক অনুদিত ও সম্পাদিত)

Bernier, F. : Travels in the Mughal Empire, ১৬৫৬-১৬৬৮ (A. Constable কর্তৃক অনূদিত ও সম্পাদিত, লণ্ডন, ১৯১৪)

De Laet, John : Empire of the Great Moghual ১৬৩০-১৬৩২ (J. S. Hoyland কর্তৃক অনূদিত)

Finch, W. : Travels, ১৬০৮-১৬১১

Howkins, William : Early Travels in India, ১৬০৮-১৬১৩ (W. Foster কর্তৃক সম্পাদিত)

Manucci, Nicholas : Storia do Mogor (W. Irvine কর্তৃক অনূদিত ও সম্পাদিত Travels ১৬৫৩-১৭০৮, ৪ খণ্ড)

Manrique, F. S. : Travels, ১৬৪০-১৬৫৩

Monserrate : Commentary ১৫৮০-৮২ (এস. এস. ব্যানার্জী ও J. S. Hoyland কর্তৃক সম্পাদিত, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯২২)

Mundy, Peter : Early Travels in India, ১৬৩৩-১৬৬৭ (R. C. Temple কর্তৃক সম্পাদিত, ১৯১৪)

Nikitin, Athansius : India at the fifteenth century being a narrative of the travels in India by Abdur Razzaq, Nikitin and others (R. H. Major কর্তৃক সম্পাদিত)

Pelsaert, Francisco : The Remonstrantie (W. H. Moreland ও P. Geyl কর্তৃক ইংরেজীতে অনূদিত Jahangir's India)

Roe, Sir Thomas : Travels, ১৬১৫-১৬১৯ (Sir W. Foster কর্তৃক সম্পাদিত)

Tavernier, J. B. : Travels in India, ১৬৪১-১৬৬৭ (V. Ball কর্তৃক অনূদিত ও Sir W. Foster কর্তৃক সম্পাদিত, অক্সফোর্ড, ১৯২১)

Terry, Edward : Early Travels in India, ১৬১৫-১৬১৮ (Sir W. Foster কর্তৃক সম্পাদিত, অক্সফোর্ড, ১৯২১)

(৫) অন্যান্য ইউরোপীয় ভাষায় লিখিত গ্রন্থ ও পাণ্ডুলিপি :

Ibn Bat'uta : Voyages d'Ibn Batoutah

Catrou, F : Histoire Generale de l' Empire du Mughal

Colombari, Colonel F : Les Zamboureks

Hussain, Aga Mahadi : Le Government du Sultanat de Delhi : etude : criticique d' Ibn Batuta et des histories Indica du

Kremer, Alfred Von : Culturges Chiehtedes Orients

Mez, Adam : Die Renaissance des Islams

MZIK, H. : Die Reaise des Arabers Ibn Batuta durch Indien and China

Noer, Count Von : The Kaiser

Pelsaert, Francisco : The Remonstrantie

(৬) হিন্দি, সংস্কৃতি, উর্দু, বাংলা গ্রন্থ

কৌটিল্য (চাণক্য) : অর্থশাস্ত্র (আর. শর্মা শাস্ত্রী কর্তৃক ইংরেজীতে কামজাতক অনুদিত, মহীশূর ১৯২৩)

খান, সাইয়েদ আহ্‌মদ : কাদিম্‌ নিজাম-ই-দেহ্‌লি

,, : আসার-উস্‌-সানাদিদ

জায়সি, মালিক মুহম্মদ : পদ্‌মাভত্‌ (হিন্দি-মূল গ্রন্থ জিয়াউদ্দীন ইবরাত কর্ত্‌ক উর্দুতে অনূদিত)

বিষ্ণু-স্মৃতি—(Julius Jolly কর্ত্‌ক ইংরেজী অনুবাদ The Institutes of Vishnu)

মহাভারত, শান্তি পর্ব

মনুর ধর্মশাস্ত্র (A. C. Burnell ও G. Blihler কর্ত্‌ক ইংরেজী অনুবাদ, The Laws of Manu)

শুক্রনীতি (বি. কে. সরকার কর্তৃক অনূদিত)

সাভা, কে. এন. পি : শব্দ-সাগর, হিন্দি ২য় খণ্ড

হিওয়েন সাং : ভ্রমণকাহিনী, Travels

(৭) সহায়ক গ্রন্থ

Fncyclopaedia of Islam, প্রথম—চতুর্থ খণ্ড

Epigraphia Indica, ১৮৮৯

Egerton : Cataloque

Elliot, H. M. : Supplementary Glossery

Imperial Gazetteer of India, দ্বিতীয়

Hughes, T. P. : Dictionary of Islam

Platts, John T. : A Dictionary of Urdu

Steingass, F. : Persian-English Dictionary

Wilson, H. M. : Glossary of Judicial and Revenue Terms.

(৮) **পত্র-পত্রিকা**

Calcutta Police Journal, ১৯৫৩ (কলিকাতা)

Hindustan Standard, মার্চ ১৯৫৫

Indian Antiquary, দ্বিতীয় খণ্ড (বোম্বাই)

Indian Historical Quaterly, ১৯০৭ (কলিকাতা)

Islamic Culture, অক্টোবর ১৯৩৭, অক্টোবর ১৯৩৮, জুলাই ১৯৬১

Journal of Asiatic Society of Bengal (JASB,) ১৮৭১, ১৮৭৬, ১৯১৭, ১৯৩৫ (কলিকাতা)

Journal of Indian History, ১৯৩৬

Journal of Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland (JRAS) ১৮৯৯, ১৯১০, ১৯১৬, ১৯৩৫, ১৯৩৬ (লণ্ডন)

Moder Review, অক্টোবর ১৯০৮, আগস্ট ১৯২২

প্রবাসী, ফাল্গুন ১৩৫১

(৯) বিবিধ

Calcutta Municipal Gazette Seventeenth Anniversary Number 1941, 6th December

Report of Criminal Justice, Lower Province of Bengal Speech, Bengal Legislative Council, 23rd. July, 1892.

পরিশিষ্ট 'ঘ'

শব্দ-সংক্ষেপ

আইন	:	আইন-ই-আকবরী
আই. ও. পাণ্ডুলিপি	:	ইণ্ডিয়া অফিস পাণ্ডুলিপি
জে. এ. এস. বি.	:	জার্নাল্ অফ এশিয়াটিক সোসাইটি অফ বেঙ্গল
জে. আর. এ. এস.	:	জার্নাল অফ রয়েল এশিয়াটিক সোসাইটি
ব্রি. মি. অ. পাণ্ডুলিপি	:	ব্রিটিশ মিউজিয়াম অতিরিক্ত পাণ্ডুলিপি
ব্রি. মি. প্রা. পাণ্ডুলিপি	:	ব্রিটিশ মিউজিয়াম প্রাচ্য পাণ্ডুলিপি
সি. এইচ. আই.	:	কেমব্রিজ হিস্টরি অফ ইণ্ডিয়া

পরিশিষ্ট 'ঙ'

নির্ঘণ্ট

অম্বর ১৭১

অযোধ্যা ১৮০, ২২৬

আইরভিন ৯৪, ১৮৩, ১৮৫, ১৯৮

আওরঙ্গজেব ৫, ১৩০, ১৪০, ১৪২, (আলমগীর) ১৪৪, ১৪৬, ১৪৮, ১৫৪, ১৫৭, ১৬০, ১৬১, ১৬২, ১৬৮, ১৬৯, ১৭০, ১৭১, ১৭৩, ১৭৫, ১৭৬, ১৭৭, ১৭৮, ১৭৯, ১৮১, ১৮২, ১৯০, ১৯৩, ১৯৮, ২০১, ২০৯, ২১১, ২২৩, ২৩৯, ২৫০

আকবর ২, ৪, ৮, ৫৫, ৭৬, ১৩৪, ১৩৭—১৫৪, ১৫৭, ১৬১, ১৬৪, ১৬৫, ১৬৬, ১৬৮, ২৬৯, ১৭২, ১৭৩, ১৭৫, ১৭৭, ১৮১, ২৮২, ১৮৬, ১৮৭, ১৯৩, ১৯৫, ১৯৭, ১৯৮, ১৯৯, ২২৭, ২০১, ২০৩, ২১০, ২১৪, ২১৫, ২১৯, ২২১, ২২৭, ২৩৯, ২৪১, ২৪৪, ২৫০, ২৫১, ২৫২, ২৫৩, ২৫৪

আকিল খান ১৬২

আগ্রা ১৮০, ২০৫, ২২৬

আজাদ, মুহম্মদ হুসাইন ১৩৯

আজমীর ১৮০, ২২৬

আত্‌গা, শামসউদ্দীন ১৪৭

আনন্দ রাম ২০২

আফগানিস্তান ১৮১

(আল্লামি) আফজাল খান ১৪৫, ১৬২

আফিফ, শামস-ই-সিরাজ ২, ৪৫, ৭৮, ৮৪, ৯৭, ১০০

আবদুল আজিজ ৯৮

আবদুল্লাহ্ ২১৪

আবদুস সামাদ আফজাল মুহম্মদ ৭

আবুল ফজল ৪, ৬৭, ৬৯, ৭৫, ৭৬, ১৩৫, ১৩৭, ১৪১, ১৪৩, ১৫৫, ১৫৯, ১৬৯, ১৭১, ১৯০, ২৩৫

আবুল হাসান, খাজা ১৫৩, ১৫৫

আমীর খসরু ২, ১৪, ৯৮, ১০১, ১১৩

আর্যাবর্ত ২৫৩

আল্-কালকাশান্দী ৪৬, ৯৮, ১০২, ১০৫, ১০৮

আল্-কারদিজী ১

আল্-বেরুনী ৭১

আল্‌-মাওয়ার্দী ৮ ৩৫, ১৪৫, ২২২

আল্‌-মুসতাক্‌ফিবিল্লাহ্ ১৫, ১৬

আল্-মুসতানসিবিল্লাহ্, আবু জাফর মনসুর ১২
আলাউদ্দীন খল্জী ১৩, ১৪, ৩৮, ৫৮, ৬০, ৬১, ৬৭, ৮৮, ৮৯, ৯০, ৯২, ৯৫, ৯৯, ১০০, ১১৩
আলী আহ্মদ ৬
আলী কুলী খান ১৫২
আসফখান ১৪৮, ১৫৩, ১৫৪
আসালত খান ১৫৬
আহ্মদ নগর ১৭৭, ২২৬
আহ্মদাবাদ ২২৬

ইতিমাদ খান ১৭২
ইতিমাদ-উস-দৌল্লাহ ১৫৩
ইন্দ্রপাত ১২১
ইবনে খালদুন ৮, ১৬৫
ইবনে বতুতা ৩, ৫৮, ৮৫, ১০৯, ১১৩, ১২১, ১২২, ১৭৩
ইবনে হাসান ২১১
ইবাদত খান ১৫৩, ১৫৫
ইব্রাহীম লোদী ১৭, ৪০, ৯৫, ১০১, ১০৩
ইরাক ৮৫, ১৩১
ইলতুৎমিশ, শামসউদ্দীন ১২, ১০৮
ইলিয়ট ৭৫
ইস্পাহানী, ফজল-বিন-রোজেবাহান ৭
ইসলাম খান ১৫৪, ১৫৫
ইসলাম শাহ ১৭২
ইসলাম শাহ সুর ৯৮
ইসামী ২

ঈশ্বরী প্রসাদ ১৮৫

উৎবী ১
উরমি, ইবনে ফজল উল্লাহ আল্ ৩, ৯৪, ৯৭, ৯৯, ১০১

এলাহাবাদ ১৮০
এশিয়া ২৩৪

ওয়ায়েজ মুহম্মদ ১৪৪, ১৪৫

কন্সট্যান্টিনোপল ১৯৯
কনৌজ ৬২
কবুলিচ খান ১৮৬
কাইকুবাদ ৯৮, ১০০, ১০১
কাজউইন ১৪৬
কাজী মুগিস্ ৬২
কানুনগো, কালিকারঞ্জন ৮২
কাফুরি, মালিক তাজ-উল-মুলক ৩৮, ৯১

কাবুল ২২৬
কামবুহ, মুহম্মদ সালিশ ৪
কারাচা বেগ ১৪৫
কালিঞ্জর ৯৬
ক্যাট্রো ২০১
কুতুবউদ্দীন আইবেক ১, ১২, ৫৯, ৬৩, ৭২, ৮৩৯৭, ১০১, ১২১, ১২৪, ১৬৮
কুতুবউদ্দীন মুবারক শাহ ১৪, ১৮, ৭৩, ৭৮, ৯১
কুতলুঘ খান ১৫
কুলিজ খান ১৫২
কেওয়ালরাম ৭
কোকা, মির্জা আজিজ ১৪৬
কৌটিল্য ৩৩, ৭১, ১২১, ৪৩৬

খলিলউল্লাহ খান ১৫৬
খাজা জাহান মকবুল ৩৯, ৪৪
খাজা মুহাজ্জাব ৩৮
খান-ই-জামান ২২৮
খন্দেশ ১৭৭, ২২৬
খিজির খান ১৭
খুরাসান (খোরাসান) ৮৫
খুশহাল চান্দ ২০০
গজনী ১, ১১, ৩৮, ৭৭, ৯৮, ১০০, ১০১, ১২৪, ১৬৮

গাজ্জালী ৮
গিরধর বাহাদুর ১৭১
গিয়াসউদ্দীন ১১
গিয়াসউদ্দীন তুঘলক ১৫, ৩৮, ৬৮, ৭৩, ৭৭, ৭৮, ৭৯, ৯৭, ১০২
গিয়াসবেগ ১৫২
গীব ২০
গুজরাট ৯৩, ৯৫, ১৮০
গোলকুণ্ডা ১৭৪
গোয়ালিওর ২২৪

চাত্তারমল ৫
চাহারচামন ৭
চেঙ্গিজ খান ৯৮, ১৩৩

ছাজ্জু, মালিক ১০২

জয় সিংহ ১৭১
জাফর খান ১৫৪, ১৫৬
জালাল উদ্দীন ফিরোজ খিল্জী ১৩, ৩৮, ১০১
জাহাঙ্গীর ২, ৪, ১৩৫, ১৩৬, ১৩৭, ১৩৮, ১৩৯, ১৪০, ১৪১, ১৪২, ১৪৪, ১৪৬, ১৪৮, ১৫০, ১৫৩, ১৫৪, ১৫৫, ১৫৭, ১৬১, ১৬৪, ১৭৭, ১৮১, ১৮৬, ২১৯, ২২০, ২৩৮, ২৫২

জুনাইদি ৩৮, ৩৯

টমাস, এ ড্‌ওয়ার্ট ১৭৫
টমাসরো, স্যার ৮, ১৫৩
ট্রানসোক্সিয়ানা ৮৯
টেভারনিয়ার ১৩৮
টেরী, এডওয়ার্ট ৮, ২১৫, ২২৫
টোডরমল ১৫১, ১৫২, ১৭৯, ১৮৬, ২৪১,

ডাওসন ৭৫

ত্রিপাঠি ১৬৭
তুর্কিস্তান ৯২
তৈমুর ৭৫, ৭৭, ৯৫, ১৩৩, ১৭৮, ১৮৪

দানিশমন্দ খান ২০৭
দাহির ১১
দ্যালিট ৮, ১৩৭
দিল্লী ১, ৬, ১৩, ১৪, ১৭, ১৮ ১৯, ২৩, ২৪, ৩২, ৩৪, ৩৭, ৪০, ৪৪, ৫৩, ৫৫, ৭০, ৭২, ৭৬, ৭৮, ৮৫, ৯০, ৯১, ৯৩, ১০৩, ১০৬, ১১৫, ১৩৯, ১৪০, ১৬৮, ১৭২, ১৭৩, ১৭৪, ১৮০, ১৯৩, ২০৫, ২১৫, ২২৭
দেবল ১১
দোয়াব ৭৩, ৭৪

নজাফ আলী খান ৬
নাসির উদ্দীন খুসরু ১০১
নিকিতিন ৯৩
নিজাম ই-আরুজী ১০
নিজাম উদ্দীন (ওয়াজির) ১৪৪
নিজাম উদ্দীন (সাধক) ১০৫
নিজাম উদ্দীন আহমদ ২, ৫
নূরজাহান ১৫২, ১৫৩

পাঞ্জাব ১১, ১৬৮
পানিপথ ৯৫, ১০১
পেল্‌সারট্‌ ৮, ১৫৩, ২২৫
ফখর-ই-মুদাব্বির ৪০, ৮৭, ১০২
ফখর উদ্দীন মুবারক শাহ ৩
ফজিল খান ১৬২
ফাতেউল্লাহ, মীর ১৫৪
ফারুখ শিয়ার ১৭৯
ফিঞ্চ, উইলিয়াম ২১৫
ফিরিশতা ৭৪, ৯২
ফিরোজ শাহ তুঘলক ২, ১৬, ৩০, ৪৫, ৫৬, ৫৮, ৬২, ৭০, ৭৪, ৭৭, ৭৯, ৮০, ৮৪, ৮৭, ৮৮, ৮৯,

৯১, ৯২, ৯৩, ৯৭, ৯৯, ১০০, ১০৬, ১১৪, ১১৬, ১৬৮, ১৭৩, ১৭৫, ১৯২

বইহাকী, আবুল ফজল ১, ৯২
বঙ্গদেশ (বাংলাদেশ) ৯৩, ২২৬
বলবন, গিয়াসউদ্দীন ৮৭, ৯০, ৯১, ৯২, ১০১, ১১৩, ১১৬, ১৫৫
ব্লকম্যান ১২৪, ১৮৫, ২০১
বদায়ুনী, আবদুল কাদির ২, ৫,১৬৪
বাঁকিপুর ২
বার্নিয়ার ৮, ১৯১, ১৯৭, ১৯৯, ২০১, ২০৫, ২১৫, ২২৫
বাবর ৭৬, ৯৫, ১০১, ১০৩, ১৩৩, ১৩৬, ১৪১, ১৪৪, ১৪৬, ১৭৮, ১৯৮, ১৯৯, ২১১
বারনী, জিয়াউদ্দীন ৭২, ৭৩, ৭৪, ৭৭, ৮২, ৯৮, ১১৮, ১২১, ১২৩, ১২৪, ২১৫
বারবোসা ৯১, ৯২, ৯৫
বাহলুল লোদী ৪০
বিহার ১৮০, ২২৬
বুগরা খান ৯৮
বেরার ১৭৭, ২২৬
বৈরাম খান ১৪৫, ১৪৬, ১৪৭, ১৪৮, ১৪৯, ১৫৩
বোখারী, সাইয়েদ জালাল ১৬৪

মইজউদ্দীন মুহম্মদ-বিন-সাম (মুহম্মদ ঘুরী) ১১, ৯২
মকবুল ৩৯
মনসারেট, ফাদার ৮, ১৩, ২১৩, ২১৮, ২২০
মনু ১৩৫
মহব্বত খান ২২৭
মহারাষ্ট্র ১২৭
মানসিংহ ১৮৬
মানুচী, নিকোলাস ৯, ১৬০, ১৯৫, ২১৫, ২৩৫
মালব ১৮০
মালোয়া ১৫৪, ২২৬
মাস্উদ ১১, ৯২
মাহমুদ (গজনী) ১১, ১০০, ১২৪
মাহমুদ শরকী ৯৩
মাহাম আনগা ১৪৭
মিনহাজ-উস-সিরাজ ১, ৬৭, ১০৭
মিশর ১৬, ১৭, ১২৯
মীর জুমলা ১৫৪, ১৫৫, ১৫৯, ১৬০
মীর ফাতাহ্-উল্লাহ সিরাজী ১৫২
মীরান সদর জাহান ১৬৪
মুজাফফর খান ১৪৭, ১৪৮, ১৫১, ১৫২
মুতামিদ খান ৫, ১৫৩, ১৫৫
মুনইম খান ১৪৬, ১৪৭, ১৫৪
মুন্সী ঠাকুর লাল ৬
মুন্সী হরকরণ ৬

মুলতান ৭৫, ১৮০, ২২৬
মুল্লা আলা-উল-মুলক ১৬২
মুর্শিদ কুলী খান ১৭৯
মুস্‌তাসিম ১২, ১৩
মুশভি খান ১৬৪
মুহম্মদ-বিন-কাসিম ৬১, ৬৩, ১২৪ ১৬৪, ১৬৮
মুহম্মদ বিন-তুঘলক ১৫, ১৬, ৩৯, ৪৫, ৭৩, ৭৭, ৭৯, ৮০, ৮৪, ৮৮, ৯১, ৯৩, ৯৭, ৯৯, ১০০, ১০২, ১০৬, ১০৮, ১০৯, ১১০, ১১৩, ১১৬, ১২১, ১৭৩
মুহম্মদ মুকিম ১৫২
মুহম্মদ শাহ ১৫৯, ১৬১, ১৭১, ২০১
মুহম্মদ শাহ বাহমনী ৯৩
মোরল্যাণ্ড, ডাবল্‌ইউ. এইচ. ৬৩, ৬৭, ৬৯, ৭২, ৭৪, ১১৮, ১২০, ১২১, ১২৪, ১৬৮, ১৮৬, ১৮৭

যদুনাথ সরকার ৪, ১২৮, ১৩১, ১৩৭, ১৩৮, ১৪৩, ১৪৫, ১৬৪, ১৭৫, ১৮১, ১৮২, ২০৯, ২১১, ২২৬, ২৩৮, ২৪৬, ২৫৪

রণথম্ভর ২২৪
রাইপাতর দাস ১৫২
রাইরায়ান ১৫৪
রাণা সঙ্গ ১০৩
রাশিয়া ৩১, ৯২
রুকন উদ্দীন ইব্রাহীম ১৩
রুস্তম আলী ২০১
রোহ্‌টাস ২২৪

লস্কর খান ১৫৫
লাহোর ৮০, ৯২, ১৮০, ২২৬
লাহোরী, আবদুল হামিদ খান ৪ ১৩৭, ১৫৩

শর্মা, শ্রীরাম ২১০
শাকির খান ৫
শামস্‌ উদ্দীন ৯৭
শাহজাহান ৫, ১৩৫, ১৩৬, ১৩৮, ১৩৮, ১৩৯, ১৪৮, ১৫০, ১৫৪, ১৫৫, ১৫৬, ১৫৭, ১৬১, ১৬২, ১৬৪, ১৭৪, ১৭৭, ১৮১, ১৮২, ১৮৬, ১৮৭, ২০১, ২১৯, ২২৩, ২২৮, ২৫২
শাহ নাওয়াজ খান ৫
শাহবাজ খান ১৫৫
শাহ মনসুর ১৫১, ১৫২
শিবাজী ১২৭
শিহাবউদ্দীন ১৪৭

শেখ আবদ-উন-নবি ১৬৪
শেখ কুতুব উদ্দীন ১০৬
শেখ গদাই কম্‌বুহ্ ১৬৪
শেখ ফরিদ ১৫৫
শেরশাহ ৬৮, ৬৯, ৭৫, ৭৭, ৮০, ৮২, ৮৩, ৮৪, ৮৮, ৯৪, ৯৫, ৯৬, ১০২, ১১৫, ১২৩, ১৩৬, ১৪৪, ১৪৬, ১৭২, ১৭৭, ১৭৮, ১৯২, ২০৯, ২১৪, ২২৩

সদর উদ্দীন মুহম্মদ ৭
সহ্‌রিন্দী, ইয়াহিয়া বিন-আহ্‌মদ আস্‌ ২
সা'দ উল্লাহ্ খান ১৫৪, ১৬২
সাদিক খান ১৫৫
সারওয়ানী, আব্বাস ২, ৭৫, ৮২
সালারত খান ১৫৬
সিকান্দার লোদী ৫৯, ৮০, ৮৯, ১০৮
সিন্ধু ১১, ৬১, ১২৪, ১৫৮
সিংহল ৯৩
সুরাট ১১৯
সুলতানখাজা ১৬৪
সেলিম ১৫২

হকিন্স ৮, ১৩৭, ১৫৭
হর্ন ১৯৫, ১৯৭, ১৯৮
হরাভি, খাজা মুহম্মদ সালিহ্ ১৬৪
হলাগু খান ১২
হাজ্জাজ-বিন-ইউসুফ ১১
হাজী আবদুল হামিদ মুহারির গজনভী ৩
হাজী সাইয়েদ ১৬
হামলানী, আলী-বিন-শাহাব ৭
হাসান ১৪
হাসান নিজামী ১, ৬৭, ৮৩, ১১৮
হিওয়েন ৭৭
হিদায়াত উল্লাহ্, সাইয়েদ ১৬৪
হিন্দুবেগ ১৪৫
হিরাতি, খাজা নেয়ামত উল্লাহ্ ২
হুমায়ূন ২৬, ১৩৬, ১৩৮, ১৪৪, ১৪৫, ১৪৭
হুমায়ুন শাহ্ বাহ্মনী ৩৫
হেগ, ডাবল্‌ইউ ১৪০

ভুল সংশোধন

পৃষ্ঠা	পংক্তি	ছাপা হইয়াছে	পড়িতে হইবে
১২	পাদটীকা ২ পংক্তি ২	কয়নেজ	কয়েনেজ
১৩	পাদটীকা ২	কয়নেজ	কয়েনেজ
১৩	পাদটীকা ৩ পংক্তি ২	কয়নেজ	কয়েনেজ
১৩	পাদটীকা ৪	কয়নেজ	কয়েনেজ
১৫	পাদটীকা ২	কয়নেজ	কয়েনেজ
১৫	পাদটীকা ৪	কয়নেজ	কয়েনেজ
১৬	পাদটীকা ২	সিরাত ই-ফিরোজশাহী	পূর্বোক্ত
১৭	পাদটীকা ২	কয়নেজ	কয়েনেজ
২৩	৪	উলামা, আইনবিশারদদের	উলামা ও আইনবিশারদ্‌দের
৩২	১০	না	কিনা
৪১	৮	গভর্ণর	গভর্ন'র
৪৪	পাদটীকা ৩	অ্যাণ্ড	ও
৪৮	পাদটীকা ৫ পংক্তি ১০	হংরেজীতে	ইংরেজীতে
৫৬	পাদটীকা ১ পংক্তি ৬	জৈন্য	জন্য
৬৩	পাদটীকা ২	মোর্ল্যাণ্ড	মোরল্যাণ্ড
৭২	পাদটীকা ৬	ফিরো জশাহী	ফিরোজশাহী

পৃষ্ঠা	পংক্তি	ছাপা হইয়াছে	পড়িতে হইবে
৭৫	পাদটীকা ৩	অ্যাণ্ড	ও
৭৯	পাদটীকা ২	অ্যাণ্ড	ও
৮০	পাদটীকা ২	অ্যাণ্ড	ও
৮১		মুশ্‌রিক	মুশ্‌রিফ
৮২	৪	শেরণাহের	শেরশাহের
৮৫	১৭	খুরাসান	খোরাসান
৮৭	২২	মো কথা	মোটকথা
৮৮	৩	হ তে	হইতে
৮৯	১১	সৈন্য দগকে	সৈন্যদিগকে
৯৪	৬ এবং পাদটীকা ৩	ওরমি	উরমি
৯৯	৪	আলউদ্দীন	আলাউদ্দীন
১০১	পাদটীকা ৪	প্রভিনশল্	প্রভিন্‌শিয়েল
১১২	পাদটীকা ৮	তমাদ্দন	তমাদ্দুন
১১৮	১৪	গভর্ণর	গভর্নর
১২৮	২৬	বল্লহীন	বল্লাহীন
১৩১	পাদটীকা ৪	প্রভিনশল্	প্রভিন্‌শিয়েল
১৪২	৬ ও ১৯	মন্ত্রী-পরিষদ	মন্ত্রি-পরিষদ
১৪৩	১১	মন্ত্রীদের	মন্ত্রিদের
১৪৯	পাদটীকা ১	টার্মস্ পৃ	টার্মস্, পৃ
১৫৪	১১	দায়ি ভার	দায়িত্বভার
১৫৭	২৬	মীরবখশীগণ	মীরবখশিগণ
১৫৮	পাদটীকা ১	ইবনে হাসান	ইবনে হাসান ঃ সেণ্ট্রাল স্ট্রাকচার

পৃষ্ঠা	পংক্তি	ছাপা হইয়াছে	পড়িতে হইবে
১৫৮	পাদটীকা ৩	ইবনে হাসান : সেণ্ট্রাল স্ট্রাকচার	পূর্বোক্ত
১৫৯	১১	মীরাসান	মীরসামান
১৬০	১৩	খান সামানকে	খানসামানকে
১৬২	২৭	ভরণ পেষণের	ভরণপোষণের
১৬৬	১৪, ২৪ ও ২৮	মন্ত্রীদের	মন্ত্রিদের
১৭৬	পাদটীকা ৪	উপকর	উপ-কর
১৭৮	২	অনান্য	অন্যান্য
১৮২	১৭	আওরঙ্গজেবে	আওরঙ্গজেবের
১৮৪	১	চেজি	চেঙ্গিজ
১৯০	১৭	১৬১/২	১৬১/২
১৯১	পাদটীকা ৪	দান. উপহারের	দান ও উপহারের
১৯১	পাদটীকা ১	বার্নিয়ার ট্রাভ্‌লস	বার্নিয়ার : ট্রাভলস্
১৯৫	৩	পটনে	প˜টনে
২০২	পাদটীকা ৩ পংক্তি ২	ডিক্‌শ্যান্যারিতে	ডিক্‌শেনারিতে
২০৩	পাদটীকা ১ পংক্তি ২	ডিক্‌শন্যারি	ডিক্‌শেনারি
২০৩	পাদটীকা ৩ পংক্তি ২	ডিক্‌শন্যারি	ডিক্‌শেনারি
২১৩	পাদটীকা ৩	গভর্ণমেণ্ট	গভর্নমেণ্ট
২১৭	পাদটীকা ১ পংক্তি ৩	ডিক্‌শন্যারি	ডিক্‌শেনারি
২১৮	২১	চুড়ান্ত	চূড়ান্ত

পৃষ্ঠা	পংক্তি	ছাপা হইয়াছে	পড়িতে হইবে
২১৯	পাদটীকা ৫ পংক্তি ৪	যে	যে,
২২১	১৭	বিশেয	বিশেষ
২৩৬	২৫	ফৌজদারের। পদ-মর্যাদা	ফৌজদারের পদ-মর্যাদা
২৩৭	৯	সাওয়ানিহ্-নর্বিস	সাওয়ানিহ্-নবিস
২৪০	৫	মন্ত্রীদের	মন্ত্রিদের
২৫৫	৭	সমদ্ধি	সমৃদ্ধি